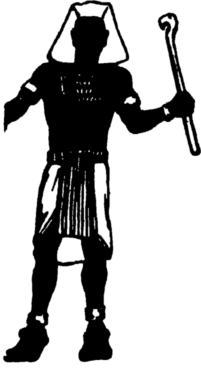
প্রথম দে'জ প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : রবিশঙ্কর বণিক। মাইক্রোডট্ কম্পিউটার
২০ শ্যামপুকুর লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

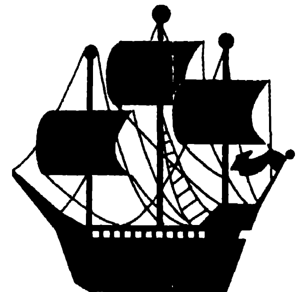




সূচীপত্র









ইনভিজিবল ম্যান

এইচ্. জি. ওয়েলস্

॥ এক ॥

সে এক তুষারাবৃত্ত ফেব্রুয়ারীর রাত্রি। হাড়কাঁপানি ঠাণ্ডা, বাইরে বেরনো পথচারীরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে ব্র্যামব্লেহার্স্ট রেল স্টেশনে ট্রেন থেকে একজন আগন্তুক নামলো। একটা বড় ব্রিকড্ টুপি এবং লম্বা কালো কোট তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের কামড় থেকে এবং গ্লাভস্ মোড়া হাতের সুটকেসের ওপর জমে থাকা তুষারের শীতের কাঠিন্য থেকে সেইসব আবরণগুলো কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারছিল না তাকে। সে সবই যেন ঠুনকো এবং শীতের প্রকোপের কাছে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বলে মনে হলো।

স্টেশনে কোনো ঘোড়ার গাড়ির পাত্তা নেই। অথচ রাতের মধ্যেই ছোট গ্রাম ইপিং-এ পৌঁছতেই হবে তাকে। বাইরে প্রচণ্ড ঝোড়ো-বাতাস আর সেই সঙ্গে তুষারপাত হয়ে চলেছে তখনও। অগত্যা তাই পায়ে হেঁটেই তাকে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হলো বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে। সে যখন তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছলো তখন সে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত ও পরিশ্রান্ত।

'কোচ এণ্ড হর্সেস' পান্থশালার দরজা খুলে বিধ্বস্ত আগন্তুক এমন ক্লান্ত হয়ে ঢুকল যে, তাকে এখন জীবন্ত লাশের মতোই দেখাচ্ছিল বুঝি, মৃত না জীবিত কিনা সে, দূর থেকে বোঝা মুশকিল, সেটা ঠাওর করতে তার খুব কাছে যেতে হবে। মাথাটা তার বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এহেন অবস্থায় কোনোরকমে সে খুব কষ্ট করে সে তার প্রয়োজনীয় কথাটা সেরে নিতে চাইলো ঃ 'আমার একটা ঘর চাই, হ্যাঁ তাতে যেন একটা অগ্নিচুল্লীর ভালো ব্যবস্থা থাকে, কেন যে দরকার আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বাইরে প্রচণ্ড শীতে আমি একেবারে কাবু হয়ে গেছি। যেকোনা মুহূর্তে আমার দেহ থেকে পৈত্রিক প্রাণটা বেরিয়ে যেতে পারে। একটু উষ্ণতার জন্য আমার এখন একটা গরম ঘরের খুবই প্রয়োজন। প্লিজ—'

'আমি ইনকীপার মিসেস হল,' ভদ্রমহিলা বার-এর পিছন থেকে বেরিয়ে এসে তাকে পথ দেখাতে গিয়ে বললো, 'স্যার, দয়া করে যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেন, ওপরতলায় একবার আসেন, তাহলে মনে হয় আমি আপনার পছন্দ মতো একটা উপযুক্ত ঘর আপনাকে দেখাতে পারি!'

ওপরতলায় উঠে সেই ঘরটার ভেতরে ঢুকে মিসেস হলের দিকে পিছন ফিরে অগ্নিচুল্লীর দিকে সরেজমিনে লক্ষ্য করতে গিয়ে আগন্তুক এবার ঘর ভাড়া এবং আহারের খরচ খরচার ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকে। আগন্তুক এ ব্যাপারে কোনো দর দস্তুর করলো না, ইনকীপারের কথায়

রাজী হয়ে গেলো। মিসেস হল এবার তার প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কাজ সেরে নিতে থাকলো। প্রথমেই শীতে পঙ্গু বোর্ডারকে একটু আরাম দেবার জন্য অগ্নিচুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর নিচে নেমে এলো তার আহারের ব্যবস্থা করবার জন্য।

গরম গরম খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে সে যখন আবার ফিরে এলো, তখন অগ্নিচুল্লীর কাঠের আগুন গনগন করে জ্বলছে, এর ফলে ঘরটা যথেষ্ট গরম ও আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। আগন্তুক অবশ্য তখনও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে ঝড়-ঝঞ্ঝার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। হয়তো সে তখন ভাবছিল, এই দুর্যোগ কখন কাটবে, তার যে এখন বাইরের কাজই বেশি। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ না কাটলে কি করেই বা সে বাইরে বেরোবে?

ইনকীপার স্থির দৃষ্টিতে তার পোশাকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে এবার সে না বলে থাকতে পারলো না, যা সে ঘরে ঢুকেই বলবো বলবো ভাবছিল।

'স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনার কোট আর টুপি থেকে তুষার গলে গলে পড়ছে আমার কার্পেটের ওপর। ওগুলো আমি কি রান্নাঘরে নিয়ে যাবো শুকোবার জন্য?'

'না!' লোকটা তিক্তস্বরে প্রবল আপত্তি জানালো, অবশেষে মিসেস হলের দিকে ফিরে আবার তেমনি আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলো, 'ওগুলো আমি আমার গায়ে চাপিয়ে রাখতেই বেশি পছন্দ করি।'

সেই মুহূর্তে এই প্রথম আগন্তুকের দিকে ভালো করে তাকালো মিসেস হল। চওডা টুপির নিচে বড় আকারের চশমায় তার চোখের সামনেটা এবং দুপাশটা ঢাকা পড়ে গেছলো। ঘন দাড়ি-গোঁফ তার কোটের কলার ঢেকে দিয়েছিল। এর ফলে তার গাল ও চিবুক সম্পূর্ণভাবে আড়াল হয়ে গেছিলো, মুখটা অস্পষ্ট, তার প্রকৃত চেহারা বোঝা ভার।

'সে তো খুব ভালো কথা,' মিসেস হল তার অসন্তুষ্টির কথা চেপে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো পত্রপাঠ।

রান্নাঘরে ফিরে এসে মিসেস হল আবিষ্কার করলো, নতুন বোর্ডারের মাংসের কারির সঙ্গে রাই-সরষে দিতে ভুলে গেছে। তাই সেটা সে একটা ট্রের ওপর রেখে সেটা নিয়ে আবার ওপরতলায় ফিরে গেলো।

অভ্যাসবশত মাত্র একবারই দরজায় নক করার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ঠেলে আগন্তুকের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। তার হঠাৎ আবির্ভাবে লোকটা বিস্মিত হয়ে উঠলো। সে তখন টেবিলের নিচে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছিল। মিসেস হলের আকস্মিক আবির্ভাবে তার মুখটা কেমন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

অগ্নিচুল্লীর সামনে একটা চেয়ারের ওপর সে তার কোট এবং টুপিটা ঝুলিয়ে রেখেছিল। সেদিকে তাকিয়ে মিসেস হল বলে উঠলো, 'স্যার আমি কি এখন এদুটো নিয়ে যেতে পারি?'

'কোটটা, হ্যাঁ নিয়ে যেতে পরেন, কিন্তু টুপিটা রেখে যান,' চেয়ারে বসতে গিয়ে লোকটা চাপা গলায় বললো।

মিসেস হল তার সামনের দৃশ্যটা দেখে শক্ পাওয়ার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। দৃশ্যটা একদিকে যেমন অদ্ভুত, তেমনি আবার হিমদৃশ্যও বটে! লোকটার নীল চশমার নিচে সাদা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে তার মাথাটা জড়ানো। কেবলমাত্র একটা উজ্জ্বল চকচকে নাক এবং কিছু খুচরো ঘন কালো

চুল ব্যাণ্ডেজের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে দেখা গেল। তার হাতদুটো বড় আশ্চর্য। আগে গ্লাভস্ দিয়ে ঢাকা ছিল। বড় একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে সে তার মুখ ও চোয়ালদুটো সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রেখেছিল। তার পরনের ড্রেসিংগাউনের উঁচু কলারটা তোলা ছিল এবং গলার সামনে একটা স্কার্ফ বাঁধা ছিল।

তার কোট ও টুপিটার দিকে তাকিয়ে মিসেস হল বুঝি বা তখনও একটু ইতস্তত করছিল। লোকটার দৃষ্টি এড়ালো না। তেমনি দৃঢ়স্বরে সে তার একটু আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে আবার বলে উঠলো, 'বললাম না টুপিটা রেখে দিতে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার।' ভদ্র মহিলা ধীরে ধীরে তার শক্টা কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে আমতা আমতা করে বলে উঠলো, "আমি স্যার জানতাম না যে,—'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম, এতেই যথেষ্ট। এখন আপনি আসতে পারেন।'

'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।' এই বলে মিসেস হল তার কোটটা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ।পিছনে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকলো সে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে আপন মনে সে বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'বেচারা নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে থাকবে, কিংবা অপারেশন জাতীয় সেরকম কিছু হয়ে থাকবে তার। উঃ, ওই সব ব্যাণ্ডেজগুলো আমাকে কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছে। সেই আতঙ্কে এখনও আমার বুক যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর মনে হয়, সে তার মুখেও আঘাত পেয়ে থাকবে। তোয়ালের আড়াল থেকে যেভাবে থেমে থেমে কথা বলছিল তাতে আমার মনে হয়েছে, কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। বেচারা!' এই সব কথা ভাবতে ভাবতে রান্নাঘরে ফিরে এলেন মিসেস হল। এখনও তার অনেক কাজ বাকী আছে। সেগুলো সারতে হবে, ভাবলো সে।

আগন্তুক তার আহার-পর্ব সারার পরেই, অগ্নিচুল্লীর সামনে একটা আরামকেদারায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে সে তার পাইপে অগ্নি সংযোগ করলো। মিসেস হল এখনি খাবারের ট্রে-টা সংগ্রহ করতে আসবে জেনে সে তার মুখের নিচের অংশটা স্কার্ফ দিয়ে জড়িয়ে ফেললো এবং পাইপটা তার ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে গুঁজে দিলো।

মিসেস হল একটু পরেই দরজায় নক্ করে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো। একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো সে। খাবার, পানীয় এবং ঘরের উষ্ণতার স্পর্শে আগন্তুকের মুখে একটা অদ্ভুত পরিবতন এসে গেছে যেন। তাই এই পরিবর্তনের ছোঁয়া অনুভব করা গেলো তার পরবর্তী কথাবার্তায়। আগের চেয়ে অনেক বেশি নম্র গলায় সে বললো ঃ

'ব্রামব্লেহার্সট স্টেশনে আমার কিছু লাগেজ রেখে এসেছি মিসেস হল। এখন সেগুলো এখানে কিভাবে আনা যায় বলুন তো?"

'আজ রাতের মধ্যে আমার স্বামী আমাদের ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে। আগামীকাল আপনার জিনিসপত্রগুলো স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে পারে।'

'আগামীকাল! আজ রাতের মধ্যেই অন্য কেউ সেগুলো আনতে পারে না?'

'না পারে না স্যার।'

'কেন?'

'এখানকার রাস্তা সব খাড়াই-উৎরাই, প্রতি পদক্ষেপে দুর্ঘটনা ঘটার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। বিশেষ করে এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সে ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। আশাকরি আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কিরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—'

'হ্যাঁ, আমি তা বুঝতে পারি বৈকি! আমি নিজেও সেরকম একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। যাতে আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়ে গেছে। আমাকে এখন অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে, আর তাই তো এখন বেশিরভাগ দিনের বেলায় আমি আমার চোখে রঙিন চশমা লাগিয়ে থাকছি।'

'ঠিক কিরকম দুর্ঘটনা বলুন তো?'

'সেটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয় মিসেস হল। আমি আপনাকে যা বলতে পারি তা হলো, আমি একজন বিজ্ঞানী, একটা অত্যন্ত সমস্যামূলক গবেষণার কাজে আমি ব্যস্ত আছি এখন। আমার ব্যাগের মধ্যে আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য এবং আমার নোটবুকটা রয়েছে। কোনোরকমে কালবিলম্ব না করেই আমি আমার গবেষণার কাজ শুরু করতে চাই। তবে আগামীকালের মধ্যে সেগুলো যদি পেয়ে যাই তাহলে মোটামুটিভাবে আমি আমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। তাহলে এই কথা রইলো মিসেস হল। শুভরাত্রি ম্যাডাম!'

মিসেস হল ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আপন মনে বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'লোকটা তার দুর্ঘটনা সম্পর্কে খুবই সচেতন, ভেঙে কিছু বলতে চায় না, তাই না?'

মিসেস হল বার-এ ফিরে যাবার জন্য ভেতরে ভেতরে ভীষণ তাগিদ অনুভব করলো। ফিরে গিয়ে সেখানে সে তার খদ্দেরদের কাছে সে তার এই রহস্যময় অতিথির বিস্তারিত বিবরণ দিতে চায়।

তার মুখ থেকে সব শোনার পর বেশিরভাগ খদ্দেররা এই আগন্তুকের দুর্ঘটনার জন্য সহানুভূতি দেখালো। তবে তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হলো গ্রামের ঘড়িপ্রস্তুতকারক টেডি হেনফ্রে।

'হাঃ, দুর্ঘটনা?' তিক্তস্বরে সে বলে উঠলো, 'পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে তাকে এখানে লুকিয়ে তো থাকতেই হবে! নিজেকে ব্যাণ্ডেজে ঢেকে রাখাটাই তো লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে ভালো উপায়।'

'ব্যাণ্ডেজের আড়ালে কে কাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে?' পান্থশালার প্রবেশ পথ থেকে একটা কৌতূহলী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'একজন আগন্তুকের মিঃ হল, এই মাত্র তোমার স্ত্রী যাকে একটা ঘর ভাড়া দিয়েছে, উত্তরে টেডি বললো।

'আগামীকাল স্টেশন থেকে তুমি যখন তার লাগেজ বয়ে নিয়ে আনবে এখানে আমি সেগুলো ভালো করে দেখতে চাই।'

'শোনো টেডি, তুমি তোমার চরকায় তেল দাও, অন্যের চরকায় তেল দিতে এসো না।' মিসেস হল রুক্ষস্বরে বললো, 'আর হল, তুমিও! এ হলো আমার পান্থশালা, আমি যেটা ঠিক মনে করবো ঠিক সেভাবেই সেটা চালাবো, অহেতুক তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কিন্তু ওদের দু'জনকে কড়া কড়া কথা শোনানো সত্ত্বেও মিসেস হলকে আপন মনে স্বীকার করতেই হলো, ওই আগন্তুকের ব্যাপারে সে-ও কম সন্দিহান নয়। আর সেই সব সন্দেহ সেদিন

রাত্রে তার সারা স্বপ্নের মধ্যে চেয়ে রইলো, গলার ওপর সাদা ওলকপির মাথায় বিরাট বিরাট দুটি কালো চোখ।............সেই মাথাটা গ্রামের প্রতিটি রাস্তায় তার পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে যেন। যেখানেই সে যায় না কেন, সেখানেই সেই অদ্ভুত জীবটাকে দেখতে পায়।

।। দুই।।

ঃ গবেষণার সূত্রপাত ঃ

পরের দিন সকালে মিঃ হল ঘোড়ারগাড়ি চালিয়ে পান্থশালায় ফিরে এসে আগন্তুকের লাগেজপত্তর গাড়ি থেকে নামাতে সাহায্য করবার জন্য চিৎকার করে উঠলো।

'হায় ঈশ্বর!' তার স্ত্রী পান্থশালা থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে উঠলো, 'ভাবলাম তার ঘরে কয়েকটা ট্রাঙ্ক থাকবে, কিন্তু তার বদলে এ যে দেখছি, ডজনখানেক বাক্স, ছটি কাঠের বাক্স, আর কি আছে, কে জানে!'

ওদিকে আগন্তুকও পান্থশালার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ হলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো সে, 'ওগুলো নিয়ে এসো! ওগুলোর জন্য অনেকক্ষণ ধরে আমি অপেক্ষা করছি।' তার কোটের কলারটা ওপরের দিকে তোলা ছিল, তার চওড়া টুপিটা অনেকটা নিচে নামানো, এর ফলে তার মুখটা অনেকটা ঢেকে গেছে; আর তার হাতদুটো ভারি গাঢ় রঙের গ্লাভসে ঢাকা ছিল।

আগন্তুক যখন ঘোড়ারগাড়ি থেকে একটা ছোট বাক্স তুলে নিতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি এক প্রতিবেশীর কুকুর সেই আগন্তুকটির কাছে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে তার একটা হাত লক্ষ্য করে। মিঃ হল ঘোড়ারগাড়িতে পৌঁছনোর আগেই কুকুরটা আগন্তুকের গ্লাভস্ পরিহিত হাতে কামড় বসিয়ে দেয় এবং ট্রাউজারের ওপর থেকে তার এক পা কামড়ে ধরে।

পরমুহূর্তে কুকুটার পিঠে চাবুকের আঘাত এসে পড়লো, এর ফলে আগন্তুকের পায়ের ওপর থেকে কুকুরটা তার কামড় তুলে নিতে বাধ্য হলো। ইতিমধ্যে কুকুরটার মালিক এগিয়ে আসে তাকে সামলাবার জন্য। হল দম্পতিরা চিৎকার করে তার উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে থাকে। আগন্তুক তার ছিন্ন গ্লাভস্ এবং ট্রাউজারের দিকে চকিতে একবার দেখে নেবার পর পান্থশালার ভেতরে ঢুকে সোজা তার ঘরে চলে যায়।

ওদিকে মিঃ হল ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, ''আমি বরং ভেতরে গিয়ে দেখি আগন্তুক ঠিক আছে কিনা, কি বলো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যাও, তাড়াতাড়ি করো! তার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো।

আগন্তুকের ঘরের দরজা খোলাই ছিল, হয়তো রাগে উত্তেজনায় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে থাকবে সে। যাই হোক, হল সহজেই তার ঘরে ঢুকে প্রথমে তাকে সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো তার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। দরজা জানালার পর্দাগুলো নামানো থাকার দরুন ঘরের আলোটা অস্পষ্ট, তবু সেই অস্পষ্ট আলোয় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলো হল। শুধু অদ্ভুতই নয়। এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। লোকটার কোটের একটা হাতা তার সামনে দুলতে থাকে............কিন্তু কি আশ্চর্য রক্ত-মাংসের হাত নেই! পরমুহূর্তেই হল তার বুকে একটা কঠিন

আঘাত অনুভব করলো। কেবল এখানেই শেষ নয়, আরও অনেক বিষয় যেন অপেক্ষা করছিল তার জন্য। তারপর সেই হাত-বিহীন কোটের হাতার ধাক্কায় ঘরের বাইরে ছিটকে পড়লো সে এবং পরক্ষণেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো তার মুখের ওপর।

হল হতভম্বের মতো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু না বোঝার মতো আপন মনেই ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকলো সে। ঘটনার আকস্মিকতা কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে সে তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, 'ঘরের ভেতরে ঐ আমি কি দেখলাম? আমি কি কিছু দেখেছি?'

জবাব না পেয়ে সে এর পর ক্লান্ত বিষণ্ণ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। তার হতভম্বভাবটা কাটেনি তখনো। ওদিকে পান্থশালার বাইরে তখন রীতিমতো ভীড় জমে গেছে। তার স্ত্রী তখনো সে বেয়াদপ কুকুরের মালিকের সঙ্গে সমানে তর্ক করে যাচ্ছিল। মালিক তার কুকুরের গলায় বেল্টটা সজোরে চেপে ধরে রেখেছিল তাকে।

আগন্তুকের ঘরের মধ্যে হল আসলে কি যে দেখেছিল নিজেই জানে না, তাই সে তার স্ত্রীকে শুধু বললো, 'আমার কোনো সাহায্যই চায় না সে। আমার মনে হয় আমরা বরং তার লাগেজপত্তর তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'তবু কুকুরে কামড়ানো বলে কথা, আমার মনে হয় কুকুরে কামড়ানো তার ক্ষতস্থানটা একবার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলে বোধহয় ভালো করতেন।' ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন মহিলা পরামর্শ দিলো।

'আমি কিন্তু তার শরীরের কোনো অংশে রক্তের চিহ্ন দেখতে পাইনি।' আর একজন বলে উঠলো, 'এমন কি ছেঁড়া ট্রাউজার বা গ্লাভসের নিচে চামড়ায় কোনো ক্ষতের চিহ্ন দেখতে পাইনি।'

'সেটা কোনো ব্যাপার নয়,' আর একজন পুরুষ তাদের সেই আলোচনায় একটা জ্বালাময়ী পরামর্শ দিলো, 'কুকুরটাকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত, আর এখনি!'

ঠিক এই সময়ে কুকুরটা তার মালিকের বন্ধন ছিন্ন করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কুকুরটা নাক উঁচিয়ে পান্থশালার দিকে কি যেন ইঙ্গিত করলো এবং তীব্র স্বরে গর্জন করতে শুরু করে দিলো। তা দেখে উপস্থিত সবাই তখন পান্থশালার প্রবেশ পথের দিকে তাকালো।

'মিঃ হল চলে আসুন!' পান্থশালার প্রবেশপথের দরজার সামনে এসে আগন্তুক রাগতস্বরে বলে উঠলো।

আগন্তুকের পরনে নতুন ট্রাউজার এবং হাতদুটো নতুন গ্লাভসে মোড়ানো ছিল। তার কোটের কলারটা ওপরে ওঠানো ছিল তখনো। আর তার বড় প্রশস্ত টুপিটা আবার তার মুখের ওপরে নামানো, তাতে তার মুখের অনেকখানি অংশ ঢাকা পড়ে গেছে।

'স্যার, আপনার আঘাত কি খুব গুরুতর?' মিসেস হল জিগ্যেস করলো।

'না, খুব একটা নয়। কুকুরটা আমার হাত বা পায়ের চামড়ায় একটু আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারেনি।' তারপর সে তার স্বামীর দিকে ফিরে বললো, 'মিঃ হল, লাগেজগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসুন।'

হল আর কালবিলম্ব না করে লাগেজগুলো এক এক করে তুলে নিয়ে এলো আগন্তুকের ঘরে। সেগুলো রাখতেই আগন্তুক অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাক্সগুলো খুলতে শুরু করে

দিলো। বাক্সের ভেতর থেকে খড়ের কুচি বার করলো, কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়লো সেগুলো যন্ত্রপাতিগুলো বার করতে গিয়ে। শুধু যন্ত্রপাতিই নয়, সেই সঙ্গে বেরিয়ে এলো হাতে লেখা নোটবুক, টেস্ট টিউব এবং নানান আকারের নানান রঙের আরও কিছু বোতল। সেগুলোর মধ্যে কিছু পাউডারে ভর্তি ছিল এবং আরও কিছু বোতলে তরল 'বিষ'-এর লেবেল আঁটা ছিল। সেগুলো সে ক্যাবিনেটে, সেলফ, জানালার ওপরে তাক এবং ঘরের চারপাশে ছড়ানো টেবিলগুলোর ওপরে রাখলো। সেটা এখন আর শয়নকক্ষ বলা যাবে না, যেন গ্রামের কোনো এক ওষুধের দোকান।

পোশাক ভর্তি ট্রাঙ্ক এবং বই ভর্তি বাক্সগুলো অস্পর্শ রেখে আগন্তুক তখনি তার গবেষণার কাজে নেমে পড়লো। সারাটা সকাল এক নাগাড়ে সে তার গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলো ঃ কখনো বোতল থেকে টেস্ট টিউবে ঢেলে পাউডার মেশানো এবং টেস্ট টিউবগুলো ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে থাকে তরল পদার্থ ও পাউডারের মিশ্রণ প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য। এক সময় মিসেস হল মধ্যাহ্নভোজের ট্রে হাতে দরজায় নক করে যখন তার ঘরে ঢুকলো, দেখলো তার ভ্রূক্ষেপ নেই, আপন মনে তন্ময় হয়ে সে তার গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলো।

প্রথমে মিসেস হলের কোনোরকম মনোযোগ না দিলেও পরে কিন্তু সে যখন টেবিলের ওপর খাবারের ট্রেটা রাখলো, যেন সে দেখলো আগন্তুক তার অভ্যাস মতো চোখে নীল চশমাটা পরেনি।

'হায় ঈশ্বর!' হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলো মিসেস হল। 'কি আশ্চর্য, আগন্তুকের অক্ষি কোটর যে শুন্য, এরকমই যে দেখাচ্ছে বলে আমার মনে হলো।' নিজের মনেই কথাগুলো বললো সে।

আগন্তুক তার মনের কথা শুনতে না পেলেও তার হাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ঠিক শুনতে পেলো এবং তার অর্থ বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না তার। মিসেস হলের ভাবনার কথাটা অনুমান করেই বোধহয় সে দ্রুত নীল চশমাটা তার চোখে লাগিয়ে নিলো। তারপর রুক্ষস্বরে বললো, 'আমি চাই এর পর থেকে ভবিষ্যতে দরজায় নক্ করবেন এবং আমার অনুমতি পেলে তবেই ঘরে ঢুকবেন, তার আগে নয়!'

'স্যার, আমি বেশ কয়েকবার দরজায় নক্ করেছিলাম, কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা গেলো যে, আপনি বোধহয়—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সম্ভবত আপনি নক্ করেছিলেন। কিন্তু আমার গবেষণার কাজে তখন মনসংযোগটা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই আমি আদৌ কোনো গোলমাল পছন্দ করি না।'

''আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। দরজায় একটা তালা আছে, ইচ্ছে করলে আপনি যেকোনো সময়ে সেটা ব্যবহার করতে পারেন।' তারপব কার্পেটের ওপর অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খড়কুটোগুলোর প্রতি আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে একটু খোঁচা দেবার জন্যই বললো, 'আপনার বাক্স খালি করবার সময় এই যে সব খড়ের টুকরোগুলো স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে, এর অর্থ হলো পরিষ্কার করতে বাড়তি পরিশ্রম হয়।'

'এ ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করবেন বা। এর জন্য বাড়তি খরচ যা হয় আমার বিলে না হয় চার্জ করে দেবেন। এখন আমাকে কাজ করতে দিন, আপনি যেতে পারেন।'

পরবর্তী বেশ কয়েক ঘণ্টা আগন্তুকের ঘর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না কারণ

নিঃশব্দে কাজ করছিল সে। তারপর হঠাৎই বোতল ভাঙার শব্দ শুনতে পেলো মিসেস্ হল। আর সেই সঙ্গে আগন্তুকের ঘরে পায়ের দাপাদাপির শব্দ ভেসে এলো। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে এরকম আশঙ্কা করে মিসেস হল একরকম ছুটেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে এলো। আগন্তুকের শাসানির কথা মনে পড়ে যেতেই নক্ না করে দরজায় কান পেতে শুনতে থাকলো।

'এভাবে আমি চলতে পারি না,' ক্রুদ্ধ হয়ে লোকটা বলে উঠলো, 'না, এভাবে আমি চলতে দিতে পারি না! এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উত্তর পেতে পেতে আমার সারাটা জীবন তাহলে কেটে যাবে। আমার সময় নেই। আর আমার ধৈর্য্যও নেই! আমি কিই বা করতে পারি?'

।। তিন ।।

ঃ কিছু অনুভব, কিন্তু দেখার কিছুই নেই। ঃ

এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত পরবর্তী দু'মাস আগন্তুক প্রতিদিন এবং প্রায় বেশিরভাগ রাত জেগে কাজ করতে থাকে। কচ্চিৎ কাজ বন্ধ করে হেঁটে বেড়ায়, কিন্তু সে শুধু সন্ধ্যালোকে।

মিসেস হল যখন তার জন্য খাবার নিয়ে আসে, কিংবা সে যখন বাইরে বেরোয় তখন সব সময় সে তার মুখ আর হাত ঢেকে রাখে। সে যখন বাইরে বেড়াতে বেরোয় যেন গ্রামবাসীদের অভিবাদন এড়িয়ে যায়। তবে বাচ্ছা ছেলে বৌয়েরা যখন তার পিছু ধাওয়া করে সে তখন যথেষ্ট মজা উপভোগ করে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের মনে কথা বলে সে এবং মাঝে মাঝে রাগে উত্তেজনায় ঘরের আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করতে থাকে।

মিসেস হল তার আসবাবপত্র ভাঙচুর হতে দেখে অভিযোগ করলে, সে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার দামের সঙ্গে বাড়তি কিছু অর্থ দিয়ে দেয় তাকে।

এ ব্যাপারে মিঃ হল বহুবার তার স্ত্রীকে বলেছে, এই আগন্তুকের হাত থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা করার জন্য, কিন্তু প্রতিবারেই সে তার স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছে, 'বছরের এই সময়ে আমারা খুব বেশি পেয়িংগেস্ট পাই না। তাই গ্রীষ্মের ব্যবসা যতক্ষণ না শুরু হয় আমি অপেক্ষা করবো। সে তো এখন তার বিল পেমেন্ট করে যাচ্চে যথারীতি আর আমরা সেই টাকা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি।'

ইপিং-এ তিনমাস থাকার সময় গ্রামবাসীদের মধ্যে এই আগন্তুক নিয়মিত আলোচনার খোরাক হয়ে দাঁড়ালো। তার ব্যাপারে প্রশ্নগুলোর জবাবে মিসেস হল ব্যাখ্যা করে বলে, 'সে একজন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী, সরকারের হয়ে একটা অত্যন্ত গোপন গবেষণার কাজ চালাচ্ছে সে', কিংবা যেমন, 'একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় পড়ে সে যায় সে ফলে তার মুখ ও হাত ভয়ঙ্করভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। সে একজন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবন ভদ্রলোক, তাই সে জনসাধারণের সামনে মুখ দেখাতে চায় না।'

সে যাই হোক, শহরের লোকেরা কিন্তু টেডি হেনফ্রের ব্যাখ্যাটাই বেশি পছন্দ করে' টেডির ধারণা হলো, লোকটা একজন অপরাধী, তাই সে চোখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পুলিশের কাছ থেকে নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। এই লোকটির ব্যাপারে অন্যেরা আবার অযথা সময় নষ্ট করতে চায় না, তাদের বক্তব্য খুবই সহজ সরল, লোকটি নির্দোষ, স্রেফ একটা পাগল ছাড়া আর কিছু নয়!

অন্য সবার চেয়ে ইপিং-এ একজন লোক এই আগন্তুকের ব্যাপারে অনেক বেশি কৌতূহলী, সে হলো গ্রামের ডাক্তার জন কাস। হাজার হাজার বোতলের কাহিনী শুনে সে মুগ্ধ। তাই সেগুলোর নিজের চোখে দেখতে চায় সে। কিন্তু এর জন্য কি অজুহাত বা কারণ দেখাবে সে? যাই হোক, অনেক ভেবেচিন্তে আগন্তুকের ঘরে যাবার একটা উপযুক্ত বাহানা পেয়ে গেলো সে ইপিং নার্স ফাণ্ডে চাঁদা সংগ্রহের অনুরোধ নিয়ে ডাঃ কাস কোচ এণ্ড হর্সেস পান্থশালায় গিয়ে হাজির হলো।

মিসেস হল ডাঃ কাসকে সঙ্গে করে ওপরতলায় আগন্তুকের ঘরের সামনে নিয়ে এলো। ডঃ কাস দরজায় নক্ করলো। মিসেস হল অপেক্ষা করে রইলো। উত্তরে ঘরের ভেতর থেকে বিড়বিড় আওয়াজ শোনা গেল, ঠিক মতো বোঝা গেল না গেলেও সেটা যে ঘরে ঢোকবার অনুমতি দেওয়া, এরকম একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে ডাক্তার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

অবশ্য ডঃ কাস ঘরে ঢুকে পিছন থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেও মিসেস হল কিন্তু এক পাও নড়লো না হলওয়ে থেকে. আগন্তুক ও তার গতিবিধির ব্যাপারে সে যেন এত বেশি কৌতূহলী যে, সেখান থেকে নড়তে চাইলো না, সেখানে দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে। কিন্তু তাতে যে তার কৌতূহল খুব একটা মিটলো তা নয়, কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে সে যা শুনলো, সে সব সবই বিড়বিড় শব্দ, অস্পষ্ট, যা বোধগম্য হবার নয়!

হঠাৎ এক আশ্চর্যজনক চিৎকারের শব্দ শুনে লাফিয়ে পিছু হটে গেলো। সেই শব্দের পরে পরেই দ্রুত পায়ে চলার শব্দ এবং হাসিতে ফেটে পড়ার শব্দ ভেসে এলো তার কানে। তারপরেই দরজাটা হাট করে খুলেই ডঃ কাস একরকম ছুটেই সেই দরজা পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। তার দৃষ্টি তখনো পড়েছিল ঘরের ভেতরে, সে চোখে তার ভয়ঙ্কর ভয়ার্ত চাহনি এবং তার মুখখানি ভয়ঙ্কর সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, যেন সেই মাত্র ঘরের ভেতর থেকে কেউ কোনো কারণে তার মুখের ওপর থেকে রক্ত শুষে বার করে নিয়েছিল। সিঁড়ির দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাবার জন্য মিসেস হলের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো সে সেখান থেকে।

শয়নকক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করতে গিয়ে আগন্তুক তেমনি বন্যহাসি হাসছিল, সেই হাসির শব্দ মিসেস হলের কানে স্পষ্ট ভেসে এলো।

ইতিমধ্যে ডঃ কাস তখন রেভারেণ্ড বান্টিং-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। যাজকের স্টানিতে হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ে ডঃ কাস। হাঁপাচ্ছিল সে। দম নেবার জন্য হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল সে। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু কোনোরকমে সে বলে উঠলো, 'আমার মনে হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আচ্ছা, আমাকে কি পাগলের মতো দেখাচ্ছে?'

বিস্মিত রেভারেণ্ড গির্জায় বক্তৃতা মঞ্চে বক্তৃতা দেবার জন্য ধর্মোপদেশ লিখছিলেন, লেখা বন্ধ করে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাগল? কাস, তোমার এতো রাগের কারণ কি জানতে পারি?'

'পান্থশালায় সেই আগন্তুকটির জন্য,' রুদ্ধশ্বাসে বলল ডাক্তার। 'এই মাত্র তার সঙ্গে আমার এক ভয়ার্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। নার্স ফাণ্ডে চাঁদা তুলতে গিয়েছিলাম তার কাছে। তার ঘরের দরজা খুলতেই দেখি আমাকে দেখা মাত্র সামনে ভূত দেখা মাত্র ভয় পেয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতদুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে ধপাস করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লো। আমি যখন নার্স

ফাগুের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সারাক্ষণ আমার দৃষ্টি পড়েছিল বোতল, পাউডার, রাসায়নিক দ্রব্য আর টেস্ট টিউবের ওপরে। মায় আমার দৃষ্টি পড়ছিল তার ঘরের সর্বত্র। তারপর আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা, আপনি কি কোনো গোপন গবেষণার প্রজেক্টের ওপর কাজ করছেন?'

'মনে হয় তার সর্দি লেগে থাকবে, হাঁচি চেপে নাকি সুরে আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলো সে, 'যদি আপনি একান্তই জানতে চান তাহলে বলবো হ্যাঁ! বছরের পর বছর ধরে আমি একটা ফরমুলার সন্ধান করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি উত্তরটা পেয়ে গেছি। কিসের জন্য কখনো মনে করিনি। এই গবেষণার সমস্ত উপাদানগুলো এটা কাগজের টুকরোর ওপরে লিখে ল্যাব-টেবিলে রেখেছিলাম, হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঢুকে এসে কাগজটাকে অগ্নিচুল্লীর দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি যখন মরিয়া হয়ে উঠে সেদিকে ছুটে যাই কাগজটা দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরবার জন্য ঠিক এই ভাবে—'

'এই বলে আমাকে দেখানোর জন্য সে তার হাতদুটোকে বুঝি বা ট্রাউজারের পকেট থেকে টেনে বার করতে গেলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার কোনো হাত ছিল না, স্রেফ তার কোটের হাতা! সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, তার হাতটা বোধহয় কৃত্রিম, তাই হয়তো সে লজ্জা পেয়ে সেটা গুটিয়ে নিয়ে থাকবে। কিন্তু তারপরেই আমি অবাক হয়ে ভাবি, তার যদি আসল বা কৃত্রিম কোনো হাতই না থাকবে, তাহলে কি করেই বা সে তার কোটের হাতা নাড়ছিল। কখনো ওপরে আবার কখনো বা নিচে, এসবই করছিল সে, কি করে সেই উড়ন্ত কাগজটা ধরার চেষ্টা করছিল তা বোঝবার জন্য...... না, কোটের সেই হাতায় কিছুই ছিল না। আমি সেই হাতটা ঠিকভাবে দেখেছিলাম, স্পষ্ট দেখেছিলাম কনুই পর্যন্ত, সেটার নিচে বাকী অংশটা, অর্থাৎ কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত অংশটা একেবারে শূন্য, কিছুই নেই। সে দেখলো আমি তার সেই শুন্য হাতটার দিকে তাকিয়ে আছি আর—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে যান,—তারপর?'

'তারপর আর কিছু নেই। ব্যাস, এই পর্যন্ত। তারপর সে আর একটা কথাও বলেনি। সে তার পকেটে কোটের হাতাটা ঢুকিয়ে স্রেফ আমর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। একটু পরে তার গবেষণার সে কাগজটা অগ্নিচুল্লীর দিকে উড়ে যাচ্ছিল, সেই কাহিনীতে ফিরে এলো। 'আমি কিন্তু সেটা চুল্লীর আগুনে পড়তে দিতে চাইনি।'

'তা আপনি খালি হাতে এগোলেনই বা কি করে?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'একথা বলার পর সে এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং যতক্ষণ না আমার মুখের কাছ থেকে ইঞ্চিখানেক দূরত্বের ব্যবধানে আসা না পর্যন্ত আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো সে। তাকে ওভাবে এগিয়ে আসতে দেখে আমি কি ভয় যে পেয়েছিলাম তা বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই।'

'কেন, ভয় পেলেন কেন?'

'ভয় পেয়েছিলাম তার মুখে ব্যাণ্ডেজ দেখে আর তার অমন ভয় জাগানো রঙীন চশমাটা আমার মুখের এতো কাছে এসেছিল যে, তার ভয়ঙ্কর চোখদুটো সামনা-সামনি দেখতে না পেলেও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ভয়ে আতঙ্কে আমার সারা শরীরটা যেন কাঁপিয়ে তুললো ভীষণভাবে।'

'তারপর তার কণ্ঠস্বর আমার কাছে ভীতিপ্রদর্শনের মতো মনে হলো। 'আপনি কি বললেন, আমার খালি হাতা?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই বলেছি।'

'তারপর ধীরে ধীরে সে তার পকেট থেকে কোটের হাতাটা টেনে বার করে তুলে ধরলো এমন করে, যেন সে আবার সেটা আমাকে দেখাতে চাইছে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। দেখলাম খালি হাতটা যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে, এইরকম আর কি? তারপর হঠাৎ যেন গেলে কিছু, যেন বুড়ো আঙুল সমেত অন্যসব আঙুলগুলো দিয়ে আমার নাকে চিমটি কাটলো।'

রেভারেণ্ড হাসতে শুরু করলেন।

'হাসবেন না! সেখানে কিছুই ছিল না!' আতঙ্কে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ডাঃ কাস। 'একথা আমি শপথ নিয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন!'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রেভারেণ্ড বান্টিং, তার মাথা দোলালেন এবং অবাক হয়ে নিজের মনে ভাবলেন এই ভদ্রলোক কি ব্যাপারটা সত্যি বলে কি কল্পনা করতে শুরু করেছেন, নাকি মদ খেয়ে নেশার ঝোঁকে এসব কথা বলছেন? রেভারেণ্ডকে কেমন যেন হতভম্বের মতো দেখালো।

'রেভারেণ্ড, দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন!' ডঃ কাস অনুরোধ করলো। 'এমন কি আমার হাত দিয়ে তার শরীরটা বুলিয়েছি আর তার হাতায় হাতও দিয়েছি। আমার তখন মনে হয়েছে, আমি যেন সত্যিকারের একটা রক্ত-মাংসের হাতে হাত দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তার কোটের হাতার নিচে কোনো হাতই ছিল না! এ যেন কিছু অনুভব করা, কিন্তু কিছু দেখলাম না! না কিছুই নয়, আমি সত্যি বলছি, কিছুই দেখতে পাইনি। কিছুই নয়। তার পোশাকের নিচে যেন লুকিয়ে রয়েছে একটা ভূত, জীবন্ত ভূত!'

।। চার ।।

ঃ হতবাক করা ডাকাতি ঃ

কয়েক সপ্তাহ পরে, মে মাসের শেষ দিকে, রেভারেণ্ড বান্টিং এবং তার স্ত্রীর বাড়িতে এক আশ্চর্য ডাকাতি হয়ে গেল। একদিন ভোর হওয়ার আগে তাঁর শয়নকক্ষের বাইরে নিচে সিঁড়ির কাছে খালি পায়ের শব্দে মিসেস বান্টিং-এর ঘুম ভেঙে যায়।

'মিঃ বান্টিং জেগে ওঠেন। তিনি তাঁর ঘুমন্ত স্বামীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে।

রেভারেণ্ড চোখে চশমা লাগিয়ে পায়ে স্লিপার পরে নিলেন। তারপর তার আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। অস্ত্র নিমেষে অগ্নিচুল্লীতে খোঁচা দেবার পোকারটা হাতে তুলে নিলেন এবং পা টিপে টিপে সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে এসে দাঁড়ালেন নিচে আগন্তুকের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য। নিচে স্টাডি থেকে গোলমালের শব্দ শুনতে পেলেন, সেই সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার ভেসে এলো।

ওদিকে মিসেস বান্টিং তার একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন পিছনে। রেভারেণ্ড তাঁর স্ত্রীর পাশ কাটিয়ে হন্তদন্ত হয়ে অন্ধকার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে একটা অদ্ভুত নীরবতা

বিরাজ করছিল। কিন্তু সেই নীরবতা সিঁড়ির শেষ ধাপে কার যেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দে এবং স্টাডিতে কাগজের খসখসানি শব্দে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। সেই সব শব্দের তীব্রতা এতোই বেশি যে দেওয়ালে প্রতিহত হবার সময় ঘরের জানালার শার্সিগুলো ঝনঝন করে উঠলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁরা যখন ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার জন্য সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে নেমে এলেন তখন সেসব শব্দ আর নেই, আগের মতোই সব শান্ত এবং বুঝি বা একটা শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছিল সেখানে।

স্টাডির দরজাটা অর্ধেক খোলা অবস্থায় ছিল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা ভেতরে উঁকি মারলেন। আগের রাত্রে ঘরের আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এর ফলে সেটা এখন অন্ধকারে ডুবে থাকারই কথা। কিন্তু এখন ডেস্কের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছিল আর সেই আলোয় দেখা গেল ড্রয়ারটা খোলা। তবে আপাতদৃষ্টিতে চুরি-ডাকাতির কোনো আভাস লক্ষ্য করা গেলো না।

একটা অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করছিল সেখানে। হঠাৎ সেই নীরবতা মেঝেতে কোনো মুদ্রা পড়লে যেরকম ঠুন্ শব্দ গেলো সেখানে।

'মনে হয়, সে আমাদের সংসার খরচের টাকার সন্ধান পেয়ে থাকবে।' ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন মিসেস বান্টিং, 'ড্রয়ারে দু'পাউণ্ডের বেশি স্বর্ণমুদ্রা ছিল।'

এই খবরটা রেভারেণ্ডকে সক্রিয় করে তুললো। পোকারটা শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে তিনি ঘরের ভেতরে ছুটে গেলেন। ভয়ঙ্কর জোরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি ঃ 'আমরা তোমাকে ধরে ফেলেছি। এখন তোমার আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তুমি এবার...................'

রেভারেণ্ড বান্টিং হঠাৎ যেভাবে চুপ করে গেলো, তাতে তাঁর স্ত্রী মোটেই সন্তুষ্ট নন, তিনি তাঁর স্বামীর ওপর দোষারোপ করতে থাকলেন তাঁর অক্ষমতার জন্য।

'আমি কি করতে পারি, দেখছো না ঘরটা যে ফাঁকা!' রেভারেণ্ড চিৎকার করে উঠে বিস্ময়াবিষ্টের মতো তাঁর চারপাশ একবার তাকিয়ে দেখলেন।

'কিন্তু এখান থেকেই যে আমি কোনো একজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি,' তবুও তাঁর স্ত্রী জোর দিয়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত!'

মিনিটখানেক কথা না বলে তাঁরা চুপ করে রইলেন, তারপর ঘরটা সার্চ করতে থাকলেন, ডেস্কের তলায়, পর্দার আড়ালে, জানালাগুলোর বাইরে, অগ্নিচুল্লীর চিমনির ওপরে, এমন কি ওয়েস্টপেপারের বাস্কেট এবং কয়লার ঝুড়িও বাদ গেলো না তাঁদের অনুসন্ধানের আওতা থেকে।

'এ কি করে হতে পারে?' হতবাক রেভারেণ্ড চিৎকার করে উঠলেন। 'এখানে কেউ এখন না থাকলেও আমাদের এখানে আমার আগে কেউ নিশ্চয়ই মোমবাতিটা জ্বালিয়ে থাকবে!'

'আর ড্রয়ারটা?' মিসেস বান্টিং মনে করিয়ে দিলেন, 'স্পষ্টতই সেটা এখন খোলা অবস্থায় দেখতে পাচ্চি, আর আমাদের টাকাও উধাও।'

'আ—চু!' একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এলো হলওয়ে থেকে।

বান্টিং দম্পতি নতুন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন। এই সময় রান্নাঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হতে শোনা গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা স্তব্ধ, হতবাক। যাই হোক, সেই ভাবটা কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে তাঁরা ছুটে গেলেন রান্নাঘরের দিকে এবং

দরজায় সজোরে ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল। ঠিক এই সময়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখা গেলো এবং সেই অস্পষ্ট আলোয় বাগানটা শূন্য অবস্থায় দেখা গেলো।

'মদের ক্যাবিনেট!' রেভারেণ্ড মৃদু চিৎকার করে উঠলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'মোমবাতিটা নিয়ে এসে আমাকে অনুসরণ করো।'

রান্নাঘরের মদের ক্যাবিনেট এবং প্রতিটি ক্যাবিনেট আর প্যান্ট্রি অনুসন্ধান করে সন্দেহজনক তেমন কিছুই পাওয়া গেলো না। বান্টিং দম্পতি তখন বাড়ির প্রতিটি ঘরে সন্ধান কাজ চালাবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

মিসেস বান্টিং-এর হাতের মোমবাতিটা যখন নিভে গেলো, রেভারেণ্ড এবং তাঁর স্ত্রী তখন খুবই বিভ্রান্ত। তাঁরা তখন স্টাডিতে ঢুকে প্রথমেই ডেস্কের ওপর মোমবাতিটা জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়ার পর থেকে যেসব আকস্মিক ঘটনাগুলো ঘটে গেল, সে সবের পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন অতঃপর। যতোই তাঁরা ভাবেন, ততোই যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এর শেষ কোথায়, আর কিই বা আছে শেষে, ঠাওর করতে পারেন না তাঁরা।

।। পাঁচ ।।

ব্যাণ্ডেজের বন্ধনমুক্ত

বান্টিংদের বাড়িতে রহস্যজনক ডাকাতি হওয়ার সেই সকালেই ছ'টার সময় মিস্টার এবং মিসেস হল আবিষ্কার করলেন, পান্থশালার সামনের দরজার খিলটা নামানো রয়েছে আর দরজাটা সামনে একটু খোলা রয়েছে।

'গতরাতে ঘুমোতে যাবার আগে আমি নিজের হাতে দরজার খিল লাগিয়ে ছিলাম?' মিসেস হল বললেন, 'তাহলে কেই বা সেটা খুলতে পারে?'

'কে, কে সেই?' আগন্তুকের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে মিঃ হল বললো, 'চলো তো, লোকটার ঘরটা চেক করে দেখা যাক।'

তারা যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠছিল সেই সময় মিঃ হল কাশির শব্দ শুনতে পেলো, তার মনে হলো যে সামনে আগুয়ান তার স্ত্রী বোধহয় কেশে থাকবে। ওদিকে সেই একই কাশির শব্দ শুনে মিসেস হলও ভেবে নিলো যে, এটা তার স্বামীরই কাশির শব্দ হবে হয়তো!

'ঠিক আছে' মিসেস হল বলে উঠলো, 'নক্ করে কিছু হবে না, অন্য কোনোভাবে দরজা খোলবার চেষ্টা করো।'

মিঃ হল দরজার নবটা ঘোরালো, একবারের চেষ্টাতেই দরজা খুলে গেলো সহজে।

বিছানায় কিংবা ঘরের কোথাও কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। মিঃ হল তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে বললো, 'কি ব্যাপার বলো তো?'

কিন্তু মিসেস হল যেন ভয়ঙ্করভাবে বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। অবাক চোখে অগ্নিচুল্লীর কাছে বড় আরাম কেদারাটার দিকে তাকিয়েছিল সে।

'দেখো,' হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়ে মিসেস হল বললো, 'ওই চেয়ারটার দিকে একবার তাকিয়ে

দেখো, আগন্তুকের কোট, ট্রাউজার, জুতো জোড়া আর চশমা তেমনি পড়ে রয়েছে চেয়ারটার ওপরে। এবং তার টুপিটা খাটের ছতরিতে টাঙানো রয়েছে।'

'আর তুমি এবার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে দেখো, তার চোখের সমস্ত ব্যাণ্ডেজগুলো সেটার ওপর স্তূপিকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে!' তার স্বামী আরও বললো, 'এমন কি তার পোশাকগুলো এখানে তেমনি পড়ে রয়েছে, কিন্তু সে নেই, ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে, তাই না?'

'এ সবই কৌতূহল জাগানোর মতো ব্যাপার বটে।' এই বলে মিসেস হল তার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। বালিশের ওপর সে তার হাত রাখলো। তারপর সে মন্তব্য করলো, 'এগুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই মনে হয় ঘণ্টাখানেকের জন্য বাইরে বেরিয়ে থাকবে সে।'

আর ঠিক তখনি খুবই একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে দেখা গেলো। কম্বল আর চাদর এক সঙ্গে জড়ো হয়ে গেলো, ছোটখাটো একটা পাহাড়ের চূড়ার মতো আকার ধারণ করলো সেটা। সেটাকে অনুসরণ করলো আগন্তুকের টুপিটাও এবং মিসেস হলের মুখের চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকলো।

পরমুহূর্তেই তারা তাদের সামনে একতা তিক্ত হাসির শব্দ শুনতে পেলো, কিন্তু হাস্যরত লোকটাকে দেখতে পেলো না। আরামকেদারাটা ঘুরিয়ে দিলো কে যেন, তাতে আগন্তুকের কোট, ট্রাউজার, জুতোজোড়া এবং চশমা চেয়ারের ওপর থেকে উড়ে গিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে। চেয়ারটার চারটে পা যেন হাওয়ায় এগিয়ে আসছে মিসেস হলের দিকে। পান্থশালার মালকিন আর্ত চিৎকার করে স্বামীর চারপাশে ঘুরতে থাকে। চেয়ারটার চলার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে গেলো এবং মিসেস হলের পিছনে এসে সেটা একেবারে থেমে গেলো। তারপর সেটা একরকম ধাক্কা দিয়ে হল দম্পতিকে ঘর থেকে বার করে দিলো।

তারপরেই দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেলো ভেতর থেকে। তারপরেই সব শান্ত, একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে।

এ যেন এক ভুতুড়ে কাণ্ড, অপ্রকৃতিস্থ দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে মিসেস হল তার স্বামীর গায়ে ঢলে পড়লো। 'আমি শপথ নিয়ে বলছি, নিশ্চয়ই এ একটা অশুভ শক্তি!'

'শান্ত হও জেনি,' তার স্বামী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'এর একটা ব্যাখ্যা বার করতে হবে। চলো, নিচে গিয়ে আলোচনা করা যাক।'

মিঃ হল তার স্ত্রীকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য নিজের হাতে চা তৈরী করে চায়ের কাপটা তার সামনে মেনে ধরলো। চা পান করারপর মিসেস হলের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে থাকলো একটু একটু করে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে তার স্বামীকে বললো, 'শোনো জর্জ, সময় থাকতে থাকতে আমাদের সতর্ক হতে হবে, আগন্তুকের ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা আমার ভালো ঠেকছে না। তাই বড়রকম কিছু দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আমি বলি কি তার ঘরের দরজার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে তার অশুভ শক্তিটাকে ঘরবন্দী করে রাখতে হবে। বেশ বুঝতে পারছি, সে তার ঘরে আসবাবপত্রগুলোয় অশুভ শক্তি প্রয়োগ করে থাকবে।' তার ঘরটা এখন—'

'কেন, আমার ঘরে আবার কি হলো?' চাপা গলায় একটা গুম গুম শব্দ করতে করতে আগন্তুক যেন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে শুরু করলো। বড় নীল চশমার আড়াল থেকে চোখে ব্যাণ্ডেজবাঁধা আগন্তুক যেন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। আগন্তুক তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠলো, 'আমার ঘরের ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

তোমরা ঘরটা আমায় ভাড়া দিয়েছো, অতএব ওটা এখন আমার সম্পত্তি। আমার ওই অধিকারে তোমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। আমার ঘরের বাইরে থাকো তোমরা আর আমাকে একা থাকতে দাও!' এই বলে সে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে শব্দ করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

'আশ্চর্য, এই তো একটু আগে আমরা তার ঘর থেকে ফিরে আসছি। তখন তো সে ছিল না সেখানে।' মিসেস অবাক বিস্ময়ে তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'তাহলে? তা বলো কি করে সে নিচে নেমে এলো? আর কোথা থেকেই বা এলো সে?'

তার হতবাক স্বামী কোনো কথা বলতে না পেরে, স্রেফ মাথা নাড়লো। এর পর ছ'ঘণ্টা কেউই আগন্তুকের ঘরের ধারে কাছে যাওয়ার সাহস পেলো না। এমন কি মিসেস হল তার ঘন্টার ডাকে সাড়া দেবার প্রয়োজন মনে করলো না। মিসেস হল তার স্বামীকে রাগতস্বরে বললো, 'আমার মনে হয়, সে খাবার চাইছে। কিন্তু খাবার আমি তাকে দেবো না। জাহান্নামে গেলেও নয়!'

দুপুরে অন্যদিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই খদ্দেররা, বার এ এতো জমায়েত হলো। সবার মুখেই ওই একটাই কথা, রেভারেণ্ড বান্টিং-এর বাড়িতে রহস্যজনকভাবে ডাকাতি। তাদের সেই আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়লো আগন্তুককে দেখতে পেয়ে। সে যে সেই আগন্তুকই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো, মাথায় তার বহু ব্যবহৃত টুপি, হাতে পরিহিত গ্লাভস্ এবং গায়ে সেই পরিচিত লং কোট। যেটা তার আরামকেদারায় ঝোলানো থাকে। এইসব প্রমাণ তাদের সামনে রেখে আগন্তুক ধীরে ধীরে বার-এ এসে ঢুকলো।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মিসেস হলের দিকে তাকিয়ে সে দাবী করলো, 'কেন তুমি আজ আমাকে প্রাতরাশ দাওনি? আর আমি যখন ঘণ্টা বাজিয়ে তোমাকে ডাকলাম, কেন তুমি সাড়া দিলে না? তুমি কি ভেবেছো শুনি? তুমি কি আমাকে দেখেও দেখো না, নাকি না দেখার ভান করো?'

'তুমি দেখা দিলে তো?' নিজের মনে বিড়বিড় করলো মিসেস হল। 'একটু আগেই সে তো তোমার ঘরে সেরকম ঘটনার আভাসই তো দেখে এলাম।'

কিন্তু সে তার মনের কথা মনের মধ্যে চেপে রাখলো, এই ভয়ঙ্কর আজব লোকটার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, অন্তত এই মুহূর্তে তো বটেই। লোকটাকে আরও ভালো করে জানতে হবে, আর সব জানা শেষ হলে তখনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই চলবে।

মিসেস হল পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো, তুমি তোমার বিল পেমেণ্ট করোনি কেন? আজ পাঁচদিন হলো আমি তোমাকে বিলটা দিয়েছি। এর পরেও কি তুমি আমাদের কাছ থেকে এর থেকে ভালো পরিষেবা আশা করো?'

'আমি তো তোমাকে বলেছি, আমার কাছে টাকা নেই, আমার হাত একেবারে শূন্য। কিন্তু যে-কোনোদিন ডাকে আমি টাকা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।' আগন্তুক রাগত স্বরে উত্তর দিলো, 'তুমি তোমার পান্থশালার পাওনা টাকা একদিন না একদিন ঠিক পেয়ে যাবে, কারণ আমি তোমার পাওনা করায়-গণ্ডায় মিটিয়ে না দিলে তুমি আমাকে তোমার পান্থশালা ছেড়ে যেতে দেবে না। তাছাড়া অতো বড় একটা অন্যায় করার মতো মানসিকতা আমার নেই। তাই টাকা তো তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার না খেতে পাওয়ার কষ্টটা তো তুমি লাঘব করতে পারবে না। এসব কথা ভেবেও তুমি তোমার মত বদলাবে না?'

'না। হ্যাঁ, ভালো কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিই টাকা না দিলে খাবারও পাবে না—'

আগন্তুক বেশ ভালোভাবেই বুঝে গেল, এই মহিলার দয়ার ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হবে তাকে। এ অবস্থায় তার ওপর রাগ দেখানো যাবে না। তাই সে নরম গলায় যথেষ্ট নম্রভাবে বললো, 'তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি, টাকাটা এখন আমার হাতে এসে গেছে। অতএব তুমি—'

'ওহো, তাই নাকি?' তা হঠাৎ তুমি টাকাটা কোথ্থেকে পেলে জানতে পারি? একটু আগে তুমি বললে ডাকে তোমার টাকা আসবে। কিন্তু আজকের ডাক তো এখনও আসেনি। তাহলে!' বার-এ উপস্থিত খদ্দেরদের মুখে আজই সকালে বাণ্টিংদের বাড়িতে ডাকাতির ব্যাপারে আলোচনার কথা শুনেছিল মিসেস হল। সে কথা মনে করেই আগন্তুকের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির উৎসটা জানতে চাইল সে। 'সেই সঙ্গে আমার আসবাবপত্রে ভাঙচুর করার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে হবে তোমাকে। ওপরতলায় তোমার ঘরে আমার আরামকেদারাটা তুমি কি যাদুমন্ত্র বলে বশ করে রেখেছিলে তার ব্যাখ্যাও করতে হবে তোমাকে। আর আজ সকালে ছ'টায় তোমার ঘরে গিয়ে দেখছি, তুমি তখন ছিলে না সেখানে। কিন্তু তোমার ঘরে গিয়ে ঢুকলই বা কী করে? সেখানে ঘরে ঢুকতে তো দেখিনি। আমার পান্থশালায় অতিথিরা দরজা দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। অথচ সেই দরজা দিয়ে তোমাকে তো প্রবেশ করতে দেখিনি!'

এ কথায় আগন্তুকের মুখের রঙ হঠাৎ বদলে গেলো, লাল রক্তবর্ণের মতো দেখালো তার মুখটা। সে তার গ্লাভস্ পরিহিত হাত দুটো ওপরে তুলে ধরলো এবং মেঝের ওপর সজোরে পা ঠুকে মৃদু চিৎকার করে উঠলো সে 'চুপ করো।' রাগে উত্তেজনায় তার দু'চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো আগুন বুঝি ঝরে পড়ছিল।

ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলো মিসেস হল এবং তারপর সে একেবারে নীরব হয়ে গেলো।

'আমি কে আর আমার ক্ষমতা কতখানি, তুমি বুঝতে পারছো না।' এক অদ্ভুত ভুতুড়ে শান্ত গলায় ধীরে ধীরে সে বললো, 'তবে ঈশ্বরের কৃপায় আমি তোমাকে আমার স্বরূপ দেখাবো!'

অতঃপর সে তার হাত দিয়ে একবার মুখ ঢেকে পরক্ষণেই হাতটা আবার সরিয়ে নিলো। আর তখনি দেখা গেল, তার মুখের ঠিক মাঝখানে, যেখানে তার নাকটা থাকার কথা, সেখানে নাকের বদলে একটা কালো গর্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না।' যথাস্থানে আমার নাকটা দেখতে না পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছো, তাই না? অবাক হওয়ার কিছু নেই, এই তো এটা এখানে,' এই বলে সে মিসেস হলের হাতে নরম ও রবারের মতো একটা জিনিস সপে দিলো।

মহিলা তার হাতের তালুর দিকে তাকাতে গিয়ে সে যখন সেই অদ্ভুত জিনিসটা লক্ষ্য করলো, সে তখন পড়ি কি মরি করে একরকম ছুটে বার-এ এসে হাজির হলো, এবং সেটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'এটাই তার নাক! এটা সে তার মুখ থেকে অপসারণ করে আমার হাতে তুলে দিয়েছে!'

আগন্তুকও তার পিছু পিছু ছুটে এসেছিল। কিন্তু মিসেস হল এবং বার-এ আগত গ্রামবাসীদের চিৎকার ও উত্তেজনা সবই কিছুই অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিলো। তাদের আচরণে যেন তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে তার গ্লাভসে মোড়া হাত দিয়ে মাথার টুপিটা সরিয়ে ফেললো, তারপর চোখ থেকে নীল চশমাটাকে খুলে ফেললো। কেবল এখানেই থেমে থাকলো না। এরপর সে ভয়ঙ্কর হিংস্র অঙ্গ-

ভঙ্গি করে মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ ও মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর সে তার মাথা ও চোখ থেকে ব্যাণ্ডেজগুলো দ্রুত হাতে খুলতে থাকলো।

ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ভয়ে আতঙ্কে পিছিয়ে গেলো। তারা তাদের চোখের সামনে যা দেখলো তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। তারা তার মুখে কোনো ক্ষতচিহ্নর বিকৃত মুখ কিংবা কোনো নিষ্ঠুর নৃশংসতার চিহ্ন দেখবার জন্য প্রস্তুত থাকলেও একেবার কিছু না দেখার জন্য তারা কেউই কিন্তু প্রস্তুত ছিল না।!

ওদিকে মিসেস হল হিস্ট্রিয়া রোগিণীর মতো আর্ত চিৎকার করতে করতে বার থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে ছুটে গেলো। তার দেখাদেখি সবাই তখন আতঙ্কে এ ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেতে খেতে অনুসরণ করতে থাকলো তাকে।

ওদিকে কোচ এ্যাণ্ড হর্সেস পান্থশালার ভেতরে কেবল একজন রয়ে গেলো। সেই ছায়ামূর্তির পরনে ট্রাউজার, গ্লাভস্ এবং কলার তোলা কোট থাকলেও, কিন্তু কোটের কলারের ওপরে আদৌ কিছুই ছিল না, সেখানে শুধু একবুক শূন্যতা, তার বেশি কিছু নয়।

।। ছয় ।।

ঃ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে মুক্তি ঃ

ওদিকে ইপিং-এর কোচ এণ্ড হর্সেস পান্থশালা থেকে ছুটে আসা জনতার ভীড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে স্তম্ভিত। কৌতূহলী গ্রামবাসীরা কিন্তু সেই পান্থশালার দিকেই ছুটতে শুরু করে দিলো। তারা যেন জানতে ভীষণ উৎসুক এই উত্তেজনার কারণটা কি হতে পারে।

একটা নিরাপদ জায়গায় এসে জনতা যখন ভুতুড়ে ঘটনার ব্যাখ্যা করছিল, মিসেস হল তার স্বামীর হাতে ঢলে পড়ে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো।

উপস্থিত জনতার ব্যাখ্যাগুলো হলো এই রকম ঃ

'মস্তকবিহীন সে একটা মানুষ!'

'এ যেন কোনো জাদুকরের কৌশল!'

'এ যেন শয়তান প্রেরিত এক অশুভ শক্তি!'

'যে যেখানে আছো দাঁড়িয়ে পড়ো!' জনতার ভীড়ের পিছন থেকে একটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সে কণ্ঠস্বর গ্রামের কনস্টেবল মিঃ জেফার্সের। 'এতো চিৎকার কিসের, ব্যাপার কি?'

'পান্থশালার ভেতরে একটা লোক রয়েছে, তার মাথাটা কিন্তু নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, মাথা থাক বা না থাক, শোনো হল, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, আমি তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এখানে এসেছি।'

'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন।' কনস্টেবলকে পথ দেখিয়ে হল পান্থশালার ভেতরে ঢুকে আগন্তুকের ঘর পর্যন্ত তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে মিঃ হল তাকে বললো, 'কনস্টেবল আপনি এবার আপনার কর্তব্য পালন করুন।'

জেফার্স আগন্তুকের ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো, এবং হল অনুসরণ করলো তাকে।

মস্তকবিহীন মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে হল বললো, 'ওই যে ওই লোকটা! আগন্তুকের গ্লাভস্ পরিহিত একটা হাতে রুটি এবং অপর হাতে এক টুকরো চীজ ধরা ছিল।

কোটের কলারের ওপর থেকে শূন্যতায় ভরা মূর্তিটার কাছ থেকে ক্রুদ্ধস্বরে একটা দাবীর কথা শোনা গেলো। 'এসবের মানে কি শুনি?'

'আমি এখানে এসেছি,' জেফার্স উত্তরে বললো, 'মাথা থাকুক বা না থাকুক আমি এখানে এসেছি আমার কর্তব্য পালন করবার জন্যে, তোমাকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

'আর এক পা-ও বাড়াবেন না, যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন,' অদৃশ্য মানুষটি কনস্টেবলের কাছ থেকে একটু পিছু হটে যেতে গিয়ে সতর্ক করে দিলো তাকে।

হঠাৎ অদৃশ্য মানুষটির হাত থেকে রুটি আর চীজ পড়ে গেলো। এর পর আগন্তুকের গ্লাভস্ পরিহিত বাঁ-হাতটা উঠে এলো, এবং পরক্ষণেই জেফার্স অনুভব করলো সেটা তার মুখের ওপর সজোর আছড়ে পড়লো। যাই হোক, চড়টা কোনোরকমে হজম করে আগন্তুকের হাতবিহীন বাঁ-কব্জিটা আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হলো কনস্টেবল তার হাত দিয়ে এবং তার অদৃশ্য গলাটাও আঁকড়ে ধরলো। তবে তার এ কাজের পুরস্কার স্বরূপ অদৃশ্য মানুযটি তার পা দিয়ে কনস্টেবলের একটা পায়ে সজোরে লাথি মারলো।

পায়ে জোর লাথি খাওয়া সত্ত্বেও কনস্টেবল কোনোরকমে নিজের পতনরোধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দু'জন লোক একে অপরকে দৃঢ়মুষ্ঠিতে আবদ্ধ করে যতক্ষণ না ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় পরস্পর পরস্পরকে ক্রমাগত আঘাত করে যেতে থাকলো।

'ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরো!' জেফার্স চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু মিঃ হল সাহায্য করার আগেই অদৃশ্য জোরালো লাথির আঘাতে টাল সামলাতে না পেরে তার স্ত্রীও প্রিয় ক্যাবিনেটের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লো।

যাই হোক জেফার্স শেষ পর্যন্ত এই মস্তকহীন লোকটাকে কুপোকাত করতে সমর্থ হলো, তারপর তার ঘাড়ে চেপে বসলো কিন্তু অচিরেই সে দেখলো অদ্ভুত এই লোকটা তার পিছনে গড়াগড়ি দিচ্ছে।'

আগন্তুক কনস্টেবলের ওপরে উঠে দাঁড়ালো এবং শান্ত গলায় বলল, 'আমি আত্মসমর্পণ করছি।' তারপর সে তার ডানহাত থেকে গ্লাভস্টা খুলে ফেললো।

তারপর দুটি অদৃশ্য হাত দিয়ে সে তাড়াতাড়ি করে তার জ্যাকেটের সামনের বোতামগুলো খুলে ফেললো। জ্যাকেট এবং ট্রাউজার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো এবং তার জুতো-মোজাসহ আনাড়ির মতো চলতে শুরু করলো।

মাটিতে পড়ে যাওয়া আগন্তুকের দেহের ওপর দাঁড়িয়ে হল চিৎকার করে বলতে থা[illegible], 'আদৌ কোনো মানুষ নয় সে!' তার কোটের কলার আর পোশাকের ভেতরে তাকিয়ে দেখুন। ভেতরটা একেবারেই শূন্য। হাড়-মাস বা অস্থি-মজ্জা কিছুই নেই।' এই বলে খোলা পোশাকের ভেতরে সে তার একটা হাত ঢোকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেটা আবার টেনে বার করতে গিয়ে হঠাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সে।

কনস্টেবল যেন স্তব্ধ, হতবাক। সে তাহলে কাকে এখন গ্রেপ্তার করবে? পুলিশি আইনে অদৃশ্য মানুষ গ্রেপ্তারের কোনো নজির নেই। আর সেটা সম্ভব না, কারণ থানায় নিয়ে গিয়ে কি দেখাবে সে?

'আমার একান্ত ইচ্ছে দয়া করে আমার চোখের ওপর থেকে তোমার আঙুলগুলো সরিয়ে নাও, আমার ভীষণ লাগছে, পোশাকের ওপর কোনো এক জায়গা থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। তার আরও বক্তব্য হলো ঃ 'তোমার কথা মতো আমি শুধু শূন্যতায় ভরা নয়। আমার সবই আছে, যেমন মাথা, দুটো হাত, দুটো পা এবং একটা সম্পূর্ণ মানুষের যতো সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকার কথা আমার সবই আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, আমি বুঝি এক অদৃশ্য মানুষ।.কিন্তু তাই বলে আমাকে তিরস্কার কিংবা গ্রেপ্তার করার অধিকার কাউকে দেওয়া রয়েছে।'

এখন অন্য গ্রামবাসীরা আগন্তুকের ঘরে এসে ভীড় জমিয়েছে। তাদের চোখে মুখে অদৃশ্য কৌতূহল, এর পর কি হয় তা দেখা জন্য। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলোচনা করতে থাকে। একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে তাদের মধ্যে থেকে। এই সময় তারা কনস্টেবলকে ঘোষণা করতে শুনলো ঃ 'এখানকার একটা বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে টাকা চুরির অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করছি। আমি নিজেই তোমার হাতে হাতকড়া পরাচ্ছি।'

'বাজে কথা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!' অদৃশ্য মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো। 'আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য আমি আপনার সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে যাবো, কিন্তু আমার হাতে হাতকড়া পরাতে দেবো না!'

'কিন্তু সেরকম নির্দেশই যে আমার কাছে আছে আর সেটাই যথাযথ ব্যবস্থা বলে আইন তো স্বীকৃত।' কনস্টেবল পাল্টা প্রতিবাদ করে উঠলো।

অদৃশ্য মানুষটি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, মেঝের ওপর বসে পড়লো। সে কি করতে যাচ্ছে কেউ তা উপলব্ধি করার আগেই সে তার পা থেকে জুতো ও মোজা খোলবার পর সে তার ট্রাউজারটাও খুলে ফেললো। তার পরনে শার্টের ওপরে জ্যাকেটটা কাঁপতে শুরু করতেই অদৃশ্য মানুষটি কি করতে যাচ্ছে হঠাৎ সেটা উপলব্ধি করলো জেফার্স।

'আর নয়, আমি বলছি পোশাক খোলা বন্ধ করো!' জেফার্স হুকম করার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ছুটে গিয়ে তার পরনের জ্যাকেটটি চেপে ধরতে গিয়ে সেটা খুলে পড়ে তার হাতের মধ্যে চলে এলো। 'ওকে ধরো!' অন্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলো সে। 'এর পর ও যদি তার শরীর থেকে শার্টটাও খুলে ফেলে তাহলে তখন আমরা তাকে আর কখনো খুঁজে পাবো না।'

কিন্তু একটু পরেই তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে অদৃশ্য মানুষটি তার পরনের শেষ পোশাক সাদা শার্টটা তার গা থেকে খুলে ফেলতেই সেটা ঘরের মধ্যে পাখির ডানার মতো শূন্যে উড়তে থাকলো। তারপর সেটা হাওয়ায় দুলতে দুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরের প্রবেশ কক্ষে শার্টের হাতা দিয়ে একটা লোকের মুখে সজোরে ঘুষি মেরে বসলো। তারপর সেটা ওপরে উঠতে শুরু করলো এমন করে যেন সেটা একটা লোকের মাথার ওপর নাচতে শুরু করবে। জেফার্স তার হাতদুটো শূন্যে তুলে ধরলো সেটা আঁকড়ে ধরবার জন্য। কিন্তু এবারেও সে ব্যর্থ বলো শুধু তাই নয়, অদৃশ্য মানুষটির চোখে তার এই অন্যায় কাজের তিরস্কার স্বরূপ তার কাছ থেকে একটা প্রচণ্ড ঘুষির আঘাত পেলো যে তার মুখের ওপরে।

এর পর ঘরের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। উড়ন্ত শার্টের দু'টি হাত তখন খুবই সক্রিয় হয়ে উঠলো. কখনো শূন্যে আন্দোলিত কখনো বা কারোর মুখ কিংবা মাথায় আঘাত করতে থাকলো।

এদিকে অতো সব বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সম্মিলিত চিৎকারে ঘরটা সরব হয়ে উঠলো ঃ 'ওকে ধরো!'......... এবং 'ওকে পালাতে দিও না!'

সেই সঙ্গে শার্টের হাত। দুটোর প্রচণ্ড আন্দোলন এবং ঘরভর্তি লোকের কারোর না কারোর মুখে, মাথায় চড় ও ঘুষির আঘাত পুরোদমে চলতে থাকলো। এর ফলে কারোর নাক ভেঙে রক্তাক্ত হয়ে উঠলো, কারোর চোখ ফুলে উঠল বা মণি কোটর থেকে বেরিয়ে এলো, কারোর দাঁত ভাঙলো এবং কারোর বা চোয়াল ভাঙলো।'

হঠাৎ জেফার্স চিৎকার করে উঠলো, 'আমি একটা কিছু পেয়েছি, আমি একটা কিছু পেয়েছি............'

জেফার্স কালবিলম্ব না করে সে তার হাতের মুঠোয় অদৃশ্য অপরাধীকে বন্দী করে গ্রাম বাসীদের ভীড় ঠেলে পান্থশালা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। সেই সঙ্গে এতক্ষণ ধরে লড়াইরত গ্রামবাসীরাও জেফার্সকে অনুসরণ করে হলঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো।

মাঝপথে ভয়ঙ্কর একটা বিপত্তি ঘটলো। অদৃশ্য মানুষটি জেফার্সের হাঁটু দুটিতে প্রচণ্ড জোরে এমন লাথি মারলো যে, তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেলো, এর ফলে মানুষটি তার হাতছাড়া হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, অদৃশ্য বন্দী মানুষটি তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তাকে এমন ঠেলা দিলো যে আঘাতে জর্জরিত হাঁটু দুটোর ওপর ভর করে থাকতে না পেরে সে আছড়ে পড়লো পাথরের সিঁড়ির ওপরে। সেখানে পড়ে গিয়ে সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো এবং তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়তে থাকলো।

ওদিকে পান্থশালার দরজাপথে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা তার শরীরের একপাশে কেমন যেন একটা ধাক্কা অনুভব করলো। রাস্তায় লাথি খাওয়ার মতো একটা কুকুর চিৎকার করে উঠলো। আবার দেখা গেলো. একজন বৃদ্ধ বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক অদেখা শক্তি তাকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পথের ধারে একটা খানায়।

আর এভাবেই অদৃশ্য মানুষটি সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো শেষ পর্যন্ত! একদিকে সে একা, অন্যদিকে একজন পুলিশ কনস্টেবলসহ বহু গ্রামবাসী এবং পান্থশালার খদ্দের। বহু সম্মিলিত শক্তি মাত্র একজন অদৃশ্য মানুষের শক্তির কাছে কতো যে অসহায়, সেটাই প্রমাণ করে দিলো সে। আর এর থেকেই মনে হয়, এমন কোনো কঠিন কাজ নেই যা তার কাছে অসাধ্য বলে মনে হতে পারে।

।। সাত ।।

ঃ মিঃ থমাস মার্ভেল ঃ

[illegible] রাস্তার ধারে একটা খানায় খালি পায়ে একজন ভবঘুরেকে

বসে থাকতে দেখা গেলো। তার সামনে দু'জোড়া বুটজুতো, উভয় জোড়াই দান হিসেবে পাওয়া।

জুতো জোড়ার দিকে তাকাতে গিয়ে উভয় সংকটে পড়ে গেছে মিঃ থমাস মার্ভেল. কোন্‌টা পরবেন আর কোন্‌টাই বা রাখবেন। একটা সাইজ চার, খুবই বড়; আর অন্য জোড়ার সোল স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার পক্ষে বড়ই পাতলা।

মার্ভেলের মাথায় পশম-নরম টুপিটা তার মুখের অনেকটা অংশই ঢাকা পড়ে গেছে সেই সঙ্গে তার মুখের কুঞ্চন ভাবটাও অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, দিনটা কি শুকনো যাবে, নাকি সন্ধ্যার আগেই বসন্তের বৃষ্টি নামবে। কয়েক ঘণ্টা আগে সে যখন পথের ধারে খানায় বসেছিল তখন তার পরনের কোটটা বলিষ্ঠ দেহে খুবই আঁটো লাগছিল, তাই সে বোতামগুলো খুলে যতোটা সম্ভব আলগা করার চেষ্টা করেছিল। আর এখন সে তার বুটজুতোজোড়া পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখলো একজোড়া জুতো তার পায়ের মাপের থেকে অনেক বড়। অথচ এরকমতো হওয়ার কথা নয়।

সে যখন এ ব্যাপারে তার মনসংযোগ ঘটাচ্ছিল তখন পিছন থেকে এক অচেনা কণ্ঠস্বর তাতে ব্যাঘাত ঘটালো। 'তোমার ওই জুতোজোড়া দুটো নেহাতই কুৎসিৎ দেখতে!'

'সে কথা সত্যি, কথাটা কে বললো পিছন ফিরে না তাকিয়েই সেই বক্তার মন্তব্য সমর্থন করে ভবঘুরে যেন নতুন করে আবার ভাবতে শুরু করলো। 'কিন্তু কোন্ জুতোজোড়া বেশি কুৎসিৎ ঠিক করতে পারছে না সে। তোমরা ঠিক কোন্ ধরনের জুতো পরো?' এসব কথা ভাবতে ভাবতেই সে এবার তার মুখটা কাঁধের ওপর ঘুরিয়ে বক্তার বুটজোড়া পরীক্ষা করে দেখতে চাইলো।

কিন্তু জুতোজোড়াগুলো যেখানে থাকা দরকার সেখানে সে দুটো পা কিংবা জুতোজোড়া কিছুই দেখতে পেলো না। উধাও সেখান থেকে।

'ওহে আগন্তুক, তুমি কোথায় লুকালে?' এই বলে সে একবার চারদিকে তার চোখ বুলিয়ে নিলো। কিন্তু তখনও কিছুই দেখতে পেলো না সে।

'তবে কি আমি মদ্যপ?' আমি কি নিজের মনেই কথা বলছি?' সে তার লম্বা লম্বা দাড়ি-গোঁফে হাত বোলাতে গিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকলো।

'ভয় পেওনা,' আবার সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো।— 'না তুমি মাতাল হওনি।'

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ তোমার কথা শুনতে পাচ্চি, তোমার এই মায়াময় কণ্ঠস্বর কেন? তবে কি তুমি কোনো কবরের নিচ থেকে কথা বলছো?'

'না, ভালো মানুষ, আমি কোনো মায়াময় পুরুষ নই। কিংবা কবরস্থ হয়নি এখনও পর্যন্ত। আমি তোমার মতো একজন মানুষ, বলতে পারো একজন অদৃশ্য মানুষ! তুমি বোধহয় ভুল শুনেছো, কিংবা তুমি এখন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছো।'

মার্ভেল এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং তেমনি ধীরে ধীরে সে তার চারদিকে বারবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'আমি শপথ নিয়ে বলছি একজনকে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি, তার কথা আমি সজ্ঞানে শুনেছি, এর মধ্যে কোনো ভুল, মোহ বা বিভ্রান্তি থাকতে পারে
'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি শুনেছো, আমি তা অস্বীকার করছি না।'

এর পরেই হঠাৎ অনুভবে মার্ভেল বুঝতে পারলো, কে যেন তার কলার ধরে ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

'মনে হচ্ছে ওই বুটজুতোজোড়ার চিন্তাটা আমাকে বোকা বানিয়েছে আর মনটা খেদিয়ে তুলেছে, যার জন্য নিজেকে আমার পাগল বলে মনে হচ্ছে। কিংবা এটা কোনো ভুতুড়ে ব্যাপার হতে পারে।'

'না, তোমার কোনো অনুমানই ঠিক নয়।'

'তাহলে মনে হয় আমার ভ্রান্ত চিন্তাধারা আমার সঙ্গে চালাকি করছে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে লক্ষ্য করে কয়েকটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ছি, সেটা তোমার ভ্রান্ত চিন্তা কিংবা কল্পনা কিনা এর থেকেই বোঝা যাবে।' আর এর পরেই বেশ কয়েক ফুট দূর থেকে জলস্রোতের মতো ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ছুটে এলো তার দিকে। কিছু নুড়ি তার কাঁধ স্পর্শ করে গেলো এবং বাকীগুলো তার খালি পায়ে লেগে খানার মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়লো।'

'কি, এর পরেও কি আমি তোমার কাছে কল্পনা হয়েই থাকবো?'

স্তব্ধ, হতবাক হয়ে বসে পড়লো মার্ভেল। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! স্বপ্নে যা সম্ভব, বাস্তবে তা অসম্ভব। এর মধ্যে একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এখন তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই প্রশ্নটা করে বসলো অদৃশ্য মানুষটির উদ্দেশ্যে।

পাথরগুলো তো আর মানুষ নয়, না আছে তাদের হাত কিংবা পা, তাহলে কি করেই বা তারা নিজেরা পাথর ছুঁড়তে পারে? আর পাথরগুলো কথাই বা বলে কি করে? এ কি করে সম্ভব। আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, ভেবে কোনো কুলকিনারাই করতে পারছি না। কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে?'

'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা খুবই সহজ ব্যাপার। পাথর নয় আমি নিজেই পাথরগুলো ছুঁড়েছি, এক অদৃশ্য মানুষ।'

'অবশ্যই, যেকেউ সেটা দেখতে পারে। হা! তুমি কোথায় লুকিয়ে আছো বলছো না কেন আমাকে?'

'না, আমি লুকিয়ে নেই। আমি অদৃশ্য আর আমি এই তো এখানে, তোমার সামনে স্রেফ কয়েক ফুট দূরে।'

'আহ্, এসো, আমার কাছে এলো। আমি অন্ধ নই। আমি হয়তো একজন ভবঘুরে হতে পারি, কিন্তু আমি মূর্খ নই। তুমি কখনোই কেবলমাত্র পাতলা হাওয়া হতে পারো না।'

'কিন্তু আমি ঠিক পাই। তুমি আমার মধ্যে দিয়ে দেখতে পারো। কারণ আমি একজন অদৃশ্য মানুষ। বিশ্বাস করো, আমি একজন সত্যিকারের মানুষ, আমার এখন খাবার ও পানীয়র খুবই প্রয়োজন. আব নিজের নগ্নতা ঢাকবার জন্য প্রয়োজন কিছু পোশাক!'

'তুমি যদি সত্যিকারের মানুষই হয়ে থাকো তাহলে তোমার হাতটা আমাকে একবাব ধরতে দাও।' তুমি লাফাতে পারো, আমার হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে পারো।'

অদৃশ্য মানুষের কব্জিটা তার হাতের কাছে আসতেই মার্ভেল পর হাতটা স্পর্শ করলো। তারপর তার আঙুলগুলো অদৃশ্য মাংসল হাতের ওপর বিলি কাটতে কাটতে অদৃশ্য হৃৎপিন্ড স্পর্শ করলো। সবশেষে মার্ভেলের হাতটা স্পর্শ করলো অদৃশ্য দাড়ি-গোঁফ ভর্তি মুখের ওপর।

'ঈশ্বর! এ যেন অত্যন্ত বিস্ময়কর!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'কি আশ্চর্য ব্যাপার, তোমার মধ্যে দিয়ে আমি কেমন সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এমন কি ওই যে সামনের মাঠে একটা খরগোস ছুটছে, সেটাও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' তারপর সে আরও কাছে গিয়ে অদৃশ্য পেটটার দিকে তাকালো এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছুক্ষণ আগে তুমি কি রুটি আর চীজ খেয়েছিলে?

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার শারীরিক যা অবস্থা তাতে ওই খাবারগুলো হজম হওয়ার কথা নয়। তাই আপনি সেগুলো এখনও দেখতে পারেন।'

'এ যেন বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। তা তুমি এই প্রতারণাপূর্ণ কৌশল তুমি কি করে আয়ত্ত করলে?''

'সে এক লম্বা কাহিনী অন্য এক সময়ে আমি না হয় তোমাকে সেই কাহিনী শোনাবো। এখন আমি একটা ব্যাপারে সাহায্য চাই। নগ্ন হয়ে এবং অসহায় ভাবে শহরতলীর চারধারে ঘুরে বেরিয়েছি। প্রচণ্ড দুঃখে কষ্টে আমায় রাগের মাত্রা তখন এমনি চরমে উঠেছিল যে, আমি খুন করতে প্রস্তুত ছিলাম। তারপর আমি তোমার কাছে এলাম এবং নিজেই নিজেকে বললাম, এই যে একজন লোককে পেয়েছি যে কিনা সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, যেমন সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সম্ভবত আমার সঙ্গে ঘুরতে পছন্দ করবে সে, আর আমাকে সাহায্যও করতে পারে।'

'কিন্তু মিঃ ইনভিজিবল্, আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলো?'

'প্রথমে পোশাক আর আশ্রয় দিয়ে, পরে অন্য আরও সব প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে। পারবে তুমি?'

মার্ভেল দু'পা পিছিয়ে এলো সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর থেকে। 'দেখো, আমি একজন মূর্খ ভবঘুরে' মিনতি করে বললো সে, 'তাই আমি তোমার কোনো সাহায্যেই আসতে পারি না। আমার কথা তুমি ভুলে যাও, আমাকে যেতে দাও। আমার পথে চলতে দাও আমাকে।'

'না! আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে। ইপিং-এ যতো সব লোক পিছিয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে থেকে তোমাকেই আমার উপযুক্ত বলে পছন্দ করেছি। তুমি শুধু আমাকেই যে সাহায্য করতে পারো তা নয়, তোমার জন্য আমি বিরাট কিছু একটা করতে পারি। একটা অদৃশ্য মানুষের শক্তি যে কতো কল্পনা করে নাও!'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর মুহূর্তের জন্য নীরব হলো, ভীতি-প্রদর্শনের আগে চিৎকার করে উঠলো সে। 'কিন্তু যদি তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো, বেঈমানি করো...............যদি তুমি আমার হুকুম না মানো—'

মার্ভেল তার কাঁধে মৃদু আঘাত অনুভব করলো। উঃ কি ভয়ঙ্কর সেই স্পর্শ। ভয়ে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো মার্ভেল। সেই ভয়ঙ্কর স্পর্শ তাকে দারুণভবে প্রভাবিত করলো, সঙ্গে সঙ্গে বশীভূত হয়ে গেলো সে। কেমন বাধ্য ছেলের মতো সে বলে উঠলো। 'না, না ওরকম দুঃসাহস আমার হবে না কখনো। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি তোমার সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।' তোতলাতে তোতলাতে আরও পিছিয়ে যেতে থাকলো সে। 'ক-কখনো সেরকম কিছু ভেবো না যেন। এখানে তোমাকে বলে রাখি মিঃ ইনভিজিবল্, সব সমাস মার্ভেলেরা যদি ভাবো কাউকে সাহায্য করে, সে তোমাকে, শুধুই তো-তোমাকে। এ আমার শুধুই কথার কথা নয়। শপথ নিয়ে

বলো! আর এর অন্যথা হলে তুমি আমাকে যা শাস্তি দেবে আমি তা মাথা পেতে নেবো, এও আমি অঙ্গীকার করছি।..................

।। আট ।।

ঃ ক্রুদ্ধ মানুষ! ঃ

তখন দুপুর, দিনের মাঝামাঝি সময়, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো ইপিং। অদৃশ্য মানুষের বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে বলে যারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল, যারা তার ভয়ে শিঁটিয়ে গেছলো, সে চলে গেছে ধরে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আর তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের সন্দেহ ছিল, সেদিন সকালে কোচ এণ্ড হর্সেস পান্থশালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা নানান ধরনের ঠাট্টা, ইয়ার্কি করতে থাকলে আর যারা অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল, শেষ পর্যন্ত তারাও তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে তাদের সেই মস্করার সামিল হয়ে গেলো।

তারপর দুপুর গড়িয়ে তখন অপরাহ্ন, চারটে বাজে, একজন বেঁটে, ছোটখাটো হলেও রীতিমতো বলিষ্ঠ চেহারার এক ভভঘুরে লোককে গ্রামে ঢুকতে দেখা গেলো। আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে মনে হলো খুব ভয় পেয়ে গেছে সে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পাগলের মতো আপন মনে বিড়বিড় করে বকবক করতে করতে কোচ এণ্ড হর্সেস পান্থশালার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সে। একটু পরেই তার আবির্ভাব ঘটলো সেখানে।

মিঃ থমাস মার্ভেল বার-এর লোকজনদের এড়িয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে গটগট করে উঠে গেলো ওপরতলায়। তার গন্তব্যস্থল এখন একটাই, অদৃশ্য মানুষের ঘর! দরজা ভেজানো ছিল, একটু ঠেলা দিয়ে দরজা খুলতেই দেখলো ঘরের ভেতরে তখন একটা টেবিলের সামনে বসেছিলেন ডঃ কাস এবং রেভারেণ্ড বান্টিং। তাঁদের দৃষ্টি পড়েছিল তখন তিনটি বড় বড় নোটবুকের ওপরে, প্রতিটি নোটবুকের ওপর 'ডাইরি'র লেবেল আঁটা ছিল।

গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর ডঃ কাসই প্রথমে মুখ খুললেন। 'এক ধরনের সাংকেতিক ভাষায় এগুলো লেখা হয়েছে।'

'হয় সেরকম কিছু কিংবা কোনো অদ্ভুত ভাষায়---'

'আমি বলি কি এখানে,' দরজার সামনে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আরে, এ তো সেই অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর! সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র দুটি মানুষ ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। কিন্তু দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলে তাঁরা যখন গোলাপ-রাঙা মুখের ভবঘুরেকে দেখলেন, তাঁরা উভয়েই স্বস্তির হাসি হাসলেন।

'দেখো ভালোমানুষ, তুমি যদি বার-এর খোঁজে এখানে এসে থাকো তাহলে বলবো তুমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছো, কারণ সেটা নিচুতলায়,' ডঃ কাস বলে উঠলেন।

'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মার্ভেল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি পথে নিচে নেমে চললো। মদ পান করার জন্য কিছুক্ষণ বার-এ রইলো সে, তারপর পান্থশালা ছেড়ে চলে গেলো। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখার জন্য চোখ পিটপিট্ করে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে, দ্রুত অদৃশ্য মানুষের শয়নকক্ষের নিচে বাড়িটার একপাশে এসে দাঁড়ালো

মার্ভেল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। মুখে পাইপ লাগিয়ে ঘন ঘন ধোঁয়া উদ্গিরণ করলেও, তার কাঁপা কাঁপা হাতদুটো এবং জানালার দিকে তার ঘন ঘন চকিত চাহনিতে কিন্তু স্পষ্টতই প্রকাশ পাচ্ছিল কিরকম ঘাবড়ে গেছে সে!

ওদিকে ওপরতলায় তখন একটা নাটকীয় ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে, একটু আগে পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তা টের পেলেন না ডঃ কাস এবং রেভারেণ্ড বান্টিং। তাঁরা তখনো অদৃশ্য মানুষের নোটবুকগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন নিরীক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ তাঁরা চমকে উঠলেন, তাঁদের মনে হলো, তাদের গলার পিছন দিকে শীতল ও শক্ত কিছু ঠেকিয়ে ঠেলা দিচ্ছে কেউ। তাঁরা তাঁদের মাথা তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অগ্নিচুল্লীর ধাতব পোকার সমেত দুটো হাত টেবিলের ওপর তাদের চিবুক নামিয়ে নিতে বাধ্য করলো। ভয়ে আতঙ্কে তাঁরা তখন হাঁপাচ্ছিলেন, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হলেন তাঁরা।

তারপরেই একটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাঁদের কানে।

'মূর্খ আপনারা। একটুও নড়বার চেষ্টা করবেন না। আমার কথা অমান্য করলে আপনাদের মগজ-ধোলাই করে ছাড়বো।'

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালেন রেভারেণ্ড, মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে তাঁর নিজের মাথা থেকে। ডাক্তারের মুখেও সেই একই আতঙ্কের ভাব যা তিনি নিজে অনুভব করছিলেন।

'আপনাদের সঙ্গে এমন বাজে ব্যবহার করার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এরকম করতে আপনারাই আমাকে বাধ্য করেছেন,' অদৃশ্য মানুষটি বললো।

'আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে আমার ব্যক্তিগত ডাইরিগুলোর ওপর উঁকি মারার অধিকার কে আপনাদের দিয়েছে?'

তাঁরা উত্তর দেবার আগেই টেবিলের ওপর তাঁদের চিবুক আছড়ে পড়লো বোধহয় ভুল হবে। কারণ অদৃশ্য মানুষ দু'হাতে শক্ত করে তাঁদের চুলের মুঠি ধরে টেবিলের ওপর তাঁদের মাথাদুটো সজোরে ঠুকে দিলো, আগের চেয়েও প্রচণ্ড জোরে।

'আর আমার পোশাকগুলো নিয়ে আপনারা কি করলেন, জবাব দিন!'

'আমরা তোমার পোশাকগুলো আদৌ দেখিনি,' ডঃ কাস উত্তরে বললেন, 'আমরা এখানে আসার আগেই মিসেস হল ঘরটা পরিষ্কার করে গেছেন।'

'ওহো তাই বুঝি! ঠিক আছে, এখন আমার পোশাকের খুব প্রয়োজন, আমাকে তা পেতেই হবে যখন তাহলে শুনুন— '। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাঁদের দু'জনের কানে কানে এমন অস্বাভাবিক কথা বললে যা শুনে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

'না!' ডাক্তারই প্রথমে প্রতিবাদ করে উঠলো, 'আমি পারবো না!'

'ভয়ঙ্কর লজ্জাস্কর ব্যাপার এটা!' সঙ্গে সঙ্গে রেভারেণ্ডও চিৎকার করে উঠলেন।

'শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে আপনাদের বলার কিছু নেই। বরং আমি যা বলবো আপনাদের তাই শুনতে হবে। আমার কথা না শুনলে বুঝতেই পারছেন, আপনাদের মতো দুর্বল লোকেদের কাছে আমার ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে না।' এই বলে অদৃশ্য মানুষ তাদের চুলের মুঠি আলগা করতেই তাঁরা এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তারপর সে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং বন্ধ জানালা খুলে দিলো সে।

পান্থশালা সংলগ্ন রাস্তার ওপারে তামাকের দোকানের মালিক মিঃ হাক্সটার পান্থশালার ওপর-তলায় অদৃশ্য মানুষের ঘরের জানালা খুলে যেতে দেখেই সে তার হাঁটার গতি দ্রুত করে তুললো। মিনিট কয়েক পরেই দড়ি দিয়ে বাঁধা তিনটে বই, একজোড়া গেলিস আর নীল টেবিলক্লথে মোড়া একটা বড় বাণ্ডিল ওই খোলা জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিতে দেখলো সে। জানালার দিকে দাঁড়িয়ে ছিল ভবঘুরে লোকটা, সে তার হাতদুটো প্রসারিত করে প্রস্তুত হয়েই ছিল, তাই সেগুলো তালুবন্দী করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না তার।

'চোর, চোর! পালাচ্ছে, ওকে থামান!' ছুটন্ত ভবঘুরের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করতে থাকে হাক্সটার।

দশ পাও যায়নি হাক্সটার, তার আগেই তার একটা পা মনে হলো কোনো রহস্যময় ভাবে কেউ যেন আঁকড়ে ধরলো। এখানেই শেষ নয়, আরও চমক যেন অপেক্ষা করছিল তার জন্য। পরমুহূর্তে সে দেখলো, সে নিজেই হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, তারপর আকাশ থেকে নিচে মাটিতে আছড়ে পড়ে গিয়ে মুখটা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠলো এবং একটু পরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে।

হাক্সটারের "চোর চোর! ঐ যে ধরুন!" চিৎকার শুনে কোচ এ্যাণ্ড হর্সেস পান্থশালার বার থেকে বেরিয়ে এলো খদ্দেররা এবং রাস্তায় নেমে পড়লো হাক্সটারের বর্ণিত চোরটাকে ধরবার জন্য। সবাই চোরটার পিছনে ধাওয়া করতে রাস্তায় নামলেও মিসেস হল তার পান্থশালায় রয়ে গেলো ক্যাস রেজিস্টার পাহারা দেবার জন্য।

হঠাৎ অদৃশ্য মানুষের শয়নকক্ষের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো মিসেস হল এবং ডঃ কাসকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সদর দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখলো। বৃদ্ধ ডাক্তার পরনে ছিল শুধু আণ্ডারওয়্যার এবং জ্যাকেট।

'ওকে থামাও! ওকে আঁকড়ে ধরো!' ডাঃ কাস চিৎকার করতে থাকেন। 'সে আমার ট্রাউজার আর রেভারেণ্ডের পরনের সমস্ত পোশাক নিয়ে পালাচ্ছে। ধরো, ধরো ওকে!'

ঠিক তাঁর পিছু পিছু রেভারেণ্ড বান্টিংও এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে একটা সুতোও ছিল না। সব নিয়ে পালিয়েছে সেই অদৃশ্য মানুষটা। রেভারেণ্ড মরীয়া হয়ে অগ্নিচুল্লীর কম্বল এবং দৈনিক সংবাদপত্র দিয়ে তাঁর শূন্য পোশাকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁর নগ্নতা ঢাকতে পারেন।

তাঁদের সেই অস্বাভাবিক পোশাকে আবির্ভূত হতে কেউ তাঁদের দিকে তাকিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা দূরে থাক, এক নজরে একটু তাকিয়েও দেখলো না। তারা তখন জনতার ভিড়েতে নিজেদেরকে সামিল করে তোলার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

হাক্সটার তখন অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়েছিল। কেউ কেউ ছুটন্ত অবস্থায় লাফ দিয়ে তার অবসন্ন দেহটাকে টপকে যাচ্ছিল, আর অন্যেরা রহস্যজনকভাবে মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কোনোরকমে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে থাকে। অদৃশ্য মানুষটির এই অতর্কিত আক্রমণ জনসাধারণের মনে দারুণ ভীতি সঞ্চার করলো এবং সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর যেন আকারে ইঙ্গিতে তাদের বুঝিয়ে দিলো, আমার কি শক্তি তার পরিচয় তো তোমার ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছো। অতএব প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, আর এগিও না, বাড়ি ফিরে যাও লক্ষ্মী ছেলের মতো, এই মুহূর্তে সেটাই হবে তোমাদের একমাত্র নিরাপদ স্থান।

ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা যে যার বাড়ি ফিরে গেলো অতঃপর। অদৃশ্য মানুষের মধ্যে তারা একটা ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পেয়ে হয়তো তাকে এর বেশি ঘাঁটাতে চাইলো না। তার নির্দেশ মানলে যদি সে তাদের আর কোনো ক্ষতি না করে এই আশায় তাদের এই রণে ভঙ্গ দেওয়া।

কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উলটো ঘটনাই ঘটতে দেখা গেলো। যাই হোক, অদৃশ্য মানুষটি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় গ্রামবাসীদের অনুসরণ করে তাদের গ্রামে আবার ফিরে চললো। এবং ফেরার পথে তার চোখের সামনে যা কিছু পড়লো সবই সে নির্বিকার ভাবে ধ্বংস করে চললো। তার কাছে কোনো ক্ষমা নেই, যারা তার অগ্রগতির বিরোধিতা করেছে কিংবা তার অস্তিত্বের অস্বীকার করেছে, তাদের কাউকেই রেহাই দিলো না সে, তারা একের পর এক তার শিকার হতে থাকলো। অবশ্য সে তাদের প্রাণে না মারলেও তাদের দামী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সব ভেঙে চুরমার করতে করতে এগিয়ে চললো।

তার প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য হলো মিঃ হল। পান্থশালার সামনে তার ঘোড়ারগাড়িটা দেখতে পেয়ে খেলনা পুতুলের মতো সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো। তারপর বাণ্টিং-এর পার্লারের জানালা লক্ষ্য করে একটা ল্যাম্প নিক্ষেপ করলো এবং মি. হাক্সটারের দোকানের জানালা দিয়ে একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে দিলো সজোরে, এর ফলে তার দোকানের সমস্ত জিনিসপত্তর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এর পর তার লক্ষ্য হলো ডঃ কাস-এর চেম্বার, সেখানকার প্রতিটি ওষুধের বোতল ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো সে।

আর সব শেষে টেলিগ্রাফের সমস্ত তার কেটে দিয়ে ইপিং-এর সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিলো।

সেই তাণ্ডবলীলা শেষ হতেই অদৃশ্য মানুষটি ইপিং থেকে কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেলো। তারপর থেকে তার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আর কখনো শোনা যায়নি, তাকে কখনো আর দেখা যায়নি, কিংবা গ্রামের কোথাও তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি। সাময়িকভাবে গ্রামবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো এই ভেবে যে, যাক বাঁচা গেলো, এর পর সেই অদৃশ্য মানুষটির অত্যাচার আর সহ্য করতে হবে না তাদের।

।। নয় ।।

ঃ এক অনিচ্ছুক সহযোগী ঃ

সেদিন সন্ধ্যায় ইপিং ছেড়ে চলে গেলো থমাস মার্ভেল। ক্লান্তিতে পথ চলতে পারছিল না সে। পা-দুটো অবশ হয়ে আসছে। তবু তাকে চলতে হচ্ছে, তাকে এখন অনেক দূরে পাড়ি দিতে হবে। তার দু'হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা তিনটি বই এবং নীল টেবিল ক্লথে বাঁধা একটা বাণ্ডিল। রাস্তার প্রতিটি মোড়ের মাথায় যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে সে তার চারদিকে পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিল এবং অদৃশ্য মানুষটির দৃষ্টি এড়িয়ে পালাবার পথ খুঁজছিল।

কিন্তু সে তো জানে না, অদৃশ্য মানুষটি অন্তর্যামী, সবার মনের কথা, সবার ভাবনার কথা সে ঠিক টের পেয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। এই মুহূর্তে মার্ভেল যা ভাবছে তা সে বেশ বুঝে গেছে। প্রায়শই অদৃশ্য মানুষের হাত দুটো ভবঘুরের কাঁধের ওপর আছড়ে পড়ছিল এবং একটা

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বারবার তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলছিল, 'তুমি যদি আমার কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করো, আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি তোমাকে অবশ্যই খুন করবো!'

'তুমি মিথ্যে সন্দেহ করছো, আমিও শপথ নিয়ে বলছি, আমি মোটেই পালাবার চেষ্টা করছি না।' চোখ ভর্তি জল নিয়ে মার্ভেল প্রতিবাদ করে উঠলো, 'এখানকার রাস্তাঘাট আমার জানা নেই, আর আমি হারিয়ে যেতেও চাই না।'

'আমিও তো তাই চাই। ইপিং-এর মূর্খ লোকগুলো কেমন করে যেন জেনে গেছে, আর আমার সব গোপনীয়তা। খুব শীগগীরই খবরের কাগজে প্রকাশ পেয়ে যাবে। আমার তরফে এটা খুবই অশুভ লক্ষণ বলা যায়। এখন প্রত্যেকে প্রতিটি জায়গায় আমার খোঁজ করবে। তাই আমার সামনে এখন অনেক কাজ, যা আমি প্রকাশ্যে নিজে কখনো করতে পারবো না, তার জন্য তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। আর সেই জন্যই তোমাকে আমার সঙ্গে রাখতেই হবে।'

'কিন্তু আমি যে এখন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় আমি তোমার কোনো কাজেই লাগতে পারি না। আমার আশঙ্কা হয়তো আমি তোমার যে-কোনো পরিকল্পনা ধ্বংস করে দিতে পারি।'

'ওসব কথা তোমার চিন্তা না করাই ভালো!' অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাকে সতর্ক করে দিলো। 'আর তোমার ভয় পাবারও কিছু নেই। আমি যা বলি সেই মতো কাজ করে যাও তাহলে দেখবে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, কিংবা আঘাত পাবে না। টেবিলক্লথে মোড়ানো পোশাকের ওই বাণ্ডিলটা এখন আমার আর দরকার নেই। তাই ওটা তুমি এখন রাস্তার ধারে কোথাও ফেলে দিতে পারো। বরং তার চেয়ে আমার বইগুলো তুমি তোমার জীবন দিয়ে রক্ষা করতে পারো! এ আমার আদেশ!'

রাতের বেশিরভাগ সময় তারা হেঁটেই কাটালো। কেবল চলার পথে ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা গাছের তলায় বসলো।

পরের দিন সকলে তারা সমুদ্র তীরবর্তী পোর্ট শোয়ি শহরে এসে পৌঁছলো। সেখানে একটা ব্যাঙ্ক ছিল, সেটা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো তারা। রাস্তা তখন মোটামুটি ফাঁকাই বলা যায়। ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে মার্ভেল লক্ষ্য করতে থাকে, ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর ভেতর থেকে টাকার নোটগুলো হাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলো এবং অদৃশ্য মানুষের নির্দেশ সেগুলো কেমন করে তার কোটের এবং ট্রাউজারের পকেটে চালান হয়ে গেলো। পকেটগুলো টাকায় ভর্তি হয়ে যেতেই মার্ভেল তখন দ্রুত পালিয়ে এলো সেখান থেকে।

ব্যাঙ্ক থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে এসে যখন সে পৌঁছলো, তখন ভয় আর ক্লান্তি তখন তাকে একটা পান্থশালার বাইরে বেঞ্চে বসতে বাধ্য করলো। সে তার হাতের বইগুলো তার পাশে বেঞ্চের ওপর রাখলো। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিতে ভুললো না, কে জানে কেউ তার ওপর নজর রাখছে কি না!

খুব বেশি সময় বসেনি সে, একজন বৃদ্ধ নাবিক পান্থশালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পাশে এসে বসলো বেঞ্চটার ওপরে। 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই বুঝি সন্ধ্যা হয়!' প্রবাদটা মনে পড়ে গেলো তার। হ্যাঁ, তার আশঙ্কাই সত্যি হলো। নাবিকটি যদিও তার হাতের খবরের কাগজটা পড়ার ভান করছিল, আসলে সে বেশ আগ্রহসহকারে বেঞ্চের একপাশে রাখা মার্ভেলের বইগুলো এবং তার পোশাকের স্ফীত পকেটগুলোর ওপর যে নজর দিচ্ছিল, মার্ভেলের বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না।

খবরের কাগজের ওপর তেমনি চোখ রেখেই বৃদ্ধ নাবিকটি হয়তো মার্ভেলকে শুনিয়েই বলে উঠলো, 'খবরের কাগজে কি বিস্ময়কর খবরই না বেরিয়েছে। এই লেখা থেকে মনে হচ্ছে, এক অদৃশ্য মানুষ এই অঞ্চলে অবাধে ঘোরাফেরা করছে, কেউ তার নাগাল পাচ্ছে না।'

'না, না এ অসম্ভব, এ একটা আজগুবি খবর!' মার্ভেল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো। 'এরকম খবর সত্যি আপনার বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি অন্তত করি না।'

'না, আমি আপনার কথা ঠিক মানতে পারলাম না,' বৃদ্ধ নাবিক পালটা প্রতিবাদ করে উঠলো।

'এ কথা কেন আপনার মনে হলো?' মার্ভেল কৈফিয়ত চাইলো।

'কারণ খবরের কাগজগুলো যখন বলছে, এরকম ঘটনা ঘটেছে, তখন সেটা অবশ্যই সত্যি বলে ধরে নিতে হচ্ছে।'

'সেই অদৃশ্য মানুষটি কি করছে, বলেছে কিছু তারা?'

'হ্যাঁ, বলেছে বইকি, খবর তো সেখানেই!'

'কি বলেছে শুনি?'

'সব কিছুই। এই তো এখানে ওরা বলেছে, একটা সংঘর্ষে তার মাথা থেকে ব্যাণ্ডেজটা যখন ছিঁড়ে ফেলা হয়, সে যে একজন অদৃশ্য মানুষ তখনি আবিষ্কৃত হয়, দেখা যায় ব্যাণ্ডেজের নিচে তার মাথা ছিল না। তারপর লোকটা এক এক করে তার পরনের সমস্ত পোশাক খুলে কখন যে উধাও হয়ে যায় কেউ খেয়াল করতে পারে না, কারণ তখন যে তার দেহ বলতে কিছুই ছিল না, পোশাকমুক্ত হওয়া মাত্রই সে যে অদৃশ্য মানুষে পরিণত হয়ে গেছলো, এর থেকেই বোঝা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে তার পোশাক দেখা গেলেও তার নিচে রক্ত-মাংসের কোনো শরীরের অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। আসলে তার পোশাকগুলোই একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, অদৃশ্য মানুষকে জীবন্ত মানুষ বলে চালিয়ে দিয়েছিল এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে!'

'হ্যাঁ, সত্যি? এ তো খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার! আর অদৃশ্য বলেই ওভাবেই সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে পারলো, তাই না? ওঃ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার।' এখানে একটু থেকে মার্ভেল আবার বললো, 'ভালো কথা, তার কোনো বন্ধু কি তাকে সাহায্য করছে, এরকম কোনো খবর কি কাগজে লিখেছে?'

'না, সেরকম কিছু বলেনি বটে, তবে তাদের অনুমান, এখানে এই পোর্ট শোয়ির দিকেই এসেছে সে। ভেবে দেখুন, যদি সে এখানে থেকেই থাকে আর ঠিক করে আপনার যা কিছু আছে সব ডাকাতি করে নেবে, আপনি তাকে থামাতে পারবেন না, কারণ আপনি তাকে দেখতে পাবেন না। আরব পুলিশ তার হদিশ করতে পারবে না।

নাবিকটি যখন তার সঙ্গে কথা বলছিল, মার্ভেল সারাক্ষণ নিজের চারপাশে দৃষ্টি ফেলে রাখছিল, পায়ের শব্দ শোনবার জন্য কান পেতে রেখেছিল, কিংবা কোনো গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। যা তাকে বলে দিতে পারে অদৃশ্য মানুষটি কোথায়! কিন্তু কোনো কিছু শুনতে না পেয়ে সে ভাবলো, এখানে সে যথেষ্ট নিরাপদে আছে। সে আবার এও ভাবলো, সম্ভবত পালাবার এই তো সুযোগ। তাই নাবিকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে সে তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, এই অদৃশ্য মানুষটির সম্পর্কে আমি কিছু খবর জানি, সেসব খুব বিস্ময়কর খবর! শুনলে আপনি অবশ্যই চমকে উঠবেন।'

'তাই কি! ঠিক আছে, বলুন আমাকে! নাবিকটি মৃদু চিৎকর করে উঠলো।

'ব্যাপারটা হলো এই রকম যে, 'মার্ভেল আগ্রহসহকারে বলতে শুরু করলো এই ভাবে, 'আমি.............আউ!' এই পর্যন্ত হলে হঠাৎ একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো সে এবং সে তার বাঁ-হাতটা নিজের বাঁ-কানের ওপর তুলে ধরলো। একটু আগেই যেখানে এক অদৃশ্য হাতের চড় এসে পড়েছিল প্রচণ্ড জোরে। তারপর একটু আগে সে তার সেই ছোট্ট উক্তি 'আউ'-এর দ্রুত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো, এবং কান্না স্বরে বলতে থাকলো, 'এই যে আমার দাঁতগুলো! দাঁতগুলো সত্যি আমায় ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে! আমাকে এখনি চলে যেতে হবে এখান থেকে।' এই বলে বইগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে দ্রুত চলে গেলো সেখান থেকে।

কিন্তু সেই অদৃশ্য মানুষটি?' বৃদ্ধ নাবিক তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলো। 'তার কথা তুমি কি জানো, তা তো বলে গেলে না!'

'যা বলেছি তার এক বর্ণও সত্যি নয়। ওটা স্রেফ একটা গুজব। আর যে ছেলেটি প্রথম এই গুজব রটাতে শুরু করে আমি তাকে জানি। সেই ছেলেটিই খবরের কাগজের লোকেদের মনে বিশ্বাস জাগায়, এটা সত্য ঘটনা!'

'ওহে মূর্খ বুড়োখোকা, আপনি যে সত্যি সত্যি অদৃশ্য মানুষের ব্যাপারে কিছু জানেন, কেন তবে সে কথা প্রথমে বলে আবার উল্টো গাওনা গাইছেন এখন? আমি যে আপনার কথা বিশ্বাস করে—'

বৃদ্ধ নাবিকের এ প্রশ্নের উত্তর কি করেই বা দেবে মার্ভেল! সেই অদৃশ্য হাতটা যে তার কাঁধ আর হাতের ওপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতেই বোবা হয়ে গেছলো সে তখন। তবে বোবা হয়ে গেলেও তার চলার গতি অব্যাহত তো রইলোই, বরং আরও বেশী দ্রুততর হতে থাকলো, কারণ অদৃশ্য দুটি হাত দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ করে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে।

।। দশ ।।

পরের সেদিনই বাইরে পোর্ট পারডক টাউনের কাছে একটা বাড়িতে বিজ্ঞানী গবেষক ডঃ আর্থার তাঁর টপ ফ্লোর স্টাডিতে একটা টেবিলের সামনে বসেছিলেন। পাতলা রোগাটে চেহারার তরুণ বিজ্ঞানী, মাথায় সোনালী চুল, এবং ঠোঁটের ওপর পুরু গোঁফ। ওদিকে শেষ অপরাহ্নবেলায় অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু তার ঘর থেকে মুছে গেলে পর সে তার মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে তাকালো চারদিকে।

কেম্প তার হাতের কলমটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। হাত দুটো প্রসারিত করে জানালার ধারে এগিয়ে গেলো। খোলা জানালাপথ দিয়ে রাস্তায় পথ চলতি মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করতে গিয়ে একটা আজব দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একজন বলিষ্ঠ চেহারার বেঁটে ছোটখাটো একটা লোক প্রচণ্ডভাবে হাত নেড়ে ছুটছিল। একটু কষ্ট করে অনুমান করতে গিয়ে কেম্পের মনে হলো, লোকটা টাউনের দিকেই ছুটছে। কিন্তু বোকার মতো ছুটছে কেন সে? সাধারণত চোরেরাই তো এভাবে পালিয়ে থাকে!

'আর একজন বোকা!' কেম্প নিজের মনে বিড়বিড় করে আবার বলে উঠলো, 'আশ্চর্য, এই

লোকটাও কেমন বুনো শূয়োরের মতো ছুটছে, অকারণ! যেমনটি আজ সকালে শহরের পথে আমি যখন হাঁটছিলাম, তখন এরই মতো একজন মূর্খ লোক আমার পিছন পিছন ছুটে আসছিল। আর চিৎকার করে বলছিল, 'স্যার সাবধান! অদৃশ্য মানুষ আসছে! আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেলে ভালো হয়। আমি বুঝতে পারছি না, লোকেরা কি করে বোকার মতো এইসব গুজবে কান দেয়, বিশ্বাস করে?'

কিন্তু পোর্ট বারডকের লোকেরা যারা থমাস মার্ভেলকে শহরের পথ ধরে অদৃশ্য মানুষ সম্পর্কে চিৎকার করে সাবধান করে দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছিল, তখন তার সেই ঘর্মাক্ত মুখে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেয়েছিল, তারা কিন্তু এটাকে বোকামো কিংবা গুজব বলে উড়িয়ে দেয়নি। এমন কি সেই ভবঘুরে লোকটির কয়েক পা পরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনেও তারা সেটা আজগুবি বলে অবহেলাও করেনি। শুধু তাই নয়, অদৃশ মানুষটি যখন রাস্তার একটা কুকুরকে লাথি মারলে সে যখন ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠেছিল, তখনও প্রত্যক্ষদর্শীরা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। আরও আছে, দুটি ছেলে ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছিল, সেই সময় হঠাৎ তারা অনুভব করে, অদৃশ্য মানুষটি হঠাৎ তার কনুই দিয়ে আঘাত করে, তখনও তারা তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'সাবধান অদৃশ্য মানুষ ঢুকে পড়েছে আমাদের শহরে! যে যার বাড়িতে ফিরে যাও!' তারপর এক মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে শহরের পথ দিয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ অদৃশ্য মানুষটি তার কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ধারে যখন ছুঁড়ে ফেলে দেয় তখনো সে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। তাই এই সব ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্টতই ধরে নেওয়া যায় যে, শহরে অদৃশ্য মানুষের যে তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে, তা জনসাধারণ পুরোপুরিই বিশ্বাস করে নিয়েছে। এর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো কিন্তু নেই!

পথচারীরা ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটে গেছে অদৃশ্য মানুষের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, আকাশে বাতাসে জনসাধারণের চিৎকার ধ্বনিত হতে থাকে, "অদৃশ্য মানুষ এখন এখানেই রয়েছে।"

কিন্তু সেই সব চিৎকার ধ্বনি, এবং অদৃশ্য মনুষটির সম্পর্কে সতর্কবাণী জলি ক্রিকেটার পান্থশালার ভিতরে এখনও পৌঁছায় নি। সেখানকার লোকজন এবং খদ্দেররা জানে না, সারাটা দিন ধরে শহরে অদৃশ্য মানুষ কিভাবে তার দৌরাত্ম চালিয়ে যাচ্ছে, এমন কি ভবঘুরে থমাস মার্ভেল যখন পান্থশালার প্রবেশ পথের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিল, তখনও কেউ তার সেই দুরাবস্থার কথা জানতো না। তার মাথায় টুপি উধাও, আর তার পরনের কোটের কলার ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তবুও বইগুলো সে তার হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ভেতরে ঢুকেই সে দরজার ওপর আছড়ে পড়লো ভেতর থেকে সেটাকে বন্ধ করার জন্য, যাতে করে অদৃশ্য মানুষ তার নাগাল না পায়। সে তার কান্না আর চেপে রাখতে পারলো না। অশ্রুর বাদল নামলো তার দু'চোখে। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সে খবর দিলো ঃ 'সে আসছে! অদৃশ্য মানুষ আসছে! আমার পিছু ধাওয়া করেছে সে। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সাহায্য করুন, প্লিজ!'

'তাহলে খবরের কাগজে যেসব খবর বেরিয়েছে সব সতি!' ভয়ার্ত বারম্যান হাঁ করে তাকিয়ে রইলো মার্ভেলের দিকে।

একজন পুলিশম্যান বার-এ মদ খাচ্ছিল। মার্ভেলের কথা শুনে হুকুম করলো, 'তাড়াতাড়ি করে দরজায় খিল্ লাগিয়ে দিন।'

'আমাকে একটা নিরাপদ ঘরে লক্ ঘরে রাখুন।' মার্ভেল কাতর মিনতি জানালো। 'আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু সে আমার পিছনে লেগে আছে। আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে সে, আর আমি এও জানি যে, একদিন না একদিন সে আমাকে ঠিক খুন করবেই!'

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খিল্ আঁটা দরজাটা ভয়ঙ্কর ধাক্কায় ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

'ওই সে এলো!' মার্ভেল চিৎকার করে উঠে চারদিক তাকিয়ে লুকানোর জায়গার খোঁজ করলো, তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ পড়তে দেখা গেলো। 'আমাকে খুন করতে দেবেন না তাকে!'

দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেওয়ার ফলে বারম্যান তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো নিমেষে। বার-এর পিছনে টেনে নিয়ে গেলো মার্ভেলকে।

'দয়া করে দরজা যেন খুনবেন না!' মার্ভেল মিনতি জানায়। 'পান্থশালার অন্য সব দরজাগুলো বন্ধ কিনা দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন। সে এক চতুর শয়তান। যদি এখানে কোনো দরজায় তালা না দেওয়া থাকে, তাহলে ওর যা বুদ্ধি তাতে ও ঠিক সেই দরজার সন্ধান পেয়ে যাবে। আর তারপর........'

'হায় ঈশ্বর!' বারম্যান চিৎকার করে উঠলো। 'উঠানার দরজা, পিছনের দরজা, আর রান্নাঘরের —'

ঠিক তখনি দরজায় আবার ধাক্কা লাগলো, বারম্যান দ্রুত রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বিরাট ছুরি হাতে নিয়ে ফিলে এলো।

'রান্নাঘরের দরজা তো বন্ধ, কিন্তু উঠানের দরজা খোলা রয়েছে, তাই মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যে সে নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বার আর রান্নাঘরের দরজা সশব্দে খুলে যেতেই পুলিশম্যান তার রিভলবারটা হোল্ডার থেকে দ্রুত হাতে বার করে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। হঠাৎ অদৃশ্য মানুষটি বার-এর পিছন থেকে মার্ভেলকে টেনে এনে ঘরের বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। তাদের কারোরই পা মাটিতে ছিল না, যেন শূন্যে ভাসছিল তারা। ওদিকে পুলিশম্যানের হাতের রিভলবার গর্জে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বার-এর পিছনে বিরাট প্রমাণ সাইজের আয়নাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়লো মেঝের ওপরে।

বারম্যান ও পুলিশম্যান স্তব্ধ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, অদৃশ্য মানুষ যেন তাদের সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছে। তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এবং তাদের চোখের সামনে দিয়ে মার্ভেলকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো অদৃশ্য মানুষটি, তারা কোনোরকমে বাধাও দিতে পারলো না। অদৃশ্য মানুষ এসেছিল রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে এবং সেই পথেই ফিরে যেতে চাইলো সে।

ইতিমধ্যে পুলিশম্যান সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং নিমেষে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো। বার-এর দরজা বন্ধ করে সে তাদের পিছু ধাওয়া করলো রান্নাঘর পর্যন্ত। অদৃশ্য মানুষ যে হাত দিয়ে মার্ভেলকে ধরে টানতে টানতে পান্থশালার বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল,

সেটার কব্জিটা আঁকড়ে ধরলো পুলিশম্যান। কিন্তু অতর্কিতে অদৃশ্য মানুষ তার মুখে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারতেই টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

'পেয়েছি, আমি তাকে পেয়েছি,' শূন্যে হাত তুলে আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিমায় চিৎকার করে উঠলো বারম্যান।

হঠাৎ নিজেকে অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে মুক্ত হতে দেখে মার্ভেল যুদ্ধরত তাদের দু'দলের পায়ের ফাঁক দিয়ে গুটিসুটি মেরে পালিয়ে গেলো নিরাপদ স্থানে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেলে তার স্বাদ যে কত মধুর মার্ভেল বেশ ভালোভাবেই সেটা অনুভব করলো! তার পরেই যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার শোনা গেলো, সে চিৎকার যে অদৃশ্য মানুষের চিনতে একটুও ভুল হলো না মার্ভেলের। পুলিশম্যান তার শক্ত বুটজুতো দিয়ে অদৃশ্য মানুষের পা চেপে ধরে ছিল তখন। তবে অচিরেই যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠলো। এবার তার বদলা নেবার পালা। পুলিশম্যান কিন্তু আদৌ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না কারণ সে যে এক অদৃশ্য মানুষ। তার অস্তিত্ব একমাত্র বোঝা যায় অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাজের মাধ্যমে। আর এক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটতে দেখা গেলো। পুলিশম্যান তাকে খুঁজে বার করার আগেই তার অদৃশ্য দুটি হাতের ঘুষি এবং দু'পায়ের লাথি প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়লো তার গায়ের ওপর। সবই এলোপাথারি এবং সে সবের তীব্রতা এতোই বেশি যে, তার আগের আঘাতের দ্বিগুণ আকার নিতেই সে এবার ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লো মেঝের ওপরে। নড়াচড়ার ক্ষমতা তো লোপ পেলোই, সেই সঙ্গে বুঝি বা তার জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো।

পুলিশম্যানের অমন দুরাবস্থা দেখে মার্ভেল তো বিভ্রান্ত। সে তখন ভাবছিল, অদৃশ্য মানুষের হিংস্র তাণ্ডবলীলায় রক্ষক পুলিশম্যানই যখন পরাস্ত, পর্যুদস্ত, তখন সে তো তার কাছে এক অসহায় মানুষ বই তো কিছু নয়! এখন ওই হিংস্র অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে তার বাঁচার একমাত্র উপায় হলো এখান থেকে সরে পড়া। যেসব বইগুলো এতক্ষণ তার প্রহরায় ছিল, সেগুলো সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে সবার অলক্ষ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এলো। রান্নাঘরে পা দেওয়া মাত্র সে আর পিছন ফিরে তাকালো না। এবার সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুট দিলো উঠানের দরজার দিকে।

কয়েকমুহূর্ত পরেই হতভম্ব দেখলো, শূন্য হাওয়ার সঙ্গে তারা নিজেরাই লড়াই করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

একটুতেই বারম্যান হাঁফিয়ে ওঠে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কোনোরকমে অস্ফুট স্বরে সে বললো, 'আশ্চর্য কোথায় গেলো সে?'

'সে নিশ্চয়ই যে পথ দিয়ে এসেছিল, সে পথ দিয়েই চলে গেছে।' পুলিশম্যান উত্তরে বললো।

'কিন্তু কোন্ পথে তা তো বলবেন?' বারম্যান স্পষ্ট করে জানতে চাইলো, 'পথ কোন্টা?'

'তার ক্ষেত্রে পথ তো একটাই, উঠানের দরজা দিয়ে!' এই বলে পুলিশম্যান এবার উঠে দাঁড়ালো, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

তারা রান্নাঘরে, প্রবেশ করা মাত্র একটা প্লেট সোঁ সোঁ শব্দে উড়ে এলো পুলিশম্যানের মাথার কাছে।

পুলিশম্যান বুঝতে পারলো, অদৃশ্য মানুষটির এ এক নতুন ধরনের খেল্!

'মজা দেখাচ্ছি তাকে!' পুলিশম্যান খিঁচিয়ে উঠে বললো। তারপর সে তার হাতের রিভলবারটা উন্মুক্ত উঠানের দরজা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলো, ট্রিগার টেপার অপেক্ষায়।

পর পর পাঁচটি শট। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে জ্বলন্ত বুলেটগুলো ছুটে যায় উঠানের দরজার দিকে এক এক করে। তারপরেই সেখানে এক নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

'আপনি নিশ্চয়ই তাকে গুলিবিদ্ধ করে থাকবেন,' বারম্যান বলে উঠলো। 'একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি একটা লণ্ঠন নিয়ে আসছি। দেখবে, তার দেহটা উঠানের কোথাও পড়ে আছে!'

।। এগারো ।।

ঃ ডঃ কেম্পের দর্শনপ্রার্থী ঃ

জলি ক্রিকেটার পান্থশালায় যখন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছিল। ডঃ কেম্প তখন তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁর মাইক্রোস্কোপ এবং লেখা নোটগুলোর মধ্যে তাঁর মনোযোগ দুভাগে ভাগ করে। কিন্তু তাঁর সেই মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটলো হঠাৎ পোর্ট বারডক থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে আসাতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালার সামনে ছুটে গেলেন।

'জলি ক্রিকেটার পান্থশালার সামনে জনতার ভীড়।' শহরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে তিনি বলে উঠলেন 'আমার মনে হচ্ছে, অনেক বেশি মদ খেয়ে ফেলেছে, আর এই কারণেই বোধহয় গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে।'

মোটামুটি এই রকম একটা ধারণা নিয়ে ডঃ কেম্প টেবিলের সামনে ফিরে এসে তাঁর গবেষণার কাজে মন দিলেন। পরবর্তী এক ঘণ্টা ধরে তিনি আবার মনোযোগসহকারে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। আর তার পরেই তার দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠতেই তাঁর কাজে বাধা পড়লো। কান খাড়া করে তিনি শুনতে থাকলেন, ওদিকে তাঁর হাউসকীপার আগন্তুকের ডাকে সাড়া দিতে গেলো। কিন্তু ডঃ কেম্প অবাক হয়ে গেলো এই জন্য যে, হাউসকীপার ফিরে এসে তাঁর দর্শনার্থী আসার খবর তো জানালো না।

যাই হোক, বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর তিনি তাঁর স্টাডি থেকে বেরিয়ে হলে এসে হাউসকীপারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 'কে এলো অ্যানি?'

'কেউ নয় স্যার। মনে হয় কেউ বোধহয় মস্করা করেছে, হয়তো সে ঘণ্টা বাজিয়েই চলে গেছে।'

অ্যানির মন্তব্যটা ঠিক মনঃপুত হলো না ডঃ কেম্পের। তাই তিনি তাঁর কাজে ফিরে এলেও বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে অস্থির হয়ে রইলেন, কাজে মন বসাতে পারলেন না।

অবশেষে রাত তখন দু'টো, তিনি তাঁর কলমটা টেবিলের ওপর রেখে একটা মোমবাতি হাতে তুলে নিলেন। নিচতলায় তাঁর শয়নকক্ষে, সিঁড়িটা অন্ধকারে ডুবে ছিল। তিনি তাঁর শয়নকক্ষে যাবার পথে অন্ধকার ঘোচাতেই মোমবাতিটা হাতে তুলে নিলেন। নিচে একতলায় সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে তিনি তাঁর শয়নকক্ষের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মেঝের ওপর একটা গাঢ় লালরঙের দাগ দেখতে পেয়ে। তিনি একজন বিজ্ঞানী। স্বভাবতই এরকম এটা স্বাভাবিক কিছু

দেখলে সব বিজ্ঞানীদের যেরকম কৌতূহল হয়, ঠিক তেমনি হলো তাঁরও, তাঁর মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগলো। নিজের মনে তিনি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'ওই দাগটা কিসের?'

যাই হোক, কৌতূহল মেটাতে তিনি নিচু হয়ে সেই দাগটা স্পর্শ করলেন। 'আরে, এ যে দেখছি লাল দাগ, এবং আঠালো, শুকনো রক্তের মতোন। ওহো, সেটা রক্তের দাগই বটে। সম্ভবত সামান্য একটু আঘাট পেয়ে, অ্যানির ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে, পড়ে থাকতে পারে। হয়তো সকালে সেটা পরিষ্কার করে ফেলেবে।'

সেই দাগটার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডঃ কেম্প তার শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে চললেন অতঃপর। কিন্তু ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে হাতলের ওপর রক্তের দাগ পেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন, মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না তাঁর, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর শয়নকক্ষের সামনে।

অনেকক্ষণ পরে একটু থিতু হয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকেই তিনি আঁতকে উঠলেন ঃ 'হায় ঈশ্বর! রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে বিছানার চাদর এবং সেটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আর আমার বালিশে এমন ভাবে খাঁজ পড়েছে যে, দেখে মনে হয়, কেউ হয়তো সেটার ওপর শুয়ে থাকবে। তাজ্জব ব্যাপার। আমার অনুপস্থিতিতে এখানে এসব কি ঘটলো?' আপন মনে বললেন তিনি। মনে হলো, তিনি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

ঠিক সেই সময়ে ঘরে একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। 'ঈশ্বরের দোহাই, আপনিই তো ডঃ কেম্প, তাই না?'

প্রশ্নটা শোনা মাত্র কেম্প ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ফেললেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, একমাত্র তিনিই ঘরের ভেতরে রয়েছেন। দ্বিতীয় কোনো পুরুষ কেউ আর ছিল না। একজন চিকিৎসক এবং একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, ঘরে কেউ নেই, অথচ কারোর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে, এমন ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা তিনি কখনোই বিশ্বাস করতে পারেনই না। তাই তিনি মনে করলেন, হয়তো শুনতে ভুল করেছেন তিনি। কিন্তু অতো রক্তের দাগ, সেটাও কি তাঁর দেখার ভুল! এ কথাটি তাঁকে ভাবতে হচ্ছে এখন।

তারপরেই তাঁর ওয়াশস্ট্যাণ্ড থেকে একটা শব্দ তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিলো যেন। পরক্ষণেই তাঁর চোখের সামেন রক্তমাখা একটা ব্যাণ্ডেজ একটা হাতের মতো অঙ্গে জড়ানো অবস্থায় শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখলেন তিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেখানে কোনো হাতের অস্তিত্বই নেই! ব্যাণ্ডেজটা স্পর্শ করার জন্য কেম্প প্রায় পৌঁছে গেছলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আবার একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ

'ভয় পাবেন না ডঃ কেম্প! আপনি কোনো রক্তমাংসের মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন না। আসলে আমি একজন অদৃশ্য মানুষ!'

বেশ কয়েক সেকেণ্ড শূন্যে ঝুলন্ত সেই ব্যাণ্ডেজটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কেম্প। তারপর তোতলাতে তোতলাতে বলে উঠলেন, 'ও—ওটা কি ক-কথা বলা ব্যাণ্ডেজ?..........এ-এক অ-অদৃশ্য........মা-মানুষ?

'হ্যাঁ, আমি এক অদৃশ্য মানুষই বটে!'

'তাহলে আজ সকালে শহরে যেসব কথাবার্ত হচ্ছিল, সে সবই সত্যি?' কেম্প বললেন বটে, তবু এখও তিনি কি শুনছেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'গ্রামবাসীরা যখন এখানে অদৃশ্য এক মানুষের অস্তিত্বের কথা বলছিল তখন আমি ভেবেছিলাম, বোকার মতোই কথা বলছে তারা। কিন্তু আবার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে তুমি, তোমার শরীরে ব্যাণ্ডেজ কেন বাঁধা রয়েছে?'

ব্যাণ্ডেজটা আবার স্পর্শ করার জন্য কেম্প আবার সেই অদৃশ্য হাতটার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অদৃশ্য আঙুলগুলো তার কব্জির ওপর চেপে বসলো। ভুতুড়ে স্পর্শের আতঙ্কে ডঃ কেম্পের মুখটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলো। অদৃশ্য মানুষের আবদ্ধ হাতের মুঠো থেকে তিনি তাঁর হাতটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না, বরং কব্জির ওপরে তার অদৃশ্য হাতটা আরও শক্ত করে চেপে বসলো যেন। এর পর তিনি মরীয়া হয়ে উঠে নিজেকে তার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য কেম্প শূন্যে তাঁর চারপাশে প্রবলভাবে হাতটি আন্দোলিত করে আঘাত করতে থাকলেন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অদৃশ্য হাতটা লক্ষ্য করে। কিন্তু এ তার বৃথা আস্ফালন!

তাঁর অদৃশ্য শত্রু নিজেকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সে আক্রমণ করলো ডঃ কেম্পকে। কেম্প দেখলেন, অদৃশ্য দুটো হাত তাঁকে চ্যাংদোলা করে তাঁর বিছানার ওপর নিক্ষেপ করলো আর তিনি যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে শুরু করলেন, চাদরের একটা অংশ তাঁর মুখের ভেতরে গুঁজে দিয়ে অদৃশ্য মানুষ তার শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে তাঁর কণ্ঠনালী চেপে ধরলো। এভাবেই তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো, তিনি যে আক্রান্ত তাঁর বাড়ির লোকজন কেউ টেরও পেলো না।

'আপনি বড়ই বোকা, যুক্তি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করুন!' কেম্প এলোপাথারি ঘুষি ও লাথি মারতে থাকলে অদৃশ্য মানুষ চিৎকার করে বলে উঠলো, 'এই আক্রমণ বন্ধ করে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন। তা না করলে আমি আপনার মুখ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।'

কেম্প যখন শেষ পর্যন্ত লড়াই বন্ধ করলেন, অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ব্যাখ্যা করলো, 'আমি সত্যি একজন অদৃশ্য মানুষ। এটা কোনো চালাকী কিংবা জাদুর খেলা নয়। আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাই না কিন্তু যদি আপনি এভাবে বোকার মতো আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন, আমি তখন আপনার ওপর পাল্টা আঘাত আনতে বাধ্য হবো, যা আপনি সহ্য করতে পারবেন না, তখন আমাকে যেন, 'দোষ দেবেন না। ডঃ কেম্প, আপনি আমাকে বেশ ভালো করেই জানেন। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তে যাই। আমি জ্যাক গ্রিফিন। আমাকে আপনার মনে আছে?'

'আমাকে উঠে বসতে দাও, তবেই তো এসব বোঝবার চেষ্টা করতে পারবো।' ডঃ কেম্প এবার নরম সুরে বললেন।

অদৃশ্য মানুষ তাকে বাধা দিলো না। বিছানায় উঠে বসে কেম্প একটু সময় কি যেন ভাবলেন, তারপর যেন মনে পড়েছে, এরকম ভাব করে তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, তুমি তো সেই জ্যাক গ্রিফিন, যে কিনা কেমিস্ট্রিতে কলেজে স্বর্ণপদক পেয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি সেই গ্রিফিনই বটে! এখন আমি কেবল নিজেকে অদৃশ্য এক মানুষে পরিণত করেছি।'

'সে তো ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ব্যাপার! কিন্তু নিজেকে তুমি এমন শয়তানসুলভ আকৃতিতে পরিণত করতে গেলে কেন? আর তা করলেই বা কি করে জানতে পারি?'

'দেখুন ডঃ কেম্প, এই মুহূর্তে তার কৈফিয়ত আপনাকে দিতে পারবো না। আমি আহত, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। তাছাড়া আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। কিছু খাবার পর আরাম করে পরে আপনার এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবো, বুঝলেন?'

রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজটা ঘরের চারদিক পরিক্রমা করার পর একটা চেয়ারের সামনে গিয়ে থামলো, বিস্ময়কর সেই দৃশ্য। কেম্প স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। অদৃশ্য মানুষ সেই চেয়ারে বসতেই গদিটা একটু নিচু হয়ে গেলো। এর থেকেই কেম্পকে বুঝে নিতে হলো, সে চেয়ারে আসন গ্রহণ করলো।

'আমি কিছু পান করতে চাই।'

একটা গ্লাসে কিছু হুইস্কি ঢেলে চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলেন কেম্প। অদৃশ্য মানুষটির উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'এটা আমি তোমাকে কোথায় দেবো বলো?'

চেয়ার নড়ে চড়ে ওঠার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। তারপরেই কেম্প অনুভব করলেন, একটা অদৃশ্য হাত যেন হুইস্কির গ্লাসটা তাঁর হাত থেকে টেনে নিলো। চেয়ারের আসন থেকে প্রায় কুড়ি ইঞ্চি ওপরে গিয়ে গ্লাসটা থেমে গেলো।

'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সম্মোহিত করছো,' কেম্প অভিযোগ করলেন।

'বাজে কথা!' অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে গমগম করতে থাকলো। তারপরেই দেখা গেলো, গ্লাসটা একটু কাত হতেই শূন্যে হুইস্কির ছোটখাটো একটা ডোবার সৃষ্টি হয়ে গেলো। আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'শুনুন ডঃ কেম্প, এখন কাজের কথাটা শুনুন! আমি ক্ষুধার জ্বালায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, আর যেহেতু আমার পরনের কোনো পোশাক নেই, তাই শীতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। আপনার কাছে বাড়তি একটা ড্রেসিং গাউন আছে?

'দেখছি, হয়তো থাকতে পারে?' এই বলে কেম্প তাঁর আলমারির সামনে দিয়ে সেখান থেকে একটা লাল রঙের একটা গাউন বার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতে হবে?'

অদৃশ্য আঙুলগুলো তাঁর হাত থেকে গাউনটা নিয়ে নিলো। হাওয়ার মাঝে গাউনটা যেমন রহস্যময়ভাবে উড়তে থাকে, সেটা কেমন সোজা হয়ে গেলো, যেমন করে মানুষের গায়ে চাপালে হয়, অদৃশ্য আঙুলগুলো কেমন করে মানুষের মতো কোমরে বেল্ট আঁটলো। তারপর অদৃশ্য মানুষটি চেয়ারের ওপর বসতেই গদিটা নিচু হয়ে গেলো।

'এবার যে আমার আণ্ডারওয়্যার, মোজা, স্লিপার চাই। আর সেই সঙ্গে কিছু খাবার..............'

'অবশ্যই, সেসবও পাবে তুমি। আর কিছু দরকার তোমার?' কেম্প জিজ্ঞেস করলেন।

'আপাতত, এগুলো পেলেই যথেষ্ট।' উত্তর এলো অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে।

'কিন্তু এরকম পাগলের প্রলাপ আমার জীবনে কখনো শুনিনি।'

মুখে এতো সব কথা বললেও ডঃ কেম্প অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতোই রান্নাঘরে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে অদৃশ্য মানুষটির জন্য রুটি ও মাংস নিয়ে এলেন। এখন চেয়ারের ওপর উপবিষ্ট অদৃশ্য মানুষটির গায়ে আণ্ডারওয়্যার, পায়ে মোজা ও স্লিপার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'কিছু মনে করবেন না, ছুরি, কাঁটা-চামচ না হলে কি রুটি মাংস ঠিক মতো খাওয়া যায়?' এই বলে অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের অধিকার এক এক করে ঠাণ্ডা মাংসের টুকরো মুখে ঘুরতে থাকে। মাংসের টুকরোগুলো শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এবং অদৃশ্য দাঁতগুলো কামড় দিতে থাকে সেগুলোর ওপরে।

কেম্প তাঁর বিছানার ধারে বসে থেকে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে থাকেন। এখনও তিনি তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর মাথা নাড়ার মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ছায়া পড়তে দেখা যায় যেন।

'অদৃশ্য!' হাঁ হয়ে গেছেন তিনি। 'সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে--'

'আসলে,' একমুখ খাবার নিয়ে অদৃশ্য মানুষটি ডঃ কেম্পের চিন্তায় বাধা দিলো, 'অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো এই যে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে গৃহহীন ও অসহায় হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার ভাগ্য ভালো হওয়া উচিত ছিল, আর তা হলে আমি পরিচিত কারোর বাড়িতে গিয়ে আমার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিতে পারতাম। আমার শরীরের অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো এমন কি আমার রক্তও দেখা যায় না, অদৃশ্য। অতএব কোথায় আমার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, আপনি তা দেখতে পারেন।'

'তা কিভাবেই বা তুমি আহত হলে?'

'সে এক মূর্খ লোকের মূর্খামির খেসারত দিতে হয়েছে আমাকে। সেই মার্ভেল লোকটাকে অভিশাপ দিতে হয়, আমাকে যার সাহায্য করা উচিত। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকে, ওপরন্তু সে আমার টাকা আর বইপত্তর চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'আচ্ছা, সে কি তোমাকে গুলি করেছিল?'

'না।'

'তাহলে তুমিই কি তাকে গুলি করেছিলে? কারণ শহর থেকে গুলির আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি।'

'না, এক পান্থশালায় একজন বোকা লোক আমাকে গুলি করে...............। কিন্তু এখন আর কোনো কথা নয়, যথেষ্ট হয়েছে ডঃ কেম্প। এই খাবার শেষ করার জন্য আমার যে এখন একটা সিগারের খুব প্রয়োজন!'

কেম্প তার জন্য সিগার নিয়ে এলো এবং বিছানায় বসে থেকে অবাক হয়ে অদৃশ্য মানুষের নাক-মুখ থেকে সিগারের ধোঁয়া উদ্গিরণ করত দেখতে থাকে।

অবশেষে ডঃ কেম্প সাহস করে একটু জোর দিয়ে বললো, 'এসব কি করে ঘটলো, তোমাকে সব খুলে বলতেই হবে। এরকম অবস্থা তোমার কে করলো?'

'হায় ঈশ্বর আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি যে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত আর আমার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি, সে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?' হঠাৎ অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে গোঙানির আওয়াজ ধ্বনিত হলো। তারপরেই ড্রেসিং গাউনটা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল, হাতদুটো ওপর দিকে তুলে, অদৃশ্য হাতের ওপর অদৃশ্য মাথাটা ভর করে। 'শুনুন ডঃ কেম্প, আমি অনেক দূর থেকে ছুটে আসছি, তিনদিন তিনরাত্রি চোখে আমার ঘুম নেই।'

'বেশ তো এখন ঘুমোও এখন। এখানে এই ঘরেই ঘুমোও তুমি!'

'কিন্তু যদি আমি ঘুমোই মার্ভেল তখন আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাছাড়া, পুলিশের হাতে নিজেকে ধরা দেবার সুযোগ আমি করে দিতে চাই না।'

কেম্প হাত-পা ছড়িয়ে বসে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন। 'কি বললে পুলিশ? এখানে পুলিশের প্রশ্ন আসে কেন? তবে কি তুমি—'

অদৃশ্য মানুষের হাত দেখা না গেলেও সে যে রাগে উত্তেজনায় টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারলো, তার আওয়াজ শোনা গেলো। সেই সঙ্গে তার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কেম্পের কানে।

'আমি মূর্খ, আমি বোকা!' সে তার বোকামোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরও বললো, 'মার্ভেলকে আমি আমার গোপন রহস্যের কথা অনেক বলেছি, কিন্তু সে আমার কথা রাখেনি, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার এই পরিবর্তনের ব্যাপারে অনেক গোপন তথ্য আমি তুলে ধরেছি আপনার কাছে, আমার মতলবের কথা আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি, এখন আপনাকেও আমি আর বিশ্বাস করি না!'

'এ তোমার ভুল ধারণা জ্যাক, আমার তরফ থেকে আদৌ তা হবে না!' কেম্প সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন। 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি তোমার সব কিছুই গোপন রাখবো। তুমি যে আমার এখানে এসেছিলে, কেউ তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। এই ঘরের ভেতর থেকে দরজায় লক্ করে দিয়ে তুমি নিরাপদে ঘুমোতে পারো, কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

'ঠিক আছে,' লম্বা একটা হাই তুলে বললো অদৃশ্য মানুষটি। 'আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। তোমার এই ঘরে থাকার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। তবে আজ রাতে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি যখন তোমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছি, মানুষের পক্ষে অদৃশ্য হওয়া সম্ভব, তখন তুমি তা বিশ্বাস করতে পারো। বছর কয়েক আগে আমি সেটা আবিষ্কার করেছি। আর সেটা আমি নিজের মধ্যেই গোপন রাখতে চাই। কিন্তু এখন দেখছি সেটা শুধু আমার মধ্যে গোপন রাখতে পারছি না। তাই আমার একজন পার্টনার অবশ্যই দরকার। যৌথভাবে সেই কাজটা আমরা চমৎকারভাবে করতে পারবো। তবে এখন আমাকে ঘুমোতেই হবে, তা না হলে আমি মরে যাবো!'

'তাহলে আর কোনো কথা নয়, শুভরাত্রি,' অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য তার কাছে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললেন কেম্প।'

ড্রেসিং গাউন কেম্পকে অনুসরণ করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলো এবং অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাঁকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিলো, 'আমার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ কিংবা আমাকে ধরার কোনো চেষ্টা না করাই ভালো, বুঝলেন, ডঃ কেম্প!

কেম্প মাথা নেড়ে তার কথার সায় দিলো।

।। বারো ।।

ঃ চমৎকার আবিষ্কার ঃ

ডঃ কেম্প তাঁর নিজের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই ভেতর থেকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে এবং তারপরেই দরজায় তালা লাগানোর শব্দ ভেসে এলো ভেতর থেকে। শব্দটা

মিলিয়ে যেতে না যেতেই ডঃ কেম্প নিজেই নিজের কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন ঃ 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি?' বিস্ময় বিহ্বল হয়ে তিনি নিজেই নিজেকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবী কি রসাতলে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, নাকি আমিই পাগল হয়ে গেছি?' সংঘর্ষের সময় অদৃশ্য মানুষ তার অদৃশ্য হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছিল। এর ফলে সেখানে কালশিরা পড়ে যায়। সেখানে হাত বোলাতে গিয়ে কেম্প মাথা নেড়ে নিজের মনে বলে উঠলেন আবার ঃ 'না, এটা স্বপ্ন নয়। এটা একটা সত্য ঘটনা। এটা বাস্তব এবং এটা একটা অনস্বীকার্য ঘটনা!'

কেম্প ধীরে ধীরে নিচে নেমে এসে তার ছোট্ট অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এক এক সময় এখানেই তিনি তাঁর রোগীদের দেখে থাকেন। তবে তাঁর ওষুধের বেশির ভাগ অনুশীলনের কাজ তিনি ব্যয় করেন গবেষণার কাজে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তিনি গ্যাস ল্যাম্প জ্বালালেন। তারপর দিনের সব খবরের কাগজগুলো জড়ো করলেন এক জায়গায়। সেগুলো তাঁর জন্য অফিস ঘরে রেখে গেছিলো হাউসকীপার।

প্রতিটি খবরের কাগজ সম্পূর্ণভাবে পড়তে শুরু করলেন, কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। খবরের শিরোনামগুলো তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে বিহ্বল করে তুললো। যেমন, 'ইপিং থেকে অদ্ভুত কাহিনী' এবং ''সাসেক্সের সারা গ্রাম উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।'' এ ব্যাপারে খবরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে একটি অদৃশ্য মানুষকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যাওয়া খবরের কথা জানতে পারলেন তিনি। এই অদৃশ্য মানুষটি যে পথ দিয়েই গেছে, সেখানকার লোকজনকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে, আক্রমণ করেছে একজন কনস্টেবলকে, একজন চিকিৎসক এবং রেভারেণ্ডকে অপমান করেছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।

খবরগুলো পড়ে কেম্প চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন হতভম্বের মতো। অদ্ভুত ও বিস্ময়কর খবরগুলো তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। নিজের মনে তিনি বলেন, 'অদৃশ্য মানুষটির এখন লক্ষ্য একটিমাত্র লোক, যার নাম সে বলেছিল মার্ভেল। এই পৃথিবীতে অন্য আয় কেউ কি নেই? কেবল এই লোকটার পিছনে কেনই বা ধাওয় করছে অদৃশ্য মানুষটি? খবরের কাগজে কোনো খবরেই অদৃশ্য মানুষটির কোনো সহযোগির নাম উল্লেখ করা নেই। যে কেবল অদৃশ্য মানুষই নয়, কাগজ পড়ে যেটুকু জেনেছি, খুন করবার মতো যথেষ্ট দক্ষও বটে!'

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রাতের অবশিষ্ট সময়ে ডঃ আর্থার কেম্প তাঁর ছোট্ট অফিসঘরের মধ্যে পায়চারি করে কাটিয়ে দিতে থাকেন। তাঁর এখন কেবল একটাই চিন্তা, এরপর তিনি কি করবেন, কি তাঁর করা উচিত তার একটা সমাধান সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন তিনি।

ইতিমধ্যে এক সময় রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখা গেলো। বাইরে পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে। দিনের প্রারম্ভিক কাজে সবাই মেতে উঠেছে। ডঃ কেম্প কিন্তু তখনো তাঁর অফিসঘরে রয়ে গেছেন। সকাল হতেই হাউসকীপার যখন দরজায় নক করলো, তিনি তখন তাকে ওপরতলায় স্টাডিতে দুজনের জন্য প্রাতরাশের খাবার পরিবেশন করার জন্য হুকুম করলেন। তিনি তাঁকে আরও নির্দেশ দিলেন। সারাটি দিন সে যেন নিতচলায় থাকে কোথাও যেন না যায়।'

প্রভাতী সংবাদপত্র না আসা পর্যন্ত কেম্প তাঁর অফিসঘরে অপেক্ষা করতে থাকলেন। কাগজ

আসতেই তিনি হুমড়ি খেতে পড়লেন খবরের শিরোনামগুলোর ওপরে। তিনি এখন এমন ভাব করছেন যেন খবরগুলো গোগ্রাসে গিলছেন। খবরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, গত রাত্রে জলি ক্রিকেটার পান্থশালায় অদৃশ্য মানুষের তাণ্ডবলীলা। অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! আর অদৃশ্য মানুষ! থমাস মার্ভেলের কথাও উল্লেখ করেছে তারা এবং তার জবানবন্দীও লিখেছে, "অদৃশ্য মানুষটি আমাকে তার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে বাধ্য করেছে।"

যাইহোক, মার্ভেল কিন্তু অদৃশ্য মানুষের কাছ থেকে চুরি করা সেই তিনটি বই কিংবা চুরি করা তার টাকা যা তার পকেট ভর্তি হয়ে ফুলে রয়েছে, সেসব ব্যাপারে সে বেমালুম চেপে গেলো, একটা কথাও বললো না।

'অদৃশ্য এই মানুষটি খুবই ভয়ঙ্কর, আমি ভয় পেতে শুরু করেছি, না জানি কি করবে সে।' ফিসফিসিয়ে বললেন কেম্প। 'পাগল সে, তার মস্তিষ্ক ভয়ঙ্কর ভাবে বিস্তৃত, যে কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাজ সে করে ফেলতে পারে। শুধু তাই নয়, সে এখন আমার বাড়িতেই অবস্থান করছে, বাতাসের মতো মুক্ত সে, ঝড়ো বাতাস! কখন যে এ বাড়িতে ঝড় তুলে একটা প্রলয়কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে, কে জানে! তাই আমি এখন কি করবো?..............তবে কি আমি আমার কথার খেলাপ করি যদি.............?'

একটু সময় ভাবলেন কেম্প, তারপর মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন তিনি। তিনি তাঁর ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে ফেললেন খস্‌খস্‌ করে। সেটা একটা খামে পুরে ঠিকানা লিখলেন সেটার ওপরে ঃ "কর্ণেল অ্যাডি, কোর্ট বারডক পুলিশ............"

খামটা শহরে ডেলিভারি দেবার জন্য সবেমাত্র সেটা তিনি তাঁর হাউসকীপারের হাতে তুলে দিতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর শয়নকক্ষ থেকে একটা ভয়ঙ্কর গোলমালের শব্দ ভেসে এলো নিচে একতলায়। ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করার শব্দ। চেয়ার টেবিল ওলট-পালটের এবং ভাঙার শব্দ এবং ওয়াশস্যান্ড আর কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ার শব্দ। সব মিলিয়ে যাকে একটা তান্ডবলীলা বলা যায়, এই আর কি!

কেম্প ফিস্‌ফিসিয়ে তাঁর হাউসকীপারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে ওপরতলায় চলো!" এই বলে হাউসকীপারকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে ওপরতলায় ছুটে গেলেন তিনি।

গতরাতে থেকে শয়নকক্ষের দরজা ভেতর থেকে তেমনি তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু কেম্পের জেরে জোরে দরজায় নক্ করার দরুন সঙ্গে সঙ্গে দবজা খুলে গেলো।

কোনো ভূমিকা না করেই কেম্প মস্তকবিহীন ড্রেসিংগাউনের উদ্দেশ্যে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কি ব্যাপার? ঘরের সবকিছু তছনছ করে ফেলা হয়েছে কেন?'

'ও কিছুই নয়?' ড্রেসিংগাউনের ওপর থেকে অদৃশ্য একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বাতাসে, 'স্রেফ একটু উত্তেজনাবশে এমনটি ঘটে গেছে। আমি যখন ঘরের আসবাবপত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম তখন আমি ভুলেই গেছিলাম যে আমার এই হাতটা জখম!'

'মনে হচ্ছে আজ এই প্রথম নয়, এর আগেও তুমি অনেকবার তোমার মেজাজ হারিয়ে বিশ্রী সব গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসেছিলে।' এই বলে কেম্প নিজেই ঘরের মেঝের ওপর থেকে ভাঙা

কাচের টুকরোগুলো কুড়তে গিয়ে অভিযোগ করলেন। তারপর আসপত্রগুলো গোছগাছ করার কাজে হাত লাগালেন।

কাজ শেষ হতেই তিনি অদৃশ্য মানুষটির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'প্রত্যেক খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তোমার এবং ইপিং ও পোর্ট বারডকের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটার খবর ছাপানো হয়েছে। সবাই এখন অবাক হয়ে ভাবছে তুমি কোথায়, পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। অবশ্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।'

অদৃশ্য মানুষ ঘরের মধ্যে ঘনঘন পায়চারি করতে থাকে এবং ভেতরে ভেতরে কি যেন শপথ নেয়। ডঃ কেম্প তাকে প্রাতঃরাশে আহ্বান না করা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে তেমনি অবিচল ভাবে পায়চারি করতে থাকে। পায়চারি থামিয়ে সে এবার কেম্পকে অনুসরণ করে ওপরতলায় তাঁর স্টাডিতে এসে ঢুকলেন।

জানালার দিকে ভয়ে ভয়ে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে একটা টেবিলের সামনে একটা চেয়ারের ওপর বসলেন। তাঁর ঠিক উল্টোদিকে বসেছিল মাথা ও হাতবিহীন ড্রেসিংগাউন পরিহিত অদৃশ্য মানুষটি। অদৃশ্য মানুষটি তখন তার অদৃশ হাত দিয়ে টেলিরে ওপর থেকে একটা ন্যাপকিন টেনে নিয়ে ড্রেসিংগাউনের ওপর রাখলো। কেম্প খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সেই গতিবিধি লক্ষ্য করলো।

'শোনো গ্রিফিন, তোমার ইচ্ছে মতো গতরাতের পর থেকে আশা করি তোমার যথেষ্ট আহার ও নিদ্রা হয়েছে,' কেম্প বললেন, এই যে মানসচক্ষের আড়ালে তোমার অদৃশ্য হয়ে থাকার ব্যাখ্যা এবার করবে? আমার বিশ্বাস, তোমার এই চমৎকার আবিষ্কারের ব্যাপারে আমি কতোই না কৌতূহলী, তা নিশ্চয়ই তুমি উপলব্ধি করতে পারছো।'

'চমৎকার! হ্যাঁ, শুরুতে আমারও সেরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি ঠিক অতোটা নিশ্চিত নই........ অন্তত যতক্ষণ না আমারা এই আবিষ্কারের একটা মহান রূপ দিতে পারছি। শুনুন ডঃ কেম্প আমার আবিষ্কারের সব কথাই আপনাকে বলবো, বলবো কি করে, আমার আবিষ্কারের নেশার বাস্তবরূপ দিয়েছি!'

।। তেরো ।।

ঃ অদৃশ্য মানুষের কাহিনী ঃ

'আমি আমার অধ্যয়নে পরিবর্তন এনে মেডিসিন থেকে ফিজিক্সে মোড় ঘুরিয়েছিলাম, খুব সম্ভব এ ব্যাপারটা তুমি জানো না। আমার বয়স তখন বাইশ। আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল আলো এবং পরিপূর্ণ পদার্থ ও তরল পদার্থের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে পড়াশোনা করা। যেমন ধরুন, একটা জলের আধারের মধ্যে দিয়ে আলো যখন ফেলা হয়, তখন সেই জলে একটা কাচের টুকরো ফেললে দেখা যাবে সেটা কেমন অদৃশ্য হয়ে গেছে, কারোরই চোখে পড়ার কথা নয়।

'হ্যাঁ, কিন্তু মানুষ তো আর কাচের মতো স্বচ্ছ বা আলোকভেদ্য নয়,' কেম্প বললেন, 'তাই, এ নিয়ে তোমার কি করার থাকতে পারে?'

'আঃ, মানুষ কিন্তু স্বচ্ছ, মানুষের শরীরের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে আলো ভেদ করানো যায়।

বস্তুত, মানুষ অনেক বেশি স্বচ্ছ! ডঃ কেম্প, একবার ভেবে দেখুন, হাড়, মাংস, চুল, নখ, স্নায়ুকোষ, মানুষের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বচ্ছ; কেবল তার লাল রক্ত, কিন্তু রঞ্জক পদার্থ কিংবা রঙীন বস্তু ছাড়া। এই রকম একটা ধারণা নিয়ে আমি দীর্ঘ ছ'বছর ধরে আমার গবেষণার কাজ চালিয়ে যাই। আমি আমার এই গবেষণার কাজ অত্যন্ত গোপনে চালিয়ে যাই। আমার লক্ষ্যে নিখুঁতভাবে না পৌছনো পর্যন্ত কোনো লোককে বলিনি, কিংবা আমার ওই গবেষণার কাজের ওপর কোনো প্রবন্ধ ও পত্রপত্রিকায় লিখিনি। থমাস মার্ভেল আমার যে তিনটি নোটবুক চুরি করে নিয়ে গেছে, তাতে আমি আমার সমস্ত গবেষণার কথা, প্রতিটি ফর্মুলা যা আমি আবিষ্কার করি, সব লিখে রেখেছি। আর এই কারণেই তাকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে আর ওই নোটবুক তিনটি ফিরে পেতেই হবে আমাকে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু রক্ত আর রঞ্জক পদার্থকে কি করে তুমি অদৃশ্য করতে পারলে?'

'সেটার জন্য আরও তিনবছর গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হয় আমাকে। তবে এক সময় টাকার অভাবে আমার গবেষণার কাজ প্রায় বন্ধ করে দেবার উপক্রম হয়। কিন্তু আমার গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য আমি তখন এমনি বদ্ধপরিকর ছিলাম যে, আমি আমার বাবার টাকা চুরি করতে বাধ্য হই। টাকাটা কিন্তু বাবার সৎ পথে উপার্জিত ছিল না, তাই সেটা চুরি করতে আমার বিবেকে একটুও বাধেনি।'

এই পর্যন্ত বলে অদৃশ্য মানুষটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলের সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং তারপর জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কেম্প কয়েক মুহূর্ত নীরবে সেই মস্তকবিহীন মূর্তিটির পিছন দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য মানুষের ড্রেসিংগাউনের এক হাত ধরে টেনে এনে তার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

'গ্রিফিন, তুমি খুবই ক্লান্ত। তোমার এখনও যথেষ্ট বিশ্রামর প্রয়োজন আছে। এই যে তুমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছো, আমি মনে করি এটা ঠিক নয়। দয়া করে তুমি তোমার চেয়ারে থিতু হয়ে বসে তোমার রোমাঞ্চকর কাহিনী চালিয়ে যাও!'

অদৃশ্য মানুষের চেয়ার এবং জানালার মাঝখানে বসলেন কেম্প যাতে করে শহরের রাস্তার দৃশ্য সে দেখতে না পায়। তবুও সে বারবার জানালার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। বাইরের দৃশ্য দেখতে সে যে এখনও খুব উৎসুক বুঝতে পেরে তার মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য কেম্প তাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'কই তোমার কাহিনী আবার শুরু করো!'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর এবার মুখর হলো ঃ 'চুরি করা টাকা দিয়ে আমি আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম. প্রথমে আমি একটা সাদা উল ফ্যাব্রিক অদৃশ্য করে দিলাম। সেই আমার প্রথম সাফল্য, সে কি আনন্দ আর উন্মাদনা। আমি যখন শূন্য বাতাসে হাত মেলে ধরে একটা নীরেট পদার্থ অনুভব করলাম, তখন সেকি অদ্ভুত অনুভূতি যা আমি এখনো ভুলতে পারবো া। ঘটনার আকস্মিকতায় কিনা কে জানে এমন কি আমি সেটা ঘরের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর সেটা যে কোথায় ফেললাম খুঁজে পেতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হলো আমাকে।

'এ যেন ভয়ঙ্কর বিস্ময়কর!' কেম্প চিৎকার করে উঠলেন।

'এ আর এমন কি শুনলেন, এর পরের গবেষণা আরও বেশি বিস্ময়কর। একদিন হলো কি প্রতিবেশীর এক ক্ষুধার্ত বিড়াল আমার ল্যাবরেটরিতে হঠাৎ ঢুকে পড়লো। তাকে দেখা মাত্র হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম, এই বেড়ালটাই হবে আমার পরবর্তী গবেষণার লক্ষ্য!'

'তার মানে তুমি কি সেই বেড়ালটাকে অদৃশ্য করে দিয়েছিলে?

'তার শরীরের প্রায় সমস্তটাই ধরে নিতে পারেন। আমি আমার ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে অদৃশ্য করার কিছু ওষুধ আবিষ্কার করেছিলাম। এবার সেটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার সময় কিছু খাবারের সঙ্গে সেই ওষুধ মিশিয়ে তাকে খেতে দিলাম। বেশ তৃপ্তি সহকারেই সে খেলো। তখন আমি তাকে আদর করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। অচৈতন্য হয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা শুয়ে ছিল সে। এই সময়ে তার দেহের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবল সে যখন জেগে উঠে তখন তার চোখের পিছন দিকের সবুজ রঞ্জক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। পুরোপুরি চেতনা ফিরে পেয়ে সে যখন লাফ দিয়ে খোলা জানালা পথ দিয়ে আমার ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে যায় তখন শেষ বারের মতো তার চোখের পিছনে দুটি উজ্জ্বল সবুজ বৃত্ত দেখতে পাই।'

'তারপর? তোমার এই প্রথম সাফল্যের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তোমার, বলো?'

'সে এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া! এই পরীক্ষার অভূতপূর্ব সাফল্য আমার মাথায় যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম, একজন অদৃশ্য মানুষ এই পৃথিবীতে চমৎকার চমৎকার সব জিনিস সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমার চুরি করা টাকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল তখন। এছাড়া বাড়িওয়ালার কাছে আমার বাড়িভাড়া বাবদ অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছলো। আরও অন্য সব খরচা যোগাতে গিয়ে বাজার থেকে অনেক টাকা ধার করতে হয়েছে আমাকে। ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলেছে, পাওনাদাররা যে-কোনো মুহূর্তে এই ঋণ পরিশোধের জন্য আর্দালী আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। তাই এদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য হঠাৎ একদিন আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেলো। এই পৃথিবী থেকে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেললে কেমন হয়? তাই নিজেকে অদৃশ্য আর উধাও করার ইচ্ছেটা আমার দুর্নিবার হয়ে উঠলো। তাই আমি আমার সেই পরিকল্পনাটার একটা বাস্তব রূপ দেবার জন্য আমি তখন ভীষণ তৎপর হয়ে উঠলাম।'

'ঠিক সেদিনই আমি আমার সেই তিনটি নোটবুক একটা প্যাকেটে পুরে লণ্ডনের অপর দিকে একটা প্যাকেজ পিকআপ অফিসে গিয়ে তাঁদের জিম্মায় দিয়ে এলাম আমার নিজের নামে ডেলিভারি দেবার জন্য। তারপর আমি আমার ঘরে ফিরে এসে ওষুধগুলো একটা গ্লাসে মিশিয়ে এক চুমুকে সেটা গলাধঃকরণ করে ফেললাম।

সেই ওষুধের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্য আমি আমার ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলাম। আমার মধ্যে ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছলো তখন, একটা ঝিমুনি ভাব, সেই সঙ্গে বুঝিবা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় দরজায় নক্ হতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে জেগে উঠলাম। আমার মধ্যে তখন কি পরিবর্তন এসেছিল আমি নিজেই তা জানতাম না। কোনো রকমে টলতে টলতে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখি, ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা আমার বাড়িওয়ালা বাড়ি খালি করে দেওয়ার নোটিশ আমার হাতে গুঁজে দেবার জন্য প্রায় উদ্যত। মাথা নিচু করে ছিলেন

তিনি। মাথা তুলতেই তাঁর চোখদুটি আমার মুখের ওপর পড়তেই ভয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন। নোটিশের কাগজটা তাঁর হাত থেকে খসে পড়লো এবং পরক্ষণেই পড়ি কি মরি করে আমার ঘরের সামনে থেকে ছুটে চলে গেলো নিচের হল ঘরে। পা টলছিল তাঁর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়ে আমার আয়নার দিকে তাকালাম। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখা মাত্র আমার মুখটা সাদা পাথরের মতো হয়ে গেলো যেন!'

পরবর্তী সময়ে সেদিন রাত্রে যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আমি পেয়েছিলাম, তা আমি ভাষায় বর্ণনা দিতে পারবো না। তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার গায়ে যেন আগুন জ্বলছিল। আমার পেটটাও যেন খিদের জ্বালায় জ্বলছিল। কখনও জ্ঞান হারাচ্ছি, তারপরেই আবার জ্ঞান ফিরে পাচ্ছি। আমার তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। একটু পরেই চোখের জলে সব একাকার হয়ে উঠলো, মুখ দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছিল। সেই অবস্থায় নিজের মনে কথা বললাম, আমি মরতে চাই, কিন্তু আমি আবার বাঁচতেও চাই!'

'পরের দিন সকাল নাগাদ প্রায় যন্ত্রণামুক্ত হয়ে গেলাম। বিছানায় শুয়ে আমি আমার হাতদুটোর দিকে তাকালাম। হাতদুটো তখন মেঘাচ্ছন্ন কাচের মতো দেখাচ্ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, হাতদুটো ক্রমশ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে কেমন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। এক সময় হাত দুটো আমার চোখ দুটোর সামনে তুলে ধরে তাকাতে গিয়ে দেখি সেগুলো কাচের মতো কেমন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, চোখ সে দুটোর মাধ্যমে আমি ঘরে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একবার এক এক করে আমার পা দুটো এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং হাড়-মাস সব কিছুই কাচের মতো স্বচ্ছ দেখালো। এমন কি আমার ধমনীর সমস্ত রক্ত পর্যন্ত যেন এক একটা কাচের আধার হয়ে গেছে।'

'দিনের শেষে সন্ধ্যা নামতেই আমি বিছানা থেকে উঠে বসার জন্য খুবই কসরত করলাম। আমি তখন ঠিক শিশুর মতো প্রথম হাঁটতে শিখছি, ধীরে ধীরে পা ফেলছি, টলে পড়ছি। কিন্তু কি আশ্চর্য আমি কিন্তু আমার পাদুটো দেখতে পাচ্ছিলাম না। হাতের মতো পা দুটোও অদৃশ্য। অদৃশ্য পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনোরকমে আমার ঘরের প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার চমকে উঠলাম, আমার পিছনে ঘরের দেওয়াল, আসবাবপত্র ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই আয়নায় প্রতিবিম্ব হচ্ছে না।'

'ঠিক সেই সময়ে আমার দরজায় দুম দড়াম শব্দ হতে শোনা গেল, তারপরেই আমার বাড়িওয়ালার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম দরজার ওপার থেকে। তার হুকুম, আমি যদি দরজা না খুলি তাহলে তাঁর ছেলেরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে বাধ্য হবে। যাইহোক, আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে তারা বাধ্য হয়ে কুড়ুল দিয়ে দরজা ভাঙতে শুরু করে দিলো।'

'আমি তখন খুবই বেপরোয়া। আমার গবেষণার জন্য যেসব রাসায়নিক দ্রব্য আর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, আমি চাই না সেগুলো তারা দেখুক। তাই আমি সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করে গ্যাস লাইটার স্যুইচ অন্ করে দিলাম। তারপর খোলা জানালা পথের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে আমি একটা জ্বলন্ত দেশলাইকাঠি সেই স্তূপের ওপর ছুঁড়ে দিলাম। এবং দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত আমার গবেষণার জিনিসগুলোকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম সেখান থেকে।'

'তার মানে তুমি সারা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে অন্যদের জীবনহানির ঝুঁকি নিয়েছিলে?'

'বাড়িটা মাটিতে ধুলিসাৎ করে দিয়েছিলাম,' অদৃশ্য মানুষ চোখ-মুখে অবজ্ঞার ভঙ্গি করে বললো, 'আমার গোপনীয়তা কেউ যাতে না আবিষ্কার করে ফেলে সেটা রুখতে এটাই একমাত্র পথ বলে মনে হয়েছিল, আমার কাছে তখন। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে আমি এবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি, বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমার মনে তখন এক চমৎকার বন্য চিন্তা উঁকি মেরেছিল, ধরা না পড়ে আমি এখন যে-কোনো কাজ করতে পারি।'

'তা তারপর তুমি কোথায় গেলে?'

'আমি তখন প্যাকেজ পিক-আপ অফিসের দিকে ছুটলাম আমার নোটবইগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য। আমার তখন কি মজা! আমায় কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অথচ একটার পর একটা ব্যাপার ঘটিয়ে মজা উপভোগ করে চললাম। কিন্তু কেউ টেরও পেলো না। কখনো পিছন থেকে কারোর পিঠে ঘুষি মারলাম, কখনো কারোর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললাম, কিংবা কোনো মহিলার হাতের প্যাকেট ছিনিয়ে নিলাম, আবার কখনো বা কোনো মহিলা হয়তো তার শিশুকে প্যারামবুলেটারে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, সেটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেলাম। এসব করতে গিয়ে আমি মজা উপভোগ করলেও সংশ্লিষ্ট লোকেরা কিন্তু দারুণ ক্ষেপে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেও তারা কেউই আমাকে দেখতে পেলো না, কারণ আমি যে অদৃশ্য মানুষ হয়ে গেছি!'

'কিন্তু অদৃশ্য মানুষ হলে হবে কি, যেহেতু পথচারীরা কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই পথ চলতে গিয়ে অনেকেই আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকলো। যেমন কোনো ডেলিভারি ভ্যানের লোকের ধাক্কা খাওয়া, পথচলতি ঘোড়ার লাথি খাওয়া এবং বিকেলে বাড়ি-ফেরা লোকের ভীড়ে স্যাণ্ডউইচ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর কুকুরগুলো, আমাকে সশরীরে দেখতে না পেলেও তাদের ঘ্রাণশক্তি এতোই প্রবল যে, শুঁকতে শুঁকতে আমাকে অনুসরণ করতে থাকলো। এর ওপর আমার খালি পায়ের দারুণ হিমারিক পাথুরে রাস্তায় পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। আর গায়ে আমার এক চিলতে পোশাকও ছিল না, জানুয়ারীর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিলাম। তবে অদৃশ্য হওয়ার জন্য যতো না হোক, প্রাকৃতিক আবহাওয়াই আমাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল।'

'তাছাড়া ছোট ছোট কয়েকটা ছেলে আমার কাছে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। আমি যখন দ্রুত রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। অদৃশ্য হলেও আমার পায়ের ছাপ ঠিক পড়ে যাচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে। আমার সেই সব পায়ের ছাপগুলোর দিকে আঙুল তুলে তারা নিজেদের মধ্যে কৌতূহল হয়ে বলাবলি করছিল ঃ

'দেখো,' একজন আরেকজনকে বলে, 'রাস্তার ওপর কার যেন পায়ের ছাপ পড়ে যাচ্ছে, অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে না। বড় আশ্চর্য ব্যাপার। তাই না?'

'আবার দেখো, একটা পায়ের ছাপে রক্তের দাগ কেমন লেগে রয়েছে।' অন্যজন বলে ওঠে।

বেগতিক দেখে আমি তখন ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু সেই দুটি ছেলে আমার পিছু ছাড়লো না। তারা চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'দেখো, দেখো, অদৃশ্য পাদুটো কেমন ছুটছে।'

'অচিরেই একদল অতি উৎসাহী পথচারী ছেলে দুটির পিছন পিছন ছুটতে থাকে। যাইহোক,

আমি তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ছুটছিলাম, যার ফলে তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেলাম সারাটা পথ। কর্দমাক্ত রাস্তা। তবে বেশ কয়েকটা বসতি এলাকা পেরিয়ে এসে এক সময় শুকনো রাস্তায় এসে পা ফেললাম। আমি সেখানে একটু সময়ের জন্য থামলাম, আমার কাদা মাখা পা দুটো পরিষ্কার করে নিলাম, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম আগের মতো। এবার আমার অনুসরণকারীরা আমার পায়ের ছাপ আর দেখতে পেলো না রাস্তায় কোথাও।'

অনুসরণকারীর কথা সে উল্লেখ করতেই ডঃ কেম্প ঘাবড়ে গিয়ে জানালার দিকে তাকালেন এবং সঙ্গে অদৃশ্য মানুষটিকে অনুরোধ করে বলে উঠলেন, 'গ্রিফিন বলে যাও! তারপর কি হলো বলো?'

।। চৌদ্দ ।।

ঃ চরম হুমকি ঃ

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, বলতে তো আমাকে হবেই!' অদৃশ্য মানুষ বলে চললো ঃ 'সেদিন আকাশটা যেন উঠে পড়ে লেগেছিল আমার পিছনে। রাত নামার আগেই আরও তুষারপাতের আভাস পাওয়া গেলো। আমার মনে যেন নতুন একটা ভাবনা জেগে উঠতে দেখা গেলো। আর সেই ভাবনাটা হলো এই রকম, যদি এই সব ছোট ছোট তুষারকণা আমার ওপর চেপে বসে, তাহলে আমি সবার সামনে দৃষ্টিগোচর হয়ে যেতে পারি, তখন তাদের চোখে আমি অদৃশ্য মানুষ হয়ে আর থাকতে পারবো না। তাই তখনি আমাকে একটা উষ্ণ জায়গার সন্ধান করতে হয়, যেখানে আমি বিশ্রাম নিতে পারি, চিন্তা-ভাবনা করতে পারি এবং পরিকল্পনা করতে পারি।'

'তালাচাবি লাগানো ঘরে প্রবেশ করার কোনো পথ আমার নেই, আর পান্থশালায় যাওয়ার ঝুঁকিও নিতে চাই না। কিন্তু আমি যখন ওমনিয়াম ডিপার্টমেন্ট স্টোরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমার তখন মনে হলো, আমার পক্ষে এটা একটা উপযুক্ত জায়গা। ভেতরে গিয়ে আমি আমার খাবারের সন্ধান করতে পারি, পছন্দ মতো পোশাক পেতে পারি, আর সব চেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থ, দুনিয়াটা কার বশ? টাকার বশ! আর সেই টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল আমার তখন।'

'দ্বাররক্ষী যতক্ষণ না একজন খরিদ্দারের জন্য দরজা খুলে দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। অবশেষে একজন মহিলা খরিদ্দার এলে সে দরজা খুলে দিলো, আমি সেই খরিদ্দারের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। একটা উষ্ণ জায়গার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঘুরে বেড়ালাম। হঠাৎ এক কোণায় তোষকের একটা স্তূপাকার দেখতে পেলাম। আমার তখন খুব শীত করছিল। তাই তাড়াতাড়ি সেই তোষকের স্তূপের মধ্যে বসলাম একটু উষ্ণতার জন্য। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে সেখানে বসে থাকলাম আমি আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা স্থির করার জন্য। মনে মনে ঠিক করলাম, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর একবার বন্ধ হয়ে গেলে আশাকরি কিছু খাবার ঠিক খুঁজে বার করে নিতে পারবো। ছদ্মবেশ ধারণ করার জন্য কিছু পোশাক সংগ্রহ করতে হবে। আর দরকার কিছু নগদ অর্থ, স্টোরের ক্যাশ অফিস থেকে সেটা পাওয়া যেতে পারে। তারপর স্টোরের একটা বিছানায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পরের দিন এখান থেকে বেরিয়ে আমার নোটবইগুলো সংগ্রহ করে নেবো।'

'তা তোমার পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলে?'

'না, আমি যেমন আশা করেছিলাম, ঠিক তেমনটি হয়নি। আগের রাত্রে আমি আমার প্রয়োজনীয় খাবার পোশাক আর অর্থ যথারীতি সংগ্রহ করতে পেরে খুবই খুশী হয়েছিলাম, গায়ে পোশাক চাপালাম। খুব খিদে পেয়েছিল পেট ভরে খেলাম, টাকাগুলো আমার পোশাকের পকেটে পুরে নিলাম। তারপর শোবার একটা জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম। মেঝের মাঝখানে নরম পোশাকের একটা স্তূপ দেখতে পেয়ে সেখানেই সারাদিনের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহটা এগিয়ে দিলাম। অচিরেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। ঘুম খুবই গাঢ় হলো। এক ঘুমে রাত কাবার।'

'তারপর?' ডঃ কেম্প খুবই উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

'ইচ্ছে ছিল পরের দিন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলবার আগেই আমি সেখান থেকে পালাবার জন্য প্রস্তুতি নেবো, টয়লেটে লুকিয়ে থাকবো। তারপর স্টোর যখন খুলবে, কর্মচারীদের সঙ্গে খদ্দেররা এসে ভীড় করবে, তখন আমি তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সুযোগমতো কোনো সময়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমার পরিকল্পনা ঠিক মতো কাজ করলো না শেষ পর্যন্ত। যেমন ধরুন, আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই স্টোর খোলা হয় এবং আমি সবার সামনে দৃষ্টিগোচর হয়ে যাই। স্টোরের কর্মচারীদের দেখে আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসি এবং পাগলের মতো ছুটতে থাকি। তা দেখে স্টোরের সেলস্‌ম্যানরা হতবাক হয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে থাকে। এ গলি সে গলি করে আমি প্রাণভয়ে ছুটতে থাকি। ট্রাউজার, কোট, গ্লাভস্, জুতো ও টুপি পরিহিত মস্তকহীন আমার মূর্তি দেখে তারা ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো। আমি তখন উপলব্ধি করলাম, আমাকে পালাতে হবে, তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে হবে আর তার জন্য প্রয়োজন আমার গা থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলা। কারণ আমার মাথা নেই, অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ নেই, অদৃশ্য মানুষ হয়েও পোশাকগুলোই তাদের কাছে আমাকে দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে। তাই আমি একটা নির্জন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার গা থেকে এক এক করে পোশাক খুলে ফেললাম।'

'তারপরেও তারা কি তোমাকে দেখতে পেয়েছিল?' কেম্প জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই নয়, পুলিশ আসার আগেই কোনোরকমে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হই। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, আমার পরনে কোনো পোশাক নেই, অর্থ নেই......আর এরপর আমি যে কি করবো, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার। তাছাড়া, আমি যখন প্রাণপণে ছুটছিলাম তখন খেতেও পারিনি, কারণ খাবারগুলো হজম না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি সবার দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠতো, আমি তখন ধরা পড়ে যেতাম তাদের চোখে।'

'এ ব্যাপারটার কথা আমি কখনো ভাবিনি,' কেম্প বললেন। এখানে একটু থেমে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুষার পড়াটা কি তোমার কাছে কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল?'

'না, যা কিছু ছিল তার সমাধান হয়ে গেছলো, কিন্তু সেসব সমস্যা ছিল মানুষজনদের নিয়ে। তবে আবহাওয়ার সমস্যা আরও বিপজ্জনক ছিল আমার কাছে, যা আমাকে সতর্ক করে দেয়। বৃষ্টিতে ভিজে আমি খুবই কাবু হয়ে পড়ি তখন, আমার দেহরেখা নগ্ন হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। পরে কুয়াশা তখন আমার কাছে আর এক শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তবু এসবের কাছে তুষার তেমন সমস্যা বলে মনে হলো না আমার। তবে সেটা একটা ভয়ঙ্কর শীতলতমদিন, তার ওপর ঝোড়ো

বাতাস বইছিল। এ অবস্থায় প্রথমেই আমার ভীষণ প্রয়োজন ছিল পোশাকের। আমি তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম, এই শীতই আমাকে একেবারে পঙ্গু করে দেবে শেষ পর্যন্ত। তাই আমি তাড়াতাড়ি আমার পথ চলা শেষ করে একটা নিরাপদ জায়গায় খোঁজ করতে থাকলাম। যেখানে একটু উষ্ণতা আমাকে সেই প্রবল শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।'

'কিছুক্ষণ পরে ভাগ্য আমার ওপর বুঝি বা একটু সদয় হলো, রাস্তার একেবারে এক নির্জন জায়গায় একটা কস্টিউমের ছোট্ট একটা দোকান দেখতে পেলাম, সেখানে দরজা খুলে ঢুকতে গিয়ে কেউ আমাকে দেখতে পেলো না। দোকানের মালিক তখন তার মধ্যাহ্নভোজ সারতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তার কানদুটো নিশ্চয়ই খুবই ধারালো ছিল, কারণ আমি তার দোকানে প্রবেশ করা মাত্র প্রবেশ পথের সামনে ছুটে এসে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে থাকলো। তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে সে তখন রান্নাঘরে ফিরে যায় আবার তার মধ্যাহ্নভোজ সারতে।'

'আমি তখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পোশাকের একটা র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটাকে তখন ফিরে আসতে দেখলাম। এই সময় সে তার হাতের রিভলবার উঁচিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে দিলো, 'কে, কে ওখানে?' আমি তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি, তোমার নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গেছো। তুমি যেখানেই লুকিয়ে থাকো না কেন, ভালো চাওতো আমার সামনে বেরিয়ে এসো, তা না হলে...........।' এই বলে সে পরপর বেশ কয়েকবার তার রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লো আমার পায়ের শব্দ আর নিঃশ্বাস অনুসরণ করে। একটা বুলেট তো আমার অদৃশ্য মাথা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।.........তবে আমি তার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে ভুললাম না, একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ে তাক করতে থাকলাম।'

'হায় ঈশ্বর!' তাহলে তুমি কি তাকে খতম করে ফেলেছিলে?'

'না, আমি অন্তত তা মনে করি না। পিছন থেকে একটা টুল দিয়ে আঘাত করলাম তাকে। মাটিতে পড়ে যেতেই আমি তার চোখ মুখ একটা চাদর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম, যাতে করে সে আমার ছদ্মবেশ দেখতে না পায়........ওহো ডক্টর, একজন খুনী হিসেবে ওভাবে আমার দিকে তাকাবেন না। সেই অপ্রিয় কাজটা আমাকে করতে হতো। তার হাতে একটা উদ্যত রিভলবার, আর আমি নিরস্ত্র। তবু আমি তখন চাইনি যে আমার ছদ্মবেশ দেখে ফেলে আমার চেহারার বর্ণনা দিক অন্যদের কিংবা পুলিশের কাছে।'

'কিন্তু লোকটা তো তার বাড়িতেই ছিল, আর তুমি চুরি করার জন্য তার দোকানে ঢুকেছিলে!'

'তার মানে সেজন্য আপনি আমাকে দোষারোপ করতে চাইছেন, করছেন না? আর একটা কথা আপনার মতলবটা ঠিক কি বলুন তো?'

কেম্প কি ভেবে হঠাৎ তাঁর গলার স্বর বদলে ফেললেন, এই মুহূর্তে গ্রিফিনকে রাগিয়ে দিলে তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়ে উঠতে পারে, হয়তো সে তাঁর প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। না, সেরকম ঝুঁকি নিতে চান না তিনি। তাই তিনি তার সমর্থনেই বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই করেছিলে। তুমি তখন আক্রান্ত। তাই নিজের নিরাপত্তার জন্য তোমার ওইভাবে প্রতিরোধ করার খুবই প্রয়োজন ছিল। সে যাইহোক তারপর তুমি কি করলে?'

'আমি আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর, যেমন পোশাক, কালো চশমা, নকল দাড়ি-গোঁফ, জুলফি, পরচুলা, আর অবশ্যই তার ক্যাশ ড্রয়ার থেকে রুপোর মুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা এবং কিছু কারেন্সি নোট সংগ্রহ করে নিলাম। আমি তখন সব কিছুই পেয়ে গেছি, আমি যে হাতে চাঁদ পেয়ে গেছি, বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছি।'

'আর তুমি তাকে তেমনি চাদরের বাঁধনে ফেলে রেখে এসেছিলে?' কেম্প জিজ্ঞেস করলো। গ্রিফিন উত্তর দেবার আগেই জানালার সামনে থেকে সরে এলেন তিনি।

'কেনই বা তা করবো না? সম্ভবত পরে সে নিজেই নিজের বাঁধন খুলে ফেলে থাকবে। সেই মুহূর্তে আমার তখন কেবল একটাই চিন্তা , কিভাবে আমার খাবার যোগাড় করবো, কারণ আমার তখন খুব খিদে পেয়েছিল। এ অবস্থায় আমি কোনো রেস্তোরায় গিয়ে লোকের ভীড়ে খেতেও পারবো না। তাই একটা গৃহস্থ বাড়ির ডাইনিংরুমই পছন্দ করলাম, সেখানে গিয়ে আমার দুরাবস্থার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম, হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আমার মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। আর এই কারণে আমি একা খাওয়া পছন্দ করি।'

এখানে একটু সময়ের জন্য থামলো অদৃশ্য মানুষটি এবং সে তার শরীরটা ফেরালো কেম্পের দিকে। তিনি তখন আবার জানালার সামনে ফিরে গিয়ে পায়চারি করছিলেন।

তিনি তাঁর অতিথির মুখ থেকে আরও কিছু কথা শুনতে চাইছিলেন তখনও। তাই তিনি গ্রিফিনকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'আর তারপরেই কি তুমি ইপিং-এ গেছলে?'

'হ্যাঁ, আমি আমার সেই নোটবইগুলো পোশাক আর যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে ইপিং-এ চলে আসি। আমি ইপিং-এ কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করি। অবশ্যই নিরিবিলিতে। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আমার একটা আশা ছিল, যা এখনও আমার আছে, আর সেই আশা হলো, আমি যেন সবার কাছে আবার দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠতে পারি।.......কিন্তু যখন এই রকম একটা কিছু করবো বলে আমি মনস্থ করলাম আর সেটা করার জন্য সব রকম প্রস্তুতি নেবার পর আমার ইচ্ছে হলো আরও কিছুদিন মানুষের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকি। আর তার জন্য ডক্টর, আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।'

'ইপিং-এ তুমি যেমন সেখানকার অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিলে, সেরকম কাজে আমি কিন্তু তোমাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারবো না।'

'তার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না, তারা ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু থমাস মার্ভেল সুস্থ থাকলে পারবে না। আমি তাকে একবার আমার হাতের মুঠোয় পেলে আমি তাকে ছেড়ে দেবো না। সে আমার যা ক্ষতি করেছে তার খেসারত তাকে তো দিতেই হবে! আর তাই ভবিষ্যতে যারা আমার পরিকল্পনা বানচাল করবে, আমি তাদের রেহাই দেবো না! আমি তাদের হত্যা করবো! আমি তাদের সবাইকে হত্যা করবো! এই আমার শেষ কথা!'

।। পনেরো ।।

ঃ *বিশ্বাসঘাতক* ঃ

রাস্তা দিয়ে তিনজন লোককে তাঁর বাড়ির দিকে আসতে দেখে ডঃ কেম্প জানালার সামনে

থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন। অদৃশ্য মানুষ এবং জানালার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি পজিশন নিয়ে নিলেন। তারপর শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা পোর্ট বারডকে তোমার কি পরিকল্পনা বলো?'

'আমি কি করেছি, একটা জাহাজ নিয়ে দক্ষিণে স্পেন অভিমুখে রওনা হবো। সেখানে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় আমি পোশাক ছাড়াই যেতে পারবো, আর সেখানে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো একটা লোকের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখবে না।'

'তোমার এ প্রস্তাবটা অবশ্যই মেনে নেওয়া যায়।'

'ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে সৌভাগ্যবশত আপনার বাড়িতে এসে পড়ার আগে পর্যন্ত এরকমই একটা পরিকল্পনা ছিল আমার। এখন সব কিছুই বদলে গেছে। ডাক্তার কিছুক্ষণের আলোচনায় আমি বুঝেছি, আমি কি করতে চাই একমাত্র আপনিই তা বুঝতে পারেন। আমাদের সামনে যে সাফল্যের সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে আপনি তা বুঝতে পারেন। ওই নোংরা শয়তানটা, যে আমার সবকিছু লুঠ করে পালিয়েছে, আপনি তার চেয়ে অনেক ভালো আর আমাকে সাহায্য করার অনেক গুণই আছে আপনার। আপনি আমাকে একটা গোপন জায়গার সন্ধান দিতে পারেন। যেখানে আমি আত্মগোপন করে নির্ভাবনায় ঘুমতে পারবো, খেতে পারবো এবং বিশ্রাম নিতে পারবো। এমন কি দরকার হলে খুনও করতে পারবো.......এবং অনায়াসে পালিয়েও আসতে পারবো, কারণ কেউ আমাকে দেখতেও পাবে না। আর একটা কথা ডঃ কেম্প, আমি আপনার মতো ভাবপ্রবণ হতে পারবো না। তাই খুন আমাদের করতেই হবে। আর আমার প্রথম শিকার হবে সেই চোর বাটপার ভবঘুরেটা!'

'তু-তুমি, প্রথমে তার কাছ থেকে বইগুলো পা-পাবার ব্যবস্থা করো', ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বললেন কেম্প, এই সময় বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি কথা বলে সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন। 'কাগজগুলো বলেছে, সে এখন পুলিশ স্টেশনে, তার অনুরোধেই পুলিশ তাদের একটা শক্তিশালী কক্ষে তাকে লক্-আপ করে রেখেছে। হয়তো এভাবেই তোমার হাত থেকে বাঁচতে চায় সে।'

'তবু সে বাধা অনতিগম্য হবে না আমার কাছে! কোনো বাধাই আমাকে রুখতে পারবে না! হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

গ্রিফিনের খেপাটে হাসির শব্দে সামনের দরজা খোলার শব্দটা চাপা পড়ে যায়, সে তার ক্রোধোন্মত্ত বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকে!

'শুনুন ডঃ কেম্প, আমরা বিজ্ঞের মতো খুন করবো। আমরা সন্ত্রাসের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। আমরা আপনার বারডক শহর দখল করে নেবো এবং সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবো। আর যারাই আমাদের বিরোধিতা করবে, আমরা তাদের খতম করে দেবো। আমি বলি কি, দুশমনের কোনো ক্ষমা নেই! খুন! খুন! খুন! এই একটাই কথা, মন্ত্রপোচ্চারণের মতোন!'

'কিন্তু, গ্রিফিন, এ অবস্থায় কেন তুমি আমাকে জড়াতে যাচ্ছো?' কেম্প তার কণ্ঠস্বর যতোটা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে বললেন, 'হাজারহোক, আমি—?'

'চুপ, চুপ করুন! নিচে ওই গোলমালের শব্দটা কিসের বলুন তো?'

'কিন্তু আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না,' কেম্প তার মনটাকে অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। 'শোনো গ্রিফিন, আমি তোমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পাচ্ছি না।

বরং তুমি যদি তোমার এই গবেষণার বিষয়ে কাগজে লেখো তাতে তোমার সুনাম তো হবেই, সেই সঙ্গে পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হবে। তোমার এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা সবাইকে জানতে দাও। সম্ভবত কোনো বিজ্ঞানী তোমার এই আবিষ্কারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারে।

অদৃশ্য মানুষ ডাক্তারের কথার মাঝে বাধা সৃষ্টি করে বলে উঠলো, 'কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে শুনলাম আমি। ওরা বোধহয় আপনার কাছেই আসছে, ওরা আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে পারে, যদি কাউকে আমার এখানে থাকার কথা বলেন—'

'না, না আদৌ আমি কাউকে কিছু বলবো না, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো!'

'হ্যাঁ, আপনার না বলাই ভালো!' দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে অদৃশ্য মানুষটি সতর্ক করে দিলো কেম্পকে।

কেম্প এবার একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। গ্রিফিন দরজার সামনে পৌঁছনোর আগেই তিনি তার আর দরজার মাঝখানে লাফিয়ে পড়লেন।

গ্রিফিন তাঁর মতলবের কথা বুঝতে পেরে খিঁচিয়ে উঠলো, 'বিশ্বাসঘাতক! আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন!'

তারপরেই হঠাৎ সে তার পরনের ড্রেসিংগাউনটা সরিয়ে ফেললো এবং অন্যান্য পোশাকগুলোও এক এক করে খুলে ফেললো।

সেই ফাঁকে কেম্প লাফিয়ে দরজার সামনে গিয়ে ত্রস্তহাতে সেটা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন থেকে একটা উড়ন্ত ড্রেসিংগাউন ছুটে এলো অদৃশ্য শরীরে।

অদৃশ্য মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কেম্প। এবং তার পিছনে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন। তখন তাঁর সামনে কেবল একটাই কাজ বাকী ছিলো। দরজায় তালা লাগানো। একবার সেই কাজটা সম্পন্ন করতে পারলেই তিনি তাকে নিরাপদে ঘরের ভেতরে বন্দী করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করতেই ঝাঁকুনিতে চাবিটা তালা থেকে ছিটকে পড়ে গেলো মেঝের ওপরে।

ভয়ে আতঙ্কে কেম্পের মুখ ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেলো। তিনি তখন নিরুপায় হয়ে দু'হাত দিয়ে দরজার হাতলটা চেপে ধরলেন। কিন্তু সেটা ঝাঁকুনি দিয়ে খুলে গেলো এবং অদৃশ্য দেহটা তাকে ধাক্কা দিয়ে দরজা ও দরজার ফ্রেমের মাঝখানে স্ট্যাচুর মতোন দাঁড়িয়ে পড়লো।

পরক্ষণেই অদৃশ্য মানুষ তৎপর হয়ে উঠলো, তার অদৃশ আঙুলগুলো ডঃ কেম্পের কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসলো। তার একমাত্র উদ্দেশ্য কেম্পকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলা। তারপর ড্রেসিং গাউনটা ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলো হলে। যাবার সময় কেম্পকে ঠেলা দিয়ে সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পরমুহূর্তেই দেখা গেলো শূন্য ড্রেসিংগাউন তাঁর ওপর চেপে বসেছে। ড্রেসিংগাউনটা ফাঁকা হলে হবে কি, একটা বলিষ্ঠ মানুষের ওজন অনুভব করলেন ডঃ কেম্প।

পুলিশ চীফ কর্ণেল অ্যাডি সিঁড়ির মাঝপথে উঠে এসে ডঃ কেম্পকে একটা ভারী ড্রেসিং গাউনের চাপে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে স্তব্ধ হতবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই সেই ড্রেসিংগাউনটা পুলিশ চীফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অদৃশ্য আঙুলগুলো তার কণ্ঠনালীর

ওপর চেপে বসলো। অদৃশ্য হাঁটু দুটো তার পেটে এলোপাথারি গুঁতো মারতে থাকলো। তারপর এই অদৃশ্য শক্তি তাঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেললো।

দু'জন হতবাক পুলিশম্যান কর্ণেল অ্যাডির পিছনে কয়েক ধাপ নিচে থমকে দাঁড়িয়ে পরে অবাক চোখে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখছিল, সম্বিৎ ফিরে পেতে তারা এবার ছুটে এলো তাকে সাহায্য করার জন্য। ওপর থেকে ওদিকে সদর দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো।

'চলে গেছে সে!' সিঁড়ির নিচে কোনোরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন কেম্প, তাঁর পরনের পোশাক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, এবং তাঁর মুখটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল তখন। মেঝেতে পড়ে থাকা নরম ড্রেসিংগাউনটা হাতে তুলে নিয়ে তিনি হাঁ হয়ে গেলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে! আমরা তাকে হাতে পেয়েও হারালাম।'

।। ষোলো ।।

ঃ অদৃশ্য মানুষের সন্ধান ঃ

ডঃ কেম্প তখন বিভ্রান্ত, পাগলের মতো অবস্থা তাঁর। সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর বেশ কয়েক মিনিট কথা বলতে পারলেন না তিনি। অবশেষে কর্ণেল অ্যাডিকে তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে এলেন তিনি এবং দু'জনে মদ্য পান করলেন।

'লোকটা পাগল!' হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন তিনি। 'এখন সে আর মানুষ নেই। স্বার্থপর সে, আর সে কেবল নিজের অন্য কাজ চরিতার্থ করতেই বেশি আগ্রহী। অনেক লোককে জখম করেছে সে এবং তার জন্য পরোয়া করে না সে। আমরা এখনি তাকে রুখতে না পারলে অনেককেই খুন করতে পারে সে।'

'তাহলে তো অবশ্যই তাকে ধরতে হবে,' বললেন অ্যাডি।

'হ্যাঁ, আমাদের এই জেলা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই তাকে ধরতে হবে। একবার এখান থেকে পালাতে পারলে শহরতলীর দিকে তার চলার পথে যে বাধা সৃষ্টি করবে তাকেই সে হত্যা করবে। এখানে এই পোর্ট বারডক থেকেই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার মতলব করছে সে। রেল স্টেশন, রাস্তায় এবং বন্দরে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে অবশ্যই তাদের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে আপনাকে। এমন কি দরকার হলে সৈন্যদেরও সাহায্য নিতে হবে। তবে আমার মনে হয় না, এখনি সে পোর্ট বারডক ছেড়ে চলে যাবে, কারণ থমাস মার্ভেলের কাছ থেকে সে তার চুরি যাওয়া নোটবইগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য বদ্ধপরিকর।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছেলেটি এখন আমাদের জেলে বন্দী জীবন যাপন করছে, বিচারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।'

'কর্ণেল, আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, ওই পাগলটার খাওয়া ও শোয়া বন্ধ করতে হবে। বসতবাড়ি, পান্থশালা এবং দোকানগুলোয় তালা-চাবি লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে অদৃশ অবস্থায় সেখানে ঢুকে পরে আহার ও বিশ্রামের সুযোগ না পায় সে। এখন আর একটা কাজ করতে হবে আমাদের রাতে ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি পড়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে আমাদের। বাইরে থাকার ঝুঁকি সে নিতে চাইবে না, কারণ তার দেহরেখা কোনো না কোনোভাবে

মানুষের চোখে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রবল, তার অদৃশ্য দেহের ঘ্রাণ ঠিক শুঁকে নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করবে, আর তখনি পথচারীরা সতর্ক হয়ে যাবে এবং তার সন্ধান পেয়ে যাবে। তবে পুলিশের পক্ষে তাকে ধরবার কাজটা সহজ হয়ে পড়তে পারে। তাই একটা আশ্রয়ের সন্ধান করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠবে সে আর তখনি আমরা তাকে আমাদের ফাঁদে পড়তে বাধ্য করবো। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি কর্ণেল অ্যাডি, আমরা যদি তা করতে না পারি, আমার আশঙ্কা তখন আমাদের সবার ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে!'

'ডঃ কেম্প, আপনার মুখ থেকে তার সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে আপনি যদি শহরে আসেন, তাহলে তার সন্ধান করার কাজে আপনি আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারবেন।'

কেম্প সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। তারপর কেম্পের ঘোড়াগাড়িতে চড়ে তাঁরা দু'জনে পুলিশ স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললেন যাওয়ার পথে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, 'কুকুরের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। অদৃশ্য মানুষ বলে তারা তাকে দেখতে না পেলেও তারা তার ঘ্রাণ শুঁকে তাকে চিহ্নিত করে দিতে পারবে।'

'এ এক চমৎকার ধারণা!' একজন ব্লাডহাউণ্ড কুকুরের ট্রেনারকে আমি জানি, এ ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আর কিছু?'

'আর একটা কথা মনে রাখবেন, যতক্ষণ না হজম হয় তার পেটের খাবার সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। তাই কোনো কিছু খাবার পর নিজেকে অবশ্যই লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। আর একটা কথা আপনার লোকদের রাস্তার ধারে প্রতিটি গাছের গুঁড়ি আর ঝোপঝাড়ে সন্ধান চালাতে বলুন আর সেখানে কেউ কোনো অস্ত্রসস্ত্র লুকিয়ে রাখেনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে বলুন। অদৃশ্য মানুষ দীর্ঘ সময় কোনো অস্ত্র বহন করতে পারে না। কিন্তু তার চলার পথে যে-কোনো অস্ত্রবাহী পথচারীর কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে সে।'

'খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন আপনি, ধন্যবাদ! আর কিছু?'

'হ্যাঁ। রাস্তায় কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন, যাতে করে তার খালি পা কেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়। আমি জানি, এটা খুবই নিষ্ঠুর কাজ, কিন্তু এই পাগল লোকটা অন্যদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করবে তার থেকে বেশি কিছু নয়। সে আর এখন মানুষ নেই। তাই তাকে এড়িয়ে গিয়ে সুযোগ মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

জুনের তপ্ত সেই দুপুর দু'টোর সময় গ্রামের সর্বত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়ে, পুলিশের সতর্কবাণী প্রচারিত হয়, সাবধান আমাদের এখানে অদৃশ্য মানুষ হাজির হয়েছে, সে একজন বিপজ্জনক অপরাধী। যেভাবেই হোক তাকে ধরতে হবে, কিংবা প্রয়োজন হলে তাকে খতম করে দেওয়া যেতে পারে।.......অশ্বারোহী পুলিশ প্রতিটি কুটিরে গিয়ে প্রত্যেককে সতর্ক করে দিয়ে বলছে, তারা যেন তাদের কুটিরের দরজায় তালা লাগিয়ে ভেতরে বসে থাকে, বাইরে না বেরোয়। পুলিশের নির্দেশে প্রতি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অভিভাবকেরা যে যার ছেলে মেয়েদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। এই সতর্কবাণীর নোটিশ শহরের রাস্তায় প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টের ওপর লটকে দেওয়া হয়েছে এবং তারবার্তা পাঠিয়ে ইংলণ্ডের সমস্ত পুলিশ স্টেশনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। প্রতিটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরা ভেতর থেকে লক্ করে দেওয়া হয় সমস্ত মালবাহী গুডস্‌ট্রেন বাতিল

বলে ঘোষিত হয়। পোর্ট বারডকের চারপাশে কুড়ি মাইল এলাকার লোকেরা বন্দুক, মুগুর ও ব্লাডহাউণ্ড কুকুরসহ গ্রামের সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের আশা অদৃশ্য মানুষটিকে ঠিক খুঁজে বার করবেই!

যাইহোক, এতো সব কড়া সতর্ক থাকা সত্ত্বেও একজন নিরীহ লোক অদৃশ্য মানুষের পাগলামির শিকার হয়ে গেলো একদিন। তার নাম লাওনেল উইকস্টীড্। মাঝবয়সী কেয়ারটেকার তার কর্মক্ষেত্র থেকে মধ্যাহ্নভোজ সারতে বাড়িতে ফিরছিল, সেই সময় আক্রান্ত হয় সে। কেন যে সে আক্রান্ত হয়েছিল, কেউ তা জানে না। কিন্তু উইকস্টীড একজন শান্তিকামী মানুষ, কোনো লোকের দ্বারাই প্ররোচিত হতে পারে না সে। লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হয়, তার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। পুলিশি তদন্তে এসব তথ্যই প্রকাশ পায়। রক্তমাখা লোহার রডটা লোকটার মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল।

পুলিশের ধারণা, নিজের আত্মরক্ষার জন্য অদৃশ্য মানুষ সেই লোহার রডটা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করতো। কাউকে খুন করার পরিকল্পনা না করেই তার পথে যেই বাধাস্বরূপ হয়ে আসুক না কেন, সে তার হাতের অস্ত্রটা ব্যবহার করতো। পুলিশ আরও ভাবলো হয়তো রাস্তা দিয়ে শূন্যে অদ্ভুতভাবে ঘোরাফেরা করতে করতে লোহার রডটার সন্ধান পেয়ে যায় এবং অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সেটা হাতে তুলে নিয়ে থাকবে পরে প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য।

উইকস্টীডের মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার পর নানান প্রান্ত থেকে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে অদৃশ্য মানুষের কাছ থেকে নানান ধরনের রিপোর্ট আসতে শুরু করলো পুলিশের কাছে। পোর্ট বারডক থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে হিনটনডীন টাউনের একটা খামারে কর্মরত কয়েকজন শ্রমিক একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, সে তখন কখনো পাগলের প্রলাপ বকছিল, হাসছিল, কখনো বা কাঁদছিল, আবার কখনো বা গোঙাচ্ছিল। এই সব শব্দ মাঠ থেকে সামনে পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছিল।

কর্ণেল অ্যাডি যখন খবরটা পেলেন, তিনি তখন কেম্পকে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ বিশ্বাস করে আপনাকে তার যেসব গোপন কথা বলেছিল, সম্ভবত সে এখন বুঝতে পেরেছে সে খবর আপনি আমাদের দিয়ে দিয়েছেন, আর সেই খবর মতো আমরা এখন তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছি। সে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে, সমস্ত বাড়ি, আর পান্থশালাগুলো ভেতর থেকে লক্ করে রাখা হয়েছে, এবং ট্রেনের কামরাগুলোও ভেতর থেকে লক্ করে দেওয়া হয়েছে। এসব খবর সে পেয়েছে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে লটকানো আমাদের নোটিস থেকে। ওদিকে সৈনিকরা এবং ব্লাডহাউণ্ড কুকুরের দল মাঠে-ঘাটে তাকে খোঁজবার জন্য চিরুনী-তল্লাশি করে বেড়াচ্ছে।

'কিন্তু সে খুবই চতুর।' কেম্প বলে উঠলেন, 'আর ইতিমধ্যে সে নিশ্চয়ই খুবই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।'

তবু এতো সব সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অদৃশ্য মানুষ যেভাবেই হোক ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেলো। পুলিশের আবার এও বিশ্বাস, তার পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এমন কি সে গত চব্বিশঘণ্টার মধ্যে যেভাবেই হোক সে তার আহার ও শোয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়, পরের দিন সকালে অদৃশ্য মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলো, তখন তার মধ্যে একটা নতুন উদ্যম দেখা গেলো, তাকে খুবই শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছিল, জীবিত মানুষের তীব্র

বিরোধী হয়ে উঠলো এবং মানুষের প্রতি আরও বেশি করে ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করলো। এসবের সঙ্গে ছিল প্রতিশোধ নেবার ভয়ঙ্কর ইচ্ছা জেগে উঠতে দেখা গেলো তার মনে! পৃথিবীর বিরুদ্ধে সে তার শেষ মহা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, যে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর সে!

।। সতেরো ।।

ঃ ডঃ কেম্পের বাড়িতে হামলা ঃ

বিকেলের ডাকে ডঃ কেম্পের বাড়িতে একটা খাম এসে পৌঁছলো. সেদিনকার হিন্টনডীন ডাকঘরের ছাপ ছিল খামের ওপরে। ডাক্তার তখন মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন, তাঁর হাউসকীপার তখন খামটা এনে তাঁর হাতে তুলে দিলো। খামটা খুলে কাগজের ওপর পেন্সিলে লেখা একটা চিঠি বার করলেন তিনি। সেটা তিনি পড়তে থাকলেন ঃ

পোর্ট বারডকের জনগণ ঃ

বিস্ময়করভাবে চতুর তোমরা। কিন্তু চালাকীর দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। তাই আমার সঙ্গে চালাকী করে তোমরা কতখানি লাভবান যে হবে আমি ভাবতে পারি না। সারারাত ধরে আমাকে অনুসরণ করে আর আমাকে খেতে ও ঘুমতে না দিয়ে তোমরা প্রমাণ করে দিয়েছো যে তোমরা আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই আমি সফল হয়েছি।

সন্ত্রাস শুরু হতে চলেছে, আর আজই প্রথম দিন। তোমাদের পুলিশ চীফ কর্ণেল অ্যাডিকে বলো, ইংলণ্ডের রাণী আর পোর্ট বারডক শাসন করেন না। অদৃশ্য মানুষ এখন এখানকার নতুন শাসক। আজই অদৃশ্য মানুষের রাজকার্য পরিচালনা করার প্রথম দিন।

আমি আমার রাজত্ব শুরু করবো একজনকে হত্যা করে আর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আমি অন্যদের শিক্ষা দিতে চাই। যদি তারা আমার বিরুদ্ধে কোনোরকম চক্রান্ত করে, তাহলে তাদের পরিণামও ঠিক এই রকমই হবে! আর আমার সেই শিকারের নাম কেম্প। হয়তো তিনি তাঁর বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে, কোথাও লুকিয়ে থেকে কিংবা চারদিকে প্রহরী রেখে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারেন এই ভেবে যে, তিনি নিরাপদ এবং অমর হয়ে থাকবেন চিরদিন। উনি ওই আনন্দেই থাকুন! আমি শপথ নিয়ে বলছি, মৃত্যু খুব শীগ্‌গীরই আসবে ওঁর জীবনে! আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনারা কেউই কেম্পকে সাহায্য করবেন না। আমার আদেশ অমান্য করলে আপনাদের জীবনেও মৃত্যু দ্রুত ঘনিয়ে আসবে। যাইহোক, আজ কেম্পের মৃত্যু দিন!'

কেম্প সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাউসকীপারকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত জানালা এবং শাটার বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি নিজে ওপরতলায় গিয়ে তাঁর স্টাডির জানালাগুলো নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে তার ছোট্ট রিভলবারটা বার করলেন। সেটার মধ্যে বুলেট ভর্তি আছে নিশ্চিত হয়ে রিভলবারটা তিনি তাঁর জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে তাঁর মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। খাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটা তখন বিক্ষুব্ধ।

অবশেষে টেবিলের ওপর সজোরে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তাকে ধরবোই! আর তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য আমি হবো টোপ!'

কেম্প খাবার টেবিল থেকে লাফ দিয়ে উঠে তাঁর ডেস্কের সামনে ছুটে গেলেন, সেখানে তিনি

একটা চিরকুট লিখলেন। তিনি আবার তাঁর হাউসকীপারকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে বললেন, 'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এই চিরকুটটা কর্ণেল অ্যাডির কাছে পৌঁছে দাও। আর আমি যতক্ষণ না যাই পুলিশ স্টেশনেই থেকে যেও। এক পাগলা আমার পিছু নিয়েছে, সে আসছে এখানে, আমার জীবন অনিশ্চিত হলেও তুমি কিন্তু নিরাপদে থাকবে সেখানে।'

ঘণ্টাখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে সামনের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং সাড়া দেবার জন্য কেম্প নিচে নেমে গেলে দরজার খিল খুললেন তিনি, কিন্তু দরজাটা মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে যথারীতি চেন দিয়ে বেঁধে রাখলেন। কর্ণেল অ্যাডির কণ্ঠস্বর না শোনা পর্যন্ত তিনি নিজেকে দৃষ্টিগোচর করলেন না।

'তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিন কেম্প! একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। আপনার হাউসকীপার আক্রান্ত।'

'ওহো না, না, এ হতে পারে না!' দরজার চেনটা খুলে দিতে গিয়ে ডক্টর চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠিক আছে তো সে?'

'সে এখন পুলিশ স্টেশনে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সে বলেছে, আপানার একটা চিরকুট আমাকে দেবার কথা ছিল তার, কিন্তু পথে কে যেন সেটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। তা সেই চিরকুটে কি লেখা ছিল ডক্টর?'

'আমি কি বোকা! আমার বোঝা উচিত ছিল হিনটনডীন থেকে হাঁটা পথে মাত্র এক ঘণ্টা সময় লাগার কথা। ইতিমধ্যেই এখানে এসে হাজির হয়ে গেছে সে!'

'কেনই বা সে হিনটনডীনে এসেছে? এখানে তার আসার প্রয়োজনটাই বা কি হতে পারে?'

'এই যে তার এই চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন,' এই বলে ডঃ কেম্প অদৃশ্য মানুষের চিঠিটা কর্ণেল অ্যাডির হাতে তুলে দিলেন। তাকে ধরবার জন্য আমি এখানে একটা ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করি। আমার এই অভিমত জানিয়ে একটা চিরকুট পাঠাই আপনার কাছে আমার হাউসকীপারের মাধ্যমে। কিন্তু মাঝপথে অদৃশ্য মানুষ তাকে বাধা দিয়ে তার হাত থেকে চিরকুটটা ছিনিয়ে নেয় আর আমার মতলবের কথা জানতে পেরে যায়।'

'কিন্তু আমরা মনে হয় না, এখানে আসার ঝুঁকি সে নেবে।'

'ওহো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে আসবেই!'

এই সময় ওপরতলা থেকে কাচ ভাঙার শব্দ ভেসে এলো। 'মনে হচ্ছে আমার স্টাডির কাচ ভাঙার শব্দ!' কেম্প চিৎকার করে উঠলো। 'আসুন কর্ণেল, আমার সঙ্গে আসুন!'

কাচ ভাঙার শব্দ ক্রমাগত ভেসে আসতে থাকলে তারা দুজনে এক সঙ্গে সিঁড়ির দুটো ধাপ টপকে উঠতে থাকলেন। ওঁরা স্টাডিতে গিয়ে ঢুকতেই দেখলেন, ঘরের তিনটে জানালার কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মেঝের ওপরে।

'সে তার সন্ত্রাসের কাজ শুরু করে দিয়েছে!' কেম্প বলে উঠলেন।

'ওপরে উঠে আসার মতো তার কোনা রাস্তা নেই। মনে রাখতে হবে, এই ঘরটা চারতলায়।'

'কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন সে কেমন নির্বিবাদে এখানে চলে এসেছে?'

ঠিক এই সময়ে নিচুতলা থেকে কাচের বোর্ড ভাঙার শব্দ ভেসে এলো।

'সে এখন আমার শোবার ঘরের জানালাগুলোর সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। ওকে বিভ্রান্ত করে তুলুন।' কেম্প ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন। 'সারা বাড়িটা ভেঙে তছনছ করে দিতে চায় সে। কিন্তু বোকা সে। ভেতরের শাটারগুলো বন্ধ থাকার দরুন কাচের টুকরোগুলো বাইরেই পড়বে আর এর ফলে তার পা দুটো কেটে রক্তাক্ত হয়ে যাবে।'

জানালাগুলো ভাঙচুড় চলতে থাকলে অ্যাডি প্রস্তাব করলেন, 'আমি ব্লাডহাউণ্ড কুকুরগুলোকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি, দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো। আপনার রিভলবারটা আমাকে ধার দিন আর ঘরে তালা লাগিয়ে এখানে বসে থাকুন।'

কেম্প তাঁর রিভলবারটা কর্ণেলের হাতে তুলে দিয়ে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। নিঃশব্দে দরজার খিল খুলে তিনি ফিসফিসিয়ে কর্ণেলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ুন, যাতে করে ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে সে।'

কর্ণেল অ্যাডি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেম্প দ্রুত হাতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খিল এঁটে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কর্ণেল অ্যাডি দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে লন পেরোতে গেলেন। তারপর তিনি গেটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝোড়ো হাওয়া বইতে দেখলেন। সেই হাওয়ার প্রচণ্ডতা এতোই বেশি ছিল যে, ঘাসের শিসগুলো পর্যন্ত দুলে উঠলো এবং তখনি একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাঁর উদ্দেশ্যে হুকুম করে উঠলো, 'দাঁড়ান!'

অ্যাডি দাঁড়ালেন বটে, তবে একটা হাত তাঁর পকেটে রিভলবারের ওপর চেপে বসলো। 'এসব কি হচ্ছে?' যতোটা সম্ভব নিজের ওপর আস্থা রেখে সাহসের সঙ্গে তিনি অদৃশ্য মানুষের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন।

উত্তরে সেই কণ্ঠস্বর বললো, 'বাড়ি ফিরে যান!'

'দুঃখিত। আমি এখন ডিউটিতে রয়েছি, এ বাড়ির নিরাপত্তার ভার এখন আমার ওপর। আমাকে আমার কাজ করতে দাও!'

'এখানে কি কাজ আছে আপনার?'

'সেটা তোমার জানার কথা নয়।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অ্যাডি অনুভব করলেন তার একটা অদৃশ্য হাত কণ্ঠনালী যেন জড়িয়ে ধরলো, একটা অদৃশ্য হাঁটু পিছন থেকে তাঁর পিঠের ওপর গুঁতো মারতে থাকে। পরমুহূর্তেই তিনি হাত পা ছড়িয়ে মাটির ওপর বসে পড়লেন। তিনি তাঁর পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে এলোপাথারি গুলি চালালেন। কিন্তু অপর দিকে অদৃশ্য হাতের একটা প্রচণ্ড ঘুষি তাঁর মুখের ওপর পড়তেই রিভলবারটা তাঁর হাত থেকে ছিটকে শূন্যে উড়ে গেলো।

অ্যাডি দেখলেন রিভলবারটা তাঁর মাথা থেকে প্রায় ছ'ফুট ওপরে শূন্যে ভাসছে এবং একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে।

'আমি আপনাকে খতম করে ফেলবো। যদি না একটা বুলেট অযথা নষ্ট করতে চান, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন!'

সুবোধ বালকের মতো অদৃশ্য মানুষের হুকুমে অ্যাডি উঠে দাঁড়ালন। এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল জুন মাসের একটা দিনে তিনি তাঁর জীবনটা অসময়ে শেষ হতে দিতে চান না।

'আপনার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই।' অদৃশ্য মানুষটি বললো, 'কিন্তু আমি আপনার টাউনে যেতে চাই না, আমি সেখান থেকে কোনোরকম সাহায্য আমি আপনাকে পেতে দিতে চাই না। তাই এখনি ভালো মানুষের মতো ডঃ কেম্পের বাড়িতে ফিরে যান।'

'কেম্প আমাকে ঢুকতে দেবেন না।'

'তাঁকে বোঝাতে হবে আপনাকে। এখানে আপনার অন্য কোনো পছন্দ আর থাকতে পারে না।'

'ঠিক আছে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, খুন করবে না তাঁকে।'

'না, আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না।'

ওঁদের মধ্যে এইসব কথাবার্তা যখন চলছিল, ডঃ কেম্প হামাগুড়ি দিয়ে কাচের টুকরোগুলো সরাচ্ছিলেন, একসময় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্টাডিরুমের জানালার গোবরাটের ওপর উঁকি মারতে তাঁদের দেখতে পেলেন। নিজের মনে তিনি বললেন, 'ওঁখানে দাঁড়িয়ে অ্যাডি কথা বলছেন কেন? কথা বলার কিই বা থাকতে পারে? কেন তিনি গুলি করছেন না?'

তারপরেই ছোট্ট রিভলবারের ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হতে দেখা গেলো এবং কেম্পের বুঝতে অসুবিধে হলো না, তাঁর রিভলবারটি এখন কার দখলে।

আর ঠিক তখনি অ্যাডি বাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং মাথার ওপর দু'হাত তুলে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলেন। মাথার ওপর ইঞ্চিখানেক দূরত্বের ব্যবধানে ছোট্ট কালো রিভলবারটা অনুসরণ করতে থাকলো তাঁকে।

হঠাৎ অ্যাডি লাফিয়ে উঠে রিভরবারটা হাতের মুঠোয় ধরতে চাইলেন। কিন্তু তিনি সফল হলেন। পরমুহূর্তেই সেখানকার আকাশ বাতাস নীল ধোঁয়ায় ভরে গেলো। অ্যাডি হাত দিয়ে তাঁর বুক চেপে ধরলেন, তারপর সামনে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন এবং স্থির, নিথর হয়ে পড়ে রইলেন।

ওদিকে কেম্পও জানালার সামনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে তার দৃষ্টি পড়েছিল লন এবং রাস্তায় রিভরবারের আভাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় সেটা উধাও হয়ে গেলো। রাস্তায় কেবলমাত্র দু'জন পুলিশম্যানের গতিবিধি লক্ষ্য করা গেলো, তারা তাঁর বাড়ির দিকেই আসছিল।

ঠিক তখনই বাড়িতে অদৃশ্য মানুষের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেলো আবার। একতলা থেকে কাচের টুকরো ছিটকে পড়তে লাগলো। কেম্প দ্রুতপায়ে নিচতলায় নেমে এলেন, রান্নাঘরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। জানালার কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং কুড়ুলের আঘাতে শাটারগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই কুড়ুল দিয়েই এখন জানালার লোহার ফ্রেম ভাঙা হচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে এসে কেম্প ভাবতে থাকলেন, অদৃশ্য মানুষ যেকোনো মুহূর্তে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে, কারণ ভেতরের দরজাগুলো তার গতিপথ রুখে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ঘণ্টার শব্দ শুনে কেম্প স্তব্ধ, হতবাক, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামনের দরজার দিকে ছুটে গেলেন।

এবং দুজন পুলিশম্যান তাদের পরিচয় দিতেই তিনি দরজার চেনটা সরিয়ে নিলেন।

কেম্প কোনো ভূমিকা না করেই বলে উঠলেন, 'অদৃশ্য মানুষ এখন এখানেই রয়েছে। আর তার কাছে কুড়ুল ও একটা রিভলবার রয়েছে।

রান্নাঘর থেকে অদৃশ্য মানুষের আরও তাণ্ডবলীলার শব্দ তাদের কানে ভেসে আসতে শোনা গেলো। 'যেকোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে সে!' চিৎকার করে উঠলেন কেম্প। এখন তাঁকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত বলে মনে হলো।

পুলিশের লোকদের ডাইনিংরুমে নিয়ে এলেন তিনি। রিভলবারের বিকল্প হিসেবে তাদের হাতে অগ্নিচুল্লীতে খোঁচা দেবার পোকার তুলে দিলেন। এদিকে রান্নাঘর থেকে ডাইনিংরুমের দরজাপথে শূন্যে একটা কুড়ুল ভেসে উঠতে দেখা গেলো তখন।

একটা পোকার কুড়ুলের আক্রমণ স্তব্ধ করে দিলো। দ্বিতীয় পোকারটা জোরে আঘাত হানলো রিভলবারটার ওপরে, সেটা মেঝের ওপর পড়তেই ধাতব শব্দ হলো।

তেমনি মেঝে থেকে দু'ফুট শূন্যে ভাসতে ভাসতে কুড়ুলটা পিছু হটে হলের দিকে চলে গেলো, রুদ্ধশ্বাসে অদৃশ্য মানুষটা পুলিশের লোকদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'আপনারা দু'জন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করবো না। আপনাদের ওপর কোনো রাগ নেই। আমি কেম্পকে খুঁজছি, আমার যা কিছু মোকাবিলা তাঁর সঙ্গেই হবে।

'কিন্তু আমরা যে তোমাকেই খুঁজছি!' প্রথম পুলিশম্যান খিঁচিয়ে উঠলো। তারপর যেদিক থেকে অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসছিল সেদিকে সে তার হাতের পোকারটা দুলিয়ে অদৃশ্য মানুষটিকে খোঁচা দেবার চেষ্টা করলো। তাতে কাজ হলো। কুড়ুলটা অদৃশ্য হাত থেকে খসে পড়লো। কিন্তু সেটা আবার আন্দোলিত হলো, পুলিশম্যানের হেলমেটের ওপর সেটা আছড়ে পড়তেই সেটা ভেঙে খানখান হয়ে গেলো এবং ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়লো সে মেঝের ওপরে।'

দ্বিতীয় পুলিশম্যান কুড়ুলটাকে লক্ষ্য করে তার হাতের পোকারটা নিক্ষেপ করলো, কিন্তু মনে হলো মেটালের নরম কোনো কিছুর ওপর গিয়ে বিঁধলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ ভেসে এলো এবং কুড়ুলটা মেঝের ওপর পড়ে গেলো। পুলিশম্যান সেই একই জায়গায় আবার তার পোকারটা শূন্যে দোলালো, কিন্তু এবার সেটা আর কোনো কিছুতে আঘাত করলো না। কুড়ুলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে আবার সে তার পোকার দিয়ে আঘাত করলো, কিন্তু এবারেও কার্যত কোনোভাবেই আঘাত করতে পারলো না সে। তারপর সে স্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো, কান পেতে রইলো, যদি কোনো গতিবিধির শব্দ শুনতে পায়। না, কোনো শব্দও কর্ণগোচর হলো না তার।

এই সময় প্রথম পুলিশম্যান উঠে বসলো। তার মাথাটা কেটে গেছিলো, সেই ক্ষতস্থান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছিল তার মুখের ওপরে। 'কোথায়, কোথায় সে? জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি তাকে আঘাত করেছি, কিন্তু সে যে এখন কোথায় আমি জানি না। সে নিশ্চয়ই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। দেখো, ডাইনিংরুমের জানালা যেন খোলা থাকে। আর আমাদের সাহসী ডঃ কেম্পও নিশ্চয়ই ওই জানালা পথ দিয়েই পালিয়ে গেছেন। তিনি এখন নায়কে পরিণত হয়ে থাকবেন।

।। আঠারো ।।

আর্থার কেম্প ডাইনিংরুমের জানালা টপকে সব্জিবাগানের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান তিনি, সেই রাস্তাটা চলে গেছে সামনে সারি সারি তরুবীথির মধ্যে। যেসব সব্জি আমি আমার জুতোর তলায় মাড়িয়ে এসেছি, মিনিট কয়েক পরে সেগুলো আবার অদৃশ্য মানুষের পায়ের তলায় আবার পিষ্ট হতে দেখা গেলো। তাঁকে অনুসরণ করে আসছিল সে।

কেম্প তার নিকটবর্তী প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে ছুটে চললেন, কিন্তু তার শত চিৎকার কিংবা দরজায় বার বার ধাক্কা মারা সত্ত্বেও কেউ সাড়া দিলো না। তাঁর সব রকম আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কারণ অদৃশ্য মানুষের ভয়ে সেই দরজা ভেতর থেকে লক্ করা তাই সেই প্রতিবেশীর বাড়ির সবাই তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, কেউ দরজা খুলতে এগিয়ে আসেনি।

তাঁর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও, কেম্প তাঁর বোধশক্তি অটুট রেখে শহরের দিকে ছুটে চলেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি কাচের টুকরো ছড়ানো এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে হাঁটছিলেন। সেই পথ ধরে অদৃশ্য মানুষ খালি পায়ে চললে তার কি দশা হবে তা একমাত্র তিনিই ভালো জানেন।

পোর্ট বারডকে পৌঁছানো মাত্র কেম্প তার পিছনে অদৃশ্য পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর নিজের গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে অদৃশ্য মানুষের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ভেসে এলো তাঁর কানে। সেই নিঃশ্বাস যেন পিছন থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছে। আরও ভয়, আরও আতঙ্ক পেয়ে বসলো তাঁকে।

'অদৃশ্য মানুষ!' চিৎকার করে তিনি রাস্তায় কর্মরত শ্রমিক এবং শহরের শেষ প্রান্তে ট্রামের আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। 'আমার পিছন পিছন আসছে!'

ছড়ানো ছিটানো ভীড়! মহিলারা এবং শিশুরা ভয়ে বাড়ির দিকে ছুটছে। রাস্তায় কর্মরত শ্রমিকরা যে যার হাতের গাঁইতি এবং শাবল উঁচিয়ে কেম্পকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে ছুটতে শুরু করে দিলো।

হঠাৎ কেম্প থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলেন, 'রাস্তা বরাবর একটা লাইন তৈরি করে এগিয়ে চলো!'

কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর কানে প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলেন। চরকির মতো এক পাক ঘুরে গিয়ে, কিন্তু কোনোরকমে তিনি তাঁর ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ হলেন এবং তিনি তাঁর অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশ্যে শূন্যে ঘুষি পাকিয়ে হাতটা আন্দোলিত করতে থাকলেন। তারপর তিনি আবার তাঁর চোয়ালে আঘাত পেলেন। এবার তিনি টাল সামলাতে না পেরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। পরমুহূর্তেই অদৃশ্য একটা হাঁটু তাঁর বুকের ওপর চেপে বসলো এবং অদৃশ্য আঙুলগুলো তাঁর কণ্ঠনালী শক্ত করে টিপে ধরলো।

ডঃ কেম্প যখন অদৃশ্য মানুষের আঙুলগুলো তাঁর কণ্ঠনালীর ওপর থেকে আলগা করার চেষ্টা করছিলেন, তখন রাস্তায় কর্মরত এক শ্রমিকের ছুঁড়ে দেওয়া কোদাল শূন্যে চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে নরম কোনো বস্তুর ওপর ভারী কোনোবস্তু আঘাত করার মতো শব্দ হলো। কেম্পের গলার ওপর থেকে অদৃশ্য হাতের দৃঢ়মুষ্টি আলগা হয়ে গেলো এবং ডক্টর তাঁর মুখের ওপর সিক্ত ফোঁটা অনুভব করলেন।

যাইহোক, এতক্ষণ অদৃশ্য মানুষের ভারের চাপ ছিল কেম্পের ওপর। সেই ভার কাটিয়ে তিনি এবার তাঁর শরীরে মোচড় দিয়ে অদৃশ্য মানুষের ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। এরপরেই তিনি অনুভব করলেন একটা অদৃশ্য দেহ যেন পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর।

'আমাকে সাহায্য করো!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন। 'আমি তাকে পেয়েছি। কেউ যেন তার পা ধরে রেখেছে!'

চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে সামিল হওয়ার জন্য। জায়গাটা যেন ফুটবল লড়াইয়ের একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেলো। শূন্যে ঘুষির উত্তোলন এবং সেই সঙ্গে লাথি মারা চলতে থাকে যতক্ষণ না একটা অদৃশ্য আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হতে শোনা গেলো, 'দয়া করো, দয়া করো আমাকে!'

'বোকা গর্দভ, ফিরে যাও এখান থেকে!' মাথার ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল, ডঃ কেম্পের তবু তা সত্ত্বেও তিনি সেই অদৃশ্য মানুষটির কাছ থেকে জনতার ভীড় হাঁটাতে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'সে এখন মারাত্মকভাবে আহত!'

জনতা পিছু হটে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাদের এখন এটাই কৌতূহল, অদৃশ্য মানুষটাকে নিয়ে ডঃ কেম্প কি করেন তা দেখতে হবে। ওদিনকে ডাক্তার অদৃশ্য হাতজোড়া দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

ইত্যবসরে কিছু লোক চলে যাবার উপক্রম করতেই একজন লোক তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওকে ছেড়ে চলে যেও না তোমরা। সম্ভবত আহত হওয়ার ভান করছে।'

'না, মিথ্যে অভিনয় করছে না সে।' কেম্প রাগতস্বরে বলে উঠলেন।

কেম্প তাঁর একটা হাত অদৃশ্য মানুষের হাতের ওপর থেকে তুলে তার অদৃশ্য মুখের ওপর হাত রেখে বললেন, 'লোকটার সারা মুখ সিক্ত, রক্তের মতো মনে হচ্ছে।' তারপর তিনি অদৃশ্য মানুষের বুক যেখানে থাকে, সেখানে তাঁর হাতটা নামিয়ে আনলেন। 'হায়, ঈশ্বর! লোকটার নিঃশ্বাস পড়ছে না। আমি তার হৃৎপিন্ডের কোনো সাড়া পাচ্ছি না, আর—'

'ওই যে ওইদিকে তাকিয়ে দেখুন!' ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলো।

বৃদ্ধার নির্দেশমতো সবাই তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাতেই দেখলো, একটা হাতের দেহরেখা কাচের মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, স্বচ্ছ দেখাচ্ছে রক্তবাহী শিরা, ধমনী, হাড় এবং স্নায়ুকোষগুলো। এমন কি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে জনতা যখন স্থির চোখে তাকিয়েছিল, হাতটা মনে হলো স্বচ্ছ থেকে অন্ধকারাচ্ছন্নে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

'আর ওখানে তাকিয়ে দেখুন!' বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে একটা লোক বলে উঠলো, 'ওখানে তার পা-দুটোও কেমন দর্শনীয় বলে মনে হচ্ছে।'

আর তাই ধীরে ধীরে তার হাত দুটো থেকে শুরু করে পা-দুটো এবং তার শরীরের মাঝখানে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সব কিছুই কেমন একটু একটু করে দৃষ্টিগোচর হতে চলেছে। প্রথমে দেখা গেলো স্নায়ুকোষগুলো, তারপর হাড় এবং রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সব শেষে মাস ও চামড়া। লোকটার চূর্ণ-বিচূর্ণ বুকটা এবার দৃষ্টিগোচর হলো।

কেম্প তাঁর-পরনের জ্যাকেটটা খুলে ফেলে তিরিশ বছর বয়স্ক যুবক জ্যাক গ্রিফিনের নগ্ন দেহ ঢাকা দিয়ে দিলো।

'তার মুখটি ঢেকে দিন!' বিস্ফারিত চোখ এবং দোমড়ানো-মোচড়ানো ক্রোধোন্মত্ত মুখটা দেখে একজন মহিলা বলে উঠলো।

কেউ একজন বুদ্ধি করে জলি ক্রিকেটার পান্থশালা থেকে একটা সাদা চাদর এনে গ্রিফিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিলো। তারপর আর্থার কেম্প তাঁর স্কুলের পুরনো সহপাঠীর কালসিটে পড়া এবং ভাঙাচোরা দেহটা বহন করে পান্থশালাটার ভেতরে নিয়ে গেলেন।

।। উনিশ ।।

ঃ অপহৃত নোটবই ঃ

অদৃশ্য মানুষ সৃষ্টির জন্য গবেষণার কাজটা যেমন অশুভ তেমনি আবার অদ্ভুত। সে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটলো এখানেই। কিন্তু যদি আপনি তার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত কিছু জানতে চান, তাহলে পোর্ট স্টোফির কাছে ইনভিজিবল ম্যান পান্থশালায় চলে যান এবং বিত্তবান পান্থশালার মালিকের সঙ্গে কথা বলুন, বেঁটে ছোট-খাটো শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ। তাঁকে কখনো কোট পরতে দেখা যায় না। আর মাথায় টুপি পরতেও দেখা যায় না।

তার কাছ থেকে কিছু খাবার কিনুন আর অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে তার রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শুনতে থাকুন। সেই সঙ্গে তার বুদ্ধির পরিচয়ও পেয়ে যাবেন। যেমন পুলিশ তার পকেট থেকে হিসাববহির্ভূত বাড়তি অনেক টাকা পেয়েছিল, সে টাকা বাজেয়াপ্ত করে দিতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু সে তার প্যাঁচালো বুদ্ধি আর কৌশলে উকিলদের, যারা সেই টাকাটা আত্মসাৎ করে দিতে চেয়েছিল, তাদের সেই প্রচেষ্টা সে তার বুদ্ধি আর কৌশলে কেমন করে বানচাল করে দিয়েছিল তারই সরস গল্প শোনাবে সে আপনাদের।

কিন্তু যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, সেই তিনটি নোটবইয়ের খবর কি, সে তখন শপথ নিয়ে আপনাকে বলবে, অদৃশ্য মানুষটি নিজেই সেগুলোর দখল নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, আর ডঃ কেম্পই তাকে অভিযুক্ত করে বলেচেন, মিঃ থমাস মার্ভেলই সেই নোটবইগুলো চুরি করেছিল এবং কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু রবিবার পান্থশালা যখন বন্ধ হয় মার্ভেল তার পার্লারে যায়, ভেতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে জানালার খড়খড়িগুলো নামিয়ে দেয়। তারপর কাপবোর্ড খুলে একটা বাক্স বার করে। সেই বাক্সটা খুলে তার ভেতর থেকে তিনটি নোটবই বার করে সে।

মার্ভেল তার আরামকেদারায় গা এলিয়ে দেয়, পাইপে অগ্নিসংযোগ করে, তিনটি নোটবইয়ের মধ্যে একটা তার হাতে মেলে ধরে। নোটবইয়ের পাতায় লেখা সাংকেতিক চিহ্নগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'X, একটা ছোট্ট সংখ্যা 2 শূন্যে ভাসে, একটা ক্রস চিহ্ন.......সাধারণ লোকের চোখে এ যেন এক অর্থহীন বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে সেটা কি চমৎকার গোপনীয়তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। একবার এই সব সাংকেতিক চিহ্নের পাঠোদ্ধার করতে পারলে, আমি তখন........ভালো কথা, সে যা করেছে, আমি কিন্তু তা করবো না, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত!'

ডঃ কেম্প এবং পুলিশ চীফ কর্ণেল অ্যাডি অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তাকে, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে। কিন্তু থমাস মার্ভেল জানে, অদৃশ্য মানুষটির সেই নোটবইগুলো কোথায়.........আর মার্ভেল যতক্ষণ না মারা যাচ্ছে কেউই সেসবের হদিশ পাবে না..........।

~ 0 ~

রহস্যময় দরজার কাহিনী

আর. এল. স্টিভেনশন্

মিস্টার আটারসনের পেশা ওকালতি। শক্তসমর্থ চেহারার মধ্যে একটা কেমন রুক্ষভাব, হাসিতেও ঢাকা পড়ে না, বরং বিহ্বল করে তোলে, অনুভূতির মধ্যে কোনো বালাই নেই। পাতলা রোগাটে, দীর্ঘদেহে বিষণ্ণতার ছাপ লক্ষণীয়। বন্ধুসুলভ সাক্ষাৎকারের সময় এবং মদের আস্বাদ পেলে তার চোখের ভাষা কেমন যেন বদলে যায়, অবশ্যই এমন কিছু যা তাঁর কথাবার্তায় কখনো প্রকাশ পায় না। তবে নৈশভোজের পর এই সব নীরব ঈঙ্গিত যা বললো, তা কিন্তু প্রায়শই তার জীবনধারায় যথেষ্ট সরবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ হেন একজন বিনয়ী মানুষের পক্ষে তাঁর বন্ধুমহলকে গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক, আর সেটাই হলো উকিলের পথ, সেই পথ ধরেই তিনি তাঁর বন্ধুত্বের বিস্তার লাভ ঘটালো। তবে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে রক্তের একটা সম্পর্ক থেকে যায়, তাঁরা সবাই তাঁর আত্মীয়, সবার সঙ্গেই একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। তাই নিঃসন্দেহে এ ধরনের আত্মিক মেলবন্ধন তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয় মিস্টার রিচার্ড এনফিল্ডকে তাঁর অনেক কাছে এনে দিয়েছে, শহরে যিনি বহু-পরিচিত। এখন এঁরা দু'জন যেন হরিহর-আত্মা, প্রায় সব ব্যাপারেই দু'জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল আছে, যা সচরাচব দেখা যায় না। রবিবারের সান্ধ্যভ্রমণে যারাই এঁদের দুজনকে এক সঙ্গে বেড়াতে দেখেছে, তাদের অভিমত হলো তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই তারা দেখতে পায় না, ওঁদের দু'জনের আবির্ভাবে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সব সময়!

একদিন ওঁরা সেই খেয়ালখুশী-ভ্রমণের পথ বেছে নিলেন বড় রাস্তার সমান্তরাল একটা রাস্তা। তখন লণ্ডন শহরটা খুবই ব্যস্ত। তবে তুলনামূলকভাবে এ রাস্তাটা ছোট এবং বেশ শান্ত। কিন্তু কাজের দিনেই এই ছোট্ট রাস্তাটাই আবার ভিড়ে ঠাসা পথযাত্রীদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কেমন মুখর হয়ে ওঠে। এখানকার প্রতিবেশিরা সবাই সম্ভ্রান্ত এবং আপ্রতিষ্ঠিত।

বাঁদিকে রাস্তাটা যেখানে পূবদিকে বেঁকে গেছে। ঠিক দুটো বাড়ির পরেই কর্ণার প্লটে একটা দোতলা বাড়ি ওঁদের দৃষ্টি এড়ায় না এই কারণে যে, বাড়িটা যেন একটা অশুভ ছায়ার আবরণে ঢাকা রয়েছে।

মিস্টার এনফিল্ড এবং উকিলবাবু রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে হাঁটছিলেন! তবে তাঁরা যখন পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে সেই অশুভ বা অভিশপ্ত বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন তখন মিস্টার এনফিল্ড তাঁর হাতের ছড়িটা তুলে সেই বাড়িটার দিকে উঁচিয়ে বললেন, 'তুমি কি কখনও ওই বাড়ির দরজাটা সম্পর্কে কখনও মন্তব্য করেছিলে?' তাঁর সঙ্গী যখন হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন, তিনি তখন আর একটা কথা বললেন, 'ওটার সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাহিনী জড়িয়ে আছে।'

'তাই কি!' কণ্ঠস্বর একটু বদল করে মিস্টার আটারসন বললেন 'তা সেটা কি শুনি?'

'ঠিক আছে, শোনো তাহলে' প্রত্যুত্তরে মিস্টার এনফিল্ড বললেন, 'আমি সেদিন, রাত প্রায় তিনটে হবে. একটা জায়গা থেকে ফিরছিলাম, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা রাত, আমার গন্তব্যস্থল এমন একটা পথ দিয়ে যেতে হবে যেখানে আক্ষরিক অর্থে কেবল কতকগুলো রাস্তার ল্যাম্পের আলো ছাড়া আর কিছুই দৃশ্য নয়, রাতের ঘনকালো অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল। রাস্তার পর রাস্তা, সেখানকার অধিবাসীরা তখন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে ছিল। অবশেষে আমার মনে হলো, একটা লোক কান পেতে কি যেন শুনছে এবং একজন পুলিশম্যানের খোঁজ করছে। হয়তো সে আমার দেখার ভুল, কিংবা মনের ভুল। আর তারপরেই আমি দুটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম ঃ একজন ছোট-খাটো বেঁটে লোক পূবমুখো রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে দুলকি চালে। আর একজন, সে হলো একটি আট কিংবা ন'বছর বয়সের মেয়ে রাস্তার বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসছিল তখন, মনে হলো সে যেন রাস্তা পার হতে চাইছিল। তারপর দেখলাম, তারা দু'জনেই এ ওর দিকে ছুটে যাচ্ছে। একই লাইনে। এর ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হলো। সে এক ভয়ঙ্কর বীভৎস ঘটনা, যা চোখে দেখা যায় না। দু'জনের সংঘর্ষে বাচ্চা মেয়েটি টাল সামলাতে না পেরে সেই বেঁটে লোকটার পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়লো। আর কি আশ্চর্য, তা দেখেও লোকটা থামলেন না, কেমন শান্ত নির্বিকার চিত্তে সবলে মেয়েটির দেহ পদদলিত করে চলে গেলো। আর মেয়েটি মাটিতে পড়ে থেকে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলো। শুনতে তেমন কিচ্ছু না হলেও কিন্তু দেখতে নারকীয় বলে মনে হলো আমার। এটা তার মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। এ যেন জঙ্গলের পশুর প্রবৃত্তিকে পেয়ে বসেছিল তাকে তখন। কিন্তু আমি তো রক্তমাংসের সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ, মানুষ নামক জানোয়ারকে ছেড়ে তো দিতে পারি না। আমি তার ভুল সংশোধন করতে চাইলাম, ছুটে গিয়ে তার শার্টের কলার চেপে ধরে তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘটনাস্থলে নিয়ে এলাম। সেখানে তখন কাতর-রত মেয়েটিকে ঘিরে ছোট-খাটো একটা ভিড় জমে গেছিলো। মেয়েটির অমন দুরাবস্থা দেখেও যার জন্য মূলত সেই দায়ী, কেমন ঠাণ্ডা মাথায় দাঁড়িয়ে রইলো লোকটা এবং নিজেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করলো না। কিন্তু একবার সে আমার দিকে তাকালো, কি কুৎসিত তার সেই চাহনি। তা দেখে আমি এতোই ভয় পেলাম যে, অমন তীব্র শীতের রাতেও আমি ঘামতে শুরু করে দিলাম। যারা সেখানে এসে জড়ো হয়েছিল, তারা সবাই মেয়েটির পরিবারের। এবং অচিরেই যে চিকিৎসক মেয়েটিকে সম্ভবত ওষুধ কিনে আনতে পাঠিয়েছিল তিনিও এসে হাজির হলেন। তবে যতোটা ভয় পাওয়া গেছলো মেয়েটির অবস্থা ততো খারাপ নয়, সবোনসের অভিমত অন্তত এই রকম, আর এই আকস্মিক ঘটনার এখানেই সমাপ্তি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপরেও একটা কৌতূহল অবশ্যই থেকে যায়। প্রথম দর্শনেই লোকটিকে আমি ঘৃণাসহকারে পরিহার করেছিলাম। তাই অনুরূপভাবে মেয়েটিকে পরিবারের ওপরেও আমার কম রাগ হয়নি, অমন একটা বাচ্চা মেয়েকে অতো রাত্রে একা একা কাউকে বাইরে যেতে দেয় নাকি! তাছাড়া সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যাপারটা আমার মনে কেমন যেন সন্দেহের উদ্রেক করে। রোগীর অসুখটা যে কি, স্বাভাবিকভবে তিনি যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, হয়তো রোগীকে পরীক্ষা না করেই নিজেই উপযাচক হয়ে মন্তব্য করে ফেললেন। এছাড়া তিনি আমাদের মতোই সব সময়েই তিনি আমার বন্দীর দিকে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে দেখছিলেন। আমি আবার এত দেখলাম যে, তাকে খুন করার জন্য সবোন্স কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি জানতাম তার মনে কি ছিল, যেমন তিনি জানতেন আমার মনে কি ছিল। তবে খুন করাটা যে প্রশ্নাতীত, তাই আমরা

পরবর্তীকালে যা ভালো বুঝলাম তাই করলাম। আমরা তখন সেই লোকটিকে বললাম, আমরা তার নামে বিশ্রী কলঙ্ক রটাবো যে, লণ্ডন শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সেটা ছড়িয়ে পড়বে, তখন তার আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠবে তার পক্ষে। উপস্থিত সবাই তখন তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, তাদের লাল চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝড়ে পড়ছিল। একজন মধ্যবয়স্ক লোকের চোখ-মুখ দেখে মনে হলো সেও খুব ভয় পেয়েছে। জানো ভাই, সত্যি কথা বলতে কি আমারও কেন জানি না মনে হয়েছিলো, লোকটি সত্যি সত্যি যেন সাক্ষাৎ শয়তান! 'আপনি যদি এই অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা থেকে টাকা রোজগার করতে চান, আমি তাহলে সম্পূর্ণ অসহায়,' লোকটি এবার সাফ জানিয়ে দিলো। 'যাই হোক, আপনাদের দাবীর অঙ্কটা কতো কি জানতে পারি?' ঠিক এমনটিই আমরা চাইছিলাম। তাই কাল বিলম্ব না করে বললাম, মেয়েটির পরিবারের জন্যে একশো পাউণ্ড দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে যাওয়াতে আমাদের কেমন যেন সন্দেহ হলো, এর মধ্যে ওর কোনো খারাপ অভিসন্ধি নেই তো? আমাদের পরবর্তী কাজ হলো টাকাটা আদায় করা। কোত্থেকে সে টাকাটা এনে দিলো জানো ভাই, ওই বাড়ির একমাত্র দরজা পথ দিয়ে? পকেট থেকে চাবি বার করে, দরজার তালা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় সে এবং কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে এলো স্বর্ণ মুদ্রায় দশ পাউণ্ড আর অবশিষ্ট নব্বই পাউণ্ডের জন্য একটা বেয়ারার চেক দিলো। চেকটা এমন একজন লোক সই করেছিল যার নাম আমি উল্লেখ করতে পারবো না। যদিও এটা আমার এই কাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট। তবে সইটা ভালোই অবশ্য যদি সেটা আসল হয়। আমি যখন লোকটাকে বললাম, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, বাস্তবে এই লোকটার কোনো অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। তখন ভোর চারটে হবে, লোকটা আবার সেই দরজা পথে বাড়ির ভেতরে চলে যায় এবং একটু পরেই আবার ফিরে এলো অন্য আর একজন লোকের সই করা চেক নিয়ে, এবার পুরো একশো পাউণ্ডের চেক। কিন্তু তাকে একেবারে সহজ স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল এবং চোখে-মুখে অবজ্ঞার ভাব। 'আপনারা মনস্থির করে অপেক্ষা করুন,' লোকটা বললো, 'ব্যাঙ্ক যতক্ষণ না খোলে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো আর আমি নিজে চেকটা ক্যাশ করিয়ে নেবো।' তাই আমরা সবাই আমার চেম্বারে স্থিতি হয়ে বসে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, মেয়েটির বাবা, আমাদের একজন বন্ধু আর আমি নিজে। পরের দিন প্রাতরাশের পর আমরা সবাই মিলে ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলাম। চেকটা আমি নিজেই ব্যাঙ্কে দিয়ে বললাম, আমার বিশ্বাস, এই চেকটা জাল। কিন্তু তা একেবারেই নয়। চেকটা আসল।

'ছিঃ ছিঃ!' মিস্টার আটারসন মন্তব্য করলেন।

'আমি দেখছি আমার মতো তোমার অনুভূতি এক,' বললেন মিস্টার এনফিল্ড। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সত্যি সত্যি তাকে নরকেই পাঠানো উচিত। আর যে ব্যক্তি এই চেকটা ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়েছিল, চেকটা তাকে ভালো বলতেই শোনা গেছে। এ এক ধরনের ব্ল্যাকমেল, আমি অন্তত তাই মনে করি। আর একেই আমি ব্ল্যাকমেল হাউজ বলি। ঘটনাচক্রে যে বাড়ির ওই একটাই দরজা। তা সত্ত্বেও জানো, এসব কিছুর ব্যাখ্যা করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।'

নেহাতই হঠাৎ মিস্টার আটারসন জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আর যে চেক ইস্যু করেছে তুমি জানো না সে সেখানে থাকে কি না?'

'খুব পরিচিত জায়গা হবে, তাই না?' প্রত্যুত্তরে এনফিল্ড বললো, কোনো এক সময় তার

ঠিকানাটা আমার চোখে পড়ে যায়, কোনো এক স্কোয়ার নাকি ওই রকমই কোনো এক জায়গায় থাকে সে।'

'আর, ওই দরজাসহ কোনো বাড়ির কোনো খোঁজ তুমি নিশ্চয়ই করোনি, তাই না?' বললেন, আটারসন।

'না, আমার রুচিতে বাধলো বলে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।' এনফিল্ডের উত্তর হলো এই রকম : 'আমার নিজস্ব একটা নিয়ম-কানুন আছে; তাছাড়া রাস্তাটা এমনি অদ্ভুত আর সন্দেহজনক ছিল যে, আমি ভাবলাম এক্ষেত্রে কম কৌতূহল প্রকাশ করাই ভালো।'

'এতো খুব ভালো নিয়ম তোমার,' বললেন উকিল ভদ্রলোক।

'কিন্তু আমি নিজে বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি,' মিস্টার এনফিল্ড বলতে থাকেন, 'মনে হয়, এ ধরনের বাড়ি খুব কমই আছে। ওই একটা দরজা ছাড়া অন্য কোনো দরজা নেই। আর ওই দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করে না কিংবা কাউকে বাইরে বেরিয়ে আসতেও দেখা যায় না। তবে একমাত্র আমার এই লোকটাকেই কেবল এই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা গেছে। দোতলায় তিনটি জানালা থাকলেও সব সময় বন্ধ থাকে ভেতর থেকে। তবে সেগুলো বেশ পরিষ্কার। আর ওই বাড়িতে একটা চিমনি আছে, আর সেই চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেছি, তাই মনে হয়, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সেখানে বসবাস করে।

মানিকজোড় আবার নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করলেন, আর তারপরেই মিস্টার আটারসন আবার বললেন, 'এনফিল্ড, সেটা তোমার বেশ ভালো নিয়ম-কানুন বলেই মনে হচ্ছে। সে যাই হোক, আমি এখন একটা কথা জানতে চাই, যে লোকটি মেয়েটিকে পদদলিত করেছিল তার নাম কি?'

'হ্যাঁ, লোকটার নাম বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই,' উত্তরে মিস্টার এনফিল্ড বললেন, 'লোকটার নাম হাইড।'

'হুঁ! তা লোকটা দেখতে কেমন?'

'সহজে তার চেহারার বর্ণনা করা যাবে না। তার সেই চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব ছিল, ঘৃণার উদ্রেক হয় এমনি। এরকম ঘৃণা বা অপছন্দ আমি আর অন্য কোনো লোককে করিনি। কিন্তুআ কেন আমি তা জানি না। কোথায় যেন তার অঙ্গ-বিকৃতি ছিল, যদিও আমি সেটা ঠিক চিহ্নিত করতে পারিনি। অথচ অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে লোকটা। তবুও সম্পূর্ণ ভাবে আমি তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবো না। তবে এ আমার স্মরণশক্তির অভাব তা নয়!'

মিস্টার আটারসন আবার খানিকটা পথ নিঃশব্দে পেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে যে চাবি ব্যবহার করেছিল এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?'

মিস্টার আটারসন তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন দেখে বিস্মিত হয়েই এনফিল্ড জোর দিয়ে বললেন, 'গত সপ্তাহে এই বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে ওই সন্দেহজনক লোকটাকে ওই দরজাটা খোলবার জন্য তালায় চাবি ঢোকাতে দেখেছিলাম। আর এর থেকেই আমি সন্দেহাতীতভাবে ধরে নিয়েছিলাম, দরজার তালার একটা চাবি তার কাছে আছে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি,' সব শুনে আটারসন বললেন, 'আমি জানি, ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। আবার দেখো, যিনি সেই চেকটা সই করেছিলেন, তার নাম আমি কেন জানতে চাইনি জানো? কারণ তাঁর নাম আমি জানি। তুমি মনে করলে আমি যা যা বলি, সব তুমি তোমার জানার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারো।'

আমার ধারণা, তুমি আমাকে সতর্ক করে দিলে,' উত্তরে আটারসন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'তুমি আমাকে প্রায়ই বলে থাকো, আমি নাকি একজন মূর্খ-পণ্ডিত, তবুও এই মূর্খের ধারণা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে বলি শোনো, লোকটার হাতে চাবিটা এখনও আছে। আমি তাকে সেই চাবিটা ব্যবহার করতে দেখেছি, সে তো তোমাকে আগেই বলেছি।'

মিস্টার আটারসন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিন্তু ফিরে আর একটা কথাটি বললেন না, তবে এনফিল্ডের উদ্দেশ্যে তার শেষ কথাগুলি ছিল এইরকম ঃ 'চেকের স্বাক্ষরকারী কে, সে নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে না দেখে আমি তোমার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তবে সেই সঙ্গে আমি আবার এও বলবো, সেদিন রাতের ঘটনা নিয়ে তুমি আলোচনা না করলেই আমি খুশী হতাম।' এনফিল্ড সে কথার জের টেনে বললেন, 'একটু আগে তোমার কাছ থেকে আর একটা উপদেশ শুনলাম, কিছু না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমার কিন্তু বড় দোষ হলো, আমি আমার জিভ সামলাতে পারি না, সব সময় বড় বেশী হালফাল কথা বলে ফেলি। কিন্তু আমি শপথ নিয়ে বলছি, এ ভুল ভবিষ্যতে আর কখন হবে না।'

'বেশ তো, আমি তাহলে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে,' মিস্টার আটারসন বললেন, 'তোমার সঙ্গে করমর্দন করছি রিচার্ড।'

।। দুই ।।

ঃ মিস্টার হাইডের সন্ধানে ঃ

সেই দিনই সন্ধ্যায় মিস্টার আটারসন বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন তাঁর ব্যাচেলর হাউসে এবং কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়েই নৈশভোজ সারতে ডাইনিং টেবিলে বসে পড়লেন। সাধারণত প্রতি রবিবার তাঁর অভ্যাস ছিল আহারের পর ফায়ার-প্লেসের সামনে তার পড়ার টেবিলে ধর্মশাস্ত্রের একটা বই রেখে পড়তে থাকেন। যতক্ষণ না পাড়ার চার্চের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজে এবং তারপরেই তিনি তাঁর বিছানায় আশ্রয় নেন কিন্তু আজ রাত্রে তিনি একটা মোমবাতি জেলে ব্যবসা-সংক্রান্ত ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর আলমারি খুলে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাম বার করলে, সেই খামের ওপর লেখাছিল ডক্টর জেকিলের উইল এবং সেটা পড়তে বসলেন। অতঃপর সে এক অদ্ভুত ধরনের উইল, যা মেনে নেওয়া যায় না। যদিও তিনি এখন এই উইলের একমাত্র এক্সিকিউটর, কিন্তু সেটার খসড়া তৈরি করতে অস্বীকার করেছিলেন এই কারণে যে, সেটার বিষয়বস্তু তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে পীড়া দিয়েছিল হ্যাঁ এই উইলে তিনি তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এবং অর্থ তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড হাইডকে দিয়ে গেছেন। তবে এই উইলের একটা উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো, ডাঃ জেকিল যদি তিন মাসের বেশী সময় অনুপস্থিত থাকেন, যার জন্যে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না, কিংবা এই তিনমাস যদি তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান ঘটে, তাহলেও এডওয়ার্ড হাইড সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ হেনরী জেকিলের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে এবং ডাঃ জেকিলের বাড়ির কয়েকজন লোককে সামান্য কিছু অর্থ প্রদান করা ছাড়া আর কারোর কাছে দায়বদ্ধতা থাকবে না তাঁর। এই উইলটা তাঁর মতো সৎ উকিলের কাছে দীর্ঘসময় ধরে চক্ষুশূল হয়েছিল। একজন আইনজ্ঞ এবং আইনের ধারক হিসেবে সেটা তাকে খুবই

ব্যথিত করে তুলেছিল। এতদিন পর্যন্ত মিস্টার হাইড ছিল তাঁর কাছে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি, কিন্তু হঠাৎ এখন তার আবির্ভাব ঘটলো তাঁর কাছে। আর এ জানার পিছনে সব থেকে হাইডের যে ঘৃণ্য চরিত্র তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো সেটা সহ্য করা তাঁর খুবই কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে।

'আমার মনে হয়, এ এক পাগলামো।' উইলটা আলমারির মধ্যে আবার তুলে রাখতে গিয়ে মিস্টার আটারসন ভাবলেন, 'আর এখন আমার আশঙ্কা? এক লজ্জাকর ব্যাপার এবং এর একটা প্রতিকার করা দরকার।' নিজের মনে এই বলে তিনি মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে গায়ে একটা কোট চাপিয়ে ক্যাভেণ্ডিশ স্কোয়ারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন, যেখানে তাঁর এক বন্ধু মহান ডাঃ লেনিয়নের বাড়ি-কাম-চেম্বার। রোগীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে সব সময়। ডাঃ জেকিলের সঠিক পরিচয় যদি কেউ জেনে থাকে সে একমাত্র লেনিয়নেরই জানার কথা,' তিনি আবার এও ভাবলেন।

ডাঃ লেনিয়নের বাবুর্চি তাঁকে চিনতো, তাই সে সোজা তাঁকে তাঁর ডাইনিংরুমে নিয়ে গেলো। ডাঃ লেনিয়ন তখন সবে মাত্র নৈশভোজ সেরে একা একা তাঁর মদের গ্লাসের সামনে বসেছিলেন। লালমুখো লেনিয়নের চুলগুলো যেন অসময়ে বড্ড বেশী সাদা হয়ে গেছে। পুরোনো বন্ধু মিস্টার আটারসনকে দেখা মাত্র চেয়ার ছেড়ে হৈ হৈ করে উঠে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দু'হাত ধরে করমর্দন করলেন। ডাঃ লেনিয়নের এমন ব্যবহারে হয়তো একটা নাটকীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধু হিসেবে তাঁর এমন উচ্ছ্বাসকে তিনি সহজাত ও স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করলেন এবং বহুদিন পরে দু'জন দু'জনের উষ্ণ করমর্দন ও সঙ্গসুখ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অতঃপর। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর মিস্টার আটারসন তাঁর কাজের কথায় এলেন যে প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ থেকে তাঁর মনটা ব্যথিত করে তুলেছিল।

'লেনিয়ন, আমার ধারণা, তুমি আর আমি হেনরী জেকিলের অত্যন্ত পুরনো বন্ধু, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিও অবশ্য সেই মনে করি,' উত্তরে ডাঃ লেনিয়ন বললেন, 'কিন্তু দশ বছরের বেশী হলো হেনরী জেকিল আমার কাছে অত্যন্ত খেয়ালি বলেই মনে হয়েছে। তখন থেকেই সে ভুল করতে শুরু করে, সে তার মনের স্থিরতা হারিয়ে ফেলে সব কিছুতেই ভুল করতে থাকে। তবু তা সত্ত্বেও পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে তার ব্যাপারে আমার আগ্রহে একটুও ঘাটতি হয়নি। যাই হোক, ইদানীং তার মধ্যে একটা শয়তানসুলভ মনোভাব আমি দেখতে পেয়েছি, যতসব অবৈজ্ঞানিক আজেবাজে কথা, পাগলের প্রলাপ যাকে বলে আর কি!'

ডাঃ লেনিয়নের কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন, মিস্টার আটারসন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার এও ভাবলেন, 'বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়ে থাকতে পারে।' তবে বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে তিনি এখানে আসেননি। মিস্টার আটারসন বললেন, 'আমি যে ব্যাপারে তোমার কাছে এসেছি সে আরও খারাপ!' এর পর তিনি তাঁর বন্ধুকে ভাববার জন্য কিছু সময় দিলেন। কিন্তু তাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি আবার নিজের থেকেই বললেন, 'আচ্ছা লেনিয়ন, তুমি আগে জেকিলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হাইডের সংস্পর্শে এসেছো?'

'হাইড?' লেনিয়ন কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'না, না, আমি কখনো তার নাম পর্যন্ত শুনিনি।'

ব্যাস, এই খবরই যথেষ্ট বলে মনে করলেন মিস্টার আটারসন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বাড়িতে

ফিরে এসেই বিছানায় তাঁর দেহটা এলিয়ে দিলেন, পরদিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘুম ভাঙলো না। নিকটবর্তী চার্চের ঘণ্টার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো তাঁর সেই সকাল ছটায়। আগের রাতের সমস্যাটা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তখনও। টুকরো টুকরো সব দৃশ্য অশুভ ছায়ার মতো তাঁর মনের আকাশে প্রতিফলিত হতে থাকলো যেমন, একটি বাচ্চা মেয়ে ডাক্তারের চেম্বার থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে, উল্টোদিক থেকে ততোধিক গতিতে আসছে বীভৎস দেখতে একটা মানব না বলে বোধহয় দানব বলাই ভালো। এর ফলে যা হবার তাই হলো, দানব ও শিশুর মধ্যে জোর সংঘর্ষ। মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লোকটা কোথায় তাকে মাটি থেকে উঠতে সাহায্য করবে, না, তা না করে উল্টে কেমন নিষ্ঠুরের মতো কচি একখানা হাতের ওপর তার ভারি বুটের পা নেমে এলো। মেয়েটির আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাশ মুখরিত হয়ে উঠলো। আশ্চর্য, কোনো সভ্য মানুষ এতো নিষ্ঠুর, নির্দয় হতে পারে? আবার পরক্ষণেই অন্য আর এর দৃশ্য তার চোখে পড়লো। হেনরী জেকিল তাঁর বিরাট সুসজ্জিত শোবার ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। বিছানার চারপাশে দামী ও সুন্দর দেখতে পর্দা টাঙানো রয়েছে। হঠাৎ একদিকের পর্দাটা সরে গেলো। আর তখনি সেখানে একখানা কুৎসিত হাত ভেসে উঠতে দেখা গেলো। সেই হাতের পাঁচটা আঙুলের সব নখগুলোই ভাঙা এবং নোংরা। আর তৃতীয় দৃশ্যটা এই রকম ঃ আধোঘুম চোখে হেনরী জেকিল বসে আছেন তাঁর ডেস্কের পিছনে। হাতে তাঁর কলম, সামনে ডেস্কের ওপরে একটা চেক বই! অদ্ভুত দেখতে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর চেয়ারের পিছনে। জেকিলের মুখে একটা অসহায়তার ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায়। সেই লোকটা যেন তাঁকে বাধ্য করছে নব্বই পাউণ্ডের একটা চেক লিখে সই করে দিতে।

সে রাতের পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চোখের সামনে ভেসে ওঠা কুৎসিত দর্শনের সেই লোকটার মুখ মিস্টার আটারসনের মনে বারবার উদয় হতে থাকলো। লোকটার মুখ যদিও মিস্টার আটারসনের পরিচিত নয়, তবুও তাঁর বিশ্বাস যে এডওয়ার্ড হাইড ছাড়া অন্য আর কেউ হতে পারে না! তাই পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মিস্টার আটারসন মনে মনে একটা ছক করে নিলেন, যে ভাবেই হোক এডওয়ার্ড হাইডকে খুঁজে বার করতেই হবে। নিজের মনেই তিনি বললেন, যে-কোনো রহস্যের প্রকৃত ঘটনার কথা জানতে পারলেই সেটা আর রহস্য থাকে না। তাই ছায়া-হাইডের জায়গায় যদি রক্ত-মাংসের আসল হাইডের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো হেনরী জেকিলের সেই অদ্ভুত উইলের প্রকৃত কারণটা আমরা জানতে পারবো। এছাড়াও আরও দুটি কারণে হাইডের মুখখানা নিজের চোখে দেখতে চাই। প্রথমত কুৎসিত দেখতে হাইডকে দেখে রিচার্ডের মনে কেন সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার উদয় হয়েছিল। দ্বিতীয়ত লোকটা শিশুদের প্রতি কেনই বা এতো নির্মম আর নিষ্ঠুর। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাই সেদিন থেকেই আইন ব্যবসায় যতো জরুরী কাজই থাকুক না কেন, মিস্টার আটারসন প্রয়োজনীয় সময় বার করে নিয়ে সেই রহস্যময় হাউসের সামনে দিয়ে রোজ একবার করে ঘুরে আসতে থাকলেন। যদি এডওয়ার্ড হাইডের একবার দেখা পেয়ে যায়, তাহলে সে তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে, তুমি যদি মিস্টার হাইড হও তবে আমিও মিস্টার সিক।

অবশেষে মিস্টার আটারসন তাঁর এতোদিনের ধৈর্যের যোগ্য পুরস্কার পেলেন। নির্মেঘ আকাশ, পরিষ্কার রাত। গায়ে লাগে মৃদুমন্দ হিমেল বাতাস। সেই রহস্যময় বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন

আটারসন। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। একটা ভয়ঙ্কর নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সেখানে। সেখানে মিস্টার আটারসন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল না। একটা দরজার আঁধারে ঘেরা ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস্টার আটারসন। সেই নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে এমন একটা পদশব্দ শুনতে পেলেন, যা অশুভ বলেই মনে হলো তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। শব্দটা অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁর মনে হলো, সেটা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। তবে কি মিস্টার হাইডের পদশব্দ? তাহলে তো তার মোকাবিলা করার জন্যে তৈরী হতে হয়! যে লোকটির জন্য তিনি এখানে অপেক্ষা করছেন যদি সেই হয়?

দরজাটার পাশে একটা আঙিনা ছিলো, মিস্টার আটারসন একটু পিছু হটলেন সেদিকে। জায়গাটা একটা আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তবু তারই মাঝে তিনি দেখলেন, একজন বেঁটেখাটো ছোট্ট মানুষ রাস্তা পার হয়ে সেই রহস্যময় বাড়ির সেই পুরনো দরজাটার সামনে এসে থামলো। তারপর সেই লোকটা তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বার করলো।

ছায়াঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এবার তিনি সেই রহস্যময় লোকটির কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে, আপনিই মিস্টার হাইড, তাই নয় কি?'

মিস্টার হাইড ভয়ে যেন কুঁকড়ে গেলেন। কিন্তু সেই ভয় ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'হ্যাঁ এটাই আমার নাম। কি চান আপনি?'

'দেখলাম আপনি এই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছেন,' উত্তরে উকিল ভদ্রলোক বললেন, 'ডাঃ জেকিলের আমি একজন পুরোনো বন্ধু, মিস্টার আটারসন, গান্ট স্ট্রীটে থাকি। আমার নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। আমি ডাঃ জেকিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ঢুকতে দেবেন!'

'কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা তো হবে না, কারণ উনি এখন বাড়িতে নেই,' এই বলে সে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলতে গিয়ে মুখ না তুলেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠলেন, 'আচ্ছা, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?'

'আপনার প্রশ্নের জবাব পরে দিচ্ছি,' জবাবে মিস্টার আটারসন বললেন, 'দয়া করে আপনার মুখটা একবার আমাকে দেখতে দেবেন?'

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত ঔদ্ধত্যের ভঙ্গীতে মিস্টার আটারসনের দিকে তাকালো। ওঁরা দুজন এর ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তবে মিস্টার আটারসনই প্রথমে মুখ খুললেন, 'ভালোই হলো, এর পর আপনার সঙ্গে যে-কোনো জায়গায় দেখা হলেই ঠিক চিনতে পারবো। তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ারও প্রয়োজন ছিল।'

'ঠিক তাই, আপনার সঙ্গে আমি একমত। আমাদের দু'জনের দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হলো। মনে হয়, আমার ঠিকানাটা আপনার জানা দরকার।' এই বলে সোহো অঞ্চলের একটা রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর বললো। এখানে একটু থেমে এডওয়ার্ড হাইড জিজ্ঞেস করলো, 'এবার বলুন, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?'

'আপনার আর আমার সঙ্গে পরিচয় আছে এমনি একজন লোকের কাছ থেকে আপনার চেহারার বর্ণনা শুনে আমি আপনাকে চিনেছি।'

'কে সে?' তীক্ষ্ণস্বরে হাইড জিজ্ঞেস করলো।

'ডাঃ জেকিল।'

'না, জেকিল আমার কথা আপনাকে বলতেই পারে না,' হাইড রাগে উত্তেজনায় ফুঁসে উঠলো। 'আপনি আমাকে মিথ্যে বলছেন, আমি কিন্তু এমন আশা করিনি আপনার কাছ থেকে। আপনি...............'

'থামুন মশাই!' ধমকে উঠলেন মিস্টার আটারসন। 'আপনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

হাইডও দমবার পাত্র নয়, খিঁচিয়ে উঠলো এবং একটা কুৎসিত হাসি হেসে মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির ভেতরে উধাও হয়ে গেলো।

মিস্টার আটারসন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হতবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর রাস্তায় নেমে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন। কিন্তু হাইডের কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। যতো ভাবেন ভুলে যাবেন, ততোই মনে পড়ে যায় তার মুখটা। তার চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে। কিন্তু তার শরীরের কথাও যে ত্রুটি বা খুঁত আছে তাও নয়, তার থেকে অন্তত কিছু বোঝবার উপায় নেই। তবুও মনে হয় তার দেহে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত বা ত্রুটি আছে, আর সেটা বেশ বড়ো রকমেরই হবে। তাছাড়া তার হাসিটা বড়ই বীভৎস, তার ব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিকর। তাকে ঠিক ভীরু বলা যায় না আবার সাহসী বলেও মনে হয় না। তবে তাই বলে এই নয় যে, কেবল এসবের জন্যই মিস্টার আটারসনের মনে হাইড সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয়নি, অন্য আরও অনেক কারণও আছে। 'হাইড লোকটা' সাক্ষাৎ শয়তান!' আঁধারে ডুবে থাকা চলার পথকে লক্ষ্য করেই যেন মিস্টার আটারসন নিজের মনে কথাগুলো বললেন, 'আশ্চর্য, এমন একজন কুৎসিত স্বভাবের জঘন্য চরিত্রের লোককেই ডাঃ হেনরী জেকিলের মতো অমন সৎ ও ভালোমানুষ তাঁর বন্ধু আর উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন?'

রাস্তার মোড়টা পেরিয়ে আটারসন যেখানে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানকার পুরনো আমলের অধিকাংশ বাড়িগুলোই এক সময় খুব সুন্দর ছিল, এখন সেগুলো আগের সেই জৌলুষ হারিয়েছে। এখন সেখানকার ভাড়াটেরা নোংরা করে যে হাল করে তুলেছে, তাতে সেগুলো হারিয়ে ফেলেছে তাদের অতীত গৌরব। তবে এ সব বাড়িগুলোর মধ্যে কেবল একটা বাড়িই তার ব্যতিক্রম, তার আভিজাত্য এখনও অটুট রয়েছে। এ বাড়িতে কোনো ভাড়াটে থাকে না, মালিক নিজেই চাকর-বাকরদের নিয়ে থাকেন। সম্পদ আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেন এ বাড়িতে ভরা থাকে সব সময়। হল ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। মিস্টার আটারসন সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলেন। একজন কাঠিন্যে ভরা মুখের খানসামা দরজা খুলে দিলো।

মিস্টার আটারসন বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা পুল, ডাঃ জেকিল কি বাড়িতে আছেন?'

'আপনি বসুন স্যার, আমি দেখছি উনি এখন কোথায়?' দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে পুল বললো, 'আসুন, আমার সঙ্গে আসুন!'

মিস্টার আটারসন গুটি গুটি পায়ে বিরাট হলঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সুসজ্জিত ঘর।

'আপনি কোন্ ঘরে বস্‌বেন স্যার?' পুল জিজ্ঞেস করলো, 'এই হলঘরে, ফায়ার প্লেসের সামনে, নাকি ডাইনিংরুমে?'

'ধন্যবাদ! আমি এ ঘরেই বসতে চাই।' উত্তরে মিস্টার আটারসন বললেন। ফায়ার প্লেসের

পাশে বসে নিজের শরীরটা গরম করে নিলেন তিনি। খুব বেশী সময় বসে থাকতে হলো না। একটু পরেই পুল ঘরে ঢুকে বললেন, 'স্যার, উনি তো বাড়িতে নেই, বেরিয়েছেন।'

মিস্টার আটারসন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বাঁচা গেলো, অন্তত এই মুহূর্তে হাইড ডাঃ জেকিলের নাগাল পাবে না। পুলের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, পুরোনো শব ব্যবচ্ছেদ ঘরের দরজা দিয়ে মিস্টার হাইডকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। ডাঃ জেকিল কি তাঁর অনুপস্থিতিতে মিস্টার হাইডকে ওই দরজা পথে বাড়ির ভেতরে ঢোকবার অনুমতি দিয়েছেন? যদি তাই হয় তোমার প্রভু দেখছি মিস্টার হাইডকে খুব বিশ্বাস করেন তাই না?'

'হ্যাঁ, ওঁর হুকুম আমরা যেন মিস্টার হাইডের কথা মতো চলি।'

'তাই বুঝি!' তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, 'কিন্তু ডাঃ জেকিলের ডিনার পার্টিতে কখনো মিস্টার হাইডকে দেখেছি বলে তো আমার মনে হয় না!'

এ কথায় পুলকে যেন একটু অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেলো। একটু ইতস্তত করে সে বললো, 'না, দেখা যাবেই বা কি করে বলুন, উনি তো বাইরে কোথাও খান না। তাছাড়া বাড়ির এ অংশে তাঁকে খুব কমই আসতে দেখা যায়।'

'ওহো, তাই বুঝি! ঠিক আছে, শুভরাত্রি পুল!'

'শুভরাত্রি মিস্টার আটারসন।'

মিস্টার আটারসন বাড়িতে ফিরে এলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। ডাঃ জেকিলের কথা ভাবতে লাগলেন। বেচারা! আমার আশঙ্কা, বোধহয় সে কোনো অসৎ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় তো দেখেছি, কতো উদ্দাম প্রভৃতির যুবক ছিল সে, তাছাড়া কোনো বেপরোয়া কাজ করতে তার বাধতো না। কিন্তু সে তো বহু যুগ আগেকার কথা। যদি তখন সে কোনো অপরাধ বা পাপ কাজ করেই থাকে, সে কথা তো এতোদিনে লোকের ভুলে যাওয়ার কথা। তাছাড়া কিশোর বা তরুণ বয়সের সব অপরাধই তো ক্ষমার যোগ্য। তবে কি তার অতীতের কোনো অপরাধ যদিই বা থেকে থাকে, কেউ কি সেটা খুঁচিয়ে বার করেছে? এর থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছে, সেই সূত্র ধরে হয়তো হাইড এখন ডাঃ জেকিলকে চাপ দিয়ে তার অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করতে চাইছে? আবার এও হতে পারে, এডওয়ার্ড হাইডের চোখ-মুখের চেহারা দেখলে মনে হয়, সে একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী, আর তার সেই অপরাধের একমাত্র সাথী হলো ডাঃ জেকিল। সাক্ষীর কখনো শেষ রাখতে নেই। তাই কি ডাঃ জেকিল এখন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। কে জানে কখন হাইড অতর্কিতে পিছন থেকে আক্রমণ করে বসে তাকে। ডাঃ জেকিলের জীবনে আর একটা বিপদের সম্ভাবনা হলো, যদি হাইড তার সেই উইলের অস্তিত্বের কথা সন্দেহ করে থাকে, তাহলে উইল মাফিক জেকিলের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠতে পারে সে। তাই যদি হয় তাহলে বন্ধুকে বাঁচানোর জন্যে আমাকে অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'কেবল জেকিল যদি আমার ওপর তার রক্ষার দায়িত্ব দেয়, আমি তাহলে হাইডের মোকাবিলা অবশ্যই করবো।' আর এভাবেই তিনি দেখলেন, তাঁর চোখের সামেন সব কিছুই স্পষ্ট, স্বচ্ছ হয়ে গেছে। হাইডের সব অশুভ চেষ্টা তিনি বিনষ্ট করে দিতে পারবেন।

।। তিন ।।

ঃ সহজ স্বাভাবিক জেকিল ঃ

এক পক্ষকাল পরে ডাঃ জেকিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ এসে গেলো। একদিন তিনি তাঁর পাঁচ-ছ'জন পুরনো বন্ধুদের একটা চমৎকার নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানালেন, বলাবাহুল্য, তাঁদের মধ্যে মিস্টার আটারসনও ছিলেন। মিস্টার আটারসনের সৌভাগ্য এই যে, মনে মনে তিনি যা আশা করছিলেন, অর্থাৎ ডাঃ জেকিলের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছিলেন, তার সুযোগ তিনি অতিসহজেই পেয়ে গেলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কম বলে পরিবেশটা অত্যন্ত ঘরোয়া ছিল। তাঁদের আলোচনার মধ্যে বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধির ছাপ ছিল। সব চেয়ে বড় কথা হলো, তাঁদের মধ্যে একটা বিশেষ সৌহার্দ ছিল। ডাঃ জেকিলের আয়োজিত সুস্বাদু এবং ভালো নেশার উদ্রেক করা পানীয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো সবাই।

এক সময় রাত গভীর হলো। একে একে প্রায় সব অভ্যাগতরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, অবশিষ্ট রইলেন কেবল মিস্টার আটারসন। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়, কারণ এমন এক ঘরোয়া পরিবেশে নৈশভোজের পর ডাঃ জেকিল এবং মিস্টার আটারসন অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে কাটিয়ে দিয়ে থাকেন। আজ তারই পুনরাবৃত্তি ঘটনা। ডাঃ জেকিলও মিস্টার আটারসনের সঙ্গ ভালোবাসেন এবং মিস্টার আটারসনও। ফায়ার প্লেসে সামনে বসলে দু'জনেরই অনেক কথা মনে পড়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেলো না। মিস্টার আটারসন বারবার ডাঃ জেকিলের দিকে সতর্কভাবে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর চেহারা, কথাবার্তা বা আচার-আচরণে কোনো পরিবর্তনই লক্ষ্য করা গেলো না। তিনি সেই আগের মতোই আছেন।

ডাঃ জেকিল এবং মিস্টার আটারসন দুজনেই স্কুলের সহপাঠী হলেও ডাঃ জেকিল কিন্তু তার চেয়ে বয়সে ছোট এবং লেখাপড়াতেও তিনি অন্যসব ছাত্রদের তুলনায় বেশী মেধাবী ছিলেন। ডাঃ জেকিলের চেহারাও ছিল দেখার মতোন, দেহ দীর্ঘ, সুগঠিত এবং রীতিমত সুপুরষ। তাঁর ব্যবহারে বদান্যতার ছাপ থাকলেও ঈষৎ চতুরতার আভাস লক্ষ্য করা যায়। সবাই চলে গেলেও মিস্টার আটারসন কেন যে থেকে গেলেন সেটা আন্দাজ করে নিয়েই বোধহয় ডাঃ জেকিল বললেন, 'আটারসন, মনে হচ্ছে তুমি যে কিছু বলতে চাও আমাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তুমি বুদ্ধিমান, ঠিকই ধরেছো। হ্যাঁ, এই মুহূর্তটির জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম জেকিল,' উত্তরে মিস্টার আটারসন বললেন, 'আমি তোমার উইলের প্রসঙ্গে কিছু জানতে এসেছি।'

কথাটা শোনা মাত্র মুহূর্তের জন্য ডাঃ জেকিলের মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। তবে তিনি স্বভাব-ধূর্ত মানুষ, তাই তাড়াতাড়ি সামনে উঠে ঠাট্টার ছলে বললেন, 'দেখো আমার প্রিয় আটারসন, তোমার দুর্ভাগ্য যে, আমার মতো একজন মক্কেল তোমার কপালে জুটেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার এই 'উইল' নিয়ে তুমি যতোটা চিন্তিত হয়েছো অন্য কেউ হয়নি। আমার বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে লেনিয়নকেও অবশ্য চিন্তিত ও বিব্রত হতে দেখেছি। তার মতে আমার এই বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা আর সিদ্ধান্তগুলো নাকি বিজ্ঞান-সম্মত নয়। তবে এর জন্য আমি লেনিয়নের দোষ দিচ্ছি না, কারণ মানুষ হিসেবে সে খুবই খাঁটি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার এ কথাও বলতে বাধ্য সে, অনেক বিষয়েই তার জ্ঞানের অভাব আছে। যেমন

অনেক কিছুই সে জানে না। কিন্তু সে এতোই একগুঁয়ে আর জেদী যে, এমন মানুষ আমি বোধহয় জীবনে কখনো দেখিনি। তাই তার সম্পর্কে আমি যতোটা হতাশ হয়েছি, বোধহয় অন্য আর কেউ আমাকে এতোটা হতাশ করেনি।'

'দেখো জেকিল, আমি তখনি তোমার এই তথাকতিত 'উইল'টা অনুমোদন করিনি।' মিস্টার আটারসন তাঁর এই কথার মধ্যে দিয়ে ডাঃ জেকিলকে বেশ রুঢ়ভাবেই বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, এছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তিনি আলোচনা করতে রাজী নন। 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?'

'আমার উইল? হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার অবশ্যই মনে আছে,' ডাঃ জেকিলের কণ্ঠস্বর বেশ তীক্ষ্ণই শোনালো। 'তুমি আমাকে সেরকমই বলেছিলে তখন।'

'ভালো কথা, আমি তোমাকে আবার সে কথাই বলবো,' মিস্টার আটারসন তাঁর কথার জের টেনে বলতে থাকেন, 'কারণ তোমার প্রিয় এই তরুণ হাইড সম্পর্কে অনেক খারাপ খারাপ কথা শুনেছি। আর তাই তো আমি তোমার কাছে—'

ডাঃ জেকিলের সুন্দর মুখখানা সেই মুহূর্তে কেমন ভয়ঙ্কর বীভৎস হয়ে গেলো, বিবর্ণ হলো ঠোঁটজোড়া এবং চোখের রঙ অস্বাভাবিক কালো হয়ে গেলো। এর ফলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এ প্রসঙ্গে আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না তোমার কাছ থেকে। 'আমার যতদূর মনে হয়, অনেক আগেই আমায় এ প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য রাজী হয়েছিলাম।'

'সে তো অনেক আগের কথা,' আটারসন জোর দিয়ে বললেন, 'কিন্তু অতি সম্প্রতি আমি যা শুনেছি তা অত্যন্ত জঘন্য। তাই আমি মনে করি তোমার তা শোনা উচিত!'

'তুমি যাই শুনে থাকো না কেন, উইলের ব্যাপারে আমি আমার মত আর বদলাতে পারবো না। তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারবে না,' উত্তরে ডাঃ জেকিল অসংলগ্নভাবে বললেন, 'আমি খুবই কষ্টে আছি। জানো আটারসন আমার অবস্থা এখন বড়ই অদ্ভুত। আর সেটা এমনি যে কখনোই কথা বলে কিংবা আলোচনা করে সংশোধন করা যাবে না।'

'শোনো জেকিল,' মিস্টার আটারসন শান্ত, সংযত কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার অবস্থা যতোই সঙ্গীন হোক না কেন, দেখো আমি ঠিক তোমাকে এর থেকে বার করে আনতে পারবো।'

'প্রিয় আটারসন, ' ডাঃ জেকিল এবার নরম গলায় বললেন, 'তোমার এ প্রস্তাব খুবই ভালো। তুমি যে যেচে আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইছো তার জন্য আমি তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অন্য কেউ বিশ্বাস করার আগেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করে নিয়েছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছো ব্যাপারটা ঠিক ততোটা খারাপ নয়! তবে তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার জন্য বলে রাখি, যখনই আমি মনে করবো মিস্টার হাইডের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসা দরকার, এক মুহূর্তও আমি দেরি করবো না তখন। যাই হোক, আমার জন্য তোমার এই দুশ্চিন্তা, তোমার ভাবনা দেখে আমি মুগ্ধ। আর এর জন্য তোমাকে আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব শেষে আমি তোমাকে আর একটা কথা বলে রাখি, আশা করি এ ব্যাপারে তোমার ভূমিকা ভালোই হবে; আর এটা একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তোমাকে আবার এও অনুরোধ করছি, এখানেই এই ব্যাপারটার ইতি টেনে দাও!'

ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে মিস্টার আটারসন বললেন, 'তুমি যে ঠিক করেছো, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' এই বলে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

'ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি, আর শেষ বারের মতো আমি আশা করি,' ডাঃ জেকিল তাঁর কথার জের টেনে বলতে থাকেন, 'তবে একটা কথা তোমাকে বোঝাতে চাই, বেচারা এই হাইডের ব্যাপারে আমার একটা বিরাট প্রত্যাশা আছে, আগ্রহ আছে। আমি জানি তুমি তাকে দেখে থাকবে, সে অন্তত তাই বলেছে। আর আমার আশঙ্কা সে তোমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছে। কিন্তু তা সত্বেও ওই যুবকটির প্রতি খুবই আগ্রহ আছে এখনও। তাই হঠাৎ যদি আমাকে এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয় তাহলে আটারসন আমাকে কথা দিতে হবে, তুমি তাকে মেনে নেবে এবং তাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। আশা করি তুমি তাই করবে। তুমি যদি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে আমার চেয়ে বেশী খুশী বোধহয় আর কেউ হবে না।

'আমি যে তাকে কখনও পছন্দ করতে পারি, এ রকম মিথ্যে ভান আমি করতে পারবো না।' মিস্টার আটারসন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন।

'আমি তা জিজ্ঞেস করিনি,' জেকিল কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলেন।

'আমি কেবল বিচার চাইছি। আমি যখন থাকবো না, আমার স্বার্থে আমি কেবল তোমাকে বলতে চাই সে যেন আইনগত ব্যাপারে তোমার সাহায্য পায়।'

আটারসন একটা অদম্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম...........।

।। চার ।।

ঃ ক্যারু খুনের কেস ঃ

প্রায় বছরখানেক অতিবাহিত তখন। আর এর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটতে দেখা গেলো না। মিঃ হাইড এবং ডাঃ জেকিল সম্পর্কে বিপদের যে আশঙ্কা আটারসন বারবার করেছিলেন তার জন্য তিনি নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করলেন। তাই ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের আগমনে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। ডাঃ জেকিলের দিক থেকে সে বছর তিনি যে ভয়ঙ্কর সংবাদের আশঙ্কা করেছিলেন, ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের কাছ থেকে পাওয়া খবর তার চাইতে কম ভয়ঙ্কর নয় বলেই মনে হলো তাঁর।

সেদিন সকালে, সবে মাত্র তখন রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, এই সময় মিঃ আটারসনের চাকর তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে খবর দিলো, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একজন গোয়েন্দা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আপনার সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এসেছেন। আমি ওঁকে নিচতলায় বসিয়ে রেখে এসেছি, সেখানেই অপেক্ষা করছেন উনি।'

উকিল ভদ্রলোক মিঃ আটারসন দ্রুত পোশাক বদল করে নিয়ে নিচে নেমে এলেন। গোয়েন্দা কি চান, সেটা জেনে নিয়ে সেই মতো ব্যবস্থা করবেন তিনি।

মিঃ আটারসন দ্রুত পায়ে পার্লারে ঢুকলেন, সেখানেই তাঁর খানসামা তার বর্ণিত গোয়েন্দাকে বসিয়ে রেখে গেছিলো। একজন পুলিশ অফিসারও সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। পরিচারিকার পোশাক পরিহিতা একজন অপরিচিতা তরুণীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন পুলিশ অফিসার। মেয়েটির

দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছিল। মেয়েটিকে দেখে মিঃ আটারসন বিস্মিত। ওদিকে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন একটা ছোট নোটবুকে কি যেন লিখছিলেন।

মিঃ আটারসনকে পার্লারে ঢুকতে দেখেই ইন্সপেক্টর নিউকোমেন বলে উঠলেন, 'মিঃ আটারসন, কিছু মনে করবেন না, সাতসকালে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যি সত্যিই দুঃখিত, তার জন্য আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' তারপর মিঃ আটারসনকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন এবং এই সঙ্গে মেয়েটির পরিচয়ও দিলেন।

তারপর ইন্সপেক্টর কাজের প্রসঙ্গে এসে বললেন, 'মিঃ আটারসন, আপনাকে একটা অশুভ সংবাদ দিচ্ছি, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটে গেছে। একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, যার সাক্ষী এই মেয়েটি, বলাবাহুল্য সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের বিশ্বাস, এই হত্যার তদন্তের কাজে আপনি পুলিশকে সাহায্য করতে পারবেন। তাই আমি চাই আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি এই নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনাটা মেয়েটির নিজের মুখ থেকেই বিস্তৃতভাবে শুনুন। সেই বীভৎস দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে মেয়েটি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। কাজেই বুঝতে পারছেন, এ অবস্থায় ওব কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অসংলগ্ন হতে পারে। তাই আপনাকে সেই অসুবিধাটুকু মেনে নিতে হবে মিঃ আটারসন।'

মিঃ আটারসন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

মেয়েটি এবার তার অশ্রু-ভেজা চোখ দুটি রুমাল দিয়ে মুছলো। তার চোখদুটি বেশ বড় এবং নীল রঙের। পাশে পুলিশ অফিসারদের দেখে মেয়েটি যতো না ভয় পাচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছিল তার চারপাশের মনোরম ও আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশ দেখে। মেয়েটি মিঃ আটারসনের একটা দামী চেয়ারে কোনোরকমে আড়ষ্টভাবে বসলেও চেয়ারের পালিশ করা ঝকঝকে হাতল দু'টোয় সাহস করে সে তার নিজের হাত দুটো পর্যন্ত রাখতে পারেনি পাছে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।

এবার ইন্সপেক্টর নিউকোমেন মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'সারা, আর কান্না নয়, এবার একটু শান্ত হয়ে মিঃ আটারসনকে তোমার কাহিনী বলে যাও।'

ইতিমধ্যে মেয়েটির চোখদুটি আবার জলে ভরে উঠেছিল। যাই হোক, কোনোরকমে সে তার কান্না থামিয়ে মুখ খুললো, 'হ্যাঁ স্যার, আমি সব কথা বলারই চেষ্টা করবো, কোনো কিছুই বাদ দেবো না।'

'হ্যাঁ, তাই করো,' ইন্সপেক্টর বললেন।

মেয়েটি তার দু'চোখ মুছে এবার বলতে শুরু করলো এই ভাবে ঃ

'আমার রোজকার কাজকর্ম যখন শেষ করলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। আমি তখন নিজের ঘরে গেলাম। আকাশে তখন নিটোল গোল একটা চাঁদ শোভা পাচ্ছিল। শ্বেত-শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোয় বাইরেটা চমৎকার দেখাচ্ছিল। জানালার সামনে বসে আমি সেই রাতের আলোকিত শোভা দেখছিলাম মুগ্ধ চোখে। দেখতে দেখতে কেমন করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো টেরই পেলাম না। রাত তখন প্রায় দুটো হবে, দেখলাম একজন বৃদ্ধ মানুষ সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। এতো রাত্রে একজন বৃদ্ধ মানুষটিকে একা একা আসতে দেখে আমি রীতিমতো অবাক চোখে

তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। চোখের পলক ফেলতে বুঝি বা ভুলে গেছিলাম এমনি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আমি তখন। বৃদ্ধ মানুষটি কোন্ দিকে যান তা দেখার জন্য আমি........।'

মেয়েটির কথার মাঝে বাধা দিয়ে মিঃ আটারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো তখন চাঁদের দিকেই তাকিয়েছিলে, একটু আগে সেরকমই তো বললে, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, আপনার অনুমান যথার্থ,' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'আমাদের বাড়ির ঠিক নিচ দিয়েই একটা নদী কলকলিয়ে বয়ে যায়। চাঁদের আলো সেই নদীর জলে পড়ায় মনে হচ্ছিল যেন তরল রুপোর একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় স্কুলে পড়বার সময় কতো না রূপকথার গল্প পড়েছিলাম। নদীর দিকে তাকিয়ে আমার তখন মনে হচ্ছিল, কই আমার চেনা নদী এতো নয়, এ যেন আমার স্বপ্নে দেখা অজানা রূপকথার কোনো নদী!'

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন একটু অধৈর্য্য হয়েই বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, অপ্রাসঙ্গিক কিছু না বলে তুমি এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলো, যার জন্য তুমি এখানে এসেছো। হ্যাঁ, তুমি দেখলে, একজন বৃদ্ধ মানুষ তোমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে এইতো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ঠিক এমনটিই আমি দেখেছিলাম,' মেয়েটি মাথা নেড়ে বললো।

'তারপর'? ইন্সপেক্টর আরও জানতে চাইলেন।

পরিচারিকার দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। কান্নার স্বরে সে আবার বলতে শুরু করলো ঃ'বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বয়স হলেও মুখখানা এখনও খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেই মুখখানা দেখেই আমার মনে হলো, তিনি খুবই দয়ালু! ওদিকে উল্টোদিক থেকে আসছিলেন মিঃ হাইড। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বৃদ্ধ মানুষটি হাসলেন।'

'মিঃ হাইড?' মিঃ আটারসন বিস্ময় ভরা চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

'হ্যাঁ স্যার, উনি মিঃ হাইডই!' উত্তরে সারা বলল।

'উনিই যে মিঃ হাইড, এ কথা তুমি কি করে জানলে?' ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

'মিঃ হাইডকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি, উত্তরে সারা বললো, 'উনি আমার মনিবের বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকেন। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন ইন্সপেক্টর, বাড়ির চাকর-চাকরানীরা মিঃ হাইডকে একেবারেই পছন্দ করে না। লোকটির বিশ্রী কদাকার চেহারার মতো তার ব্যবহারটাও খুবই খারাপ এবং কথাবার্তা অত্যন্ত কর্কশ। তাই আমরা সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।'

এখানে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন একরকম বাধ্য হয়েই মেয়েটিকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই এবার সরাসরি ঘটনাটা বলার জন্য মনস্থ করলেন। কারণ সারা তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসছিল। মূল ঘটনা থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছিল সে। তাই ইন্সপেক্টর বলতে শুরু করলেন, 'সারা জানালা পথে চোখ রাখতে গিয়ে দেখেছিল, দু'জন লোক রাস্তায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করে তার কাছ থেকে তাঁর গন্তব্যস্থানে যাবার পথের খোঁজ করছিলেন। যাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তিনি হলেন মিঃ হাইড।' এই পর্যন্ত বলে ইন্সপেক্টর সারার উদ্দেশ্যে বললেন, 'সারা, এর পর তুমি তোমার কাহিনীর পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করো।'

অনুমতি পেয়ে সারা আবার বলতে শুরু করলো, 'মিঃ হাইড বৃদ্ধ মানুষটির কথায় কোনো কর্ণপাত না করেই তিনি তাঁর হাতের বেতের ছড়িটা ঘোরাতে থাকলেন এলোমেলোভাবে। মিঃ

হাইডের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চাইছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর পথ থেকে সরে যান। শুধু কি তাই, মিঃ হাইড তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করতে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে রাস্তার ওপর পা ঠুকতে শুরু করে দিলেন।'

'মিঃ হাইডের অমন অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে বৃদ্ধ মানুষটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ভয়ে তিনি বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। তিনি যে মিঃ হাইডের অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তা স্পষ্টতই বোঝা গেলো। এদিকে আমি আমার ঘরের ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলেও আমিও কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম স্যার।'

'বৃদ্ধ মানুষটি ভয়ে কয়েক পা পিছতেই তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিঃ হাইড পাগলের মতো তাঁর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাতের লাঠিটা শূন্যে একবার তুলে তিনি সজোরে বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় আঘাত করলেন। শুধু এখানেই থেমে থাকলেন না মিঃ হাইড। এর পর তিনি বৃদ্ধ মানুষটিকে লাঠি দিয়ে যত্রতত্র পেটাতে শুরু করে দিলেন। আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তারপরেও মিঃ হাইড সেই অসহায় মানুষটিকে লাঠির ঘা মারতে থাকলেন। তারপর মিঃ হাইড ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধের সংজ্ঞাহীন দেহটির ওপরে উঠে উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করে দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারলাম না, দারুণ আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি নীরব হলো।

ইন্সপেক্টর তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সারা সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অনেক পরে, রাত তখন প্রায় দু'টো হবে জ্ঞান ফিরে পেয়ে থানায় এসে এই অস্বাভাবিক ঘটনার খবরটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, রাস্তার মাঝখানে বৃদ্ধ মানুষটির ক্ষত-বিক্ষত দেহটি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পথের ধারে নর্দমায় খুনের অস্ত্রটা অর্থাৎ আধভাঙা একটা বেতের লাঠি পড়ে থাকতে দেখা গেলো। কিন্তু লাঠির বাকি অর্ধেক অংশটা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সেই অর্ধাংশটা যে হত্যাকারী সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না।'

সব শোনার পর মিঃ আটারসন ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন। পা দুটো তাঁর অসম্ভব কাঁপছিল, তাই তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা সোফায় কাঁপা কাঁপা শরীরটা এলিয়ে দিলেন। শঙ্কিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওই নিহত ব্যক্তিটি কে জানতে পেরেছেন? উত্তরটা শোনার সময়েও তাঁর মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল যেন।

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'না, আমরা এখনও সেই নিহত বৃদ্ধ মানুষটির কোনো পরিচয় জানতে পারিনি। আর এই কারণেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমরা। বৃদ্ধের মৃতদেহ ও পোশাক পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে একটা পার্স আর একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা দরকার ছিল অর্থাৎ কার্ড কিংবা পকেট ডাইরী ইত্যাদি। সেগুলো পাওয়া গেলে তাঁর পরিচয় জানা যেতো। তবে নিহত বৃদ্ধের পকেট থেকে একটা ডাকটিকিট লাগানো শীলমোহর করা খাম পাওয়া গেছে। খামটার ওপর আপনার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। আমার অনুমান ভদ্রলোক চিঠিটা ডাকে দিতে চাইছিলেন। তাই তিনি হয়তো মিঃ হাইডের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এদিকে ''পোস্ট বক্সটা' কোথায়!'

ততক্ষণে মিঃ আটারসন নিজেকে অনেকটা সামলে নিতে পেরেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে খামের মুখটা খুলে ভেতরের চিঠিতে তাঁর উদ্দেশ্যে যা লেখা ছিল চটপট তা পড়ে বলে উঠলেন, 'এই চিঠিটার সঙ্গে বৃদ্ধের খুন হওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এই চিঠিতে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই এখনকার মতো আমার বলার কিছু নেই। এর পর আমার যা বলার মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখার পর তা বলবো।'

'তাহলে এবার পুলিশ স্টেশনে যাওয়া যাক।' ইন্সপেক্টর নিউকোমেন বলে উঠলেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের সঙ্গে মিঃ আটারসন স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গেলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে নিউকোমেন বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে মিঃ আটারসন। এই বলে তিনি তাঁকে পুলিশ স্টেশনের পিছন দিককার একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একখানা কম্বলে ঢাকা ছিল বৃদ্ধের মৃতদেহটা। পুলিশ হাজতে কয়েদীদের যে ধরনের কম্বল দেওয়া হয়, এই কম্বলটা ছিল ঠিক সেই ধরনেরই।

নিউকোমেনের নির্দেশে একজন পুলিশ কনস্টেবল মৃত বৃদ্ধের মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিতেই মিঃ আটারসন আঁতকে ওঠার মতো চমকে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি এই বৃদ্ধকে চিনি, নিহত মানুষটিকে আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি আর চিনবোই না কেন? উনি আমার মক্কেল। উনি একজন বিখ্যাত মানুষ। ওঁর নাম স্যার ড্যানভার্স ক্যারু। উনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য।'

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন শিউরে উঠলেন। 'হায় ঈশ্বর, তাহলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পার্লামেন্টে ঝড় তুলবে, সারা ইংলণ্ডে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করবে।'

'হ্যাঁ তা তো করবেই। এমন একজন বিখ্যাত মানুষ...........' ইন্সপেক্টরের কথায় সায় দিলেন মিঃ আটারসন।

ইন্সপেক্টর একটা আধভাঙা লাঠির মাথার দিকটা দেখালেন। সেটা দেখা মাত্র মিঃ আটারসন আর এক দফা চমকে উঠলেন কারণ সেই লাঠিটার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। সে আজ অনেকদিন হলো, লাঠিটা ডাঃ জেকিলকে উপহার দিয়েছিলেন তিনি। আর এটা হলো সেই লাঠিটার মাথার দিক।

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন খুশী হয়ে বললেন, 'এ আমাদের বড় সৌভাগ্য, কেমন সহজেই হত্যাকারীর নাম জানতে পেরে গেলাম আপনার কাছ থেকে। এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে তাকে খুঁজে বার করা।'

মৃত ড্যানভার্স ক্যারুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিঃ আটারসন বললেন, 'ইন্সপেক্টর আমার মনে হয়, এ ব্যাপারেও আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারবো। আমার জানা হাইড যদি সেই হাইড হয়, তাহলে আমি জোর গলায় বলতে পারি, হত্যাকারীর ঠিকানা আমি জানি। আপনাদের প্রয়োজন হলে আমি আপনাদের হাইডের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারি।'

'অবশ্যই, তার বাড়িতে আমাদের যেতেই হবে। এর জন্য আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' ইন্সপেক্টর নিউকোমেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি তাড়াতাড়ি হাইডের বাড়িতে নিয়ে চলুন আমাদের।'

।। পাঁচ ।।

ঃ মিঃ হাইড এখন কোথায়? ঃ

পুলিশ স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে মিঃ আটারসনকে খুনের অস্ত্রটা দেখালেন ইন্সপেক্টর নিউকোমেন। অস্ত্রটা ছিল একটা আধভাঙা লাঠির মাথার দিকটা। লাঠিটা দেখামাত্র মিঃ আটারসন চমকে উঠলেন, আরে, এই লাঠিটাই তো তিনি ডক্টর জেকিলকে উপহার দিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে। এখন এই উকিল ভদ্রলোক বেশ বুঝতে পারলেন, এই খুনের সঙ্গে মিঃ হাইড ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

ইন্সপেক্টর একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে মিঃ আটারসনকে নিয়ে তাতে চেপে বসলেন। মিঃ আটারসন ট্যাক্সি চালককে লণ্ডনের শহরতলীর 'সোহো' পল্লীর দিকে যাওয়ার রাস্তার নির্দেশ দিলেন, আর সেই মতো ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো সেদিকে। তাঁদের গন্তব্যস্থল এখন চোর ও ডাঃ জেকিলের খুনীর বাড়ির দিকে। লণ্ডনের যতো সব দুষ্কৃতকারী চোর ডাকাত ও খুনীদের পীঠস্থান এই অঞ্চলটা। ধীর গতিতে ট্যাক্সিটা সেই অঞ্চলে ঢুকতেই গুণ্ডা-বদমাশদের দেখে মিঃ আটারসন চমকে উঠলেন।

বছরে এই প্রথম কুয়াশা পড়লো আজ। দিনের প্রথম ঊষার আলো সেই কুয়াশা ভেদ করে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন ঝাপসা আলোর মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সিটা এক সময় এসে থামলো একটা নোংরা রাস্তার ওপর একটা ভাড়াটে বাড়ির সামনে। ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়ালেন তারা। সেই বাড়িটা আর তার আশপাশের সমস্ত ভাড়াটে বাড়িগুলোর সামনে শতচ্ছিদ্র মলিন পোশাক পরিহিত কচিকাচার ভিড়। আর নানান দেশের, নানান জাতের বয়স্ক মানুষজন রাস্তা দিয়ে চলছে-ফিরছে, তবে স্বাভাবিক ভাবে নয়, তাদের পাগুলো অসম্ভব কাঁপছিল। এ অবস্থায় তাদের দেখলে স্বভাবতই মনে হয়, তারা মদে চুর হয়ে আছে।

রাস্তার ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আটকা পড়লো রাস্তায় এক দিকে একটা 'জিন'র দোকান এবং অপর দিকে একটা সস্তা রেস্তোরাঁর ওপরে। সেখান থেকে একটা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে ঘৃণায় খদ্দেরদের পালিয়ে যাবার কথা।

ভাঙা সিঁড়ি, অসতর্ক হলেই পা পিছলে পড়ে যেতে হবে একেবারে নিচে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হলেও হাড়গোড় ভেঙে একেবারে পঙ্গু হয়ে বাকী জীবন কাটাতে হবে, আর সেটা তো মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র! তাই খুব সাবধানে মিঃ আটারসন এবং ইন্সপেক্টর সেই ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হাইডের ঘরের সামনে এসে হাজির হলেন। মিঃ আটারসনকে হতবাকের মতো দেখাচ্ছিলো।

তিনি আরও হতবাক হয়ে গেলেন মিঃ হাইডের ঘরের দরজায় তালা ঝুলে থাকতে দেখে। ভাঙা সিঁড়ি, ততোধিক জীর্ণ ঘরের অবস্থা! এসব দেখে শুনে নিজের মনে তিনি ভাবলেন, 'একি ভাগ্যের পরিহাস! ডাঃ হেনরী জেকিলের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডওয়ার্ড হাইডের থাকবার জায়গা এটা। আশ্চর্য, এক মিলিয়ন পাউণ্ডের এক চতুর্থাংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর থাকবার এমন একটা জঘন্য জায়গা?'

হাইডের এ হেন ঘরের দরজায় তালা ঝুলতে দেখে স্বভাবতই বাড়িওয়ালীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলো। বাড়িওয়ালী তিরিক্ষে মেজাজের, সে বাড়ির ভেতর থেকে রাগে গজরাতে থাকে। তবে দরজা খুলে যখন সে দেখলো দু'জন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন সে

একেবারে ভোল পাল্টিয়ে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা করলো না।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই ইন্সপেক্টরই প্রথমে সক্রিয় হয়ে উঠে বাড়িওয়ালীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এ বাড়িতে এডওয়ার্ড হাইড নামে কেউ কি থাকেন?'

বাড়িওয়ালী বেশ বয়স্কা মহিলা। কিন্তু তিনি চটপট উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক।'

'উনি এখন কোথায় বলতে পারেন?' ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

'তা তো জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, মিঃ হাইড এখন তাঁর ঘরে নেই।'

'তা তিনি কখন তাঁর ঘরে থাকেন বলতে পারেন?'

'সেরকম কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই স্যার,' উত্তরে বাড়িওয়ালী বললো, 'এই তো গতকালের কথাই ধরুন না কেন, অনেক রাত করে ঘরে ফিরলেন তিনি, কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা? একটু পরেই দরজায় আবার তালা ঝুলিয়ে চলে গেলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মিঃ হাইডের আসা-যাওয়ার ধরনটাই এই রকম। এক এক সময় তাঁর আচার-আচরণ সত্যি সত্যিই বড় অদ্ভুত লাগে।'

এত সব খবর বাড়িওয়ালী নিজের থেকে দিলেও কিন্তু ইন্সপেক্টর যখন মিঃ হাইডের ঘরটা খুলে দেবার অনুরোধ করলেন তখন সে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠে বললো, 'না স্যার, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। এরকম অন্যায় আবদার আপনি করবেন না। একজন ভাড়াটিয়ার অনুপস্থিতিতে তার ঘর আমি অন্য লোকের কাছে খুলে দিই কি করে বলুন? সেটা কি ভাড়াটিয়া আইনের পরিপন্থী নয়? না, না, মিঃ হাইডের ঘর খুলে দিয়ে এত বড় একটা অন্যায় আমি কখনোই করতে পারবো না।'

এবার মিঃ আটারসন প্রথম মুখ খুললেন। বাড়িওয়ালীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ''আপনি কি জানেন, কার সঙ্গে আপনি এতক্ষণ কথা বললেন? আর কাকেই বা মিঃ হাইডের ঘরে ঢুকতে দিতে আপত্তি করছেন? জানেন না বোধহয়, জানলে এভাবে আপত্তি করতে পারতেন না। ঠিক আছে, আমিই এই ভদ্রলোকর পরিচয় দিচ্ছি। উনি হলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর নিউকোমেন।'

ইন্সপেক্টরের পরিচয় পাওয়া মাত্র বাড়িওয়ালী চিৎকার করে উঠলো। 'আহ্! হাইড তাহলে কোনো ঝামেলায় পড়েছে? কেন, তা ওর অপরাধটা কি জানতে পারি?'

বৃদ্ধার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না ইন্সপেক্টর নিউকোমেন। বরং মিঃ আটারসনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইন্সপেক্টর মিঃ আটারসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় মন্তব্য করলেন, 'এই হাইড লোকটি দেখছি এখানেও খুব পরিচিত। সে কোনো ঝামেলায় পড়লে তার বাড়িওয়ালীও খুব খুশী হয় দেখছি।'

ওঁদের পরিচয় জানবার পর বাড়িওয়ালী এবার ওঁদের প্রতি একটু নরম মনোভাব দেখিয়ে মিঃ হাইডের ঘর খুলতে আর কোনো আপত্তি করলো না। তার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি সব সময়েই থাকে। সেই চাবি দিয়ে তার ঘরের তালা খুলে দিলো বাড়িওয়ালী অতঃপর।

ঘরের ভেতরে বোধহয় ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল এই মহাবিস্ময়। ঘরের ভেতরটা বেশ সাজানো গোছানো, মূল্যবান ও বিলাসবহুল সব আসবাবপত্রে ঠাসা। তাছাড়া ঘরের সাজসজ্জার মধ্যে একটা রুচিকর ছাপ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল

'দামাস্ক-ন্যাপকিন', রূপোর পাত্র, একটা ছোট ওয়াই ক্যাবিনেটে অনেকগুলো দামী মদের বোতল। ঘরের মেঝেটা পুরু নরম কার্পেটে মোড়ানো। দেওয়ালে বিখ্যাত চিত্রশিল্পির আঁকা টাঙানো ছবিগুলোর মধ্যে একটা সুরুচির ছাপ লক্ষণীয়। মিঃ আটারসনের মনে হলো, কার্পেট ও সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো তাঁর ড্রইংরুমে থাকলে বোধহয় ভালো মানাতো। মিঃ আটারসন অবাক হয়ে আবার ভাবলেন, ওইসব ছবিগুলো কি ডাঃ জেকিল তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন? অবশ্যই সেরকম কিছু একটা হবে। কারণ ডাঃ জেকিল নিজে একজন চিত্রসংগ্রাহক।

ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে মিঃ আটারসনের মনে হলো, সেটা সে আগে বেশ সাজানো গোছানো ছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। কিন্তু এখন সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো। ঘরের প্রতিটি জায়গায় কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খল ভাব। আলমারি আর দেরাজগুলো হাট করে খোলা। মিঃ হাইডের পোশাকগুলো ঘরের মেঝের ওপর ইতস্তত ছড়ানো। ফায়ারপ্লেসের পোড়া ছাই যে উপছে পড়চে। একবার নজর ফেললেই বোঝা যায় যে, প্রচুর কাগজপত্র পোড়ানো হয়েছে সেখানে।

সময় খুবই অল্প। বাড়িওয়ালীর কথা মতো যেকোনো সময় মিঃ হাইড আসতে পারে সেখানে। তাই সময় নষ্ট না করে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তদন্তের কাজ শুরু করে দিলেন। তল্লাসি চালাতে গিয়ে প্রথমেই ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে পাওয়া গেলো একখানা আধপোড়া চেকবই। ভাঙা লাঠিটার বাকী অংশটা পাওয়া গেলো একটা দরজার পিছনে। স্যার ড্যানভার্স ক্যারুকে যে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তার একটা অংশ এ ঘরে পাওয়া যাওয়ায় স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, হাইডই তাঁর প্রকৃত হত্যাকারী। এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশই থাকার কথা নয়।

আপাতত তদন্তের কাজ এখানেই শেষ। ইন্সপেক্টর নিউকোমেন ঘরের ভেতরটা শেষবারের মতোন ভালো করে দেখে নিয়ে আধপোড়া চেকবইটা এবং হত্যার অস্ত্র লাঠিটার অবশিষ্ট অংশটা সংগ্রহ করে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলো মিঃ আটারসনকে সঙ্গে নিয়ে।

চলে আসার সময় বৃদ্ধা বাড়িওয়ালীর মুখোমুখি হতে হলো তাঁদের। বৃদ্ধার চোখে-মুখে একরাশ কৌতূহল যেন উপচে পড়ছিল। কোনো ভূমিকা না করেই ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো ঃ 'সন্দেহজনক কিছু পেলেন নাকি?'

নিউকোমেন সংক্ষেপে উত্তর দিলেন ঃ 'তদন্ত চলছে, এখন কিছু বলা যাবে না। পোড়া চেকবই এবং লাঠির অবশিষ্টাংশ প্রাপ্তির কথা বেমালুম চেপে গেলো সে এই কারণে যে, কথাটা পাঁচকান হয়ে হাইডের কানে পৌঁছে যেতে বাধ্য। আর সে তখন তার কৃতকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সতর্ক হয়ে যাবে, গা ঢাকা দিতে পারে এমন কোনো অজ্ঞাত জায়গায় যেখানে পুলিশের নজর নাও পড়তে পারে। আর তখন সে সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে।

ঐদিকে বাড়িওয়ালী তো নাছোড়বান্দা। সে এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলো, 'মিঃ হাইডের অপরাধ নিশ্চয়ই খুবই গুরুতর। তাতে তার কঠিন সাজাই হওয়া উচিত, এমন কি ফাঁসি হলেও হতে পারে, তাই না ইনপেক্টর?'

'এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না।' ইন্সপেক্টর প্রশ্নটা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেলো আইনের দোহাই দিয়ে ঃ 'দেখুন কেসটা আদালত পর্যন্ত গড়াবে, আদালতে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগেভাগে

কোনো কিছুই বলা পুলিশি আইন বিরুদ্ধ। তাই এখন আমাদের হাতে আইনের বেড়ি পড়ানো রয়েছে, দুঃখিত আমরা কিছুই বলতে পারবো না।'

'যাই হোক, শাস্তি তো হবেই!'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই!'

'হা, হা!' ইন্সপেক্টরের শেষ কথা শুনে বাড়িওয়ালী বৃদ্ধা উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'শাস্তি তাকে পেতে হবে। হ্যাঁ পেতেই হবে!'

ইন্সপেক্টর আর মিঃ আটারসনের মধ্যে আবার দৃষ্টি বিনিময় হলো, চোখে চোখে কথা হলো তাঁদের এবং নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় বার্তা বিনিময় হলো ঃ বাড়িওয়ালীও দেখছি হাইডের বিরুদ্ধে, সে-ও তার কঠোর শাস্তি চায়! এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হাইড এখানেও কতোই না অপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সবাই তাকে ঘৃণা করে। সবাই তার পাপের শাস্তি চায়। জনমত মোটামুটি এই রকমই।

ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের ধারণার সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন মিঃ আটারসন।

'এই ধারণা থেকে এটাই এখন পরিষ্কার যে, মিঃ ক্যারুর খুনী যে মিঃ হাইড, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না,' পরিশেষে মন্তব্য করলেন মিঃ আটারসন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' ইন্সপেক্টর নিউকোমেন তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'এর পর আমাদের সেই মতো তদন্তের কাজে এগোতে হবে।'

'তাহলে অতঃ কিম্?'

'প্রথমেই আমাদের মিঃ হাইডের ব্যাঙ্কে গিয়ে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে।

পরের দিনই সকালে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন মিঃ আটারসনকে সঙ্গে নিয়ে আধপোড়া চেকবইটা যে ব্যাঙ্কের সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলেন এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। এমনিতেই সাধারণত ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী কারোর অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে অন্য কাউকে কিছু বলা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পুলিশের লোক দেখে ম্যানেজার নিয়ম অনেক শিথিল করে দিয়ে ইন্সপেক্টরের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন। ব্যাঙ্কের লেজার ঘেঁটে মিঃ হাইডের অ্যাকাউন্ট চেক করে ম্যানেজার যা জানালেন তা এই রকম ঃ

মিঃ হাইডের নামে ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউন্টে বেশ কয়েক হাজার পাউণ্ড জমা পড়ে রয়েছে।

খবরটা যেন লুফে নিলেন ইন্সপেক্টর নিউকোমেন। ব্যাঙ্কে আসার সময় এমনি একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন এবং সেই প্রত্যাশা তাঁর মিটতেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি।

তাঁর এমন খুশীর ভাব লক্ষ্য করে মিঃ আটারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, আপনি হঠাৎ অমন উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে?

'হঠাৎ তো নয়, এমনি একটা আশা করেই আমি ব্যাঙ্কে এসেছিলাম, আর সেই প্রত্যাশাটা এখানে পূরণ হতেই আমি আমার খুশীর ভাবটা আর চেপে রাখতে পারলাম না বন্ধু। আমি কি বলতে চাইছি, এবার বুঝেছেন তো?'

'না, আমি দুঃখিত, ' উত্তরে মিঃ আটারসন কেমন বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন।

'ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি,' ইন্সপেক্টর তাঁর প্রত্যাশার ব্যাখ্যা করতে দিয়ে বললেন,

'জানেন মিঃ আটারসন, এ হলো অর্থের টান। আর সেই অর্থই মিঃ হাইডের জীবনে অনর্থ এনে দেবে, দেখবেন!' কথা বলতে বলতে ইন্সপেক্টর আগের মতো আবার খুশীতে উপচে পড়লেন। 'মিঃ হাইড পালিয়ে গিয়ে বড় বোকা বানিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু এবার তাকে প্রায় হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি আমরা। পুলিশের ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে সে। তা না হলে চেকবইটা পোড়াতে যেতো না সে। আর বেতের লাঠির অবশিষ্ট অংশটাও ফেলে যেতো না। কিন্তু চেকবই বা নগদ অর্থ ছাড়া কতদিনই বা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে সে। টাকার জন্য একদিন না একদিন তাকে ব্যাঙ্কে যেতেই হবে। আমরা হাইডের ছবি চারদিকে ছড়িয়ে দেবো। সে ব্যাঙ্কে এলেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানিয়ে দেবে। তাকে বেশী সময় ধরে রাখার জন্য ব্যাঙ্ক তাকে টাকা দিতে দেরী করবে। সেই অবসরে পুলিশ ছুটে যাবে ব্যাঙ্কে। কাজেই আজ হোক কিংবা কাল হোক হাইডকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হবে।'

'কিন্তু সে যদি নিজে না এসে তার কোনো লোককে টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠায়?'

'বেশ তো, আমরা তখন তাকেই আটক করবো। কান টানলেই মাথা আসার মতো তাকে কঠোরভাবে জেরা করলে হাইডের ঠিকানা ঠিক পেয়ে যাবো।'

এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মিঃ আটারসন। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু আসল কথা কি জানেন, হাইডের ছবি আপনি পাবেন কোথা থেকে?'

ইন্সপেক্টর নিউকোমের উৎসাহে আর এক দফা ভাঁটা পড়লো। একটু নিরুৎসাহ হয়েই তিনি বললেন, 'কেন হাইডের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে?'

'কিন্তু তারা কোথায় থাকেন তা কি আপনি জানেন?'

একথা শুনে ইন্সপেক্টর একেবারেই যেন ভেঙে পড়লেন। ম্লান বিষণ্ণ মুখে তিনি বললেন, 'তাই তো, তাদের ঠিকানা তো জানা নেই।'

'তাহলে?' মিঃ আটারসন চিন্তিত ভাবে বললেন।

'তাহলে একটা উপায় খুঁজে বার করতে হয়। এই বলে ইন্সপেক্টর গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন। হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেলো। খুশীর আমেজ ফিরে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'এই মাত্র একটা উপায়ের কথা আমার মনে এলো।'

'কি, কি সে উপায় বন্ধু?' মিঃ আটাবসন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'হাইডকে যারা সামনা-সামনি দেখেছে,' ইন্সপেক্টর উত্তরে বললেন, 'এই যেমন ধরুন তার বাড়িওয়ালী, পরিচারিকা সারা, আর পাড়া-প্রতিবাসীরা, তাদের কাছ থেকে আমরা তার চেহারার মোটামুটি একটা বিবরণ পেতে পারি। আর সেই বিবরণের ওপর ভিত্তি করে আমরা একজন শিল্পীকে দিয়ে তার একটা ছবি আঁকিয়ে নিতে পারি। তারপর সেই ছবি থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলো ছবি তৈরী করিয়ে নিয়ে সম্ভাব্য নানান দিকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এভাবেও হাইডকে ধরা যেতে পারে।

মিঃ আটারসনের সন্দেহ তবু যায় না। দ্বিধাচিত্তে তিনি বললেন, 'আপনার এই প্রচেষ্টা খুবই ভালো, কিন্তু আমার মনে হয়, তাতে খুব একটা কার্যকর কিছু করা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।'

মিঃ আটারসনের এই মন্তব্যটা যেন আর এক দফা জল ঢেলে দিলো ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের সব আশা ও প্রত্যাশার ওপর। এবার তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন।

মিঃ আটারসনের আশঙ্কাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো শেষ পর্যন্ত। শিল্পীকে দিয়ে হাইডের ছবি আঁকাবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত। কারণ হাইডকে যারা খুব কাছ থেকে দেখেছে তাদের মধ্যে একজন হাইডের চেহারার যে বর্ণনা দিলো তা অন্যজনের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে কোনো মিল ছিল না। ফলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পেয়ে শিল্পী তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তবে হাইডকে যাঁরা দেখেছে তাদের প্রত্যেকের দেওয়া বর্ণনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবল একটা বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু সে মিল কোনোভাবেই শিল্পীর সাহায্যে এলো না। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে, হাইডের শরীরের মধ্যে একটা বিকলাঙ্গ ভাব আছে, কিন্তু সেটা তার শরীরে ঠিক কোথায় তা কেউই নির্দিষ্টভাবে বলতে পারলো না।

যাই হোক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারলো না, তারা খুবই তৎপর হয়ে উঠলো হাইডকে খুঁজে বার করার জন্য। ব্যাপারটা তারা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে, কারণ এ খুন সাধারণ মানুষের নয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্য স্যার ড্যানভার্স ক্যারু, তাই তারা মনে করে তাঁর খুনীকে খুঁজে বার করা অত্যন্ত জরুরী। ওদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকেও খুব চাপ আসছে। তাই তাদের এই তৎপরতা।

কিন্তু যার তল্লাশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এতো তৎপরতা, সেই এডওয়ার্ড হাইড এখন কোথায়? আশ্চর্য, সে যেন কর্পূরের মতো পৃথিবী থেকেই মিলিয়ে গেছে। তবে কি তাকে কখনো কোথাও পাওয়া যাবে না?'

এ যেন মিলিয়ন স্টার্লিং-এর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে।

।। ছয় ।।

ঃ *চিঠি* ঃ

স্যার ড্যানভার্স ক্যারু খুন হওয়ার দিন মিঃ আটারসন তাঁর মক্কেলের এই আকস্মিক মৃত্যুজনিত পুলিশি ঝামেলা এড়িয়ে ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের খপ্পর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। তারপর থানা থেকে বেরিয়ে একজন আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি এবার রওনা দিলেন ডাঃ জেকিলের বাড়ির দিকে।

ডাঃ জেকিলের খাস পরিচালক পুল দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালো মিঃ আটারসনকে। পুল তাঁকে বাড়ির ভেতর দিয়ে প্রথমে নিয়ে গেলো কোর্ট-ইয়ার্ডে। তারপর কোর্ট-ইয়ার্ড পেরিয়ে মিঃ আটারসনকে নিয়ে গেলো ল্যাবরেটরিতে। এই প্রথম এখানে আসা। ডাঃ জেকিলের বাড়ির এই অংশে এর আগে তিনি কখনও আসেন নি।

মিঃ আটারসন অতীতের বেশ কয়েক বছর আগে ফিরে গেলেন, তাঁর মনে পড়লো, ডাঃ জেকিলের আগে এই বাড়ির মালিক ছিলেন একজন শল্য চিকিৎসক। তিনি তাঁর নিজের ল্যাবরেটরি এবং শবব্যবচ্ছেদ ঘরে ছাত্রদের পড়াতেন। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। আর এই কোর্ট-ইয়ার্ডটায় তখন ফুলের বাগান ছিল, চমৎক্যর সব ফুল ফুটত সেখানে। কিন্তু ক্রমাগত

অযত্ন ও অবহেলার দরুন সেদিনের সেই সাজানো বাগান আজ শুকিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। সুন্দর সুন্দর ফুলের জায়গায় আজ শুধুই আগাছায় ভরে গেছে।

পুলকে অনুসরণ করে মিঃ আটারসন ডাঃ জেকিলের ল্যাবরেটরি এবং শবব্যবচ্ছেদের ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের ভেতরে অনেকগুলো টেবিল চোখে পড়লো, টেবিলের ওপরে বহু ধরনের রাসায়নিক সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখা গেলো। মিঃ আটারসন চোখে অদম্য কৌতূহল নিয়ে তাকালেন সেগুলোর দিকে।

একসময় মিঃ আটারসনের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঘরের মেঝের ওপরে। হরেক রকমের বাক্স খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্যাকিং করবার খড় ছড়িয়ে রয়েছে ল্যাবরেটরির চারদিকে। একটা ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি রয়েছে ল্যাবরেটরির মধ্যে। সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই ডাঃ জেকিলের অফিস ঘর।

সেই সিঁড়ি বেয়ে মিঃ আটারসনকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এসে অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় মৃদু টোকা মারলো পুল। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো পুল, তাকে অনুসরণ করলেন মিঃ আটারসন।

অফিস ঘরটা বিরাট বড়। ঘরে তিনটে লোহার জানালা, জানালার ওপর পুরু হয়ে ধুলো ময়লা জমে রয়েছে, মনে হলো দীর্ঘদিন পরিষ্কার করা হয়নি। জানালাগুলো কোর্ট-ইয়ার্ড মুখী। একজন চিকিৎসকের যেসব আসবাবপত্র থাকা দরকার সব কিছুই রয়েছে। তফাৎ শুধু ঘরের এক কোণায় রয়েছে প্রমাণ সাইজের বিরাট একটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আয়না।

লণ্ডন শহর ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল তখনো। তাই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই ঘরে আলো জ্বালতে হয়েছে। ফায়ারপ্লেসের আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা চেয়ারে শীতের দাপটে কুঁকড়ে রয়েছেন ডাঃ জেকিল। তাঁর সারা মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তাঁর সেই বিষণ্ণ মুখে ক্লান্তি ও অসুস্থতার ছাপ স্পষ্ট। অনেকদিন পরে দেখা হলেও বন্ধু আটারসনকে দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। তবে বন্ধুর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে স্বাগত জানাতে ভুললেন না। কিন্তু তার পরেও তিনি কেমন যেন নীরব রয়ে গেলেন, একটা কথাও বললেন না। তাঁর এই ভাব দেখে মনে হলো কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ডাঃ জেকিলের।

একটু পরে পুল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মিঃ আটারসন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আজকের জোর খবরটা তুমি শুনেছো?'

ডাঃ জেকিল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন। তারপর ধীরে ধীরে ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'সেই কোন্ ভোর সকাল থেকেই তো দেখছি খবরের কাগজ বিক্রেতারা 'জোর খবর, জোর খবর, চিৎকার করতে করতে প্রভাতী সংবাদপত্র বিক্রী করে চলেছে।'

আটারসন এবার কাজের প্রসঙ্গ তুলতে উদ্যত হলেন। এর পর তিনি যেসব কথা বলতে শুরু করলেন সেসব একজন উকিলের কথা, বন্ধুর কথা নয়। তিনি বললেন, 'জেকিল, তুমি আমার বন্ধু নয়, একজন মক্কেলও বটে। ঠিক তেমনি স্যার ড্যানভার্স ক্যারুও আমার বন্ধু ছিলেন। এখানে একটু থেমে তিনি এবার ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি কি করতে যাচ্ছি, সেটা আমার নিজের আগে জানা দরকার। হাইডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশা করি তাঁর মতো লোককে লুকিয়ে রাখার মতো পাগলামি তুমি করবে না!'

'কেন, এ কথা তুমি বলছো কেন বন্ধু?'

'তুমি আমাকে বন্ধু বলেই যখন মনে করো, তাহলে আমিও বলছি, হাইড তোমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু আমার মক্কেল নিহত স্যার ক্যারুর পরম শত্রু একজন সে। আমাদের সন্দেহ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য সে দায়ী! হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, হাইডই তাঁর খুনী। তাই এ হেন অপরাধীকে আইনের বাইরে ছেড়ে রেখে দেওয়া যায় না, তার বিচার হওয়া উচিত, বিচারে তার কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অচিরেই ভেঙে পড়তে পারে। এর পরেও কি তুমি তার সঙ্গে................'

'শোনো বন্ধু আটারসন, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, এর পর থেকে আমি আর কখনো ওই অপরাধী হাইডের মুখ দর্শন করবো না।' ডাঃ জেকিল রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমাকে বলে রাখি, এতোসব কথা শোনার পর তার সঙ্গে আমি আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম। আমার এ কথা তুমি ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিতে পারো।'

এক সঙ্গে এতো কথা বলতে গিয়ে ডাঃ জেকিল হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। একটু সময় দম নিয়ে তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং এবার আটারসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো হাত নেড়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাকে জানিয়ে রাখি, হাইড যথেষ্ট নিরাপদেই আছে। তার নিরাপত্তার জন্য আমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজনই হবে না। আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি, আমি তাকে যতোটা চিনি, তুমি বোধহয় ঠিক ততো চেনো না তাকে। আর এও শুনে রাখো আটারসন, হাইডের কণ্ঠস্বর, কেউ কখনো আর শুনতে পাবে না।'

আটারসন গম্ভীরভাবে তন্ময় হয়ে ডাঃ জেকিলের কথা শুনতে থাকেন। জেকিল কথা বলছিলেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মতোন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ আদৌ মনঃপুতঃ হলো না আটারসনের। চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি দেখছি হাইড সম্পর্কে খুবই নিশ্চিত, এ সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের পরিধির চ্যালেঞ্জ আমি করবো না। আশা করি তোমার এই ধারণাটা যেন ঠিক হয়। তোমার ভালো হোক, সব সময়েই আমি তাই চাইবো। কিন্তু বন্ধু, আমার ভাবনা এখন অন্য রকম। আর সেটার জন্যই আমার মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করছে।'

'কি রকম?' ডাঃ জেকিল কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

'যেমন, এই ধরো, হাইড যদি ধরা পড়ে আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, তোমার বন্ধু বলে কোনোরকম দুর্বলতা দেখাবে না। নরহত্যার অপরাধে তাকে অবশ্যই আদালতে অভিযুক্ত করা হবে। বিচারের সময় সরকার পক্ষের উকিলের কঠোর জেরার মুখে তোমার নামটা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। আর তা হলে সেটা হবে এক মহাকেলেঙ্কারীর ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, সেদিকটার কথা আমিও ভেবেছি বৈকি! তবে আমিও স্থির নিশ্চিত, হাইড কখনোই ধরা পড়তে পারে না। কারণ সে এমন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে সেখানে পুলিশ শত চেষ্টা করলেও তাকে ধরা দূরে থাক তার সেই লুকোনার জায়গার হদিশও করতে পারবে না।'

'এতোটা নিশ্চিত হলে তুমি কি করে জেকিল?'

'সে এক রহস্যই বটে, কিন্তু সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না।'

এখানে একটু থেমে দম নিলেন ডাঃ জেকিল। ধীর শান্ত গলায় বললো, 'তবুও একটা ব্যাপার আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, তাই এ ব্যাপারে আমি তোমার উপদেশ চাই। আজ সকালে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। এই চিঠিটা পুলিশকে দেবো কিনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

এতক্ষণ আটারসনের চোখে-মুখে একটা ব্যর্থতার গ্লানি ফুটেছিল, যেখানে আশার কোনো চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ডাঃ জেকিল হঠাৎ একটা চিঠির প্রসঙ্গ তুলতেই একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর, চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, এক অজানা কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেলো। কোনো ভূমিকা না করে তিনি সেই সম্ভাবনার কথাটা যাচাই করে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, চিঠিটা কি হাইডের কাছ থেকে এসেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডাঃ জেকিল।

'ওহো, তাই বুঝি তুমি আশঙ্কা করছো', আটারসন মন্তব্য করলেন, 'এই চিঠিটা পুলিশ হাতে পেলে তাকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করতে পারবে, তাই কি?'

'না, একেবারেই নয়, আমার কোনো আশঙ্কাই নেই এখন আর। কারণ হাইডের কি হলো না হলো তা নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার ভাবনা এখন কেবল আমার সুনাম আর নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে। তাই চিঠিটা আমি তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি। চিঠিটার ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনো রকম উপদেশ দেবো না। তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমার বিশ্বাস, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই কাজ করবে।'

ডাঃ জেকিলের শেষ কথাটা যেন একটু ভাবিয়ে তুললো মিঃ আটারসনকে। গভীরভাবে চিন্তা করলেন তিনি। জেকিলকে কেমন যেন একটু স্বার্থপর বলে মনে হলো তার, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারটাই প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটাকেই বেশী গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি। তবে বন্ধু যে নিজের স্বার্থের দিকটা নিয়ে চিন্তিত, এটা বুঝতে পেরেও মিঃ আটারসন একটু আশ্বস্ত হলেন। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই বললেন, 'ঠিক আছে, চিঠিটা আগে দেখি, তারপর...............'

চিঠিটা মিঃ আটারসনের হাতে তুলে দিলেন ডাঃ জেকিল। চিঠিটা অদ্ভুত টানা টানা অক্ষরে লেখা। এবং চিঠির শেষ প্রান্তে এডয়ার্ড হাইডের নাম স্বাক্ষরিত। আটারসন দ্রুত চিঠিটার ওপর চোখ বোলাতে থাকেন। চিঠির বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত। যাঁর বদান্যতায় তিনি অযোগ্য হয়েও তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার তুলনাই হয় না। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে সেই ডাঃ জেকিলের চিন্তার কোনো কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। হাইড আবার এও জানিয়েছে, তার পালাবার ব্যাপারে সে এমন একটা নিশ্চিত উপায় বার করেছে যার ওপর সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে।

চিঠিটা পড়ার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন ফেললেন মিঃ আটারসন। তাঁর আরও মনে হলো, এ চিঠিটা কোনোভাবেই কোনো ব্ল্যাকমেলারের বলে মনে হচ্ছে না। চিঠিটার সমর্থনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'চিঠির খামটা কোথায়?'

'ওটার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছি। তুমি হয়তো ভাবছো, চিঠিটা কোথা থেকে পোস্ট করা হয়েছে খামটা পেলে জানতে পারতে কিন্তু খামটার ওপরে কোনো ডাকঘরের ছাপ ছিল না। কারণ একজন পত্রবাহক হাতে করে চিঠিটা দিয়ে গেছিলো।

'ঠিক আছে, চিঠিটা আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি,' মিঃ আটারসন বললেন, 'এটার ব্যাপারে কি করা যায় পরে ভাবনা-চিন্তা করে ঠিক করবো।'

'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডাঃ জেকিল বললেন, 'তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তাই আমার ব্যাপারে সবরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। আমি নিজের ওপর আমার আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, তাই তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। তোমার যে-কোনো সিদ্ধান্তই আমি সর্বান্তকরণে মেনে নেবো।'

মিঃ আটারসন হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা জেকিল, একটা সত্যি কথা বলবে আমাকে? তোমার উইলের শর্তগুলো হাইডের নির্দেশেই লেখা হয়েছিল, তাই না? এছাড়াও তোমার অনুপস্থিতি আর হঠাৎ অন্তর্ধানের ক্ষেত্রে তোমায় বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে হাইডই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তাই না?'

কেউ কারোর গোপন কথা ফাঁস করে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ডাঃ জেকিলের মুখখানা কেমন কালো বিবর্ণ হয়ে গেলো, তাঁর শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে থাকলো। ডাঃ জেকিলের অবস্থা দেখে মনে হলো, যে-কোনো মুহূর্তে তিনি হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারেন। যাই হোক, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আটারসনের কথায় সায় দিলেন তিনি।

'আমি জানতাম, আমি ঠিক এমনটিই আন্দাজ করেছিলাম বন্ধু,' মিঃ আটারসন ধীরে ধীরে বললেন, 'জেকিল তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, তুমি হয়তো জানো না, তুমি যাকে একদিন বিশ্বাস করে তোমার সব গোপন কথা মন খুলে বলেছিলে, তোমার সেই বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারেনি। রাখবার কোনো ইচ্ছেও ছিল না তার কখনো। আসলে হাইড তোমাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকদিন থেকে মতলব করছিল। তুমি খুব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছো।'

'প্রাণে বাঁচার চেয়েও বোধহয় আরও অনেক বেশী কিছু হবে,' ডাঃ জেকিল আবেগ কম্পিত গলায় বললেন, 'ওই যে একটা প্রবাদ আছে, 'ঠেকে শেখা!' হ্যাঁ, আমার সেরকম শিক্ষাই হয়েছে। হায় ঈশ্বর, কি শিক্ষাটাই না আমার হয়েছে, জানো বন্ধু! এর পর থেকে কাউকে আর বিশ্বাস করা যাবে না।'

'মানুষ চেনা সহজ নয় বন্ধু!' মিঃ আটারসন উসকিয়ে দিলেন তাঁকে।

ডাঃ জেকিল দুঃসহ এক যন্ত্রণায় যেন ভেঙে পড়লেন। লজ্জায়, দুঃখে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

ডাঃ জেকিল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটু শান্ত হতেই মিঃ আটারসন তাঁর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন। তারপর এক সময় বন্ধু জেকিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। যে পথ দিয়ে তিনি ডাঃ জেকিলের বাড়িতে ঢুকেছিলেন সেই পথ ধরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। ল্যাবরেটরির দরজা দিয়ে বেরবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না। তবে এই পথে যাওয়ার একটা সুবিধে হলো, তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় গিয়ে হাজির হওয়া যেতো। কিন্তু সে পথ তাঁকে পরিহার করতে হলো এই কারণে যে, এই পথের ব্যাপারে তাঁর মনে একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিল তার মনে। তাঁর মনে পড়ে গেলো, এই দরজার বাইরেই তাঁকে রাতের পর রাত অপেক্ষা করতে হয়েছে, যদি একবার হাইডের দর্শন পাওয়া যায়ঞ

উকিলবাবুর জন্যই বুঝি অপেক্ষা করছিল পুল। মিঃ আটারসনকে দেখেই পালিশ করা দরজাটা খুলে দিয়ে সে বললো, 'শুভ অপরাহ্ন মিঃ আটারসন।'

মিঃ আটারসন ফিরে তাকালেন পুলের দিকে। তারপর কি মনে করে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আজ এক পত্রবাহক নাকি একটা চিঠি ডেলিভারি দিয়ে গেছে এ বাড়িতে। তা সেই পত্রবাহক লোকটি দেখতে কেমন ছিল বলতে পারো?

পুল ঘনঘন মাথা নেড়ে এমন অবাক বিস্ময়ে মিঃ আটারসনের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে, কথাটা যেন সে এই প্রথম শুনছে। তাই সে বলে উঠল, 'না স্যার, মনে হয় কোথায় নে একটা ভুল হয়ে গেছে আপনার। এ বাড়ির চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের দায়িত্ব আমার ওপরে ন্যাস্ত। তাই স্পষ্টই আমার মনে আছে, আজকের ডাকে কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই কেবল কয়েকটা চিঠি এসেছে। কিন্তু কোনো পত্রবাহক তো কোনো চিঠি নিয়ে আসেনি আজ!'

মিঃ আটারসন ততোকি অবাক হয়েই আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ঠিক খেয়াল আছে তো, কোনো পত্রবাহক আজ এখানে চিঠি দিয়ে যায়নি?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার স্মরণশক্তি প্রখর, তাই আমি জোর দিয়েই বলছি, আমি ঠিক জানি যে, আজ কোনো পত্রবাহকই এ বাড়িতে কোনো চিঠি দিয়ে যায়নি।

।। সাত ।।

ধীরে ধীরে বাড়ির পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে মিঃ আটারসনের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এখন হাইডের চিঠিটাকে কেন্দ্র করে, যা সে ডাঃ জেকিলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। আবর্তিত তার সব ভাবনাই এলোমেলো, কোনো কিছুতেই স্থির হতে পারছে না যেন। পুল বলেছে, চিঠিটা সে সদর দরজা পথ দিয়ে কারোর হাত থেকে নেয়নি। তাই এর থেকে মনে হয় যে, চিঠিটা নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরির দরজা পথেই ডাঃ জেকিলের বাড়িতে এসে থাকবে। আবার এমনও হতে পারে, হয়তো ডাঃ জেকিলের ঘরে বসেই চিঠিটা লিখেছিল হাইড। আর এই ল্যাবরেটরির দিক দিয়ে জেকিলের বাড়িতে ঢোকার দরজায় চাবি তো হাইডের কাছেই থাকার কথা।

তাই স্বভাবতই মিঃ আটারসনের মনে এখন কেবল একটাই চিন্তা, হাইডের চিঠিটা কতোটাই বা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? তাই তাঁর পরবর্তী ভাবনা এখন চিঠিটার ব্যাপারে সত্য উদঘাটনের জন্য এমন একজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত যে কিনা তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন হবে। আর এই বিশ্বাসী লোকটি হলো তাঁর, নিজের অফিসেরই প্রধান করণিক মিঃ গেস্ট, সে তাঁর বহু দিনের পুরানো কর্মচারী।

বাড়ি ফিরে এসে মিঃ আটারসন তাঁর পরিচারককে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে বলে ভালো সুস্বাদু পুরনো মদ সংগ্রহ করার জন্য তাঁর ভূগর্ভস্থ ঘরে নেমে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর স্টাডিরুমে উঠে এসে মিঃ গেস্টকে আহ্বান করলেন এবং বোতল থেকে দুটি গ্লাসে মদ ঢাললেন।

মিঃ গেস্ট শুধু একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নন, তিনি একজন হস্তলিপি বিশারদও বটে। বিভিন্ন ব্যক্তির হাতের লেখা বিশ্লেষণ করেই তাঁর অবসর সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যায় তা সে খেয়ালই করতে পারে না। মিঃ আটারসন মনস্থির করে রেখেছিলেন, হাইডের লেখা চিঠিটা তিনি

মিঃ গেস্টকে দেখাবেন। হয়তো সে পত্রলেখকের হাতের লেখা পরীক্ষা করে দেখে কোনো মন্তব্য করতে পারে, যা থেকে হাইডকে সন্ধান করার কাজে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।

আটারসনের এই প্রধান করণিক ডাঃ জেকিলকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। এডওয়ার্ড হাইডের যে ডাঃ জেকিলের বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের স্বাধীনতা ছিল, সে সম্পর্কে তার সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না, কারণ এই ব্যাপারটা তার বেশ ভালো করেই জানা ছিল। মিঃ আটারসন তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে শুধু নয় যে কোনো ব্যাপারে গেস্টের কাছে কোনা কিছুই গোপন করতেন না এই কারণে যে, তিনি জানতেন কোনো গোপন কথাই সে বাইরে কারোর কাছে প্রকাশ করবে না। অসতর্কভাবে বাইরের কোনো লোকের কাছে গল্পগুজব করার মতো লোকই সে নয়। এই সব কারণেই গেস্টের ওপর আটারসনের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

বয়সের দিক থেকে মিঃ আটারসনের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট মিঃ গেস্ট। কিন্তু সে তার নিয়োগকর্তার মতোই শান্ত প্রকৃতির মানুষ, আর সব সময়েই বুঝি বা একটু শুকনো শুকনো ভাব দেখায় তাকে এবং মিঃ আটারসনের মতোই ভালো স্বাদের মদ পছন্দ করে। এখন ওঁরা দু'জনে মুখোমুখি বসে যে যার সুস্বাদু মদের গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকলেন।

মদ গলাধঃকরণ করার আগে গেস্ট তার জিভ দিয়ে বুলিয়ে নেয়। হাসলো সে। গেস্টই প্রথমে কথা বলতে শুরু করলো। 'আই মিঃ আটারসন স্যার, এর আগে আপনার ভূগর্ভস্থ ঘরে অনেক ভালো ভালো সুস্বাদু মদ পান করেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজকের মতো এতো ভালো মদ বোধহয় আগে কখনো পান করিনি।'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে আমিও একমত গেস্ট।' সুস্বাদু মদের শেষ আস্বাদ নেওয়ার পর আটারসন মাথা নেড়ে বললেন, 'সত্যি, এতো ভালো মদ পান করার সৌভাগ্য এর আগে কখনো আমার হয়নি।'

এবার এক অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এলো তাদের দু'জনের মধ্যে। এক সময় সেই নীরবতা মিঃ আটারসনই ভঙ্গ করলেন। 'স্যার ড্যানভার্সের ব্যাপারে তোমার কাছে আমি এসেছি গেস্ট, ওঁর ব্যাপারটা তুমি তো জানো দুঃখের বিশেষ করে আমাদের কাছে বড় দুঃখের এবং আমাদের পার্লামেন্টের কাছেও!'

'হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন, এই অপরাধের এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখে জনসাধারণ প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে গেছে। আশ্চর্য লোকটা খুন করলো কিনা পার্লামেন্টের একজন সম্মানিত সদস্যকে? এ খুন যে করেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে একজন বদ্ধ উন্মাদ!'

মিঃ আটারসন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিস্ফিসিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা নথিপত্র দেখাবো, সেটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পর তোমার মতামত জানিও। সেটা একটা চিঠি খুনীর নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি। এই চিঠিটা নিয়ে আমি কি যে করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'তাই কি! খুনীর নিজের হাতে লেখা চিঠি বলছেন! ওঃ তাহলে সেটা দারুন কৌতুহলোদ্দীপক বলে মনে হচ্ছে।' মিঃ গেস্ট-এর কণ্ঠে উত্তেজনার স্বর ধ্বনিত হলো। চিঠির কথা শুনে নাকি সুন্দর মদ পান করার দরুন এটা তার প্রতিক্রিয়া কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কে জানে করণিকের কাছ

দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছিল। মেয়েটিকে দেখে মিঃ আটারসন বিস্মিত। ওদিকে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন একটা ছোট নোটবুকে কি যেন লিখছিলেন।

মিঃ আটারসনকে পার্লারে ঢুকতে দেখেই ইন্সপেক্টর নিউকোমেন বলে উঠলেন, 'মিঃ আটারসন, কিছু মনে করবেন না, সাতসকালে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যি সত্যিই দুঃখিত, তার জন্য আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' তারপর মিঃ আটারসনকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন এবং এই সঙ্গে মেয়েটির পরিচয়ও দিলেন।

তারপর ইন্সপেক্টর কাজের প্রসঙ্গে এসে বললেন, 'মিঃ আটারসন, আপনাকে একটা অশুভ সংবাদ দিচ্ছি, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটে গেছে। একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, যার সাক্ষী এই মেয়েটি, বলাবাহুল্য সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের বিশ্বাস. এই হত্যার তদন্তের কাজে আপনি পুলিশকে সাহায্য করতে পারবেন। তাই আমি চাই আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি এই নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনাটা মেয়েটির নিজের মুখ থেকেই বিস্তৃতভাবে শুনুন। সেই বীভৎস দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে মেয়েটি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। কাজেই বুঝতে পারছেন, এ অবস্থায় ওর কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অসংলগ্ন হতে পারে। তাই আপনাকে সেই অসুবিধাটুকু মেনে নিতে হবে মিঃ আটারসন।'

মিঃ আটারসন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

মেয়েটি এবার তার অশ্রু ভেজা চোখ দুটি রুমাল দিয়ে মুছলো। তার চোখদুটি বেশ বড় এবং নীল রঙের। পাশে পুলিশ অফিসারদের দেখে মেয়েটি যতো না ভয় পাচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছিল তার চারপাশের মনোরম ও আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশ দেখে। মেয়েটি মিঃ আটারসনের একটা দামী চেয়ারে কোনোরকমে আড়ষ্টভাবে বসলেও চেয়ারের পালিশ করা ঝকঝকে হাতল দু'টোয় সাহস করে সে তার নিজের হাত দুটো পর্যন্ত রাখতে পারেনি পাছে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।

এবার ইন্সপেক্টর নিউকোমেন মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'সারা, আর কান্না নয়, এবার একটু শান্ত হয়ে মিঃ আটারসনকে তোমার কাহিনী বলে যাও।'

ইতিমধ্যে মেয়েটির চোখদুটি আবার জলে ভরে উঠেছিল। যাই হোক, কোনোরকমে সে তার কান্না থামিয়ে মুখ খুললো, 'হ্যাঁ স্যার, আমি সব কথা বলারই চেষ্টা করবো, কোনো কিছুই বাদ দেবো না।'

'হ্যাঁ, তাই করো,' ইন্সপেক্টর বললেন।

মেয়েটি তার দু'চোখ মুছে এবার বলতে শুরু করলো এই ভাবে ঃ

'আমার রোজকার কাজকর্ম যখন শেষ করলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। আমি তখন নিজের ঘরে গেলাম। আকাশে তখন নিটোল গোল একটা চাঁদ শোভা পাচ্ছিল। শ্বেত-শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোয় বাইরেটা চমৎকার দেখাচ্ছিল। জানালার সামনে বসে আমি সেই রাতের আলোকিত শোভা দেখছিলাম মুগ্ধ চোখে। দেখতে দেখতে কেমন করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো টেরই পেলাম না। রাত তখন প্রায় দুটো হবে, দেখলাম একজন বৃদ্ধ মানুষ সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। এতো রাত্রে একজন বৃদ্ধ মানুষটিকে একা একা আসতে দেখে আমি রীতিমতো অবাক চোখে

তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। চোখের পলক ফেলতে বুঝি বা ভুলে গেছিলাম এমনি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আমি তখন। বৃদ্ধ মানুষটি কোন্ দিকে যান তা দেখার জন্য আমি........।'

মেয়েটির কথার মাঝে বাধা দিয়ে মিঃ আটারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো তখন চাঁদের দিকেই তাকিয়েছিলে, একটু আগে সেরকমই তো বললে, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, আপনার অনুমান যথার্থ,' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'আমাদের বাড়ির ঠিক নিচ দিয়েই একটা নদী কলকলিয়ে বয়ে যায়। চাঁদের আলো সেই নদীর জলে পড়ায় মনে হচ্ছিল যেন তরল রুপোর একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় স্কুলে পড়বার সময় কতো না রূপকথার গল্প পড়েছিলাম। নদীর দিকে তাকিয়ে আমার তখন মনে হচ্ছিল, কই আমার চেনা নদী এতো নয়, এ যেন আমার স্বপ্নে দেখা অজানা রূপকথার কোনো নদী!'

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন একটু অধৈর্য্য হয়েই বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, অপ্রাসঙ্গিক কিছু না বলে তুমি এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলো, যার জন্য তুমি এখানে এসেছো। হ্যাঁ, তুমি দেখলে, একজন বৃদ্ধ মানুষ তোমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে এইতো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ঠিক এমনটিই আমি দেখেছিলাম,' মেয়েটি মাথা নেড়ে বললো।

'তারপর'? ইন্সপেক্টর আরও জানতে চাইলেন।

পরিচারিকার দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। কান্নার স্বরে সে আবার বলতে শুরু করলো ঃ'বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বয়স হলেও মুখখানা এখনও খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেই মুখখানা দেখেই আমার মনে হলো, তিনি খুবই দয়ালু। ওদিকে উল্টোদিক থেকে আসছিলেন মিঃ হাইড। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বৃদ্ধ মানুষটি হাসলেন।'

'মিঃ হাইড?' মিঃ আটারসন বিস্ময় ভরা চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

'হ্যাঁ স্যার, উনি মিঃ হাইডই!' উত্তরে সারা বলল।

'উনিই যে মিঃ হাইড, এ কথা তুমি কি করে জানলে?' ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

'মিঃ হাইডকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি, উত্তরে সারা বললো, 'উনি আমার মনিবের বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকেন। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন ইন্সপেক্টর, বাড়ির চাকর-চাকরানীরা মিঃ হাইডকে একেবারেই পছন্দ করে না। লোকটির বিশ্রী কদাকার চেহারার মতো তার ব্যবহারটাও খুবই খারাপ এবং কথাবার্তা অত্যন্ত কর্কশ। তাই আমরা সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।'

এখানে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন একরকম বাধ্য হয়েই মেয়েটিকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই এবার সরাসরি ঘটনাটা বলার জন্য মনস্থ করলেন। কারণ সারা তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসছিল। মূল ঘটনা থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছিল সে। তাই ইন্সপেক্টর বলতে শুরু করলেন, 'সারা জানালা পথে চোখ রাখতে গিয়ে দেখেছিল, দু'জন লোক রাস্তায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করে তার কাছ থেকে তাঁর গন্তব্যস্থানে যাবার পথের খোঁজ করছিলেন। যাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তিনি হলেন মিঃ হাইড।' এই পর্যন্ত বলে ইন্সপেক্টর সারার উদ্দেশ্যে বললেন, 'সারা, এর পর তুমি তোমার কাহিনীর পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করো।'

অনুমতি পেয়ে সারা আবার বলতে শুরু করলো, 'মিঃ হাইড বৃদ্ধ মানুষটির কথায় কোনো কর্ণপাত না করেই তিনি তাঁর হাতের বেতের ছড়িটা ঘোরাতে থাকলেন এলোমেলোভাবে। মিঃ

হাইডের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চাইছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর পথ থেকে সরে যান। শুধু কি তাই, মিঃ হাইড তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করতে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে রাস্তার ওপর পা ঠুকতে শুরু করে দিলেন।'

'মিঃ হাইডের অমন অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে বৃদ্ধ মানুষটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ভয়ে তিনি বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। তিনি যে মিঃ হাইডের অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তা স্পষ্টতই বোঝা গেলো। এদিকে আমি আমার ঘরের ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলেও আমিও কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম স্যার।'

'বৃদ্ধ মানুষটি ভয়ে কয়েক পা পিছতেই তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিঃ হাইড পাগলের মতো তাঁর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাতের লাঠিটা শূন্যে একবার তুলে তিনি সজোরে বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় আঘাত করলেন। শুধু এখানেই থেমে থাকলেন না মিঃ হাইড। এর পর তিনি বৃদ্ধ মানুষটিকে লাঠি দিয়ে যত্রতত্র পেটাতে শুরু করে দিলেন। আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তারপরেও মিঃ হাইড সেই অসহায় মানুষটিকে লাঠির ঘা মারতে থাকলেন। তারপর মিঃ হাইড ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধের সংজ্ঞাহীন দেহটির ওপরে উঠে উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করে দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারলাম না, দারুণ আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি নীরব হলো।

ইন্সপেক্টর তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সারা সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অনেক পরে, রাত তখন প্রায় দু'টো হবে জ্ঞান ফিরে পেয়ে থানায় এসে এই অস্বাভাবিক ঘটনার খবরটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, রাস্তার মাঝখানে বৃদ্ধ মানুষটির ক্ষত-বিক্ষত দেহটি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পথের ধারে নর্দমায় খুনের অস্ত্রটা অর্থাৎ আধভাঙা একটা বেতের লাঠি পড়ে থাকতে দেখা গেলো। কিন্তু লাঠির বাকি অর্ধেক অংশটা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সেই অর্ধাংশটা যে হত্যাকারী সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না।'

সব শোনার পর মিঃ আটারসন ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন। পা দুটো তাঁর অসম্ভব কাঁপছিল, তাই তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা সোফায় কাঁপা কাঁপা শরীরটা এলিয়ে দিলেন। শঙ্কিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওই নিছক ব্যক্তিটি কে জানতে পেরেছেন? উত্তরটা শোনার সময়েও তাঁর মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল যেন।

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'না, আমরা এখনও সেই নিহত বৃদ্ধ মানুষটির কোনো পরিচয় জানতে পারিনি। আর এই কারণেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমরা। বৃদ্ধের মৃতদেহ ও পোশাক পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে একটা পার্স আর একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা দরকার ছিল অর্থাৎ কার্ড কিংবা পকেট ডাইরী ইত্যদি। সেগুলো পাওয়া গেলে তাঁর পরিচয় জানা যেতো। তবে নিহত বৃদ্ধের পকেট থেকে একটা ডাকটিকিট লাগানো শীলমোহর করা খাম পাওয়া গেছে। খামটার ওপর আপনার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। আমার অনুমান ভদ্রলোক চিঠিটা ডাকে দিতে চাইছিলেন। তাই তিনি হয়তো মিঃ হাইডের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এদিকে ''পোস্ট বক্সটা' কোথায়!'

ততক্ষণে মিঃ আটারসন নিজেকে অনেকটা সামলে নিতে পেরেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে খামের মুখটা খুলে ভেতরের চিঠিতে তাঁর উদ্দেশ্যে যা লেখা ছিল চটপট তা পড়ে বলে উঠলেন, 'এই চিঠিটার সঙ্গে বৃদ্ধের খুন হওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এই চিঠিতে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই এখনকার মতো আমার বলার কিছু নেই। এর পর আমার যা বলার মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখার পর তা বলবো।'

'তাহলে এবার পুলিশ স্টেশনে যাওয়া যাক।' ইন্সপেক্টর নিউকোমেন বলে উঠলেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের সঙ্গে মিঃ আটারসন স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গেলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে নিউকোমেন বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে মিঃ আটারসন। এই বলে তিনি তাঁকে পুলিশ স্টেশনের পিছন দিককার একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একখানা কম্বলে ঢাকা ছিল বৃদ্ধের মৃতদেহটা। পুলিশ হাজতে কয়েদীদের যে ধরনের কম্বল দেওয়া হয়, এই কম্বলটা ছিল ঠিক সেই ধরনেরই।

নিউকোমেনের নির্দেশে একজন পুলিশ কনস্টেবল মৃত বৃদ্ধের মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিতেই মিঃ আটারসন আঁতকে ওঠার মতো চমকে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি এই বৃদ্ধকে চিনি, নিহত মানুষটিকে আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি আর চিনবোই না কেন? উনি আমার মক্কেল। উনি একজন বিখ্যাত মানুষ। ওঁর নাম স্যার ড্যানভার্স ক্যারু। উনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য।'

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন শিউরে উঠলেন। 'হায় ঈশ্বর, তাহলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পার্লামেন্টে ঝড় তুলবে, সারা ইংলণ্ডে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করবে।'

'হ্যাঁ তা তো করবেই। এমন একজন বিখ্যাত মানুষ...........' ইন্সপেক্টরের কথায় সায় দিলেন মিঃ আটারসন।

ইন্সপেক্টর একটা আধভাঙা লাঠির মাথার দিকটা দেখালেন। সেটা দেখা মাত্র মিঃ আটারসন আর এক দফা চমকে উঠলেন কারণ সেই লাঠিটার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। সে আজ অনেকদিন হলো, লাঠিটা ডাঃ জেকিলকে উপহার দিয়েছিলেন তিনি। আর এটা হলো সেই লাঠিটার মাথার দিক।

ইন্সপেক্টর নিউকোমেন খুশী হয়ে বললেন, 'এ আমাদের বড় সৌভাগ্য, কেমন সহজেই হত্যাকারীর নাম জানতে পেরে গেলাম আপনার কাছ থেকে। এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে তাকে খুঁজে বার করা।'

মৃত ড্যানভার্স ক্যারুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিঃ আটারসন বললেন, 'ইন্সপেক্টর আমার মনে হয়, এ ব্যাপারেও আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারবো। আমার জানা হাইড যদি সেই হাইড হয়, তাহলে আমি জোর গলায় বলতে পারি, হত্যাকারীর ঠিকানা আমি জানি। আপনাদের প্রয়োজন হলে আমি আপনাদের হাইডের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারি।'

'অবশ্যই, তার বাড়িতে আমাদের যেতেই হবে। এর জন্য আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' ইন্সপেক্টর নিউকোমেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি তাড়াতাড়ি হাইডের বাড়িতে নিয়ে চলুন আমাদের।'

।। পাঁচ।।

ঃ মিঃ হাইড এখন কোথায়? ঃ

পুলিশ স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে মিঃ আটারসনকে খুনের অস্ত্রটা দেখালেন ইন্সপেক্টর নিউকোমেন। অস্ত্রটা ছিল একটা আধভাঙা লাঠির মাথার দিকটা। লাঠিটা দেখামাত্র মিঃ আটারসন চমকে উঠলেন, আরে, এই লাঠিটাই তো তিনি ডক্টর জেকিলকে উপহার দিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে। এখন এই উকিল ভদ্রলোক বেশ বুঝতে পারলেন, এই খুনের সঙ্গে মিঃ হাইড ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

ইন্সপেক্টর একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে মিঃ আটারসনকে নিয়ে তাতে চেপে বসলেন। মিঃ আটারসন ট্যাক্সি চালককে লণ্ডনের শহরতলীর 'সোহো' পল্লীর দিকে যাওয়ার রাস্তার নির্দেশ দিলেন, আর সেই মতো ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো সেদিকে। তাঁদের গন্তব্যস্থল এখন চোর ও ডাঃ জেকিলের খুনীর বাড়ির দিকে। লণ্ডনের যতো সব দুষ্কৃতকারী চোর ডাকাত ও খুনীদের পীঠস্থান এই অঞ্চলটা। ধীর গতিতে ট্যাক্সিটা সেই অঞ্চলে ঢুকতেই গুণ্ডা-বদমাশদের দেখে মিঃ আটারসন চমকে উঠলেন।

বছরে এই প্রথম কুয়াশা পড়লো আজ। দিনের প্রথম ঊষার আলো সেই কুয়াশা ভেদ করে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন ঝাপসা আলোর মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সিটা এক সময় এসে থামলো একটা নোংরা রাস্তার ওপর একটা ভাড়াটে বাড়ির সামনে। ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়ালেন তারা। সেই বাড়িটা আর তার আশপাশের সমস্ত ভাড়াটে বাড়িগুলোর সামনে শতচ্ছিদ্র মলিন পোশাক পরিহিত কচিকাচার ভিড়। আর নানান দেশের, নানান জাতের বয়স্ক মানুষজন রাস্তা দিয়ে চলছে-ফিরছে, তবে স্বাভাবিক ভাবে নয়, তাদের পাগুলো অসম্ভব কাঁপছিল। এ অবস্থায় তাদের দেখলে স্বভাবতই মনে হয়, তারা মদে চুর হয়ে আছে।

রাস্তার ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আটকা পড়লো রাস্তায় এক দিকে একটা 'জিন'র দোকান এবং অপর দিকে একটা সস্তা রেস্তোরাঁর ওপরে। সেখান থেকে একটা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে ঘৃণায় খদ্দেরদের পালিয়ে যাবার কথা।

ভাঙা সিঁড়ি, অসতর্ক হলেই পা পিছলে পড়ে যেতে হবে একেবারে নিচে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হলেও হাড়গোড় ভেঙে একেবারে পঙ্গু হয়ে বাকী জীবন কাটাতে হবে, আর সেটা তো মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। তাই খুব সাবধানে মিঃ আটারসন এবং ইন্সপেক্টর সেই ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হাইডের ঘরের সামনে এসে হাজির হলেন। মিঃ আটারসনকে হতবাকের মতো দেখাচ্ছিলো।

তিনি আরও হতবাক হয়ে গেলেন মিঃ হাইডের ঘরের দরজায় তালা ঝুলে থাকতে দেখে। ভাঙা সিঁড়ি, ততোধিক জীর্ণ ঘরের অবস্থা! এসব দেখে শুনে নিজের মনে তিনি ভাবলেন, 'একি ভাগ্যের পরিহাস! ডাঃ হেনরী জেকিলের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডওয়ার্ড হাইডের থাকবার জায়গা এটা। আশ্চর্য, এক মিলিয়ন পাউণ্ডের এক চতুর্থাংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর থাকবার এমন একটা জঘন্য জায়গা?'

হাইডের এ হেন ঘরের দরজায় তালা ঝুলতে দেখে স্বভাবতই বাড়িওয়ালীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলো। বাড়িওয়ালী তিরিক্ষে মেজাজের, সে বাড়ির ভেতর থেকে রাগে গজরাতে থাকে। তবে দরজা খুলে যখন সে দেখলো দু'জন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন সে

একেবারে ভোল পাল্টিয়ে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা করলো না।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই ইন্সপেক্টরই প্রথমে সক্রিয় হয়ে উঠে বাড়িওয়ালীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এ বাড়িতে এডওয়ার্ড হাইড নামে কেউ কি থাকেন?'

বাড়িওয়ালী বেশ বয়স্কা মহিলা। কিন্তু তিনি চটপট উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক।'

'উনি এখন কোথায় বলতে পারেন?' ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

'তা তো জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, মিঃ হাইড এখন তাঁর ঘরে নেই।'

'তা তিনি কখন তাঁর ঘরে থাকেন বলতে পারেন?'

'সেরকম কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই স্যার,' উত্তরে বাড়িওয়ালী বললো, 'এই তো গতকালের কথাই ধরুন না কেন, অনেক রাত করে ঘরে ফিরলেন তিনি, কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা? একটু পরেই দরজায় আবার তালা ঝুলিয়ে চলে গেলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মিঃ হাইডের আসা-যাওয়ার ধরনটাই এই রকম। এক এক সময় তাঁর আচার-আচরণ সত্যি সত্যিই বড় অদ্ভুত লাগে।'

এত সব খবর বাড়িওয়ালী নিজের থেকে দিলেও কিন্তু ইন্সপেক্টর যখন মিঃ হাইডের ঘরটা খুলে দেবার অনুরোধ করলেন তখন সে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠে বললো, 'না স্যার, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। এরকম অন্যায় আবদার আপনি করবেন না। একজন ভাড়াটিয়ার অনুপস্থিতিতে তার ঘর আমি অন্য লোকের কাছে খুলে দিই কি করে বলুন? সেটা কি ভাড়াটিয়া আইনের পরিপন্থী নয়? না, না, মিঃ হাইডের ঘর খুলে দিয়ে এত বড় একটা অন্যায় আমি কখনোই করতে পারবো না।'

এবার মিঃ আটারসন প্রথম মুখ খুললেন। বাড়িওয়ালীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ''আপনি কি জানেন, কার সঙ্গে আপনি এতক্ষণ কথা বললেন? আর কাকেই বা মিঃ হাইডের ঘরে ঢুকতে দিতে আপত্তি করছেন? জানেন না বোধহয়, জানলে এভাবে আপত্তি করতে পারতেন না। ঠিক আছে, আমিই এই ভদ্রলোকর পরিচয় দিচ্ছি। উনি হলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর নিউকোমেন।'

ইন্সপেক্টরের পরিচয় পাওয়া মাত্র বাড়িওয়ালী চিৎকার করে উঠলো। 'আহ্! হাইড তাহলে কোনো ঝামেলায় পড়েছে? কেন, তা ওর অপরাধটা কি জানতে পারি?'

বৃদ্ধার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না ইন্সপেক্টর নিউকোমেন। বরং মিঃ আটারসনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইন্সপেক্টর মিঃ আটারসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় মন্তব্য করলেন, 'এই হাইড লোকটি দেখছি এখানেও খুব পরিচিত। সে কোনো ঝামেলায় পড়লে তার বাড়িওয়ালীও খুব খুশী হয় দেখছি।'

ওঁদের পরিচয় জানবার পর বাড়িওয়ালী এবার ওঁদের প্রতি একটু নরম মনোভাব দেখিয়ে মিঃ হাইডের ঘর খুলতে আর কোনো আপত্তি করলো না। তার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি সব সময়েই থাকে। সেই চাবি দিয়ে তার ঘরের তালা খুলে দিলো বাড়িওয়ালী অতঃপর।

ঘরের ভেতরে বোধহয় ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল এই মহাবিস্ময়। ঘরের ভেতরটা বেশ সাজানো গোছানো, মূল্যবান ও বিলাসবহুল সব আসবাবপত্রে ঠাসা। তাছাড়া ঘরের সাজসজ্জার মধ্যে একটা রুচিকর ছাপ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল

'দামাস্ক-ন্যাপকিন', রূপোর পাত্র, একটা ছোট ওয়াইন ক্যাবিনেটে অনেকগুলো দামী মদের বোতল। ঘরের মেঝেটা পুরু নরম কার্পেটে মোড়ানো। দেওয়ালে বিখ্যাত চিত্রশিল্পির আঁকা টাঙানো ছবিগুলোর মধ্যে একটা সুরুচির ছাপ লক্ষণীয়। মিঃ আটারসনের মনে হলো, কার্পেট ও সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো তাঁর ড্রইংরুমে থাকলে বোধহয় ভালো মানাতো। মিঃ আটারসন অবাক হয়ে আবার ভাবলেন, ওইসব ছবিগুলো কি ডাঃ জেকিল তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন? অবশ্যই সেরকম কিছু একটা হবে। কারণ ডাঃ জেকিল নিজে একজন চিত্রসংগ্রাহক।

ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে মিঃ আটারসনের মনে হলো, সেটা সে আগে বেশ সাজানো গোছানো ছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। কিন্তু এখন সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো। ঘরের প্রতিটি জায়গায় কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খল ভাব। আলমারি আর দেরাজগুলো হাট করে খোলা। মিঃ হাইডের পোশাকগুলো ঘরের মেঝের ওপর ইতস্তত ছড়ানো। ফায়ারপ্লেসের পোড়া ছাই যে উপছে পড়চে। একবার নজর ফেললেই বোঝা যায় যে, প্রচুর কাগজপত্র পোড়ানো হয়েছে সেখানে।

সময় খুবই অল্প। বাড়িওয়ালীর কথা মতো যেকোনো সময় মিঃ হাইড আসতে পারে সেখানে। তাই সময় নষ্ট না করে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তদন্তের কাজ শুরু করে দিলেন। তল্লাসি চালাতে গিয়ে প্রথমেই ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে পাওয়া গেলো একখানা আধপোড়া চেকবই। ভাঙা লাঠিটার বাকী অংশটা পাওয়া গেলো একটা দরজার পিছনে। স্যার ড্যানভার্স ক্যারুকে যে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তার একটা অংশ এ ঘরে পাওয়া যাওয়ায় স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, হাইডই তাঁর প্রকৃত হত্যাকারী। এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশই থাকার কথা নয়।

আপাতত তদন্তের কাজ এখানেই শেষ। ইন্সপেক্টর নিউকোমেন ঘরের ভেতরটা শেষবারের মতোন ভালো করে দেখে নিয়ে আধপোড়া চেকবইটা এবং হত্যার অস্ত্র লাঠিটার অবশিষ্ট অংশটা সংগ্রহ করে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলো মিঃ আটারসনকে সঙ্গে নিয়ে।

চলে আসার সময় বৃদ্ধা বাড়িওয়ালীর মুখোমুখি হতে হলো তাঁদের। বৃদ্ধার চোখে-মুখে একরাশ কৌতূহল যেন উপচে পড়ছিল। কোনো ভূমিকা না করেই ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো ঃ 'সন্দেহজনক কিছু পেলেন নাকি?'

নিউকোমেন সংক্ষেপে উত্তর দিলেন ঃ 'তদন্ত চলছে, এখন কিছু বলা যাবে না। পোড়া চেকবই এবং লাঠির অবশিষ্টাংশ প্রাপ্তির কথা বেমালুম চেপে গেলো সে এই কারণে যে, কথাটা পাঁচকান হয়ে হাইডের কানে পৌঁছে যেতে বাধ্য। আর সে তখন তার কৃতকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সতর্ক হয়ে যাবে, গা ঢাকা দিতে পারে এমন কোনো অজ্ঞাত জায়গায় যেখানে পুলিশের নজর নাও পড়তে পারে। আর তখন সে সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে।

ঐদিকে বাড়িওয়ালী তো নাছোড়বান্দা। সে এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলো, 'মিঃ হাইডের অপরাধ নিশ্চয়ই খুবই গুরুতর। তাতে তার কঠিন সাজাই হওয়া উচিত, এমন কি ফাঁসি হলেও হতে পারে, তাই না ইনপেক্টর?'

'এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না।' ইন্সপেক্টর প্রশ্নটা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেলো আইনের দোহাই দিয়ে ঃ 'দেখুন কেসটা আদালত পর্যন্ত গড়াবে, আদালতে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগেভাগে

কোনো কিছুই বলা পুলিশি আইন বিরুদ্ধ। তাই এখন আমাদের হাতে আইনের বেড়ি পড়ানো রয়েছে, দুঃখিত আমরা কিছুই বলতে পারবো না।'

'যাই হোক, শাস্তি তো হবেই!'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই!'

'হা, হা!' ইন্সপেক্টরের শেষ কথা শুনে বাড়িওয়ালী বৃদ্ধা উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'শাস্তি তাকে পেতে হবে। হ্যাঁ পেতেই হবে!'

ইন্সপেক্টর আর মিঃ আটারসনের মধ্যে আবার দৃষ্টি বিনিময় হলো, চোখে চোখে কথা হলো তাঁদের এবং নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় বার্তা বিনিময় হলো ঃ বাড়িওয়ালীও দেখছি হাইডের বিরুদ্ধে, সে-ও তার কঠোর শাস্তি চায়! এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হাইড এখানেও কতোই না অপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সবাই তাকে ঘৃণা করে। সবাই তার পাপের শাস্তি চায়। জনমত মোটামুটি এই রকমই।

ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের ধারণার সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন মিঃ আটারসন।

'এই ধারণা থেকে এটাই এখন পরিষ্কার যে, মিঃ ক্যারুর খুনী যে মিঃ হাইড, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না,' পরিশেষে মন্তব্য করলেন মিঃ আটারসন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' ইন্সপেক্টর নিউকোমেন তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'এর পর আমাদের সেই মতো তদন্তের কাজে এগোতে হবে।'

'তাহলে অতঃ কিম্?'

'প্রথমেই আমাদের মিঃ হাইডের ব্যাঙ্কে গিয়ে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে।

পরের দিনই সকালে ইন্সপেক্টর নিউকোমেন মিঃ আটারসনকে সঙ্গে নিয়ে আধপোড়া চেকবইটা যে ব্যাঙ্কের সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলেন এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। এমনিতেই সাধারণত ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী কারোর অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে অন্য কাউকে কিছু বলা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পুলিশের লোক দেখে ম্যানেজার নিয়ম অনেক শিথিল করে দিয়ে ইন্সপেক্টরের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন। ব্যাঙ্কের লেজার ঘেঁটে মিঃ হাইডের অ্যাকাউন্ট চেক করে ম্যানেজার যা জানালেন তা এই রকম ঃ

মিঃ হাইডের নামে ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউন্টে বেশ কয়েক হাজার পাউণ্ড জমা পড়ে রয়েছে।

খবরটা যেন লুফে নিলেন ইন্সপেক্টর নিউকোমেন। ব্যাঙ্কে আসার সময় এমনি একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন এবং সেই প্রত্যাশা তাঁর মিটতেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি।

তাঁর এমন খুশীর ভাব লক্ষ্য করে মিঃ আটারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, আপনি হঠাৎ অমন উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে?

'হঠাৎ তো নয়, এমনি একটা আশা করেই আমি ব্যাঙ্কে এসেছিলাম, আর সেই প্রত্যাশাট এখানে পূরণ হতেই আমি আমার খুশীর ভাবটা আর চেপে রাখতে পারলাম না বন্ধু। আমি কি বলতে চাইছি, এবার বুঝেছেন তো?'

'না, আমি দুঃখিত, ' উত্তরে মিঃ আটারসন কেমন বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন।

'ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি,' ইন্সপেক্টর তাঁর প্রত্যাশার ব্যাখ্যা করতে দিয়ে বললেন,

'জানেন মিঃ আটারসন, এ হলো অর্থের টান। আর সেই অর্থই মিঃ হাইডের জীবনে অনর্থ এনে দেবে, দেখবেন!' কথা বলতে বলতে ইন্সপেক্টর আগের মতো আবার খুশীতে উপচে পড়লেন। 'মিঃ হাইড পালিয়ে গিয়ে বড় বোকা বানিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু এবার তাকে প্রায় হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি আমরা। পুলিশের ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে সে। তা না হলে চেকবইটা পোড়াতে যেতো না সে। আর বেতের লাঠির অবশিষ্ট অংশটাও ফেলে যেতো না। কিন্তু চেকবই বা নগদ অর্থ ছাড়া কতদিনই বা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে সে। টাকার জন্য একদিন না একদিন তাকে ব্যাঙ্কে যেতেই হবে। আমরা হাইডের ছবি চারদিকে ছড়িয়ে দেবো। সে ব্যাঙ্কে এলেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানিয়ে দেবে। তাকে বেশী সময় ধরে রাখার জন্য ব্যাঙ্ক তাকে টাকা দিতে দেরী করবে। সেই অবসরে পুলিশ ছুটে যাবে ব্যাঙ্কে। কাজেই আজ হোক কিংবা কাল হোক হাইডকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হবে।'

'কিন্তু সে যদি নিজে না এসে তার কোনো লোককে টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠায়?'

'বেশ তো, আমরা তখন তাকেই আটক করবো। কান টানলেই মাথা আসার মতো তাকে কঠোরভাবে জেরা করলে হাইডের ঠিকানা ঠিক পেয়ে যাবো।'

এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মিঃ আটারসন। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু আসল কথা কি জানেন, হাইডের ছবি আপনি পাবেন কোথা থেকে?'

ইন্সপেক্টর নিউকোমের উৎসাহে আর এক দফা ভাঁটা পড়লো। একটু নিরুৎসাহ হয়েই তিনি বললেন, 'কেন হাইডের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে?'

'কিন্তু তারা কোথায় থাকেন তা কি আপনি জানেন?'

একথা শুনে ইন্সপেক্টর একেবারেই যেন ভেঙে পড়লেন। ম্লান বিষণ্ন মুখে তিনি বললেন, 'তাই তো, তাদের ঠিকানা তো জানা নেই।'

'তাহলে?' মিঃ আটারসন চিন্তিত ভাবে বললেন।

'তাহলে একটা উপায় খুঁজে বার করতে হয়। এই বলে ইন্সপেক্টর গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন। হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেলো। খুশীর আমেজ ফিরে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'এই মাত্র একটা উপায়ের কথা আমার মনে এলো।'

'কি, কি সে উপায় বন্ধু?' মিঃ আটারসন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'হাইডকে যারা সামনা-সামনি দেখেছে,' ইন্সপেক্টর উত্তরে বললেন, 'এই যেমন ধরুন তার বাড়িওয়ালী, পরিচারিকা সারা, আর পাড়া-প্রতিবাসীরা, তাদের কাছ থেকে আমরা তার চেহারার মোটামুটি একটা বিবরণ পেতে পারি। আর সেই বিবরণের ওপর ভিত্তি করে আমরা একজন শিল্পীকে দিয়ে তার একটা ছবি আঁকিয়ে নিতে পারি। তারপর সেই ছবি থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলো ছবি তৈরী করিয়ে নিয়ে সম্ভাব্য নানান দিকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এভাবেও হাইডকে ধরা যেতে পারে।

মিঃ আটারসনের সন্দেহ তবু যায় না। দ্বিধাচিত্তে তিনি বললেন, 'আপনার এই প্রচেষ্টা খুবই ভালো, কিন্তু আমার মনে হয়, তাতে খুব একটা কার্যকর কিছু করা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।'

মিঃ আটারসনের এই মন্তব্যটা যেন আর এক দফা জল ঢেলে দিলো ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের সব আশা ও প্রত্যাশার ওপর। এবার তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন।

মিঃ আটারসনের আশঙ্কাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো শেষ পর্যন্ত। শিল্পীকে দিয়ে হাইডের ছবি আঁকাবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত। কারণ হাইডকে যারা খুব কাছ থেকে দেখেছে তাদের মধ্যে একজন হাইডের চেহারার যে বর্ণনা দিলো তা অন্যজনের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে কোনো মিল ছিল না। ফলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পেয়ে শিল্পী তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তবে হাইডকে যাঁরা দেখেছে তাদের প্রত্যেকের দেওয়া বর্ণনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবল একটা বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু সে মিল কোনোভাবেই শিল্পীর সাহায্যে এলো না। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে, হাইডের শরীরের মধ্যে একটা বিকলাঙ্গ ভাব আছে, কিন্তু সেটা তার শরীরে ঠিক কোথায় তা কেউই নির্দিষ্টভাবে বলতে পারলো না।

যাই হোক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারলো না, তারা খুবই তৎপর হয়ে উঠলো হাইডকে খুঁজে বার করার জন্য। ব্যাপারটা তারা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে, কারণ এ খুন সাধারণ মানুষের নয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্য স্যার ড্যানভার্স ক্যারু, তাই তারা মনে করে তাঁর খুনীকে খুঁজে বার করা অত্যন্ত জরুরী। ওদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকেও খুব চাপ আসছে। তাই তাদের এই তৎপরতা।

কিন্তু যার তল্লাশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এতো তৎপরতা, সেই এডওয়ার্ড হাইড এখন কোথায়? আশ্চর্য, সে যেন কর্পূরের মতো পৃথিবী থেকেই মিলিয়ে গেছে। তবে কি তাকে কখনো কোথাও পাওয়া যাবে না?'

এ যেন মিলিয়ন স্টার্লিং-এর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে।

।। ছয় ।।

ঃ চিঠি ঃ

স্যার ড্যানভার্স ক্যারু খুন হওয়ার দিন মিঃ আটারসন তাঁর মক্কেলের এই আকস্মিক মৃত্যুজনিত পুলিশি ঝামেলা এড়িয়ে ইন্সপেক্টর নিউকোমেনের খপ্পর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। তারপর থানা থেকে বেরিয়ে একজন আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি এবার রওনা দিলেন ডাঃ জেকিলের বাড়ির দিকে।

ডাঃ জেকিলের খাস পরিচালক পুল দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালো মিঃ আটারসনকে। পুল তাঁকে বাড়ির ভেতর দিয়ে প্রথমে নিয়ে গেলো কোর্ট-ইয়ার্ডে। তারপর কোর্ট-ইয়ার্ড পেরিয়ে মিঃ আটারসনকে নিয়ে গেলো ল্যাবরেটরিতে। এই প্রথম এখানে আসা। ডাঃ জেকিলের বাড়ির এই অংশে এর আগে তিনি কখনও আসেন নি।

মিঃ আটারসন অতীতের বেশ কয়েক বছর আগে ফিরে গেলেন, তাঁর মনে পড়লো, ডাঃ জেকিলের আগে এই বাড়ির মালিক ছিলেন একজন শল্য চিকিৎসক। তিনি তাঁর নিজের ল্যাবরেটরি এবং শবব্যবচ্ছেদ ঘরে ছাত্রদের পড়াতেন। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। আর এই কোর্ট-ইয়ার্ডটায় তখন ফুলের বাগান ছিল, চমৎকার সব ফুল ফুটত সেখানে। কিন্তু ক্রমাগত

অযত্ন ও অবহেলার দরুন সেদিনের সেই সাজানো বাগান আজ শুকিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। সুন্দর সুন্দর ফুলের জায়গায় আজ শুধুই আগাছায় ভরে গেছে।

পুলকে অনুসরণ করে মিঃ আটারসন ডাঃ জেকিলের ল্যাবরেটরি এবং শবব্যবচ্ছেদের ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের ভেতরে অনেকগুলো টেবিল চোখে পড়লো, টেবিলের ওপরে বহু ধরনের রাসায়নিক সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখা গেলো। মিঃ আটারসন চোখে অদম্য কৌতূহল নিয়ে তাকালেন সেগুলোর দিকে।

একসময় মিঃ আটারসনের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঘরের মেঝের ওপরে। হরেক রকমের বাক্স খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্যাকিং করবার খড় ছড়িয়ে রয়েছে ল্যাবরেটরির চারদিকে। একটা ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি রয়েছে ল্যাবরেটরির মধ্যে। সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই ডাঃ জেকিলের অফিস ঘর।

সেই সিঁড়ি বেয়ে মিঃ আটারসনকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এসে অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় মৃদু টোকা মারলো পুল। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো পুল, তাকে অনুসরণ করলেন মিঃ আটারসন।

অফিস ঘরটা বিরাট বড়। ঘরে তিনটে লোহার জানালা, জানালার ওপর পুরু হয়ে ধুলো ময়লা জমে রয়েছে, মনে হলো দীর্ঘদিন পরিষ্কার করা হয়নি। জানালাগুলো কোর্ট-ইয়ার্ড মুখী। একজন চিকিৎসকের যেসব আসবাবপত্র থাকা দরকার সব কিছুই রয়েছে। তফাৎ শুধু ঘরের এক কোণায় রয়েছে প্রমাণ সাইজের বিরাট একটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আয়না।

লণ্ডন শহর ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল তখনো। তাই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই ঘরে আলো জ্বালতে হয়েছে! ফায়ারপ্লেসের আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা চেয়ারে শীতের দাপটে কুঁকড়ে রয়েছেন ডাঃ জেকিল। তাঁর সারা মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তাঁর সেই বিষণ্ণ মুখে ক্লান্তি ও অসুস্থতার ছাপ স্পষ্ট। অনেকদিন পরে দেখা হলেও বন্ধু আটারসনকে দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। তবে বন্ধুর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে স্বাগত জানাতে ভুললেন না। কিন্তু তার পরেও তিনি কেমন যেন নীরব রয়ে গেলেন, একটা কথাও বললেন না। তাঁর এই ভাব দেখে মনে হলো কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ডাঃ জেকিলের।

একটু পরে পুল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মিঃ আটারসন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আজকের জোর খবরটা তুমি শুনেছো?'

ডাঃ জেকিল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন। তারপর ধীরে ধীরে ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'সেই কোন্ ভোর সকাল থেকেই তো দেখছি খবরের কাগজ বিক্রেতারা 'জোর খবর, জোর খবর, চিৎকার করতে করতে প্রভাতী সংবাদপত্র বিক্রী করে চলেছে।'

আটারসন এবার কাজের প্রসঙ্গ তুলতে উদ্যত হলেন। এর পর তিনি যেসব কথা বলতে শুরু করলেন সেসব একজন উকিলের কথা, বন্ধুর কথা নয়। তিনি বললেন, 'জেকিল, তুমি আমার বন্ধু নয়, একজন মক্কেলও বটে। ঠিক তেমনি স্যার ড্যানভার্স ক্যারুও আমার বন্ধু ছিলেন। এখানে একটু থেমে তিনি এবার ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি কি করতে যাচ্ছি, সেটা আমার নিজের আগে জানা দরকার। হাইডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশা করি তাঁর মতো লোককে লুকিয়ে রাখার মতো পাগলামি তুমি করবে না!'

'কেন, এ কথা তুমি বলছো কেন বন্ধু?'

'তুমি আমাকে বন্ধু বলেই যখন মনে করো, তাহলে আমিও বলছি, হাইড তোমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু আমার মক্কেল নিহত স্যার ক্যারুর পরম শত্রু একজন সে। আমাদের সন্দেহ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য সে দায়ী! হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, হাইডই তাঁর খুনী। তাই এ হেন অপরাধীকে আইনের বাইরে ছেড়ে রেখে দেওয়া যায় না, তার বিচার হওয়া উচিত, বিচারে তার কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অচিরেই ভেঙে পড়তে পারে। এর পরেও কি তুমি তার সঙ্গে................'

'শোনো বন্ধু আটারসন, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, এর পর থেকে আমি আর কখনো ওই অপরাধী হাইডের মুখ দর্শন করবো না।' ডাঃ জেকিল রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমাকে বলে রাখি, এতোসব কথা শোনার পর তার সঙ্গে আমি আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম। আমার এ কথা তুমি ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিতে পারো।'

এক সঙ্গে এতো কথা বলতে গিয়ে ডাঃ জেকিল হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। একটু সময় দম নিয়ে তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং এবার আটারসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো হাত নেড়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাকে জানিয়ে রাখি, হাইড যথেষ্ট নিরাপদেই আছে। তার নিরাপত্তার জন্য আমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজনই হবে না। আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি, আমি তাকে যতোটা চিনি, তুমি বোধহয় ঠিক ততো চেনো না তাকে। আর এও শুনে রাখো আটারসন, হাইডের কণ্ঠস্বর, কেউ কখনো আর শুনতে পাবে না।'

আটারসন গম্ভীরভাবে তন্ময় হয়ে ডাঃ জেকিলের কথা শুনতে থাকেন। জেকিল কথা বলছিলেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মতোন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ আদৌ মনঃপুতঃ হলো না আটারসনের। চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি দেখছি হাইড সম্পর্কে খুবই নিশ্চিত, এ সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের পরিধির চ্যালেঞ্জ আমি করবো না। আশা করি তোমার এই ধারণাটা যেন ঠিক হয়। তোমার ভালো হোক, সব সময়েই আমি তাই চাইবো। কিন্তু বন্ধু, আমার ভাবনা এখন অন্য রকম। আর সেটার জন্যই আমার মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করছে।'

'কি রকম?' ডাঃ জেকিল কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

'যেমন, এই ধরো, হাইড যদি ধরা পড়ে আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, তোমার বন্ধু বলে কোনোরকম দুর্বলতা দেখাবে না। নরহত্যার অপরাধে তাকে অবশ্যই আদালতে অভিযুক্ত করা হবে। বিচারের সময় সরকার পক্ষের উকিলের কঠোর জেরার মুখে তোমার নামটা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। আর তা হলে সেটা হবে এক মহাকেলেঙ্কারীর ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, সেদিকটার কথা আমিও ভেবেছি বৈকি! তবে আমিও স্থির নিশ্চিত, হাইড কখনোই ধরা পড়তে পারে না। কারণ সে এমন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে সেখানে পুলিশ শত চেষ্টা করলেও তাকে ধরা দূরে থাক তার সেই লুকোনার জায়গার হদিশও করতে পারবে না।'

'এতোটা নিশ্চিত হলে তুমি কি করে জেকিল?'

'সে এক রহস্যই বটে, কিন্তু সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না।'

এখানে একটু থেমে দম নিলেন ডাঃ জেকিল। ধীর শান্ত গলায় বললো, 'তবুও একটা ব্যাপার আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, তাই এ ব্যাপারে আমি তোমার উপদেশ চাই। আজ সকালে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। এই চিঠিটা পুলিশকে দেবো কিনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

এতক্ষণ আটারসনের চোখে-মুখে একটা ব্যর্থতার গ্লানি ফুটেছিল, যেখানে আশার কোনো চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ডাঃ জেকিল হঠাৎ একটা চিঠির প্রসঙ্গ তুলতেই একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর, চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, এক অজানা কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেলো। কোনো ভূমিকা না করে তিনি সেই সম্ভাবনার কথাটা যাচাই করে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, চিঠিটা কি হাইডের কাছ থেকে এসেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডাঃ জেকিল।

'ওহো, তাই বুঝি তুমি আশঙ্কা করছো', আটারসন মন্তব্য করলেন, 'এই চিঠিটা পুলিশ হাতে পেলে তাকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করতে পারবে, তাই কি?'

'না, একেবারেই নয়, আমার কোনো আশঙ্কাই নেই এখন তার। কারণ হাইডের কি হলো না হলো তা নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার ভাবনা এখন কেবল আমার সুনাম আর নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে। তাই চিঠিটা আমি তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি। চিঠিটার ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনো রকম উপদেশ দেবো না। তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমার বিশ্বাস, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই কাজ করবে।'

ডাঃ জেকিলের শেষ কথাটা যেন একটু ভাবিয়ে তুললো মিঃ আটারসনকে। গভীরভাবে চিন্তা করলেন তিনি। জেকিলকে কেমন যেন একটু স্বার্থপর বলে মনে হলো তার, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারটাই প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটাকেই বেশী গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি। তবে বন্ধু যে নিজের স্বার্থের দিকটা নিয়ে চিন্তিত, এটা বুঝতে পেরেও মিঃ আটারসন একটু আশ্বস্ত হলেন। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই বললেন, 'ঠিক আছে, চিঠিটা আগে দেখি, তারপর...............'

চিঠিটা মিঃ আটারসনের হাতে তুলে দিলেন ডাঃ জেকিল। চিঠিটা অদ্ভুত টানা টানা অক্ষরে লেখা। এবং চিঠির শেষ প্রান্তে এডয়ার্ড হাইডের নাম স্বাক্ষরিত। আটারসন দ্রুত চিঠিটার ওপর চোখ বোলাতে থাকেন। চিঠির বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত। যাঁর বদান্যতায় তিনি অযোগ্য হয়েও তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার তুলনাই হয় না। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে সেই ডাঃ জেকিলের চিন্তার কোনো কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। হাইড আবার এও জানিয়েছে, তার পালাবার ব্যাপারে সে এমন একটা নিশ্চিত উপায় বার করেছে যার ওপর সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে।

চিঠিটা পড়ার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন ফেললেন মিঃ আটারসন। তাঁর আরও মনে হলো, এ চিঠিটা কোনোভাবেই কোনো ব্ল্যাকমেলারের বলে মনে হচ্ছে না। চিঠিটার সমর্থনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'চিঠির খামটা কোথায়?'

'ওটার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছি। তুমি হয়তো ভাবছো, চিঠিটা কোথা থেকে পোস্ট করা হয়েছে খামটা পেলে জানতে পারতে। কিন্তু খামটার ওপরে কোনো ডাকঘরের ছাপ ছিল না। কারণ একজন পত্রবাহক হাতে করে চিঠিটা দিয়ে গেছিলো।

'ঠিক আছে, চিঠিটা আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি,' মিঃ আটারসন বললেন, 'এটার ব্যাপারে কি করা যায় পরে ভাবনা-চিন্তা করে ঠিক করবো।'

'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডাঃ জেকিল বললেন, 'তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তাই আমার ব্যাপারে সবরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। আমি নিজের ওপর আমার আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, তাই তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। তোমার যে-কোনো সিদ্ধান্তই আমি সর্বান্তকরণে মেনে নেবো।'

মিঃ আটারসন হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা জেকিল, একটা সত্যি কথা বলবে আমাকে? তোমার উইলের শর্তগুলো হাইডের নির্দেশেই লেখা হয়েছিল, তাই না? এছাড়াও তোমার অনুপস্থিতি আর হঠাৎ অন্তর্ধানের ক্ষেত্রে তোমায় বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে হাইডই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তাই না?'

কেউ কারোর গোপন কথা ফাঁস করে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ডাঃ জেকিলের মুখখানা কেমন কালো বিবর্ণ হয়ে গেলো, তাঁর শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে থাকলো। ডাঃ জেকিলের অবস্থা দেখে মনে হলো, যে-কোনো মুহূর্তে তিনি হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারেন। যাই হোক, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আটারসনের কথায় সায় দিলেন তিনি।

'আমি জানতাম, আমি ঠিক এমনটিই আন্দাজ করেছিলাম বন্ধু,' মিঃ আটারসন ধীরে ধীরে বললেন, 'জেকিল তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, তুমি হয়তো জানো না, তুমি যাকে একদিন বিশ্বাস করে তোমার সব গোপন কথা মন খুলে বলেছিলে, তোমার সেই বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারেনি। রাখবার কোনো ইচ্ছেও ছিল না তার কখনো। আসলে হাইড তোমাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকদিন থেকে মতলব করছিল। তুমি খুব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছো।'

'প্রাণে বাঁচার চেয়েও বোধহয় আরও অনেক বেশী কিছু হবে,' ডাঃ জেকিল আবেগ কম্পিত গলায় বললেন, 'ওই যে একটা প্রবাদ আছে, 'ঠেকে শেখা!' হ্যাঁ, আমার সেরকম শিক্ষাই হয়েছে। হায় ঈশ্বর, কি শিক্ষাটাই না আমার হয়েছে, জানো বন্ধু! এর পর থেকে কাউকে আর বিশ্বাস করা যাবে না।'

'মানুষ চেনা সহজ নয় বন্ধু!' মিঃ আটারসন উসকিয়ে দিলেন তাঁকে।

ডাঃ জেকিল দুঃসহ এক যন্ত্রণায় যেন ভেঙে পড়লেন। লজ্জায়, দুঃখে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

ডাঃ জেকিল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটু শান্ত হতেই মিঃ আটারসন তাঁর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন। তারপর এক সময় বন্ধু জেকিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। যে পথ দিয়ে তিনি ডাঃ জেকিলের বাড়িতে ঢুকেছিলেন সেই পথ ধরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। ল্যাবরেটরির দরজা দিয়ে বেরবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না। তবে এই পথে যাওয়ার একটা সুবিধে হলো, তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় গিয়ে হাজির হওয়া যেতো। কিন্তু সে পথ তাঁকে পরিহার করতে হলো এই কারণে যে, এই পথের ব্যাপারে তাঁর মনে একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিল তার মনে। তাঁর মনে পড়ে গেলো, এই দরজার বাইরেই তাঁকে রাতের পর রাত অপেক্ষা করতে হয়েছে, যদি একবার হাইডের দর্শন পাওয়া যায়এ

উকিলবাবুর জন্যই বুঝি অপেক্ষা করছিল পুল। মিঃ আটারসনকে দেখেই পালিশ করা দরজাটা খুলে দিয়ে সে বললো, 'শুভ অপরাহ্ন মিঃ আটারসন।'

মিঃ আটারসন ফিরে তাকালেন পুলের দিকে। তারপর কি মনে করে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আজ এক পত্রবাহক নাকি একটা চিঠি ডেলিভারি দিয়ে গেছে এ বাড়িতে। তা সেই পত্রবাহক লোকটি দেখতে কেমন ছিল বলতে পারো?

পুল ঘনঘন মাথা নেড়ে এমন অবাক বিস্ময়ে মিঃ আটারসনের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে, কথাটা যেন সে এই প্রথম শুনছে। তাই সে বলে উঠল, 'না স্যার, মনে হয় কোথায় নে একটা ভুল হয়ে গেছে আপনাব। এ বাড়ির চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের দায়িত্ব আমার ওপরে ন্যাস্ত। তাই স্পষ্টই আমার মনে আছে, আজকের ডাকে কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই কেবল কয়েকটা চিঠি এসেছে। কিন্তু কোনো পত্রবাহক তো কোনো চিঠি নিয়ে আসেনি আজ!'

মিঃ আটারসন ততোকি অবাক হয়েই আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ঠিক খেয়াল আছে তো, কোনো পত্রবাহক আজ এখানে চিঠি দিয়ে যায়নি?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার স্মরণশক্তি প্রখর, তাই আমি জোর দিয়েই বলছি, আমি ঠিক জানি যে, আজ কোনো পত্রবাহকই এ বাড়িতে কোনো চিঠি দিয়ে যায়নি।

।। সাত ।।

ধীরে ধীরে বাড়ির পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে মিঃ আটারসনের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এখন হাইডের চিঠিটাকে কেন্দ্র করে, যা সে ডাঃ জেকিলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। আবর্তিত তার সব ভাবনাই এলোমেলো, কোনো কিছুতেই স্থির হতে পারছে না যেন। পুল বলেছে, চিঠিটা সে সদর দরজা পথ দিয়ে কারোর হাত থেকে নেয়নি। তাই এর থেকে মনে হয় যে, চিঠিটা নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরির দরজা পথেই ডাঃ জেকিলের বাড়িতে এসে থাকবে। আবার এমনও হতে পারে, হয়তো ডাঃ জেকিলের ঘরে বসেই চিঠিটা লিখেছিল হাইড। আর এই ল্যাবরেটরির দিক দিয়ে জেকিলের বাড়িতে ঢোকার দরজায় চাবি তো হাইডের কাছেই থাকার কথা।

তাই স্বভাবতই মিঃ আটারসনের মনে এখন কেবল একটাই চিন্তা, হাইডের চিঠিটা কতোটাই বা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? তাই তাঁর পরবর্তী ভাবনা এখন চিঠিটার ব্যাপারে সত্য উদঘাটনের জন্য এমন একজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত যে কিনা তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন হবে। আর এই বিশ্বাসী লোকটি হলো তাঁর, নিজের অফিসেরই প্রধান করণিক মিঃ গেস্ট, সে তাঁর বহু দিনের পুরানো কর্মচারী।

বাড়ি ফিরে এসে মিঃ আটারসন তাঁর পরিচারককে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে বলে ভালো সুস্বাদু পুরনো মদ সংগ্রহ করার জন্য তাঁর ভূগর্ভস্থ ঘরে নেমে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর স্টাডিরুমে উঠে এসে.মিঃ গেস্টকে আহ্বান করলেন এবং বোতল থেকে দুটি গ্লাসে মদ ঢাললেন।

মিঃ গেস্ট শুধু একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নন, তিনি একজন হস্তলিপি বিশারদও বটে। বিভিন্ন ব্যক্তির হাতের লেখা বিশ্লেষণ করেই তাঁর অবসর সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যায় তা সে খেয়ালই করতে পারে না। মিঃ আটারসন মনস্থির করে রেখেছিলেন, হাইডের লেখা চিঠিটা তিনি

মিঃ গেস্টকে দেখাবেন। হয়তো সে পত্রলেখকের হাতের লেখা পরীক্ষা করে দেখে কোনো মন্তব্য করতে পারে, যা থেকে হাইডকে সন্ধান করার কাজে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।

আটারসনের এই প্রধান করণিক ডাঃ জেকিলকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। এডওয়ার্ড হাইডের যে ডাঃ জেকিলের বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের স্বাধীনতা ছিল, সে সম্পর্কে তার সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না, কারণ এই ব্যাপারটা তার বেশ ভালো করেই জানা ছিল। মিঃ আটারসন তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে শুধু নয় যে কোনো ব্যাপারে গেস্টের কাছে কোনা কিছুই গোপন করতেন না এই কারণে যে, তিনি জানতেন কোনো গোপন কথাই সে বাইরে কারোর কাছে প্রকাশ করবে না। অসতর্কভাবে বাইরের কোনো লোকের কাছে গল্পগুজব করার মতো লোকই সে নয়। এই সব কারণেই গেস্টের ওপর আটারসনের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

বয়সের দিক থেকে মিঃ আটারসনের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট মিঃ গেস্ট। কিন্তু সে তার নিয়োগকর্তার মতোই শান্ত প্রকৃতির মানুষ, আর সব সময়েই বুঝি বা একটু শুকনো শুকনো ভাব দেখায় তাকে এবং মিঃ আটারসনের মতোই ভালো স্বাদের মদ পছন্দ করে। এখন ওঁরা দু'জনে মুখোমুখি বসে যে যার সুস্বাদু মদের গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকলেন।

মদ গলাধঃকরণ করার আগে গেস্ট তার জিভ দিয়ে বুলিয়ে নেয়। হাসলো সে। গেস্টই প্রথমে কথা বলতে শুরু করলো। 'আই মিঃ আটারসন স্যার, এর আগে আপনার ভূগর্ভস্থ ঘরে অনেক ভালো ভালো সুস্বাদু মদ পান করেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজকের মতো এতো ভালো মদ বোধহয় আগে কখনো পান করিনি।'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে আমিও একমত গেস্ট।' সুস্বাদু মদের শেষ আস্বাদ নেওয়ার পর আটারসন মাথা নেড়ে বললেন, 'সত্যি, এতো ভালো মদ পান করার সৌভাগ্য এর আগে কখনো আমার হয়নি।'

এবার এক অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এলো তাদের দু'জনের মধ্যে। এক সময় সেই নীরবতা মিঃ আটারসনই ভঙ্গ করলেন। 'স্যার ড্যানভার্সের ব্যাপারে তোমার কাছে আমি এসেছি গেস্ট, ওঁর ব্যাপারটা তুমি তো জানো দুঃখের বিশেষ করে আমাদের কাছে বড় দুঃখের এবং আমাদের পার্লামেন্টের কাছেও!'

'হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন, এই অপরাধের এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখে জনসাধারণ প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে গেছে। আশ্চর্য লোকটা খুন করলো কিনা পার্লামেন্টের একজন সম্মানিত সদস্যকে? এ খুন যে করেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে একজন বদ্ধ উন্মাদ!'

মিঃ আটারসন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা নথিপত্র দেখাবো, সেটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পর তোমার মতামত জানিও। সেটা একটা চিঠি খুনীর নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি। এই চিঠিটা নিয়ে আমি কি যে করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'তাই কি! খুনীর নিজের হাতে লেখা চিঠি বলছেন! ওঃ তাহলে সেটা দারুন কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হচ্ছে।' মিঃ গেস্ট-এর কণ্ঠে উত্তেজনার স্বর ধ্বনিত হলো। চিঠির কথা শুনে নাকি সুন্দর মদ পান করার দরুন এটা তার প্রতিক্রিয়া কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কে জানে করণিকের কাছ

'এ একটা আত্মহত্যার কেস,' মিঃ আটারসন ঘোষণা করলেন। 'আমরা খুবই দেরী করে ফেলেছি, এখন তাকে না পারা যাবে বাঁচাতে কিংবা তাকে তার পাপের শাস্তি দিতে। পুল, এখন আমরা কেবল একটা কাজই করতে পারি, তোমার মনিবের দেহটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করার কাজে গেলে পড়া।'

এর পর তারা প্রবল উৎসাহ সহকারে অফিসঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে থাকলো, ঘরের প্রতিটি নিভৃত কক্ষে এবং কোণায় কোণায় তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়তে থাকলো। কিন্তু কিছুই দেখতে না পেয়ে এর পর তারা তাদের সন্ধানী দৃষ্টি ফেললো ল্যাবরেটরিতে। সেখানকার অধিকাংশ নিভৃত কক্ষই একেবারে খালি অবস্থায় ছিল এবং মাকড়সার জালে ভর্তি। তাই এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, অতি সম্প্রতি কেউ সেখানে প্রবেশ করেছে বলে তো মনে হয় না। সেরকম কোনো চিহ্নই চোখে পড়লো না তাদের। তাহলে তাঁর মৃতদেহটা গেলোই বা কোথায়?

পুল আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো করে বললো, 'মনে হয় তাঁর দেহটা মেঝের কোথাও পুঁতে ফেলা হয়েছে কিংবা পিছনের দরজা দিয়ে তাঁর দেহটা বহন করে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কোথাও পুঁতে ফেলা হয়েছে।' কিন্তু পিছনের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন তাতে তালা ঝুলছে এবং চাবিটা ঘরের এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, চাবিটা ভেঙে গেছে এবং তাতে মরচে ধরে গেছে। হতবাক হয়ে অবশেষে তারা অফিসে ফিরে গেলো।

এবার মিঃ আটারসন নিয়মনিষ্ঠ পদ্ধতিতে ঘরটার অনুসন্ধান কাজ চালাতে থাকলেন। তবে ডাঃ জেকিলের মৃতদেহের সন্ধান নয়, যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায় এই ভেবে। খুঁজতে গিয়ে চায়ের টেবিলের ওপরে একটা বই খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। সেটা একটা ধর্মগ্রন্থ। আটারসনের মনে পড়লো, ডাঃ জেকিল একবার ওই বইটার খুব প্রশংসা করেছিলেন তাঁর কাছে। এখন আটারসন দেখলেন, সেই বইয়ের পাতায় পাতায় জেকিলের হস্তাক্ষর, সে সবই ঈশ্বরনিন্দায় যতো সব আজগুবি সমালোচনার মুখর যেন। উন্মত্ত হয়ে তিনি অধার্মিকের মতো ঈশ্বর-বিরোধী নানান আপত্তিকর মন্তব্য করে গেছেন সেই সব লেখায়। আটারসন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এক সময় বইটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই দেখলেন পুল একটা প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের ওপর থেকে ধূলো-ময়লার দাগ মুছছে।

আটারসনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই পুল বলে উঠলো, 'আমি কি ভাবছিলাম জানেন মিঃ আটারসন, 'এই আয়নাটা যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে আমরা যা জানতে চাই সে সেটা বলে দিতে পারতো। কারণ, আয়না কখনো মিথ্যে বলে না, যা দেখে ঠিক তাই বলে।'

পুল-এর কথায় সায় দিয়ে আটারসন বললেন, 'এই আয়নাটা নিঃসন্দেহে অনেক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে থাকবে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এখানে এই রকম একটা প্রমাণ-সাইজের আয়না রাখা হলো কেন? আরও অবাক হচ্ছি, জেকিল একটা বিজ্ঞানের ঘরেই বা কেন আয়নাটা রাখতে গেলেন, এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু জানো পুল?'

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা নেই পুলের। সে এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের টাইটা ঠিক করতে ব্যস্ত।

আটারসন এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। টেবিলটার সামনে গিয়ে সেটার ওপরে রাখা কাগজগুলো ঘেঁটে দেখতে থাকলেন, সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা

মোটা আকারের খাম পেয়ে গেলেন তিনি। খামটার ওপরে তাঁর নাম লেখা রয়েছে। খামটা খুলতেই তিনটি নথিপত্র বেরিয়ে এলো। প্রথমটা জেকিলের উইল। মিঃ আটারসনের সেফ-এ জেকিলের যে উইলটা রাখা আছে, এটাও তেমনি অদ্ভুত খামখেয়ালিতে ভরা। কিন্তু আটারসনের আসল উইলে জেকিলের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হাইডের নামে লেখা থাকলেও এই নতুন উইলে আটারসনের নাম স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

'ঈশ্বর আমাকে করুণা করুন, এর অর্থ কি হতে পারে?' আইনজ্ঞ আটারসন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'হাইডের নাম কেটে আমার নাম বসানো হয়েছে নতুন উইলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাইড এই নতুন উইলটা নষ্ট করে ফেলেনি! আমাকে পছন্দ করার মতো নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকতে পারে না তার। তাহলে?'

পরবর্তী নথিটা হলো একটা চিঠির পর্যায়ে লেখা। সেটার ওপর চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে গিয়ে তাতে লেখা তারিখটা দেখা মাত্র তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওহো পুল! দেখো এখানে কি লেখা রয়েছে? এই চিঠির তারিখ আজকের। এর অর্থ হলো এই যে, জেকিল জীবিত আছেন, অন্তত আজও কোনো এক সময়ে আমরা আসার আগে পর্যন্ত তিনি এই ঘরেই ছিলেন। হাইড তাঁকে এতো তাড়াতাড়ি খতম করতে পারেনি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি বেঁচে আছেন, তবে মনে হয় কোথাও তিনি আত্মগোপন করে আছেন।'

মনিব জীবিত থাকার খবরটা শুনে পুল প্রথমে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরে তাকে কেমন যেন হতবুদ্ধির মতো দেখালো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু কেনই বা তিনি আত্মগোপন করতে যাবেন মিঃ আটারসন?'

'আহ্, সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন পুল,' মিঃ আটারসন বললেন, 'আচ্ছা পুল, ওই যে লোকটা মেঝের ওপরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেটা একটু আত্মহত্যার কেস বলে ধরে নিলে কি ঠিক হবে? তাই এ ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে, যাতে করে ডাক্তার যেন কোনো বিপর্যয়ের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি কি লিখেছেন, এসো এবার তাঁর সেই চিঠিতে কি লেখা আছে পড়ে দেখা যাক।'

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকলেন আটারসন ঃ

'প্রিয় আটারসন, এই চিঠিটা যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি আর এখানে থাকবো না, উধাও হয়ে যাবো চিরদিনের মতো। কিভাবে যে নিরুদ্দেশের পথে চলে যাবো এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। আর কেনই বা আমাকে চলে যেতে হবে আমার পক্ষে তা বলা খুবই অস্বস্তিকর। কিন্তু আমি জানি যে, আমার শেষের সেই দিনটির জন্য আমাকে খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে না। ল্যানিয়ন আমাকে বলেছিল, সে তোমার হাতে একটা নথিপত্র তুলে দিতে চায়। সেটা এখন পড়ো। তারপর তুমি যদি আরও কিছু জানতে চাও, তাহলে আমার স্বীকারোক্তিটা পড়ো, সেটা আমি এই চিঠির সঙ্গেই গেঁথে দিয়েছি। আমি তোমার অযোগ্য আর অসুখী বন্ধু —হেনরী জেকিল।

একটা শীল করা প্যাকেটের দিকে তাকালেন তাঁরা দু'জন সেটা টেবিলের ওপরে রাখা ছিল। আর সেটাই জেকিলের স্বীকারোক্তি। শেষপর্যন্ত সেই প্যাকেটটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে চালান করে দিলেন আটারসন।

'পুল, আমি এখন আমার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেই নির্জনে ঠাণ্ডা মেজাজে আমি স্বীকারোক্তিটা পড়বো। আটারসন বললেন, 'কিন্তু প্রথমে আমি ডাঃ ল্যানিয়নের লিখিত বিবৃতিটা পড়বো। সেটা আমি আমার ঘরে একটা সেফের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। ডাঃ জেকিল যেখানেই লুকিয়ে থাকুক কিংবা মারাই যাক, আমরা অন্তত তাঁর সম্মান রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পারবো।' তিনি তাঁর ঘড়িটার দিকে তাকালেন। 'এখন রাত দশটা। মাঝরাত্রেই আমি আবার ফিরে আসবো। আর সেই সময় আমরা দরকার হলে পুলিশে খবর দেবো।'

পুল মাথা নেড়ে সায় দেয় এবং আটারসনকে অনুসরণ করে অফিস এবং ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর ল্যাবরেটরির দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। তবে অফিসঘর থেকে বেরোবার আগে পুল ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে কেটলিটা সরিয়ে রেখে এসেছিল, কিন্তু ফায়ারপ্লেসে তেমনি আগুন জ্বলছিল, আর সেই আগুন গরম রাখছিল মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটি মৃতদেহকে।

।। তেরো ।।

ঃ মাঝরাতের অতিথি ঃ

বাড়িতে ফেরা মাত্র মিঃ আটারসন তাঁর সেফ থেকে মৃত্যুর আগে ডাঃ ল্যানিয়নের পাঠানো নথিপত্রটা বার করলেন। পরনের কোটটা খুলে ফেলে একটা আরাম-কেদারায় গিয়ে বসলেন। নথিপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটার দিকে তাকালেন তিনি। অক্ষরগুলো এলোমেলো, দেখে মনে হলো লেখার সময় লেখকের হাত কাঁপছিল। আটারসন সেটা পড়তে শুরু করলেন ঃ

প্রিয় আটারসন,

আজ চারদিন হয়ে গেলো হেনরী জেকিলের কাছ থেকে রেজেস্ট্রি করা চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে। সেই ঘটনাটা আমাকে এমনি বৃদ্ধ ও দুর্বল করে তুললো যে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, এই চিঠিটা লেখা যেন আমি শেষ করতে পারি। আর তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিটুকু যেন আমার থাকে। আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি এখানে যা যা বলবো সে সবই প্রভূতপক্ষে ঘটেছে, এর মধ্যে একটুও অতিরঞ্জিত কিছু নেই।

জেকিলের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই, কারণ আগের রাতেই তার বাড়িতে আমার নৈশভোজে নিমন্ত্রণ ছিল। সেই সময়েই তো তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। তবে আজই আবার চিঠি কেন সে দিতে গেলো? কিন্তু যেহেতু চিঠিটা রেজেস্ট্রি করে পাঠানো হয়েছে ডাকে খোয়া যাতে না যায়, তাই আমার মনে হলো, এ চিঠির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। চিঠিটা পড়তে গিয়ে উপলব্ধি করলাম, এ চিঠিতে যথেষ্ট আবেগ আছে।

জেকিল লিখেছে, 'প্রিয় ল্যানিয়ন, তুমি আমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে একজন। এ কথা সত্যি যে, বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের অমিল আছে, কিন্তু বন্ধু তুমি তো জানো, যখনি তুমি কোনো ব্যাপারে আমার কাছে সাহায্যের আবেদন করেছো, আমি একটুও ইতস্তত না করে বিনা দ্বিধায় তোমার দিকে আমি আমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। এবার আমি তোমার কাছে আমাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন করছি। আশা করি অনুরূপভাবে তুমিও আমকে সাহায্য করবে। জানো ল্যানিয়ন, আমার জীবন, আমার বিচক্ষণতা, সম্মান সবই তোমার ওপর

নির্ভর করছে। আজ রাতে তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হও তাহলে আমি সর্বস্রান্ত হয়ে যাবো।

এই চিঠিটা পড়ার পড়েই তুমি পত্রপাঠ আমার বাড়িতে চলে আসবে। আমার খানসামা আমার কাছ থেকে একটা লিখিত নির্দেশ পেয়ে তোমাকে আশা করছে। সে একজন ছুতোর আর তালা-চাবির মিস্ত্রি নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার অফিসঘরের দরজায় তালা জোর করে খুলতে হবে। তারপর তুমি সেখানে প্রবেশ করবে। ঘরের বাঁদিকে একটা ক্যাবিনেট আছে। সেটার ওপরের দিক থেকে দু'নম্বর ড্রয়ারটা খুলবে। (আমার মনটা এখন এতোই উত্তেজিত যে, আমি কিছুতেই খেয়াল করতে পারছি না ড্রয়ারটা আমি তালা বন্ধ করেছি কিনা। আর যদি বা করে থাকি, তাহলে কোনোরকম দ্বিধা না করে তালা ভেঙে ড্রয়ারটা খুলে ফেলবে।

ড্রয়ারের ভেতরে তুমি কিছু গুঁড়ো পাউডার, তরল পদার্থে ভরা একটা টিউব আর নোটবুক দেখতে পাবে। তুমি এইসব জিনিসপত্রসহ ড্রয়ারটা তোমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। এটা হলো তোমার কাজের প্রথম অংশ, যা অপেক্ষাকৃত সহজ।

চিঠিটা পাওয়া মাত্র তুমি যদি যাত্রা শুরু কর, তাহলে তুমি ওই ড্রয়ারটা সহ মাঝরাতের আগেই তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। পথে দেরী হওয়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই আমি তোমাকে কিছু বাড়তি সময় দিয়ে রাখছি। আর অফিসের দরজা ভাঙতে ঠিক কতো সময় লাগবে, সে ব্যাপারেও আমার কোনো ধারণা নেই। তাই তোমার আর আমার পত্রবাহকের মিলিত হওয়ার সময় আমি ধার্য করেছি মাঝরাত। সময়টা ভালো এ কারণে যে, তোমার চাকর-বাকররাও ঘুমিয়ে থাকবে তখন। তোমাকে আমার আরও বলার আছে, তুমি নিজে আমার দূতের সঙ্গে দেখা করো, আর তুমি যেন একা তার সঙ্গে দেখা করো। তোমাদের মধ্যে অন্য আর কেউ যেন না থাকে। আমার দূতের হাতে ড্রয়ারটা তুলে দিতে হবে। এই কাজটা তুমি যদি করতে পারো তাহলে তুমি আমার অশেষ ধন্যবাদ লাভ করবে।

তুমি যদি আমার এই আচরণের একান্তই ব্যাখ্যা করতে চাও, তাহলে আমার দূতের হাতের ড্রয়ারটা তুলে দেবার মিনিট পাঁচেক পরেই তা পেয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে আমার দুরাবস্থার কথা একবার ভেবে দেখো, কি অদ্ভুত জায়গায় না আমি এখন রয়েছি। এমন একটা চরম দুর্দশার বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে যা অকল্পনীয়। বিশ্বাস করো বন্ধু, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের হাত থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারো। তোমাকে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না, এ পর্যন্ত তোমাকে যা করতে বললাম, তা করতে পারলেই আমি বেঁচে যাবো। প্রিয় ল্যানিয়ন, দয়া করে, তুমি আমার কাজটা করে দিও আর তোমার বন্ধুকে তার মহা-বিপদের হাত থেকে রক্ষা করো। তোমার প্রাণের বন্ধু হেনরী জেকিল।

পুনশ্চঃ আর একটা আতঙ্ক নতুন করে আবার আমার মনে জেগে উঠছে। তাই চিঠিটা শীলমোহর করে দিলাম। সম্ভবত ডাক-বিভাগের গোলমালের জন্য এই চিঠিটা হয়তো আজ রাতের মধ্যে তোমার হাতে নাও পৌঁছতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে আমার নির্দেশ মতো আগামীকাল কাজটা করো। মাঝরাতে আমার দূতকে আবার আশা করতে পারো। যাই হোক, তখন

অনেক দেরী হয়ে যাবে। যদি সে দ্বিতীয় রাতে তোমার কাছে আর না হয়, তাহলে জানবে হেনরী জেকিলকে আজই তুমি শেষ দেখা দেখেছো।'

ল্যানিয়নের চিঠির জের চলতে থাকে।

'জেকিলের এই অদ্ভুত চিঠিটা আমি বারবার পড়লাম। আমার মনে হলো জেকিলের বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ না আমার ধারণা মতো তার পাগলামিটা সভ্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দেশ মতো আমি আমার কাজ ঠিক করে যাবো। তাই আমি দ্রুত জেকিলের বাড়িতে চলে গেলাম। খানসামা পুল দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের ল্যাবরেটরির পিছন দিয়ে জেকিলের অফিসঘরে নিয়ে গেলো।'

'ছুতোর মিস্ত্রি দরজার শক্ত ভারি কাঠ দেখে চিন্তিত হয়ে মাথা নাড়লো। কিন্তু তালা-চাবির মিস্ত্রিতেই প্রথমে তালা খোলার কাজে হাত দিতে হলো। তালা ভাঙার কাজটা খুব কঠিন হলেও সৌভাগ্যবশত সে একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। তবে তালা ভেঙে দরজা খুলতে তার পাক্কা দু'ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। আমি তখন একাই অফিসঘরে গিয়ে ঢুকে ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্যাবিনেট থেকে ড্রয়ারটা বার করে নিয়ে সেটা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলাম। খানসামা পুল ড্রয়ারটার ওপর কিছু খড় একটা কাগজের শীট জড়িয়ে সেটা ভালো ভাবে প্যাক করে দিলো। তারপর একটা ঘোড়ারগাড়িতে চেপে আমি আমার বাড়িতে ফিরে এলাম।'

'নিজের বাড়িতে ফিরে এসে নিশীথে নিভৃতে একা একা নির্জন ঘরে বসে আমি সেই ড্রয়ারের ভিতরকার জিনিসগুলো খুব সাবধানে পরীক্ষা করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলাম। গুঁড়ো পাউডারগুলো বেশ পরিপাটি করে কাগজে মোড়া ছিল। কিন্তু এই মোড়কগুলো কোনো কেমিস্টের দোকানে পেশাদারী কায়দায় করে দেওয়া হয়নি। করলে তাদের বৃত্তিগত দক্ষতার ছাপ থাকতো। তাই এর থেকে ধরে নিলাম, জেকিলই পাউডারের গুড়োগুলো নিজের হাতে মিশিয়ে মোড়ক বানিয়েছেন। একটা মোড়ক আমি খুলে দেখলাম, ভেতরে স্রেফ সাদা রঙের স্ফটিকের মতো লবণ জাতীয় কোনো জিনিস রয়েছে।'

'আমার পরবর্তী পরীক্ষা করার বস্তু হলো কাচের টিউব। সেটাই বেশী কৌতূহল জাগানোর মতো জিনিস বটে! সেটার অর্ধেকটা রক্ত-লাল রঙের তরল পদার্থে ভরা, যার গন্ধটা বড় তীব্র, বড় উগ্র। আন্দাজে মনে বলো, ওই তরল পদার্থের মধ্যে ফসফরাস আর কিছুটা শক্তিশালী ইথার মেশানো রয়েছে। কিন্তু অন্য কিছু থাকলে সেটা ঠিক অনুভব করতে পারলাম না।'

'তবে নোটবুকটা আমায় কিছুই বলতে পারলো না। স্রেফ কতকগুলো তারিখ লেখা রয়েছে। আর যত্রতত্র লেখা রয়েছে "দ্বিগুণ" শব্দটা। আবার নোটবুকের এক জায়গায় লেখা রয়েছে ঃ "সম্পূর্ণ ব্যর্থতা"। বোঝা গেলো, নোটবুকটা জেকিলের কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার রেকর্ড। মনে হচ্ছে এই পরীক্ষার ফলটাও তার অন্য সব পরীক্ষার মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।'

'আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ওই ড্রয়ারের ভেতরে এমন কি জিনিস আছে যা জেকিলের জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে? আর কেনই বা সে সেই জিনিসটার প্রতি গুরুত্ব দিতে চাইছে? আমার কাছে তার প্রেরিত দূতকে আমার কাছে না পাঠিয়ে তার খানসামা পুলের কাছেই তো যেতে পারতো, যেমন আমি গেছি! আমার মনে আছে, আমি যখন শুনলাম তার দূত গোপনে আমার

সঙ্গে দেখা করতে আসছে, তখনি আমি খুব অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করি। তবু তা সত্ত্বেও সেই নিশীথের অতিথির সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়ার জন্য আমার বাড়ির চাকর-বাকরদের বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দিলাম। তবে আমার রিভলবারে গুলি ভরে নিতে ভুললাম না। কে জানে লোকটা গোপনে গভীররাতে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কি মতলব নিয়ে আসছে কিসের উদ্দেশ্যে? যাই হোক, আত্মরক্ষার জন্য গুলিভর্তি রিভলবারটা কাছেই রাখা উচিত।'

'গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকে গুনে গুনে ঠিক বারোটার ঢং ঢং ঢং শব্দ হওয়া মাত্র ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের দরজায় নক্ করার শব্দ হলো। দরজা খুলে দেখি, গাড়িবারান্দার থামে ভর দিয়ে বেঁটে ছোট-খাটো চেহারার লোক গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আচ্ছা, আপনি কি ডাঃ জেকিলের কাছ থেকে আসছেন? লোকটি মাথা নেড়ে সায় দিলো, আর আমি তখন তাকে ভেতরে আসতে বললাম। লোকটা চকিতে একবার সেই রাতের অন্ধকারে পিছন দিকে একবার দৃষ্টি ফেলে দেখে নিলো। এই সময় একজন প্রহরারত পুলিশ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, মনে হলো তাকে দেখে আগন্তুক ভয় পেয়ে গেছে। তা নাহলে সে অমন একরকম ছুটেই আমার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে যাবেই বা কেন? আমি আমার ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা সজোরে চেপে ধরলাম এবং তাকে আমার আলো ঝলমলে ঘরে নিয়ে এলাম।

'আমি তাকে জানিনা, চিনিনা। বেঁটে, ছোট-খাটো চেহারার লোকটি। লোকটা দেখতে অসুস্থ, আর তাকে দেখা মাত্র আমার মনে কেমন যেন একটা ঘৃণার ভাব জেগে উঠলো। অন্য কেউ হলে তাকে দেখামাত্র হেসে উঠতো, কারণ তার পরনের পোশাক তার দেহের তুলনায় অনেক বড়ো ঢলঢলে। তবে তার পরনের ট্রাউজার পা দুটো গুটিয়ে যেন খানিকটা ওপরে তুলে রেখেছিল। পাছে সে দুটো মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে ময়লা নোংরা ধুলোয় মলিন হয়ে যায়। কিন্তু সে তার পরনের ঢিলে-ঢালা জ্যাকেটটা গোটাবার কোনো সুযোগ পায়নি। এর ফলে সেটা বেঁটে ছোট-খাটো লোকটার সরু কাঁধের ওপর দিয়ে তার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

লোকটা খুবই উত্তেজিত। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'পেয়েছেন, পেয়েছেন ড্রয়ারটা?' এমন কি সে আমার হাতের ওপর তার একটা হাত রাখলো, আমার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি উত্তর পাবার তাগিদে। তার স্পর্শে আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন আতঙ্কের একটা হিমশীতল প্রবাহ বয়ে গেলো এবং আমি নিজের অজান্তেই বুঝি বা একটু পিছিয়ে গেলাম। তারপর আমি সোজাসুজি বললাম, 'একটা ব্যাপারে আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন স্যার, এখনও পর্যন্ত আপনার পরিচয় পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দয়া করে আপনি বসুন,' আমি বললাম।

'সেই সঙ্গে আমিও বসলাম এবং আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। একজন চিকিৎসক যেভাবে তার রোগীর দিকে তাকায় আমিও ঠিক সেভাবেই লোকটার দিকে তাকালাম।' কিন্তু তাকে দেখে আমি যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম, সেই ভাবটা দমন করা খুবই কঠিন হয়ে উঠলো আমার কাছে।

লোকটা যতদূর সম্ভব আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে বললো, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি ডাঃ ল্যানিয়ন। আমি এই একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়ার দরুণ হয়তো আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকবো। আপনার সহকর্মী ডাঃ জেকিলের নির্দেশেই আমি এখানে এসেছি। আমি জেনেছি......'এখানে

একটু থেমে সে তার নিজের গলায় হাত দিলো। কেন বুঝতে পারলাম, যতোটা সম্ভব শান্ত গলায় সে কথা বলবার চেষ্টা করলেও সে যেন কেমন হিসট্রিয়া রোগীর মতো তার এই রোগকে এড়িয়ে যাবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। আমি জেনেছি......একটা ড্রয়ার।

'লোকটার ওপর কেমন মায়া হলো আমার এবং আঙুল তুলে ড্রয়ারটা দেখালাম তাকে। টেবিলের পিছনে ছিল সেটা এবং সেটা আবার কাগজের শীটে ঢাকা ছিল। 'ওই যে স্যার ড্রয়ারটা ওখানে রয়েছে।'

'একলাফে ছুটে গেলো সে সেখানে। তারপর সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ সে তার বুকে হাত রেখে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার মুখখানা আসন্ন কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কায় বুঝি বা শঙ্কাতুর হয়ে উঠলো।

'তার অমন ভয়ার্ত মুখ দেখে মনে হলো, এখনি বুঝি তার দেহের মাংসপেশীতে প্রবল টান ধরতে শুরু হবে। এরকম একটা আশঙ্কা করেই আমি তাকে শান্তভাবে সতর্ক করে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'মশাই, নিজেকে একটু সংযত করে শান্ত হয়ে বসুন।'

'লোকটা আমার দিকে ফিরে হাসলো, তার হাসিটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত দেখালো। উঃ কি বীভৎস সেই হাসি, বুক কেঁপে ওঠার মতোন। হাসির সঙ্গে তার মুখের ভাবটাও কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠলো, তা দেখে আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। তারপরেই তার মুখে ফুটে উঠতে দেখা গেলো একটা নৈরাশ্যের ছাপ। চোখদুটি বন্ধ করে হঠাৎ সে ড্রয়ারের মোড়কের আবরণটা খুলে ফেললো চটপট। ড্রয়ারের ভেতরের জিনিসটা দেখা মাত্র আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে তার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পডলো। তারপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কাছে আউন্স চিহ্নিত কাচের গ্লাস আছে?'

'একটা কাচের গ্লাস এনে তার হাতে তুলে দিলাম আমি। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে সেই গ্লাসে খানিকটা রক্ত-লাল তরল পদার্থ ঢাললো। তরল পদার্থের সঙ্গে পাউডারের গুঁড়ো গলে যেতেই সেই মিশ্রণ থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। রক্ত-লাল রঙের তরল পদার্থটা ক্রমশ গাঢ় রক্তবর্ণে পরিণত হতে থাকলো। এক সময় ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেলো, তারপর মিশ্রণটা টগবগ করে ফুটতে শুরু করতেই জলের মতো স্বচ্ছ সবুজ রঙে পরিণত হলো সেটা। মাথা নেড়ে সে এমন করে সায় দিলো যেন সেটা তার মনঃপুতঃ হয়েছে। তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপরে রাখলো সে নিঃশব্দে।'

'তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলে উঠলো, 'এখন আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা, আমি কি এই মিশ্রণের গ্লাসটা নিয়ে এখান থেকে চলে যাবো। আর আমি যদি তাই করি সেক্ষেত্রে আপনি এ পর্যন্ত যা জেনেছেন তার বেশী কিন্তু আর জানতে পারবেন না। তবে ডাঃ জেকিল আপনার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু ডাঃ জেকিল সম্পর্কে আপনার অদম্য কৌতূহল মিটবে না। কিন্তু আমার ইচ্ছে মতো আপনি যদি আমার কাজটা করতে দেন তাহলে আমি আপনাকে কথা দিতে পারি, আপনার সেই কৌতূহল অবশ্যই মিটবে। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে আপনার চোখের সামনে। আজ রাতেই এই ঘরে বসেই আপনার যশ আর ক্ষমতা এসে যাবে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। তখন আপনি যা দেখবেন, তাতে আপনি

স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। আপনার এতদিনের সব বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে মনে হবে তখন। আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে আর এখনি। কারণ আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না।'

আমার কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি ধরতে যাচ্ছিল, কোনোরকমে সেটা সামলে নিয়ে আমি উত্তরে বললাম, 'আমি তো ইতিমধ্যে অনেক দূরে এগিয়ে গেছি, না হয় আরও একটু এগোলাম।'

'সে তো খুব ভালো কথা,' বললো লোকটা। 'কিন্তু ল্যানিয়ন, আপনার ডাক্তারী শপথের কথা অবশ্যই আপনার মনে রাখতে হবে। একজন চিকিৎসক হিসেবে সব কিছু গোপন রাখার দায়বদ্ধতা আপনার আছে।' এই বলে সে টেবিলের ওপর থেকে গ্লাসটা নিজের হাতে তুলে নিলো। একজন রোগীর গোপন রোগের কথা বাইরের কারোর কাছে প্রকাশ করবেন না। এটাই চিকিৎসাশাস্ত্রের কড়া হুকুম। কিন্তু আমি দেখেছি, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংকীর্ণ। আপনি আপনার সমসাময়িক অন্য চিকিৎসকের গবেষণাকে মূল্যই দিতে চান না। এতদিন আপনি আপনার চাইতে বেশী প্রতিভাশালী গবেষকের কথা শুনে কেবল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছেন আর বলেছেন, ওষুধ শুধু দেহের ওপর প্রভাব ফেলার জন্য, মনের ওপরে নয়!'

ঠোঁটের কাছে গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে লোকটা এক ঢোকে গ্লাসের সমস্ত তরল পদার্থটুকু গিলে ফেললো। খাওয়া মাত্র লোকটা যন্ত্রণায় কাতরে উঠলো, টেবিলের চারধারে ঘুরতে থাকলো কাঁপা কাঁপা পায়ে। তারপর এক সময় একটা চেয়ারের সামনে ঝুঁকে পড়ে সেটার পিছন দিকটা আঁকড়ে ধরলো এবং শব্দ করে হাঁপাতে থাকলো, তার চোখের মণিদুটো যেন অক্ষিকোটরের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকলো। আরও মনে হলো, লোকটা যেন প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, সে যেন গলে যাচ্ছে, দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আমি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকলাম। পিছু হটে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলাম। আর তারপরেই হঠাৎ আমি ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। আমার সামনে তখন সেই কুৎসিত দেখতে খর্বাকৃতি লোকটা আর নেই। আমার চোখের সামনে তখন দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটি, তার মুখ বিবর্ণ, দেহ থরথর করে কাঁপছে নারকীয় এক সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে, সে আর কেউ নয় ডাঃ হেনরী জেকিল!

উঃ সে কি ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য, মুখে তার বর্ণনা করা যায় না। একন কি পরবর্তী ঘণ্টায় জেকিল আমাকে যা বলেছিল, সে সব কথা আমি লিখতে পারবো না। তার কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো। আমার জীবনটা এক বৈজ্ঞানিকের। আমার এত দিনের সব জানা-অজানা, ধ্যান-ধারনার এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মূল পর্যন্ত যেন উপড়ে গেলো সেই মুহূর্তে।'

'আমার জীবনে সে এক বিনিদ্র রজনী কেটেছে, চোখে ঘুম ছিল না এক মুহূর্তের জন্যও। আর পরের দিন সারাটা দিন আমার কাটলো ভয়ে ও আতঙ্কে, এখন কি হয় কে জানে! তারপর থেকে আমি না পারি খেতে, না পারি ঘুমতে। এর থেকে আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু আমার আসন্ন। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবুও যে শক আমি পেয়েছি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছি না, অথচ সেটাই আমাকে এখন আমার জীবনের শেষ প্রান্তে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'

'শোনো আটারসন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। সে রাতে যে কুৎসিৎ, বীভৎস আকৃতির লোকটা আমার বাড়িতে গুটিসুটি মেরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, জেকিলের নিজের

স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, তার নাম হলো হাইড। এই লোকটাই স্যার ড্যানভার্স ক্যারুর হত্যাকারী। পুলিশ যাকে সারা লণ্ডনে হন্নে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার স্বীকারোক্তি এখানেই শেষ, তারপরেই আমার স্বাক্ষর।—হেস্টি ল্যানিয়ন।'

।। চোদ্দ ।।

ঃ যমজ শুভ ও অশুভ ঃ

ডাঃ ল্যানিয়নের চিঠিটা পড়া শেষ করতেই মিঃ আটারসন ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকলেন। তিনি এখন জেনে গেছেন যে, তাঁর অফিসঘরে সেই ভয়ঙ্কর দানবটা খুন হওয়ার পর হেনরী জেকিল আত্মগোপন করেননি। তবে সারা পৃথিবী অবশ্য জানবে, অখ্যাত মিঃ হাইড মৃত এবং ডাঃ জেকিল এক অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে অদৃশ্য হয়ে গেছেন লোকচক্ষুর আড়াল থেকে। ওঁদের দু'জনকে লণ্ডনের রাস্তায় আর কখনো দেখা যাবে না, যদিও মিঃ আটারসনের চিন্তার জগত থেকে ওরা কখনো বাইরে সরে থাকতে পারবেন না।

কিন্তু আটারসন বেশ বুঝতে পারলেন, ডাঃ জেকিলের অমন সুন্দর জীবনের এমন শোচনীয় বিয়োগান্তক পরিণতি হলোই বা কি করে, সেটা অবশ্যই তাঁকে জানতে হবে, যেভাবেই হোক না কেন। ডাঃ ল্যানিয়নের মতো তিনি এখন এতো দূরে এগিয়ে এসেছেন যে, সেখান থেকে তাঁর পক্ষে ফেরার আর কোনো উপায় নেই। অতএব, তাঁর হাত কাঁপলেও জেকিলের দেওয়া তাঁর স্বীকারোক্তির শীলমোহর করা খামটা খুললেন এবং ডক্টরের কথাগুলো পড়তে শুরু করলেন এইভাবে ঃ—

'আমি হেনরী জেকিল, এক সম্ভ্রান্ত ভালো পরিবারে আমার জন্ম। আমি বুদ্ধিমান এবং স্বাভাবিক প্রকৃতিগতভাবেই আমি পরিশ্রমী। তবে যদি বা আমার কোনো মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে, তার কারণ কিছুটা অসতর্ক লঘু প্রকৃতি এর জন্য দায়ী। আমি অকপটে স্বীকার করছি, একটা সুন্দর মন ও প্রাণের টানে কখনো কখনো আমি একটু চঞ্চল ও চপল হয়ে উঠি। আর তখনি হয়তো একটু অসতর্ক হয়ে উঠি। এসব কথা ভেবেই আমি কিন্তু যতদূর সম্ভব এই ভাবটাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম, তাতে কিছুটা সাফল্যও যে পাইনি তা নয়; আমার এই প্রচেষ্টার মূলে ছিল আমার স্বভাবজাত বাসনা, আমি সম্মান পেতে চেয়েছিলাম এবং সেই সঙ্গে আমার পরিচিত সমস্ত মানুষজনের সম্মতি পেতে চেয়েছিলাম। তাই আমার প্রথম জীবনে আমি দ্বৈত-সত্তার জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

'আমার যৌবনকালের কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো পাপকাজ ছিল না। বস্তুতপক্ষে অন্য কেউ হলে এ ধরনের উচ্চমনন এবং কখনো বা অন্য জীবনে তলিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে বেশ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জাহির করতে চাইতো। কিন্তু আমি তাদের মতো নই, আমার মধ্যে এমন একটা উচ্চ ধারণা ছিল যে আমার মধ্যে সামান্য একটু দোষ-ত্রুটি দেখা দিলে আমি লজ্জাবোধ করতাম। এই সব দোষ-ত্রুটি আমি আড়াল করতে চাইতাম, লোকালয়ে সেটা প্রকাশ করতে চাইতাম না। সেটা আমাকে অস্থির ও অসুখী করে তুলতো। নিজের এই মানসিক অবস্থার কথা ভেবে আমি সাধারণভাবে মানব-চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে দিলাম।'

'নিজেকে আমি কখনোই ভণ্ড বলে মনে করি না। এমন কি আমি যা নই তা হবার জন্যও কখনো চেষ্টা করিনি। দিনের পর দিন আমি নিজেকে লোকসমক্ষে একজন ভালো মানুষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে এসেছিল এবং একজন ভালো চিকিৎসক হিসেবে আমার রোগীদের রোগ-যন্ত্রণা নিরাময় করে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছি। তবে আমি যে সুখ ও শান্তি পেয়েছি তা অতুলনীয়। আর সেই সুনামের ভাগীদার আমি। আবার যখন আমি অসতর্কভাবে কোনো জঘন্য ও লজ্জাস্কর কাজে জড়িয়ে পড়তাম, তখন তার জন্য নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলেই মনে হতো আমার। এই হলো আমার জীবনের দ্বৈত সত্তা! আমি আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার ফলে আমি এই সত্যে উপনীত হই যে, সত্যিকারের একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব একটি নয়, আসলে কিন্তু দুটিই! কিন্তু আমার এই গবেষণালব্ধ আবিষ্কার কার্য আংশিকমাত্র। আমার বিশ্বাস, আমার পরে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-গবেষকরা এটাই আবিষ্কার করবেন, কোনো মানুষের মধ্যে একটি নয়, দুটি নয়, আছে বহুব্যক্তিত্ব। একের মধ্যে বহু মানুষ যাকে বলে আর কি!'

'এখানে বলে রাখি, মানুষের এই দ্বৈতসত্তা প্রমাণ করবার জন্য গবেষণা, তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অনেক আগে থেকেই আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, মানুষের এই দুটি সত্তাকে আলাদা করে দিতে, অর্থাৎ মানুষের শুভ ও অশুভ সত্তাদুটি থাকবে দুই ভিন্ন দেহে। সেরকম যদি করতে পারি, তাহলে এই যে আমি অস্থির ও অসুখী জীবন যাপন করছি, এরকম অভিজ্ঞতা অন্য আর কাউকে লাভ করতে হবে না। 'শুভ' অংশটা যদি 'অশুভ' থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা একটা দেহে জায়গা করে দেওয়া যায় তাহলে সেই দেহধারী মানুষ সব সময়েই মাথা উঁচু করে বিচরণ করতে পারবে। তার মধ্যে তখন অশুভ অংশটা না থাকার দরুণ সেই অংশের খারাপ কাজের জন্য শুভ অংশকে কোনোভাবেই বিব্রত হতে হবে না। একই মানুষের মধ্যে এই যে যমজ দুটি সত্তার লড়াই তখন স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে তখন এই শুভ ও অশুভের টানাপোড়েন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। নিজের খুশীমতোই কাজ করতে পারবে।'

আমি যখন আমার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করলাম, আমি তখন কয়েকটা যৌগিক পদার্থের সন্ধান পেলাম, যার প্রভাবে মানুষের দেহের মাংসের পরিবর্তন সাধন হতে পারে। এর সঙ্গে বাতাসের তুলনা করা যায়, বাতাস যেমন পর্দাকে আন্দোলিত করে তোলে, অনুরূপভাবে সেই যৌগিক পদার্থ মানুষের মাংসকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে। আমি কিন্তু দুটি কারণে আমার এই গবেষণালব্ধ কাজের ফরমুলা লিখে যাবো না এখানে। প্রথম কারণ হলো, আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা গবেষণা অসম্পূর্ণ, এই স্বীকারোক্তিটাই তার প্রমাণ দেবে। মানব চরিত্রের শুভ ও অশুভ এই দুটি যমজ অংশকে বিচ্ছিন্ন করবার ক্ষেত্রে আমি কেবল একটা স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলাম। আমার দ্বিতীয় কারণ হলো, এখন আমি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আমরা আমাদের জীবনের বোঝা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি না। কোনোরকম ঝামেলা বা বিপদের মধ্যে না পড়ে আমরা নিরবিচ্ছিন্ন সুখের মুখ দেখতে পারি না। সুখ নামক বস্তুটিকে আমরা যতোই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করি না কেন, অসুখী ভাবটা ঠিকই ফিরে এসে হানা দেবে আমাদের সুখের সাম্রাজ্যে।'

'দীর্ঘদিন ধরে আমি আর নিজের মনটাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। মানুষের ওপর

আমার গবেষণালব্ধ ফল প্রয়োগ করবো কিনা। আমি বেশ ভালোভাবেই জানতাম, তা করতে গেলে অতিরিক্ত ডোজ ব্যবহার করবার সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যায়, যার ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে যায়। কিন্তু যেহেতু আমার আবিষ্কৃত তরল পদার্থটি একেবারে নিখুঁত, আমি চুপ করে আর থাকতে পারলাম না। সেই আবিষ্কারের প্রলোভনে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি যেন আমার মন থেকে উধাও হয়ে গেলো। আমি তখন শেষ মিশ্র বস্তুর কিছু উপাদান কিনলাম,—একটা বড় পরিমাণের সাদা লবণ। একদিন গভীর রাতে সেই উপাদানগুলো মেশালাম। একটু পরেই তরল পদার্থের মিশ্রণ টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো এবং তা দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। সেই সঙ্গে তরল পদার্থের রঙ বদলে যেতে থাকলো একটু একটু করে। সেই তরল পদার্থের গ্লাসটা আমার হাতের মুঠোয় ধরে রেখে আমি একটু ইতস্তত করলাম এই ভেবে যে, আমি জানি, এটা পান করলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তা জেনেও এবার আমি সমস্ত দ্বিধা, জড়তা আর ভয় কাটিয়ে উঠে এক ঢোকে সমস্ত তরল পদার্থটা আমার গলায় ঢেলে দিলাম।'

'সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলো। আমি তখন অসুস্থ বোধ করলাম, সেই সঙ্গে এক অদ্ভুত অনুভূতি। কিন্তু এই অনুভূতিটা মুহূর্তের জন্য। আর তারপরেই অন্য এক অনুভূতি জাগলো আমার মনে, মনে হলো যেন দীর্ঘ রোগভোগের পর আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। তবে আমি আমার মধ্যে একটা অশুভ পরিবর্তন যেন অনুভব করলাম। আমার মধ্যে থেকে আমার আগের 'আমি' যেন হারিয়ে গেছে। আমি তখন এক তরতাজা যুবকে পরিণত হয়ে গেছি, আরও বেশী সুখী হয়ে গেছি। সেই সঙ্গে আমি তখন অনেক হালকা হয়ে গেছি। একটা নতুন মিষ্টি অনুভূতিতে আমার সারা দেহ মন তখন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। আমি তখন মুক্ত হয়ে কোনো অসৎ কাজ করতে পারি স্বাধীনভাবে, আমি তখন কাউকে পরোয়া করি না। আমি স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠতে পারি, এটা ক্ষমাহীন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য আমি তখন ভীষণ উদ্গ্রীব। আমার সেই অনুভূতিটা তখন মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া বলে মনে হলো। আমি তখন আমার এই নতুন পরিবর্তিত রূপটাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমার হাতদুটি ছুঁড়ে দিলাম সামনের দিকে। হাতদুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে দিতেই বুঝতে পারলাম, আমার পরনের জ্যাকেটের হাতাদুটো আমার হাতদুটি ঢেকে দিয়েও অনেকটা ঝুলে রয়েছে। এর অর্থ হলো, চেহারায় আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছি আমি। সেই সময় আমার অফিসঘরে কোনো আয়না ছিল না। যদিও পরে একটা প্রমাণ সাইজের আয়না টাঙিয়ে ছিলাম সেখানে। বাড়ির চাকর-বাকরদের ঘুম যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্য আমি বেড়ালের মতো অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চোরের ভূমিকায় নিজের শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে একটা আয়না ছিল। সেখানেই আমি আমার নতুন রূপ দেখতে পাবো। নিজের ঘরে এসে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে আমি সেই আয়নাটার দিকে তাকালাম। আয়না কখনো মিথ্যে বলে না। সেই প্রথম আমি দেখলাম, আমি এডওয়ার্ড হাইড বনে গেছি।'

'হাইড কেন জেকিলের থেকে চেহারায় ছোট হবে এবং বয়সে তরুণতর হবে, একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি তার ব্যাখ্যা করছি এখানে। হাইডের দেহটা নতুন, তার দেহটার ব্যবহার কম হওয়ায় তার ক্ষয়ও কম হয়েছে। আর একটা কারণ হলো, জেকিলের দ্বৈতসত্তার জীবনের দশভাগের নয়ভাগ কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে এবং এর ফলে তার দেহটার অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে। সে

এখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে। অথচ সে জায়গায় হাইড এখন বয়সে অনেক বেশী তরুণ। সে এখন তার অসৎ জীবন-যাপনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আয়নার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম, হাইডের সারা মুখ ছেয়ে গেছে এক অশুভ ছায়ায়। কিন্তু সে আমাকে বিরক্ত করলো না কিংবা তার উপস্থিতিতে আমি কোনোরকম অস্বস্তিবোধ করলাম না। তাই আমি তাকে স্বাগত জানালাম। তার বদলে এই দেহ, এই মনটা তো আমারি, আমার আমি হয়ে গেছি তা দেহের আড়ালে, এটা তো আর মিথ্যে নয়! হাইড তো স্বাভাবিক এবং সর্বপরি সে একজন মানুষ! তার চেয়েও বড় কথা হলো, বিভক্ত মানুষ নয় সে। তার মধ্যে দুটি পৃথক সত্তার বালাই নেই। সে একক, অনন্য!'

'আমি জানি, এই মুহূর্তে হাইডকে এ অবস্থায় যে দেখবে, সে-ই তাকে অপছন্দ করবে, তার ওপর বিরাগভাজন হবে। এর একটা সঙ্গত কারণও অবশ্য আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভ দুটি দিকই আছে, কিন্তু হাইড তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সে শুধুই অশুভ শক্তি সম্পন্ন একটা অমানুষ। অসৎ প্রকৃতির লোক। তাই তার সম্পর্কে সব মানুষের অনুভূতি এই রকমই কেবল!'

'আয়নার সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আমার হলো না। দ্রুত আমার অফিসঘরে ফিরে এলাম। সেখানে ফিরে গিয়ে আমি আবার সেই সব পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে গলাধঃকরণ করলাম। আমার শরীরের মধ্যে হেনরী জেকিল আবার ফিরে এলো।............সেটাই শুরু।'

'সম্ভবত আমি যদি আরও মহৎ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাতাম, তাহলে ব্যাপারটা হয়তো অন্যরকম দাঁড়াতো। আমার ভিতরকার দুটি সত্তার মধ্যে জেকিল ছিল তখন ভালো আর মন্দের মেশানো একটা মানুষ। অথচ হাইড হলো কেবলি মন্দেয় ভরা, শয়তানের প্রতিভূ! অতএব হাইড যখন মুক্ত হতো, আমার গতি-প্রকৃতি সবকিছুই তখন নিম্নমুখী হয়ে উঠতো, সবকিছুই খারাপের দিকে চালিত হতো। তারপর থেকে আমার দুটি সত্তার মধ্যে পারাপারি করে কখনো জেকিল, কখনো বা হাইডের রূপ ধারণ করতাম। যখনি ওষুধপত্র, বিজ্ঞান আর আমার যথাযোগ্য বন্ধুদের সঙ্গ আমার কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হতো এবং একঘেয়ে হয়ে উঠতো, তখনি আমি হাইডে রূপান্তরিত হয়ে যেতাম একটা কুৎসিৎ আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। আর এভাবেই একটু একটু করে জেকিল যেন ক্রমশই হাইডের দাসে পরিণত হয়ে যেতে থাকলো। তবে এই ভাবটাকে আমি ভালোবেসে ফেললাম।

'হাইড রূপে কুৎসিৎ ও উন্মত্ত আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার জন্য আমি সোহো অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। আমার বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছে আমি হাইডের চেহারার বর্ণনা দিলাম। তাদের আবার এও বললাম, আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়িতে তাকে যেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়। আমার হুকুম বা নির্দেশ মেনে চলতে হবে তাদের। আমার 'উইলে' হাইডকে আমার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেছি এই কারণে যে, অর্থের অভাবে তাকে যেন কষ্ট পেতে না হয়। তবে সেই 'উইল'টা আমার বন্ধু ও আইনজীবি মিঃ আটারসনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, বরং তাতে সে ক্রুদ্ধ এবং আহত হয়েছিল। কিন্তু আমি সুখী হলাম। আমার মন্দকাজের কি পরিণাম হবে সে কথা না ভেবেই তারপর থেকে আমি একটার পর একটা অনৈতিক কাজ করে যেতে থাকলাম। আমি জানতাম, যতো খারাপ অপরাধই করুক না

কেন, তার শাস্তি পাবার কোনো ভয়ই ছিল না। কারণ তার একটা বাড়তি সুবিধে হলো, অপরাধ করবার পরেই সে জেকিলে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারতো। আর ডাঃ জেকিল হলেন একজন অতি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাই তিনি ছিলেন সব সন্দেহের উর্ধ্বে। এইভাবে এডওয়ার্ড হাইড রূপে অন্যচরিত্র আর মদের নেশায় মাতাল হয়ে আমি লণ্ডন শহরে হরেক রকমের দুর্বৃত্তমূলক ও জঘন্য কাজ করে বেড়াতে থাকলাম। অতি শীগ্‌গীর জেকিল টের পেলেন, তিনি আর বিবেকের তাড়নাও বোধ করতেন না। তিনি তাঁর মনকে এই বলে প্রবোধ দিতেন যে, প্রকৃত অপরাধী তো হাইড। জেকিল তো নির্দোষ।'

'অবশ্য হাইড সব সময় তার কাজের কুফল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে পারতো না। এক রাতে হলো কি একটা বাচ্চা মেয়েকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো সে। এই অপরাধের ক্ষেত্রে পালাবার পথ সে আর পেলো না। মেয়েটির আর্ত চিৎকার শুনে তার বাড়ির লোকজন এবং কিছু পথচারী ছুটে এসে জড়ো হয়েছিল সেখানে। তারা তাঁকে এমন ভয় দেখালো যে, জেকিল নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খেসারত হিসাবে চেকে মোটা টাকা দিতে রাজী হওয়াতে সে যাত্রায় সে রেহাই পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু চেকে জেকিলের সইটাই ব্যবহার করতে হলো তাঁকে। 'পরের দিন আমি আমার হাতের লেখাটা একটু হেরফের করে হাইডের নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললাম, যাতে করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধ করলে ক্ষতিপূরণ মেটানোর জন্য হাইডই চেক সই করতে পারে। এর পর থেকে সবসময়েই সে তার প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে তার প্রয়োজন মতো টাকা তুলতে পারবে।'

'স্যার ড্যানভার্স ক্যারুর হত্যাকাণ্ডের দু'মাস আগে আমি এক রাতে শহরে নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম। সাধারণত, আমি যখনই সোহোতে হাইডের ছদ্মবেশে ফিরে যেতাম, তখন ভাড়া বাড়িতেই গিয়ে উঠতাম। কিন্তু পরের দিন সকালে জেকিলের একটা জরুরী সাক্ষাৎকার ছিল। তাই আমাকে আবার জেকিলে রূপান্তরিত হয়ে আমার নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে হলো। এবং যথারীতি ডাঃ জেকিলের ঘরেই শুতে হলো আমাকে। পরের দিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমি ভাবলাম কোথায় আছি আমি। আমি তখন নিজেকে হাইড হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে ঘুম জড়ানো চোখে আমি আশা করেছিলাম, আমি সোহোর সাজানো-গোছানো ঘরটাই দেখতে পাবো। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমি হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে নিজের হাতদুটির দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম, সেগুলো রোগাশীর্ণ, আঙুলগুলো গাঁটওয়ালা এবং গাঢ় রঙের লোমে ভর্তি। আরে, এ তো হাইডের হাত! জেকিলের হাততো লম্বা, সুগঠিত এবং ফর্সা। একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আমার মনের মধ্যে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। কি আশ্চর্য, আমার আবিষ্কৃত সেই ওষুধ না খেয়েই ঘুমের মধ্যেই আমি হাইডে রূপান্তরিত হয়ে গেছি? বিছনা থেকে নেমে আমি দ্রুত আয়নার সামনে ছুটে গেলাম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখামাত্র আর এক দফা চমকে উঠলাম। এটা সত্যি, খুবই সত্যি এই যে, রাতারাতি আমার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ না করেই আমি এখন হুবহু হাইড বনে গেছি।'

'গতকালরাত্রে আমি আমার শয়নকক্ষে হেনরী জেকিল রূপে শুতে গেছিলাম এবং এক বিন্দুও সেই মিশ্রণের তরল পদার্থ সেবন না করেই আমি আজ সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি, যে

আমি এডওয়ার্ড হাইড রূপেই প্রথম সূর্যের আলো দেখছি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এ কি করে সম্ভব হলো? কিন্তু এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে বার করার সময় আমার হাতে ছিল না। আমার সামনে তখন খুব একটা জরুরী কাজ অপেক্ষা করছিল, আর সেটা হলো, আমাকে আবার জেকিল বনে যেতে হবে। আর এখনি! কিন্তু এখন যে বাড়ির সব চাকর-বাকররা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। অথচ হাইড থেকে জেকিলে রূপান্তর ঘটানোর জন্য সেই ওষুধটা আনতে আমাকে বাড়ির অপর প্রান্তে আমার অফিসঘরে যেতে হবে। হয়তো আমি আমার মুখ ঢাকতে পারি, কিন্তু আমি আমার এই ছোট-খোটো চেহারাটা তো কোনোভাবেই ঢাকতে পারবো না। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম, যদি আমার কোনো চাকর আমাকে দেখে ফেলে, তাহলে বাড়ির এই অংশে হাইডকে দেখে তাকে খুবই অবাক হয়ে যাবে সে, কারণ বাড়ির এই অংশে সাধারণত সে কখনো আসে না। তাই আমি দ্রুত পোশাক পরে নিলাম। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ভয় কিসের! আমি হাইড রূপেই আমার অফিসঘরে যাবো। এডওয়ার্ড হাইড তো হেনরী জেকিলের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী সাহসী, যা চিরন্তন!'

।। পনেরো ।।

ঃ যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল দু'বার ঃ

আটারসন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন! চিঠিটা মুহূর্তের জন্য টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন হেনরী জেকিলের কথাগুলোর অর্থ উপলব্ধি করতে। এ যেন এক স্বপ্নের কাহিনী। স্বপ্ন স্বপ্নই, কখনো যা সত্যি হয় না। ঘুম ভেঙে গেলে সেই স্বপ্ন অসাড় হয়ে যায়। ডাঃ জেকিল আজ পর্যন্ত যতো সব অশুভ কাজ করে এসেছেন, সে সবই হাইডরূপে, যেখানে প্রকৃত জেকিলের কোনো ভূমিকাই ছিল না। ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন আটারসন। আর এই চিন্তা-ভাবনার জন্যই ডাঃ জেকিলের চিঠিটা শেষ পর্যন্ত না পড়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছিলেন মিঃ আটারসন। কিন্তু যে চিঠিটা তিনি হাতে পেয়েছিলেন সেটার প্রলোভন এতো বেশী যে, তিনি সেটা হাতে তুলে নিলেন আবার পড়বার জন্য এবং পড়তে শুরু করে দিলেন অতঃপর ....

জেকিল আরও লিখেছেন 'জেকিলের আয়নার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে গিয়ে আমার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম যা শেষের শুরুর সূচনা করছি। আমি তখন আর কালবিলম্ব না করে আমার শয়নকক্ষ থেকে সোজা অফিসঘরে গিয়ে হাজির হলাম। গ্লাসভর্তি সেই সব উপাদানের মিশ্রণ গলাধকরণ করে নিলাম। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি আবার হেনরী জেকিলে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম এবং তার প্রাতঃরাশ সারতে টেবিলের সামনে বসে পড়লাম। তারপরেই আমি উপলব্ধি করলাম, এডওয়ার্ড হাইড এখন অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমার আশঙ্কা, আমার দুটি সত্তার মধ্যে যে ভারসাম্যটা রয়েছে, সেটা হয়তো খারাপের দিকেই ঝুঁকে পড়বে, স্থায়ীভাবে! হাইডের অশুভ সত্তাটাই তখন আপনার ওপর ভর করে বসবে, আমি কখনোই আর জেকিলের ভালো দিকটার অধিকারী হয়ে উঠতে পারবো না। এ আমার কি হলো, এ আম কি করলাম?'

'ওষুধটা সব সময় নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে। প্রথমে নিজেকে হাইডে রূপান্তরিত করবার জন্য কখনো কখনো দ্বিগুণ ডোজ নিতাম। একবার তো সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি হাইড হতে পারিনি। এখন জেকিল থেকে হাইড হওয়াটা খুবই কঠিন হয়ে উঠলো। আমি বুঝতে পারলম যে, দুটি সত্তার মধ্যে থেকে একটা সত্তা আমাকে পছন্দ করতে হবে। স্থায়ী হাইডকে লোকে ঘৃণার চোখে দেখবে এবং সঙ্গীহীন হয়ে পড়বে সে একদিন। বন্ধু-বান্ধব বলে কেউ আর থাকবে না তখন। কিন্তু স্থায়ী জেকিল তার সব অশুভ কাজ ছেড়ে দেবে।' হয়তো সেজন্য তাকে কষ্টভোগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমি ডাঃ জেকিলের ভূমিকাটাই পছন্দ করলাম। পরবর্তী দু'মাস সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি হিসাবে বিরাজ করতে থাকলাম। এই সময়ে আমার মধ্যে হাইডকে কোনো স্থান করে নিতে দিলাম না। আমি আবার আগের মতো ডাঃ জেকিলের সম্ভ্রান্ত ও সংযত জীবন যাপন করতে থাকলাম।'

'আর তারপরেই একদিন ঘটনাটা ঘটলো। দীর্ঘকাল ধরে আমার দেহের খাঁচায় বন্দী হাইড যেন প্রচণ্ড ক্রোধে বাঘের মতো গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এলো। সেই রাতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্যার ড্যানভার্স ক্যারুর ওপর। তাঁকে ক্রমাগত আঘাত করতে করতে আমি যেন একটা উন্মত্ত পৈশাচিক আনন্দলাভ করতে থাকলাম। যতক্ষণ না আমার বেতের লাঠিটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁকে আঘাত করে যেতে থাকলাম। আমি নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছি। আমি তখন আমার সোহোর বাড়িতে ছুটে গেলাম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যেসব অপরাধ আমি করেছি, তার জন্য আমি উল্লসিত, আমি গর্বিত। স্যার ড্যানভার্সকে খুন করেই আমি বুঝে গেছলাম, পুলিশ এবার আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজবে, তাই তাদের চোখকে ধূলো দেবার জন্য আমাকে স্থায়ী একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি তখন সবার অলক্ষ্যে জেকিলের অফিসে গিয়ে খুশীর গান গাইতে গাইতে ওষুধটা আবার খেয়ে ফেললাম। হাইড উধাও, আমি এখন জেকিল। কার সাধ্য আমাকে ধরে। সবে মাত্র খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখেছি, নরহত্যার জেকিল নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলো জোরে জোরে। আমার দ্বিতীয় সত্তা হাইডকে আমি ধিক্কার দিলাম। আমি চিৎকার করে উঠে আমার ভয়ঙ্কর দ্বৈতসত্তাকে দোষারোপ করলাম। এখন হাইড পলাতক, পিছনের দরজা দিয়ে তার আবির্ভাব আর ঘটবে না। পিছনের দরজায় তালা লাগিয়ে আমি চাবিটা আমার পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে সেটা ভেঙে ফেলে দিয়েছি।'

আমি স্বীকার করছি, হাইড হতে চেয়েছিল জেকিল। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটাকে দমন করে আমি হাইডকে নিজের মধ্যে বন্দী করে রেখেছি। তাকে যে পুলিশ লণ্ডন শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছে এ কথা ভাবতেও ভয়ে আতঙ্কে আমার সারা শরীর যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যতোই আমার সেই আকাঙ্ক্ষাটাকে দমন করবার চেষ্টা করি না কেন, আমার হাইড হবার সুপ্ত কামনাই একদিন জেকিলকে পরাস্ত করলো। একদিন আমি পার্কের বেঞ্চে বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগে উঠলো, কেঁপে উঠলাম। আমার তখন জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো। তবে কিছু সময়ের মধ্যেই সেই ভাবটা আমার কেটে গেলো। মনে হলো, হঠাৎ আমি বুঝি খুব সাহসী হয়ে উঠেছি। আমার পোশাকের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, আমার পরনের পোশাক কেমন ঢিলে-ঢালা হয়ে গেছে। হাইডের একটা রোমশ হাত ধরে আছে আমার টুপিটা। টুপিটা হাইডের ছোট মাথার পক্ষে খুবই বড় লাগছে।'

'আমার পরিবর্তনের কারণ নিজের কাছেই এখনো বড় রহস্যময় যেন। তারপর হাইড সব সময়েই বড় ক্রুর এবং দুঃসাহস দেখাতে সিদ্ধহস্ত। আমার ওপর সে তার কর্তৃত্ব ফলালো, আমার মধ্যে থেকে জেকিল তখন উধাও হয়ে গেলো। আমার নিজের সব সত্তা, বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেলো আমি হাইডের অধীনে পরিচালিত। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হলো আমাকে এখনি ওষুধটা খেতে হবে। কিন্তু ওষুধ তো রয়েছে অফিসঘরে। সেখানে যেতে হলে আমাকে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, বাড়ির চাকর-বাকররা হাইডকে দেখতে পেলে ভয়ে চিৎকার করে উঠবে। এছাড়াও পুলিশের চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয়ও আছে। ওদিকে পিছনের দরজাটা আবার আমি নিজের হাতে বন্ধ করে এসেছি। আর চাবিটাও ভেঙে ফেলেছি। এখন উপায়? এখন একমাত্র উপায় হলো অন্য কারোর সাহায্যে নিজেকে জেকিল হিসাবে প্রতিপন্ন করা। কিন্তু সেই অন্য কেউ লোকটি কে হতে পারে যাকে বিশ্বাস করে আমি আমার গোপন পাপের কথা খুলে বলতে পারি, যে আমার এই দুরাবস্থার কথা শুনলে আমাকে বিশ্বাস করবে, তার সাহায্যের হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দেবে। আর সেই বিশ্বাসী মানুষটি হলেন একমাত্র ল্যানিয়ন।'

'যদিও আমি তখন হন্যে হয়ে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছিলাম, কিন্তু একটু আগে পর্যন্ত কোথাও যাওয়ার মতো সাহস আমার ছিল না, তবে এই মুহূর্তে কেন জানি না আমি কেমন করে একটু বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। অপরিসীম সাহস সঞ্চয় করে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমি একটা ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া করে একটা ছোট হোটেলে গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটা ঘর ভাড়া নিলাম এবং দুটি চিঠি লিখলাম, জেকিলের হস্তাক্ষরে। একটি চিঠি পাঠালাম পুলকে এবং অপরটি ল্যানিয়নকে। চিঠি দুটি ডাকে রেজেস্ট্রি করে পাঠালাম।

'মাঝরাতের কাছাকাছি আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে একটা ভাড়া ঘোড়ারগাড়িতে চেপে বসলাম ল্যানিয়নের বাড়িতে যাবার জন্য। ল্যানিয়নের বাড়ির কাছাকাছি এসে আমি গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। বাকি পথটুকু দ্রুত পায়ে হেঁটে গেলাম। ল্যানিয়নের বাড়িতে এসে দেখলাম সে আমাকে নিরাশ করেনি, আমার প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করে রেখেছে সে। ঢক্‌ঢক্ করে ওষুধটা গলাধঃকরণ করে ফেললাম। কিন্তু আমাকে দেখে তার সেই আতঙ্কভাব আর আমি যে অপরাধ করেছি, সে কথা ভেবে নতুন করে নিজেকে তার চোখে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হলো আমার।'

'তারপর আবার জেকিলে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম আমি এবং আমি আর একবার নিজের বাড়িতে নিরাপদ বলে মনে করলাম। ল্যানিয়নকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম।'

'কিন্তু পরের দিন প্রাতরাশের পর আমি যখন কোর্ট-ইয়ার্ড পেরোচ্ছিলাম, তখন আমি সেই একই কম্পন অনুভব করলাম, যা আমি সেদিন পার্কের বেঞ্চিতে বসে করেছিলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার মধ্যে আবার একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, হাইডের অশুভ সত্তাটা আবার আমার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে। আমার অফিস ঘরে ছুটে যাবার মতো যথেষ্ট সময় ছিল আমার হাতে।.....আর তারপর জেকিল যেখানে ছিলেন সেখানে হাইডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। জেকিলকে আমার মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য আমাকে দ্বিগুণ ডোজের ওষুধ খেতে হলো। কিন্তু ছ'ঘণ্টা পরে আমি আমার মধ্যে দৈহিক পরিবর্তনের যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সেদিন থেকে আমি কেবল সরাসরি ওষুধের প্রভাবেই জেকিল রূপে থাকতে পারতাম, জেকিলের শুভসত্তাটাকে ভালো কোনো কাজে লাগাতে পারতাম। রাতে ঘুমিয়ে পড়লে কিংবা দিনেরবেলায় চেয়ারে তন্দ্রাচ্ছন্ন

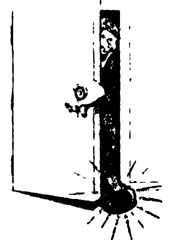
হয়ে পড়লে আমার ভেতর থেকে হাইড বেরিয়ে আসতো। হাইডের প্রতি আতঙ্কে এবং ঘৃণায় জেকিলের মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। অবশেষে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। এর পর শুরু হলো আমাদের মধ্যে সংঘর্ব, অস্তিত্বের লড়াই, যদিও চালাকি করার জন্য এখনও হাইডের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। নানান কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজ করবার সুযোগ পেয়ে গেলো। যে ধর্মগ্রন্থগুলি আমার খুব প্রিয় ছিল। যার প্রশংসায় আমি মুখর ছিলাম, তার পাতায় পাতায় হাইড ক্রোধমিশ্রিত নোংরা সমালোচনা করে লিখলো। অফিসঘরে আমার বাবার একটা ছবি টাঙানো ছিল, হাইড, সেটা পর্যন্ত নষ্ট করে ফেললো।'

'আমার গতিবিধি, কার্যকলাপ সবই সীমাবদ্ধ, এমনি অবস্থা আমার তখন। দিনের মধ্যে মাত্র কয়েকঘণ্টা আমি জেকিল রূপে থাকতে পারি। আর সেই সময়টুকুতেই আমি আমার এই স্বীকারোক্তি লিখছি। জেকিলরূপে বাঁচবার আশা আমার আর নেই। কারণ জেকিল রূপে দৈহিক রূপান্তরের জন্য যে পরিমাণ রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন তার মজুত ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে, মাত্র কয়েকদিন চলতে পারে। লণ্ডনের প্রায় সমস্ত কেমিস্টের দোকানে পাঠিয়েছি পুলকে। আসল লবণের অনুরূপ লবণ কিনে আনবার জন্য। কিন্তু কোনোটাই কার্যকর বলে মনে হয়নি আমার। এ পর্যন্ত তার আনা কোনো উপাদানই আমার ওষুধ তৈরীর কাজে লাগেনি। আমার অনুমান, প্রথম দফায় ওষুধের উপাদান হিসাবে যে রাসায়নিক লবণ আমি কিনেছিলাম, সেটা খুব একটা বিশুদ্ধ ছিল না। শুদ্ধ নয় এরকম উপাদানটার জন্যই বোধহয় মিশ্রণটা তৈরী করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন ওষুধ তৈরী করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমার আশঙ্কা, খুব শীগগির হাইডের হুকুমেই আমার জীবনটা সম্পূর্ণভাবে চালিত হবে।'

'আমি সবেমাত্র আসল লবণের শেষ অংশটা ব্যবহার করেছি। এরই মধ্যে আমি আমার এই স্বীকারোক্তি লেখার কাজ শেষ করে ফেলবো, আর তারপর কয়েক মিনিটের জন্য ডাঃ জেকিল হয়ে বসে থাকবো। এর পরেই আমি জেকিল মারা যাবো এবং হাইড দখল নেবে আমার দেহটাকে। ডাঃ জেকিল তাকে আর তার জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না, কারণ তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। জানি না হাইডের ভাগ্যে কি আছে! কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে তাদের হাতে মারা যাবে কিনা ঠিক করে জানি না। কিংবা পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আগে সাহস করে সে আত্মহননের পথটা বেছে নেবে কিনা তাও জানিনা। আর জানবার জন্য আমি তোয়াক্কাও করি না। আমি ছাড়াও এর সঙ্গে জড়িত আছে আর একজন।'

'আমি আমার দেহের মধ্যে ঈষৎ শিহরণ যেন অনুভব করছি। এটা হেনরী জেকিলের সত্যিকারের মৃত্যুর সময়.....বিদায়......বি......দ......।'

~ O ~



ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

মেরি শেলি

উত্তর মেরুর ভাসমান বরফের ছোট ছোট টুকরোগুলো ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, অচিরেই বরফের পাহাড়ে পরিণত হতে পারে, যা কিনা ভাসমান এই ছোট্ট জাহাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার হুমকির সামিল।

জাহাজের তরুণ ইংরাজ ক্যাপ্টেন রবার্ট ওয়াল্টন ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছিল, সে তার বিজয় উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য এই যে তার নাবিকদের জীবনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, সে কোনো ভুল করছে নাতো? কারণ আবিষ্কারের নেশায় সমুদ্র জাহাজ এর আগে কখনো জলে ভাসে নি। আর তীরভূমির মানুষও কখনো উত্তরমেরুর সমুদ্রে পাড়ি দেয়নি।

সে স্বপ্ন দেখে, উত্তর মেরুর কাছে ইউরোপ থেকে এশিয়ার মধ্যে সমুদ্র-পথ যদি সে আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে বিশ্বের সমস্ত মানবজাতিরই ওপকার হবে, তার সুফল ভোগ করবে তারা।

ওয়াল্টনের জন্ম এক বিত্তবান পরিবারে। তাই সে ইচ্ছে করলে সহজ ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারতো। কিন্তু সে পথে সে যায়নি। পরিবর্তে গত দীর্ঘ ছ'বছর ধরে সে তার জীবন কাটিয়ে আসছে জলপথেই একজন সাধারণ নাবিক হিসাবে কাজ করে। তার এই সমুদ্র-জীবনে এসেছে শৈত্য-প্রবাহ, অনাহার, তৃষ্ণা, নিদ্রাহীন রাত্রি, আর নিষ্ঠুর নিয়মানুবর্তিতা, এসব কিছুই সে মনের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে করে এসেছে এই সুদীর্ঘ এবং বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় তার দেহ ও মনকে ওপযোগী করে তোলবার প্রস্তুতির জন্য।

কিন্তু এখন ওই পাহাড়-সমান বরফের চাঁইয়ের দূরন্ত গতিতে ছুটে আসার দরুণ তার জাহাজ এবং নাবিকদের জীবন বিপন্ন। তার সন্দেহ এর ফলে তাদের মধ্যে একজন ইংলণ্ডে আবার তাদের বাড়ি-ঘর ও পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে কিনা!

এছাড়াও আর এক মহাবিপদ হলো ঘন কুয়াশা! সারাটা সকাল ধরে ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল জাহাজের চারপাশ। দুপুর দুটো নাগাদ সেই কুয়াশা একটু একটু করে সরে যেতে থাকে। আর সেই কুয়াশা সরে যেতেই বরফের ওপর একটা অদ্ভুত দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেলো।

'ক্যাপ্টেন, ওই দিকে তাকিয়ে দেখুন ক্যাপ্টেন!' একজন নাবিক প্রায় আধমাইল দূরে একটা গাঢ় রঙের বিন্দুর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিৎকার করে উঠলো। 'স্যার, ওটা একটা স্লেজ! এই সব কুকুরটা তাদের দেহটাকে অনায়াসে শূন্যে তুলে ধরতে পারে, দেখে মনে হবে তাদের পায়ের সঙ্গে বুঝি একজোড়া ডানা লাগানো আছে!'

ওয়াল্টন তার টেলিস্কোপটা তার চোখের ওপর তুলে ধরলো। 'ওই চালকটার দিকে তাকিয়ে দেখো!' চিৎকার করে উঠলো সে। এমন একটা দৈত্যসমান মানুষ এর আগে আমি কখনো দেখিনি। যে কোনো তীরভূমি থেকে শত শত মাইল দূরে হিমায়িত সমুদ্রের মাঝে কি করছে লোকটা এখানে?'

ক্যাপ্টেন তার বিস্ময়ভাবটা কাটিয়ে ওঠার মিনিট কয়েক পরেই অবশ্য সেই রহস্যময় ভ্রমণকারী বরফের ওপর উধাও হয়ে গেলো ওয়াল্টন আর তার নাবিকদের স্তম্ভিত এবং বাক্যহারা করে দিয়ে।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওয়াল্টন ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালো। তবে তার আগেই তার নাবিকরা ডেকের রেলিংয়ের ওপরে ঝুঁকে পড়ে স্পষ্টতই নিচে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল।

'বৎসগণ, কি হচ্ছে এখানে?' রেলিংয়ের ধারে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'স্যার, ওটা একটা স্লেজ,' একজন নাবিক উত্তরে বললো, 'গতকাল আমরা যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক সেরকমই এটা।'

তাদের দেখাদেখি ওয়াল্টনও রেলিংয়ের ওপর ওকে পড়ে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলো সামনে সমুদ্রের দিকে। তাদের জাহাজটার দিকে ধেয়ে এগিয়ে আসা একটা বিরাট বরফের চাঁইয়ের ওপরে একটা স্লেজ, কুকুরের একটা দল এবং একজন চালককে দেখতে পেলো সে। সব প্রাণীগুলোকেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেলো এবং হিমায়িত-আবরণে ঢাকা একটি লোক চালকের আসনে বসে আছে, সেই বরফের চাঁইটাকে নৌকার মতো একটা কাঠের টুকরো দিয়ে দাঁড় বেয়ে চালিয়ে নিয়ে আসছে। দেখে মনে হলো, এই লোকটিই একা জীবিত রয়েছে।

'আমরা গতকাল যে স্লেজটিকে দেখেছিলাম এটা ঠিক সেরকম নয়, ওয়াল্টন তার লোকেদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'আর এই লোকটিও সেই দৈত্যসমান জীবের মতোও নয়। যেটা গতকাল আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছলো।'

'এই যে এখানে আমাদের ক্যাপ্টেন এসে গেছেন,' নিচে লোকটির উদ্দেশ্যে একজন নাবিক বলে উঠলো, 'সম্ভবত আমাদের জাহাজে উঠে আসবার জন্য উনি তোমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'হায় ঈশ্বর! দেখছি, তুমি তো প্রায় মৃতপ্রায়!' লোকটির উদ্দেশ্যে বলে উঠলো ওয়াল্টন। 'যাই হোক, আমার লোকেরা তোমাকে জাহাজে তুলে আনবার ব্যবস্থা করবে তোমার কোনো চিন্তা নেই। তুমি হয়তো এ যাত্রায় বেঁচে যাবে।'

'ধন্যবাদ স্যার,' উত্তরে লোকটি বিনীত হয়ে দুর্বল গলায় বললো, 'কিন্তু প্রথমেই আমি জানতে চাই, আপনার এই জাহাজটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে।'

কোনো মৃত্যুপথযাত্রীকে অন্য কেউ নিজের থেকে আগ্রহ দেখিয়ে তাকে বাঁচাতে গেলে সে যে তাকে এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করতে পারে তা জানা ছিল না ওয়াল্টনের, তাই লোকটির প্রশ্ন শুনে ওয়াল্টন খুবই বিস্মিত হলো। কিন্তু তা সত্বেও লোকটির সঙ্গে কৌতুক করবার লোভটা সামলাতে পারলো না ওয়াল্টন। সে তার উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো, 'আমরা উত্তর মেরুর কাছে সমুদ্র আবিষ্কার করবার জন্য ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

লোকটি মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'উত্তর মেরু জায়গাটা ভালো। এই বলে সে তাকে জাহাজে তোলবার জন্য নাবিকদের অনুমতি দিলো অতঃপর।

তাকে ডেকে তোলা হলে জাহাজের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললো, 'তার পা দুটি প্রায় হিমায়িত হয়ে গেছে স্যার, আর তার দেহটা এতো পাতলা শীর্ণ যে, তার দেহের হাড়গোড় তার পোশাক ভেদ করে ফুটে উঠেছে।

'ঠিক আছে, এখনি ওর গায়ে কম্বল জড়িয়ে জ্বলন্ত স্টোভের সামনে ওকে শুইয়ে দাও।' ওয়াল্টন হুকুম করলো। সে আরও বললো, 'ওর শরীরটা গরম হয়ে গেলে ওকে একটু সুপ খেতে দিও। তারপর ওকে আমার কেবিনে নিয়ে এসো। সেখানে আরামবোধ করবে সে, আর আমি নিজেও ওর যত্ন নিতে পারবো।'

দু'দিন লোকটি কোনো কথা বলতে পারলো না। তার চোখের বন্য চাহনি এবং প্রায়শই তাকে দাঁত কড়মড় করতে দেখে ওয়াল্টন দারুণ ভয় পেয়ে গেলো এই ভেবে যে, ক্রমাগত কষ্টভোগ করতে করতে লোকটি হয়তো পাগল হয়ে গিয়ে থাকবে। এরকম হয়ে থাকে। তবুও তা সত্ত্বেও এক এক সময় দেখা যায়, যখন কেউ তার প্রতি দয়া দেখায় এবং তাকে সাহায্য করে, তখন তার চোখের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ছায়া পড়তে দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত লোকটি যখন কয়েকটি কথা উচ্চারণ করলো, ওয়াল্টন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'স্লেজদের মধ্যে বরফের চাঁইয়ের ওপর কি করছিলে তুমি?'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠতে দেখা গেলো। তেমনি বিষণ্ণস্বরে সে উত্তর দিলো, 'একটা স্লেজে আমার মতো দেখতে একটি লোককে আমি খুঁজছি।'

'আমরা তাকে দেখেছি,' ওয়াল্টন তাকে বললো, 'তোমাকে আমাদের জাহাজে তোলবার আগের দিন আমরা তাকে দেখেছি।'

এই খবর শুনে আগন্তুকের চোখদুটি কেমন বিস্ফারিত হয়ে উঠলো এবং বালিশ থেকে মাথা তুলে উঠে বসলো সে। 'ওই পিশাচটা কোন্ পথ গেছে বলতে পারেন?' ঢোক গিলে সে আবার জিজ্ঞেস করলো ঃ 'তার সঙ্গে কতোগুলো কুকুর ছিলো, জানেন? কতোই বা খাবার ছিল? আমাকে জানতেই হবে! তাকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে!'

'বন্ধু, শান্ত হও,' ওয়াল্টন তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, 'তুমি খুবই অসুস্থ, তাই তোমার পক্ষে এরকম উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগন্তুক বললো। 'আপনি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। আপনি আমার ব্যাপারে যে খুবই কৌতূহলী, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু আমার দুঃখ-দুর্দশা এতো বেশী গভীর যে, এখনো এ ব্যাপারে আমি কথা বলবার মতো তেমন শক্তি পাইনি। কিন্তু দয়া করে একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন, ঠিক সময়ে আমি আপনাকে ঠিক মতো খবর দেবো। আমি বেশ কিছু ভয়ঙ্কর গোপন খবর জানি, যা আমি শপথ নিয়ে বলছি, খুব শীগ্গীর আমি সেটা আপনার সঙ্গে ভাগ করে নেবো।'

ওদিকে দিন যায় এবং লোকটির শক্তি ফিরে আসতে থাকে একটু একটু করে। স্লেজের খোঁজে ডেকে যাবার জন্য জোর করতে থাকে সে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ওয়াল্টন যখন বললো, তার আবিষ্কারের স্বপ্ন সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়, সে তখন আনন্দে উল্লসিত হয়ে তার মত পরিবর্তন করে বসলো।

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু,' তরুণ ইংলিশম্যান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো, 'আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে উৎসর্গ করবো। এমন কি এই সমুদ্রপথে ভ্রমণে যদি কোনো জ্ঞানার্জনের সম্ভাবনা থাকে তার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। হয়তো কিছু পাবার জন্য সামান্যই মূল্য দিতে হবে, কিন্তু সেই পাওয়াটার ফলভোগ করবে সারা মানবজাতি।'

আগন্তুক দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো এবং তার আঙুল গলে চোখের জল কয়েক ফোঁটা হয়ে টপটপ করে ঝরে পড়তে থাকলো। 'ওভাবে কথা বলবেন না! আপনি তাহলে একজন অসুখী মানুষ হয়ে যাবেন!' চিৎকার করে বলে উঠলো সে, 'আমি আপনাকে এমন একটা গল্প বলবো আপনি দেখবেন জ্ঞানার্জনের জন্য আমি কিভাবে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। অবশ্য তার জন্য আমার একটুও দুঃখ নেই। কারণ আমার বিশ্বাস, আমার এই প্রচেষ্টা মানুষেরই মঙ্গলের কাজে লাগবে। এর ফলে আমি প্রত্যেকের জীবনে দুঃখ ও মৃত্যুর পরোয়ানা এনে দিয়েছি, যাদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে ভালোবাসি আর এখন আমি নিজেই প্রায় মৃত্যুর শিয়রে এসে ওপনীত হয়েছি। তাই বলছি বন্ধু আপনার জীবনে তা ঘটতে দেবেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, মানুষের জন্য আপনি বেঁচে থাকুন, আপনি সুস্থ থাকুন।'

'সম্ভবত তোমার দুর্ভাগ্যের কথা বলে তুমি নিজেই নিজেকে সাহায্য করবে।' ওয়াল্টন নম্রভাবে বললো, 'আর সম্ভবত সাহায্যের জন্য আমিও কিছু করতে পারি।'

'আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ,' লোকটি বললো, 'কিন্তু কোনো কিছুই আমার ভাগ্যকে বদলাতে পারবে না। বেঁচে থাকতে থাকতে আমাকে আর একটা কাজ করতে হবে, তারপর আমি শান্তিতে মরতে পারবো।'

এরপর তারা ডেক থেকে নিচে নেমে এলো এবং লোকটি তার কাহিনী শুরু করলো এই ভাবে ঃ

।। দুই ।।

ঃ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাহিনী শুরু ঃ

আমার নাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, আর বংশ পরম্পরায় আমাদের পরিবার সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা সরকারের কাছ থেকে খুবই সম্মান লাভ করে থাকে। আমার অভিভাবকরা আমাকে আর আমার দুটি ছোট ভাই আর্নেস্ট ও উইলিয়ামকে বড়ো করে তোলেন, এক মহৎ ইতালীয় পরিবারের একজন অনাথ কন্যা এলিজাবেথ ল্যাভেঞ্জাকে আমাদের পরিবারের মধ্যে এনে রাখেন। এলিজাবেথ আমার থেকে বছর খানেকের ছোট হবে, আর আমি ওকে আমার বোনের মতো সত্যিকারের ভালোবাসি। এমন কি আমি ওকে আমার খুড়তুতো বোন বলে সম্বোধনও করি। আমরা বড়ো হয়ে গেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুজনে এক সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটাই। সুইজারল্যাণ্ডে পাহাড় ও হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে খুব ভালোবাসে এলিজাবেথ। ...... অন্যদিকে প্রকৃতিতে আশ্চর্য সব জিনিস কেন ঘটে তা জানতে আমি বেশী আগ্রহী।.......আমি আবার এও জানতে আগ্রহী, আকাশ ও পৃথিবী আমার কাছ থেকে কি গোপন করতে চায়!

আমি যখন স্কুলে পড়তে শুরু করি, হেনরী ক্লারভালের সঙ্গে চিরজীবনেব বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করি। হেনরী খুবই কর্মঠ ছিল, সেই সঙ্গে তেজস্ব ছেলেও ছিল সে। বীরোচিত নাইটদের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী লিখে আনন্দ উপভোগ করে সে। তার সঙ্গে সে আমাকে তাদের ভূমিকায় অভিনয়ও করিয়ে নেয়।

কি সুন্দর ছেলেবেলাই না ছিল আমার। দয়ালু মহৎ ও উদার অভিভাবক একটি আদরের বোন, দুটি সুখী ছোট ভাই এবং কৌতুক-প্রিয় একটি বন্ধু.....এ সবই.....আমার জীবনটা শুরু হওয়ার সময়

থেকে প্রকৃতির যে সব গোপনীয়তা মানবজাতির কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলো প্রকাশ করার যে প্রচণ্ড আকাঙ্খা আমার মনে জেগে উঠেছিল তা কার্যকর করার আগেই হয়তো চলে যেতে হবে আমাকে.....।

কিন্তু আমার বয়স যখন মাত্র তেরো, বিজ্ঞানে আমার কেবল আগ্রহ ছিল রোগ নিরাময়ের পথ আবিষ্কার করা, মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা.....

আপনিই বলুন স্যার, আমার ছেলেবেলার এইসব স্বপ্নগুলো কতোই না মহৎ ছিল, তাই না!

আমার বয়স যখন পনেরো, একটা প্রচণ্ড বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টি আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের আর একমাত্রা যেন বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের বাড়ির কাছে একটা ওক গাছের ওপর হঠাৎ একদিন বাজ পড়াতে আমার মনে ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে সেই গাছটা পুড়ে যায়, কেবল অবশিষ্ট থেকে যায় পোড়া কাঠের একটা কঙ্কাল।

এই রকম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি। সেই সময় হঠাৎ আমি ওপলব্ধি করলাম, অবিশ্বাস্য হলেও ধ্বংস করবার কি ভয়ঙ্কর অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে বিদ্যুতের! আর তারপর থেকেই আমি অবাক হয়ে অন্বেষণ করতে থাকি, আমার তখন খুবই জানার ইচ্ছে, পৃথিবীর কাছ থেকে, পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে বিদ্যুৎ আরও কি অজানা শক্তি লুকিয়ে রাখতে পারে! আমার এই অদম্য কৌতূহল সতেরো বছর পর্যন্ত জাগ্রত ছিল আমার মনের মধ্যে এবং জার্মানীর একটা স্কুল ইউনিভার্সিটি অফ ইঙ্গোলস্টাডে পড়াশোনা করবার জন্য বাড়ি ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি।

যাই হোক, বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে আমার জীবনে আমাকে প্রথম দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হয়। এলিজাবেথ ভয়ঙ্কর লালবর্ণের ফুসকুড়ি জাতীয় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার জীবন খুবই বিপজ্জনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। তার যত্ন নেবার জন্য আমাদের যথেষ্ট ঝি-চাকর ছিল। তবু আমার মা নিজে তার যত্ন নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এদিকে এরকম ভয়ঙ্কর রোগের লক্ষণ তাঁর মধ্যেও দেখা দিলো। তিনদিনের মধ্যেই আমার মা সেই রোগে আক্রান্ত হলেন এবং চতুর্থদিনে তিনি মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে হাজির হলেন। তিনি তাঁর সেই অন্তিম রোগশয্যায় পরিবারের সমস্ত সদস্যদের একত্রে আহ্বান করে এলিজাবেথের একটা হাত আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি তাকে বলেন, 'তোমার ভায়েদের যত্ন নিও। আমি যদিও জানি, একদিন তোমরা দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তাহলে মনের সুখে আমি মরতে পারবো।'

এলিজাবেথ আর আমি সেই রকম প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলাম।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারদের ছেড়ে যেতে চাইলাম না। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে আমার বাবা ঠিক করলেন আমার স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। হেনরী আমাকে বিদায় জানাতে এলো। এ ওর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাবার জন্য আমরা বিপন্নবোধ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য তারও খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওর বাবা তার অনুমতি দেবেন না। কারণ তাঁর পরিকল্পনা ছিল একদিন হেনরীকে তিনি তাঁর ব্যবসার কাজে যুক্ত করবেন।

হেনরীকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে আমি গাড়িতে উঠতেই আমার জীবনে সেই প্রথম ওপলব্ধি করলাম, আমি একা একা পৃথিবীর মুখোমুখি হতে চলেছি।

।। তিন ।।

ঃ *বিস্ময়কর গোপন তথ্য আবিষ্কার* ঃ

আমার ছেলেবেলার স্বপ্ন বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করা চলতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে। মানুষের রোগ নিরাময় এবং মনুষ্য জীবন দীর্ঘায়ু করার ওপায় বার করার লক্ষ্য আমার অটুট ছিল তখনো।

আমার প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর ওয়াল্ডম্যান আধুনিক এবং প্রাচীন বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়বার জন্য উৎসাহিত করেন আমাকে। 'উভয় বিজ্ঞানীদের জ্ঞান একত্রিত করে অধ্যয়ন করলে,' তিনি আমাকে বলেন, "তুমি অন্তহীন শক্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। পৃথিবী ও আকাশের সব গোপনীয়তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে তুমি। সেই সঙ্গে মানব-দেহের গোপন-রহস্য এবং সেটা কিভাবে কাজ করে, এসব রহস্যও আবিষ্কার করতে পারবে তুমি।"

'কিন্তু স্যার,' আমি প্রতিবাদ করে উঠি, 'আমি তার চেয়েও বেশী কিছু আবিষ্কার করতে চাই, মানব-দেহ কি করে কাজ করে, স্রেফ সেই গোপনরহস্য কি আমি জানতে চাই।' আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি জানতে পারি, মানব-দেহের সৃষ্টি কিভাবে হয় আগে সেটা আমাকে আবিষ্কার করতে হবে!

আমার দু'চোখে উদ্যমের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়ে তবে কল্পনা করে নয় যা আমার আকাঙ্খা ছিল, প্রফেসর ওয়াল্ডমান আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে বললেন, 'বৎস, তোমার মনোভাব জানতে পেরে আমি খুবই উৎফুল্ল, আর তোমার এই ইচ্ছা পূরণ হলে আমি গর্বিত হবো।' তোমার সাহায্যের যা প্রয়োজন হবে আমি তোমাকে দেবো, এ ব্যাপারে, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।'

একটু একটু করে পরবর্তী দু'বছরে প্রফেসর ওয়াল্ডম্যান আমার যুগপত বন্ধু ও শিক্ষক হয়ে গেলেন। হাতের কাছে যখনই কোনো বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বইপত্র পেতাম আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকলাম, সম্ভাব্য সমস্ত বক্তৃতা-মঞ্চে হাজির হতে থাকলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকলাম। শুধু তাই নয়। আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের টপ-ফ্লোরে একটা ল্যাবরেটরি গড়ে তুললাম। আর সেখানে আমি আমার গবেষণার কাজ চালাতে থাকলাম বেশীরভাগ সময় রাতেই, এমন কি কাজ করতে গিয়ে এমনি তন্ময় হয়ে যেতাম যে, ভোর হয়ে যেতো এক এক সময়। একদিন সকালে প্রফেসর ওয়াল্ডম্যান তাঁর ল্যাবরেটরিতে ডেকে পাঠিয়ে একটা শুভ খবর দিলেন আমাকে। "শোনো ভিক্টর, গত দু'বছরে তোমার অগ্রগতি অত্যন্ত বিস্ময়কর, সবার মনে শিহরণ জাগানোর মতোন।"

"ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে জানিয়ে রাখি, এখন আমি আমার বেশীরভাগ সময় অ্যানাটমি আর মাইকোলজি অধ্যয়নে ব্যয় করছি যাতে করে মানুষের জীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল সেটা আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু আমি আবার এও জানি যে, সেটা জানতে হলে প্রথমে আমাকে অবশ্যই জীবন কি করে শেষ হয়, কি করে মানব-দেহের মৃত্যু ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এসব ব্যাপারে পড়াশোনা করতে হবে।"

"হ্যাঁ, এ একটা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত প্রজেক্ট ভিক্টর। পৃথিবীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা এই গোপন রহস্য উদঘাটন করবার চেষ্টা করে আসছে। তুমি একজন মেধাবী বিজ্ঞানী, ভবিষ্যতে তুমি একজন মহান ব্যক্তি হয়ে ওঠবার জন্য অনেক আগে থেকেই ভাগ্য তোমার নির্ধারণ হয়ে গেছে।

যদি কেউ তা করে দেখাতে পারে, সে আর কেউ নয়, তুমি, শুধু তুমি! কিন্তু তোমার চারপাশের পৃথিবী এবং মানুষদের যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের তুমি তখনো যেন অবহেলা করো না।..............ভালো কথা ভিক্টর, তুমি কি জানো, আজ দু'বছর হলো জেনেভায় তোমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে গেছিলে। তাই বলছিলাম কি এবার তুমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে........''

প্রফেসরকে বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম, ''আমার কাছে আমার কাজ এতো বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, এখন ঘরে ফেরবার জন্য একেবারেই সময় করে উঠতে পারবো না। আমি কি মনে করি জানেন স্যার, বিজ্ঞানীদের কাছে বাড়ি-ঘর বলে কিছু থাকা উচিত নয়। ল্যাবরেটরিই তাদের কাছে বাড়ি-ঘর সব কিছুই!''

আমার মনের এমন দৃঢ়তা দেখে এ ব্যাপারে প্রফেসর আর চাপ দিলেন না আমাকে।

পরবর্তী মাসগুলোতে আমি কবর খুঁড়ে তোলা মৃত মানুষের অস্থিসমূহ রাখার ঘরে দিন ও রাত্রি কাটিয়ে দিতে থাকলাম। সদ্য মৃত মানুষদের কবর দেবার আগে চার্চ-বিল্ডিংয়ে তাদের মৃতদেহ রাখা হয়। আমি জানতাম মানুষের মৃত্যুর পর তাদের দেহের অবস্থা কি দাঁড়ায়। কিন্তু আমি আরও কিছু জানতে চাই, আমি জানতে চাই সপ্তাহ, মাস এমন কি বছরের পর বছর অতিবাহিত হবার পর মৃত্যু কিভাবে মানুষের দেহের পরিবর্তন ঘটায়। এটা জানতে আমি গভীর রাতে গোপনে কবরখানায় গিয়ে হাজির হতাম এবং কবর খুঁড়ে মৃতদেহগুলো বার করলাম আমার অধ্যয়নের জন্য।

বেশ কয়েকমাস ধরে একটানা পড়াশোনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমি আমার জীবনের এক স্মরণীয় রাত্রে এসে পৌঁছলাম, যখন আমার মস্তিষ্কে এক বিস্ময়কর জ্ঞানের আলো ফুটে উঠতে দেখা গেলো। সেই বিস্ময়কর মুহূর্তে, হঠাৎ আমি ওপলব্ধি করলাম, কেমন করে জীবন মৃত্যুতে পরিণত হয় শুধু নয়.........সেই সঙ্গে এও জানলাম, মৃত্যু কিভাবে জীবনে ফিরে আসে! এই ওপলব্ধি আমাকে এতোই বিহ্বল করে তোলে যে, আমার তখন মনে হলো, তখন আমি কেবল নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারি, 'আমার আগে যেসব মহান বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন কেন তাঁরা এই গোপন তথ্যটা আবিষ্কার করে যেতে পারেননি? কেনই বা সৃষ্টির এই রহস্য উদ্ঘাটন করবার সৌভাগ্য হলো আমার?''

এর ফলে আমার কাজ আরও বেড়ে গেলো। পরবর্তী সপ্তাহ ও মাসগুলোয় আমি অবিশ্বাস্যভাবে এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে গেলাম। এই কঠোর পরিশ্রমের দরুণ আমি কেবল জীবনের উৎসই আবিষ্কার করলাম না। আমি আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম যতক্ষণ না জীবনহীন প্রাণীর মধ্যে নতুন করে জীবন সঞ্চার করতে পারি! এই অভুতপূর্ব জয়ের আনন্দে মাসের পর মাস ধরে আমি যে আমার বেদনাদায়ক কাজের মধ্যে দিয়ে সময় কাটিয়েছি, সে সবই কেমন বেমালুম ভুলে গেলাম। আমি তখন কেবল একটা কথাই জানতাম, পৃথিবীর গোড়াপত্তন থেকে বিজ্ঞানীরা যা জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিল, আমি সেটা আবিষ্কার করতে পেরেছি!

ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাহিনীর এই অংশে এসে রবার্ট ওয়াল্টন বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'বিস্ময়কর! এ যেন ভয়ঙ্কর বিস্ময়কর! আচ্ছা বন্ধু, তোমার এই গোপন আবিষ্কারের ভাগীদার' করবে আমাকে?'

ভিক্টর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘন ঘন মাথা নাড়লো। 'না রবার্ট, আমি তা করতে পারি না। আমি জানি, আমার জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য আপনার কাছে আমি ভয়ঙ্করভাবে ঋণী আর এই কারণেই আমার কাহিনীর শেষটুকু আপনি মন দিয়ে শোনবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। সব শোনবার পর আপনি বুঝতে পারবেন, কেন আমি আমার এই গোপন আবিষ্কারের ভাগীদার করতে চাইছি না আপনাকে........কিংবা পৃথিবীর অন্য কাউকে। যদি আপনি কখনো সেই ভয়ঙ্কর গোপন তথ্যটা জানতে পারেন, আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন যেমন আমি হয়েছি!'

।। চার ।।

ঃ দানবের সৃষ্টি ঃ

আমি ধ্বংস হয়ে গেছি, কেন আমি বললাম? আমি সে কথা বলেছি এই কারণে যে, সেই গোপন তথ্য থেকে যে জ্ঞান আমি লাভ করেছি এবং সেই জ্ঞানলব্ধ শক্তি আমার থেকেও বেশী কিংবা সেই ব্যাপারে যেকোনো লোক মোকাবিলা করতে পারে।

কিভাবে সেই জ্ঞান আমি ব্যবহার করবো অবাক হয়ে সে কথা ভাবতে ভাবতেই প্রথমে আমি বেশ কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিলাম। জীবন কি করে সৃষ্টি করতে হয় আমি জানি। কিন্তু বাস্তবে রূপ দিতে সেই জীবনে আমি কি কি সংযোজন করবো? যতদূর মনে হয়, আমার সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হলো ঃ মাংসপেশী, হাড়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-ওপশিরা এবং দেহের অন্য আরও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ। তবে কি আমি স্রেফ কোনো জানোয়ার কিংবা আমার মতো একজন মানুষ সৃষ্টি করবো? আমার প্রচণ্ড চিন্তাশক্তি অনেক উঁচুতে উঠে গেলো, আর আমার সত্যিকারের বিশ্বাস, এই জ্ঞান দিয়ে আমি যা খুশী করতে পারি। হ্যাঁ, আমি একটা জানোয়ারকে জীবন দান করবো, যাতে করে সেটা একটা একজন জটিল ও বিস্ময়কর দৈত্য মানবে পরিণত হবে।

সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য যা দিয়ে একটা মানুষের দেহ তৈরী করা যায়, আমি ঠিক করলাম আমার সৃষ্টি করা জীবটা কখনোই ছোট হতে পারে না। এমন কি স্বাভাবিক আকারেরও নয়। তাহলে? হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা দৈত্যাকারের মতো হতে হবে, প্রায় আট ফুট লম্বা, আমার পক্ষে দেহটার ভেতরে ও বাইরে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা সম্ভব হবে।

আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করতে পরবর্তী বেশ কয়েক মাস সময় লেগে গেলো। যেমন, কবর থেকে তোলা অস্থিসমূহ রাখার ঘর থেকে হাড়গোড়, কসাইখানায় যেখানে বাজারে বিক্রীর জন্য মাংস তৈরী হয়, সেখানে ফাঁদে ফেলে জীবন্ত জানোয়ার ধরা আবার কিছু কিনতেও হলো। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শবব্যবচ্ছেদ ঘর থেকে মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং যন্ত্রপাতি আর হ্যাঁ, অবশ্যই কবরের নিচ থেকে একটা গোটা মৃতদেহ তোলবার কাজও সারতে হলো।

আমি যখন এইসব কাজ করতে শুরু করলাম তখন গ্রীষ্মকাল, তাই বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। তারপর বর্ষা, শীত ও বসন্তেও রাতের পর রাত জেগে চললো আমার দৈত্য-মানব গড়ার কাজ। তারপব পরের গ্রীষ্মে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করতে থাকলাম। আমি তখন খেতে ভুলে গেলাম। কচ্চিৎ ঘুমতাম। এমন কি আমি তখন আমার পরিবারের কথাও ভুলে গেলাম। আমার বাবা তাঁর প্রতিটি চিঠিতে লিখতেন আমার জন্য কি ভয়ঙ্কর চিন্তায়ই না দিন কাটাচ্ছেন।

এক এক সময় আমার নিজের কাজের ওপরেই ঘৃণা হতো। তারপরেই এক সময় আমি আমার সৃষ্টির কাজ শেষ করবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলাম। তখন প্রায় শীতের সময়, আমার মানুষ গড়ার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু তখন আমার মনে হলো, সেই সাফল্যের জন্য আমার তৈরী দেহটার কি মূল্যই বা পাওয়া যাবে? অতিরিক্ত পরিশ্রম করে আর জ্বরে আমার মস্তিষ্কের কোষগুলো যৎপরোনাস্তি বিধ্বস্ত। আমার স্নায়ুকোষগুলো তখন এতো বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দ শুনে আমি চমকে উঠতে থাকলাম। মাসের পর মাস আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেককে এড়িয়ে যেতে থাকলাম, কারণ আমার তখনকার সেই ভগ্নদেহ খুবই ভয়াবহ দেখতে হয়েছিল। এমন কি আয়নার সামনে নিজেই নিজেকে দেখে শিউরে উঠতাম!

কিন্তু আমি নিজেই নিজকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, "এটা সাময়িক। আমার কাজ শেষ হলেই আমার এই ভগ্নদশার অবসান হয়ে যাবে, আর খুব শীগ্‌গীর আমি আমার হারানো স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাবো।'

কিন্তু পরে বুঝলাম কতোই না আমার ভুলের মাত্রা!

।। পাঁচ ।।

ঃ জীবনের স্ফুলিঙ্গ ঃ

নভেম্বরের এক বিষণ্ণ রাত্রি, শেষ পর্যন্ত আমার বহু আকাঙ্খিত কাজটা সম্পূর্ণ হলো। বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি, আমার যন্ত্রপাতির ঝনঝন আওয়াজে বৃষ্টি পড়ার টাপুর-টুপুর শব্দটা চাপা পড়ে গেলো। আমার সামনে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা প্রাণহীন জীবটার দিকে তাকালাম। আমি জানতাম, তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে তোলাটা তখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। যে মোমবাতিটা এতক্ষণ আমার ল্যাবরেটরি আলোয় আলোকিত করে রেখেছিল, সেটা তখন প্রায় পুড়ে গেছলো, নিষ্প্রভ আলো, কিন্তু আমি আমার যন্ত্রপাতি দিয়ে জীবটাকে স্পর্শ করার পক্ষে সেই আলোটুকুও যথেষ্ট ছিল। সেটার স্পর্শে একটা অদ্ভুত স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হলো, আর সেটাই তার দেহে জীবনের সঞ্চার ঘটালো অবশেষে।

ধীরে ধীরে জীবটা তার হলুদ চোখদুটি মেলে ধরলো। একটা কঠিন, খরখর শব্দে নিঃশ্বাস নিয়ে সে তার বিশাল বুকটা ওপরে তুলে ধরলো। একই সময়ে তার দৈত্যাকারের হাত ও পাগুলো ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলো, সেই সঙ্গে তাঁর গতিবিধির মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেখা গেলো।

কঠোর দৃষ্টিতে এই জীবটার দিকে আমি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম। ভাবতে অবাক লাগে একে সৃষ্টি করতে আমার দু'বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছে। এক সময় আমি এটাকে একটা চমৎকার কাজের নমুনা বলে বিবেচনা করতাম, যা আমার জীবনের বহু আকাঙ্খিত স্বপ্নের ফসল, কিন্তু এখন সেটা আমার কাছে যেন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আর বিরক্তিকর বলে মনে হলো।

তার হলুদ রঙের চামড়া হাড় এবং মাংসপেশীগুলোর ওপর ছড়ানো তার শরীরটা সম্পূর্ণ নগ্ন। তার অদ্ভুত মুখটা কেমন যেন শুকনো, বিবর্ণ এবং কোঁচকানো তার লম্বা লম্বা কালো চুলগুলো সেই মুখ ও গলার ওপর ছড়িয়ে ছিল। তার কালো ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁক দিয়ে প্রকাশিত মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো যেন বড় বেমানান বলে মনে হচ্ছিল।

এ আমি কি করলাম?........বুঝি বা আর এক মিনিটের জন্যও সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ জীবটার দিকে তাকাবার মতো সাহস বা শক্তি পেলাম না। আমি তখন এতোই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে, সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবরেটরি থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে এসে নিচে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। তেমনি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ভয়ার্ত শরীরটা কোনোরকমে আমার বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ভাবলাম একটা টানা ঘুম দিতে পারলে এই মাত্র দেখা আতঙ্ক ও বিরক্তিকর যে ছবিটা আমার মস্তিষ্কের পর্দায় ফুটে উঠতে দেখেছি, সেটা মুছে যাবে।

অবশেষে ঘুম এলো আমার চোখে। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস স্বপ্নের আবর্তে বুঝি বা ফেলে দিলো আমাকে। সে স্বপ্ন মৃত্যুর, এলিজাবেথ আর আমার মায়ের। হঠাৎ যখন আতঙ্কের মধ্যে ঘুম থেকে আমি জেগে উঠলাম। আমার দাঁতগুলো কিচির-মিচির করছিল, আর প্রবল উত্তেজনায় আমার হাত পা আলোড়িত হতে থাকলো।

জানালা দিয়ে প্রতিফলিত চাঁদের মৃদু আলো আমার শয়নকক্ষে বাচ্চা মেয়ের মতো লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমি আমার ঘুম-জড়ানো চোখদুটি ভালো করে মেলে ধরতেই চমকে উঠলাম, চোখের সামনে বিশাল চেহারার সেই দৈত্যটা ফুটে উঠলো, আমার বিছানার চারপাশে ঝুলন্ত পর্দাটা তুলে ধরেছিল সে। তার ভয়ঙ্কর দৃষ্টি তখন স্থির নিবদ্ধ আমার ওপর, মুখে দেঁতো হাসি, যা তার চিবুকে এবং কুৎসিত কালো ঠোঁটজোড়ার ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এর পর তার শক্ত চোয়ালদুটো সচল হয়ে উঠতে দেখা গেলো এবং বিড়বিড় করে যা সে বললো তার কোনো মানে হয় না। আমাকে স্পর্শ করবার জন্য সে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি আমার বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লাম এবং রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে ছুটলাম। সেখানে আমি লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করলাম। আমি তখন খুবই দুর্বল, আকস্মিক এবং তিক্ত ভাবে মোহমুক্ত। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় সেই বিষণ্ণ, বর্ষণমুখর রাতের অবশিষ্ট সময়টুকু আমি সেখানেই লুকিয়ে কাটিয়ে দিতে থাকলাম।

।। ছয় ।।

ঃ একি পাগলামো! ঃ

পরের দিন সকাল ছ'টায় আমি আমার জলসিক্ত শরীরটা কোনোরকমে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোর্ট-ইয়াডের বাইরে টেনে আনলাম। আমার দুর্বল শরীরটা অসম্ভব টলছিল, সেই অবস্থায় কোনারকমে ইঙ্গোলস্ট্যাডের রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকি, আমি কোথায় চলেছি কিংবা আমি কি করছি, এসব ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না আমার তখন।

আমি আমার ঘরে ফিরে যেতে ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কিত, তেমনি ঘরের প্রতিটি কোণার দিকে তাকাতে পারবো না, কারণ সেই আতঙ্কটা যেন সমানে তাড়া করে ফিরছিল আমাকে। আমার তখন একমাত্র ভয়, সেই দানবটা হয়তো সেখানে কিংবা যে-কোনো জায়গায় অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরির পর এক সময় দেখলাম একটা পান্থশালার

সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সেটা ছিল ঘোড়ারগাড়ির যাত্রাবিরতির জায়গা। প্রতিটি ঘোড়ারগাড়ি সেখানে এসে থামে এবং সেখান থেকেই আবার যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে শহরের বাইরে যাবার জন্য। আমি জানি না সেই মুহূর্তে কি কারণেই বা আমি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু চারদিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম জেনেভা থেকে আসা একটা ঘোড়ারগাড়ি সেদিকেই এগিয়ে আসছে। ঘোড়ারগাড়িটা আমার সামনে এসে থামতেই ভয়ঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখলাম, যে যাত্রীটি নামলো, সে আমার প্রিয় বন্ধু হেনরী ক্লারভাল।

'ভিক্টর!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মৃদু চিৎকার করে উঠলো সে। 'আমার কি সৌভাগ্য যে, তুমি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছো!'

বহুদিন পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে দেখতে পেয়ে আমিও কম উৎফুল্ল হলাম না। তার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে আগের দিন রাত্রে আমি যে একটা ভয়ঙ্কর এবং দুর্ভাগ্যপূর্ণ অবস্থায় ছিলাম, সে কথা সেই মুহূর্তে যেন ভুলে গেলাম।

এর পর আমরা এ ওর হাতে হাত রেখে আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় কেন যে সে ইঙ্গোস্ট্যাডে এসেছে তার ব্যাখ্যা করছিল হেনরী। 'অবশেষে আমি আমার বাবার ধারণার কথাটা তার মনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য বললাম, একজন হিসাবরক্ষক তার ব্যবসায় কি রকম হবে জানার চেয়ে পৃথিবী সম্পর্কে আমি অনেক বেশী কিছু জানতে চাই। তাই নতুন করে আমার আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার ব্যাপারে রাজী হয়ে গেলো সে।'

'সে তো খুবই চমৎকার হেনরী!' আমি তাকে বললাম, 'তোমাকে এখানে পেয়ে সত্যি আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু এখন আর আমি একটা ব্যাপারে খুবই চিন্তিত আছি। আমার পরিবারের কোনো খবর কি তুমি জানো?'

'ওঁদের ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ওরা সবাই খুব ভালো আছেন আর বেশ সুখেও আছেন। তবে দীর্ঘদিন তোমার কোনো খবর না পেয়ে ওঁরা খুবই চিন্তায় রয়েছেন।' তারপর সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে কঠোরভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, 'ভিক্টর, তোমাকে দেখে আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, তোমার ব্যাপারে আমিও খুব চিন্তিত। তোমাকে খুবই বিবর্ণ এবং রোগা দেখাচ্ছে। তুমি কি অসুস্থ?'

'না, না, অসুস্থ নই,' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। 'একটা প্রোজেক্টের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে, মাথা ঘামাতে হয়েছে। অবশ্য এখন সেটা শেষ করে ফেলেছি। অবশেষে আমি এখন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারি।'

আমরা আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোতেই হেনরীকে দেখে আমার যে আনন্দ হয়েছিল তার জায়গায় দ্রুত সেই ভয়টা যেন স্থান করে নিলো। আমি তখন ভয়ে কাঁপতে থাকলাম। এই ভেবে যে, যদি সেই দানবটা এখনও আমার শোবার ঘরে থেকে থাকে? আমি তাকে ভীষণ ভয় পাই, কিন্তু আমার আরও ভয়, হেনরীও হয়তো তাকে দেখতে পাবে, তখন সে তাকে কি বলবে? বলতে পারবে সেটা তারই সৃষ্টি?'

এক রকম ছুটেই আমি হেনরীর আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। দরজার হাতলটা ঘোরাতে গিয়ে একটা বরফ-শীতল হিমপ্রবাহ যেন আমার সারা শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে

গেলো। হাতটা আমার ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলো, তবু সেই অবস্থায় আমি ধীরে ধীরে দরজাটা খুললাম। আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ফাঁকা দেখে আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং আনন্দের সঙ্গে হেনরীকে ঘরের ভেতরে আহ্বান করলাম। আমি তখন এতো বেশী উৎফুল্ল যে, আমি হাসতে শুরু করে দিলাম শব্দ করে। আমার সেই উচ্ছ্বসিত হাসি দেখে অবাক হয়ে গেলো হেনরী। তারপর আমি যখন চেয়ারের ওপর লাফাতে শুরু করে করতালি দিতে থাকলাম, সে তখন সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলো।

সে তখন আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, 'ঈশ্বরের দোহাই ভিক্টর, সত্যি সত্যি তুমি অসুস্থ! কি ব্যাপার?'

আমার চোখদুটো প্রবলভাবে ঘুরপাক খেতে থাকলো। আমি যেন দানবটাকে আমার ঘরের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। 'ওই লোকটা, হ্যাঁ ওই লোকটাই আমার আজকের এই অবস্থার জন্য দায়ী!' আমি দরজার দিকে আঙুল তুলে হেনরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম। অথচ সেখানে কেউই ছিল না তখন। 'দয়া করে আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও হেনরী!'

হেনরী আমার কাঁধে আবার ঝাঁকুনি দিতেই আমি ধরে নিলাম, দানবটাই আমাকে স্পর্শ করেছে, আর সেই মতো প্রচণ্ডভাবে লড়াই করলাম তার সঙ্গে। ঘুষি, চড়-থাপ্পড় মারতে থাকলাম তাকে। ক্লান্ত হয়ে এক সময় মেঝেতে পড়ে গেলাম। তবে আমার হাত পা কাঁপছিল তখনো।

আমাকে এ অবস্থায় দেখে না জানি কতোই না উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল হেনরী। কিন্তু সেই ঘটনার পর বেশ কয়েক মাস আমার মানসিক উদ্বিগ্ন হয়েছিল জানি না। আমার অসুস্থতার কথা হেনরী কখনো আমার পরিবারকে জানায়নি, কিন্তু তার বদলে সে নিজেই আমার যত্ন নেয়। সারা দিন-রাত সে আমার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। এই কটামাস আমার চোখের সামনে প্রতিটি মুহূর্তে যেন দানবটা ভেসে উঠতো। আমি তখন রাগে উত্তেজনায় অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলতাম। সেসব কথায় কান দিতো না হেনরী। সেটা আমার পাগলামো বলে উড়িয়ে দিতো।

তখন বসন্তকাল, ইতিমধ্যে পাঁচ মাসেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত, তারপর থেকে আমি আরোগ্যলাভ করতে থাকলাম। আমার বিষণ্নভাবটা কেটে যেতে থাকে। এই ভাবেই আমি একদিন হেনরীর সেই আগের হাসিখুশীতে ভরা বন্ধু হয়ে উঠলাম। আমি জানি, আমার সেই আলোর জীবন ফিরে পাওয়ার পিছনে কতোই না ঋণী আমি। এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। 'প্রিয় হেনরী, যে বিশ্ববিদ্যালয় তোমার কাছে বহু বছরের স্বপ্ন ছিল, সেখানে যোগদান না করে সারাটা শীতকাল তুমি যেভাবে আমার শরীরের যত্ন নিয়েছিলে, তার ঋণ আমি কি করে শোধ করবো বলো?

'তুমি আমার ঋণ শোধ করতে চাইছো? ঠিক আছে, তুমি নিজে তোমার যত্ন নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করলেই ধরে নিও আমার ঋণ শোধ হয়ে যাবে।'

সেই দিনটা যেদিন এলো, হেনরীকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, আমার প্রফেসর আর অন্য সব ছাত্রদের কাছে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

প্রফেসর ওয়াল্ডম্যান উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের এবং হেনরীকে বললেন, 'ভিক্টরের বিস্ময়কর অগ্রগতির জন্য আমরা সবাই গর্বিত। এর জন্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ওকে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য করি আমরা!'

আমার প্রশংসায় প্রফেসর পঞ্চমুখ হলেও আসলে ওঁর সেই কথাগুলো আমাকে ভয়ঙ্কর পীড়া দিয়েছিল। কারণ আমি তো জানি, প্রফেসরের ভাষায় আমার সেই বিস্ময়কর অগ্রগতি কিরকম বাজে কাজে ব্যবহার করেছি। সেই ভয়ঙ্কর দানব সৃষ্টির জন্য দায়ী আমার অগ্রগতি, এ কথা আমি অস্বীকার করি কি করে!

হেনরী আমার প্রকৃত বন্ধু, সে আমাকে বেশ ভালোভাবেই জানে। আমার মনোভবের প্রতি সব সময়েই অনুভবশীল সে। প্রফেসর ওয়াল্ডম্যান যখন আমার সম্পর্কে কথা বলছিলেন সে তখন আমার চোখে নিদারুণ যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পেয়েছিল। আমার মনোভাব তথা নিদারুণ যন্ত্রণার কারণ জানতে না চেয়ে প্রসঙ্গটা বদলে ফেললো হেনরী, তাতে আমার পক্ষে কথা বলা সহজ হয়ে গেলো। হেনরীকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, সে যেন আমার ভায়ের মতোন। তাই আমি আমার যন্ত্রণার কথা বলে তাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাইনি। ভাবলাম বড় জোর তাকে আমার সেই গোপন তথ্য জানিয়ে অংশীদার করে নেবো তাকে।

হেনরী যখন আমার অ্যাপার্টমেন্টের ওপরে ল্যাবরেটরিতে এলো, আমি তখন আমার গবেষণার যন্ত্রপাতিগুলো দেখে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়লাম, হেনরী সেটা নিজের চোখে লক্ষ্য করলো, তবে ওই দানব সৃষ্টির মূলে ওইসব যন্ত্রপাতির ভূমিকা সম্পর্কে তার জানার কোনো ওপায়ই ছিল না। আমার নার্ভাস হওয়ার ব্যাপারে এবারেও সে কোনো প্রশ্ন না করে শান্তভাবে যন্ত্রপাতিগুলো প্যাক করে রেখে ল্যাবরেটরি ঘরে তালা লাগিয়ে দিলো। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, না আর নয়, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে দেবো। কারণ আমার জীবনে সেটা একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বলাবাহুল্য, বৈজ্ঞানিক পন্থায় সৃষ্ট আমার সেই মহাদানবটাই আতঙ্কের একমাত্র কারণ। কিন্তু অলসভবে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়, তাই আমি ঠিক করলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে হেনরীর সঙ্গে প্রাচ্যের ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করবো।

নতুন সব ভাষা শিখতে গিয়ে এবং পারস্যের লেখকদের লেখা সুন্দর সুন্দর বই পড়ে আমরা প্রভূত আনন্দের সঙ্গে একটা বছর কাটিয়ে দিলাম। শুধু তাই নয় এই সময়ে ইঙ্গোলস্ট্যাডের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে, কখনো বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওপভোগ করতেও ছাড়লাম না। কয়েক বছর আগে আমি যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি, তখন আমি কতো সুখেই না ছিলাম, অচিরেই সেই সব সুখের দিনগুলো আমি যেন ফিরে পেলাম। আর কোনো দুঃখ নেই, নেই কোনো যন্ত্রণা কিংবা আমার শরীর অসুস্থ হওয়ার কোনো কারণ দেখতে পেলাম না। সেই ভয়ঙ্কর দানবের আতঙ্ক এবং তাকে সৃষ্টি করবার পর আমার মধ্যে যে পাগলামো ভাবটা দেখা দিয়েছিল, আমার স্মৃতি থেকে সেসব মুছে গেলো।

।। সাত ।।

ঃ প্রথম খুন ঃ

মে মাসের এক উষ্ণ সকাল। শহরতলীতে বেড়িয়ে সতেজ হয়ে ফিরে এলে পর আমার বাবার প্রেরিত একটা চিঠি পেলাম। এমনি একটা চিঠি আমি আশা করছিলাম। দীর্ঘ দু'বছর বাড়ি থেকে

দূরে থাকার পর আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মনে মনে মতলব করছিলাম।

খাম খুলে আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম ঃ

জেনেভা, ১২ই মে

আমার প্রিয় পুত্র,

দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি তোমাকে বাড়ি ফিরে আসতে বলছি। কিন্তু তোমার এখানে এসে পৌঁছনোর আগে একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে গেছে। সেই খবরটা শোনার পর তুমি যাতে সহ্য করতে পারো, সেইভাবে তোমার মনটাকে আমি তৈরী করে তুলতে চাই। সেই খবরটা হলো এই যে, তোমার প্রিয় ছোটভাই উইলিয়াম মারা গেছে। সে ছিল খুবই নম্র, ভদ্র এবং নিরীহ, এ হেন ছেলেকে খুন করা হয়েছে, ভাবা যায়? আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবো না, কিন্তু আমরা এ ঘটনার ব্যাপারে যতটুকু জানতে পেরেছি, সেটাই শুধু বলবো তোমাকে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলিজাবেথ তোমার দুইভাই আর আমি প্লেনপ্যালাইসের জঙ্গলে ঘেরা পার্কে বেড়াতে গেছিলাম। তোমার মনে আছে সেই পার্কটার কথা যেখানে ছেলেবেলায় তুমি ছোটাছুটি করতে ভালোবাসতে। উইলিয়াম আর আর্নেস্ট আমাদের আগে আগে ছুটছিল লুকোচুরি খেলবার জন্য। সন্ধ্যা পেরিয়ে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, তখন আমি আর এলিজাবেথ পার্কের একটা বেঞ্চের ওপর বসে ছেলেদের ফেরার অপেক্ষায় থাকলাম। একটু পরেই আর্নেস্ট একা ফিরে এসে জানতে চাইলো উইলিয়ামকে আমরা দেখেছি কিনা। লুকোচুরি খেলবার সময় সে নাকি কোনো অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়েছিল, কিন্তু ফিরে আর আসেনি সে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লাফ দিয়ে উঠে তার খোঁজ করতে শুরু করে দিই। কিন্তু তখনকার মতো আমরা তাকে খুঁজে পেলাম না। তখন রাত নেমে এসেছিল সেখানে, এলিজাবেথ তখন বাড়ি ফিরে যায় আমাদের প্রতিবেশীদের খবর দিয়ে সতর্ক করে দেবার জন্য, সেই সঙ্গে কিছু টর্চ সংগ্রহ করবার জন্য অন্ধকরে উইলিয়ামকে নতুন করে খোঁজবার জন্য।

পরের দিন সকাল পাঁচটায় আমি একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আবিষ্কার করলাম। উইলিয়ামের শীতল, প্রাণহীন দেহটা ঘাসের ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম, তাঁর গলায় খুনীর আঙুলের ছাপ পড়েছিল তখনো! অশ্রুভরা চোখে আমি তার মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে এলাম বাড়িতে এবং তার বিছনায় শুইয়ে দিলাম। উইলিয়াম যে মৃত তখনো জানতো না এলিজাবেথ। সে যখন নিচু হয়ে তার প্রাণহীন দেহটা আর তার গলার ক্ষতস্থানটা দেখলো, তখন সে চিৎকার করে ওঠে। 'হায় ঈশ্বর! আমি আমার প্রিয় সন্তানকে হত্যা করেছি!' এই বলে আমার হাতের ওপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

তারপর আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে পর সে তখন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, লকেটসহ তার গলার হারটা তাকে পড়তে দেবার জন্য অনুরোধ করে। সেই হারটা ছিল তোমার প্রয়াত মায়ের এবং লকেটে তাঁর একটা ছবি ছিল। এলিজাবেথ উইলিয়ামকে এতো বেশী ভালবাসতো যে, তার কথা কখনো ফিরিয়ে দিতে পারতো না সে। মৃত উইলিয়ামের গলার হারটা দেখতে গিয়ে এলিজাবেথ যখন দেখলো, লকেটটা তাতে নেই, সে তখন স্বভাবতই অনুমান করে নিলো, সেই চুরিটাই তার খুনের প্রকৃত কারণ।

এখনও পর্যন্ত খুনীর কোনো খোঁজ করতে পারিনি আমার। এদিকে এলিজাবেথ সমানে কেঁদে চলেছে আর উইলিয়ামের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করলো। ভিক্টর, এখানে তোমাকে আমাদের

একান্ত দরকার তবে খুনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়, আমাদের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়গুলোকে সান্ত্বনা দিতে সাহায্য করবার জন্য।

তোমার স্নেহময় পিতা
আলফোন্স ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

চিঠিটা টেবিলের ওপর নিক্ষেপ করে দু'হাত দিয়ে আমি আমার মুখ ঢাকলাম এবং হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিলাম, সে কান্না আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

হেনরী আমার দু'কাঁধে তার হাতদুখানি স্থাপন করে জিজ্ঞেস করলো, প্রিয়বন্ধু আমার, তোমার কি হয়েছে বলো তো, কোনো গোলমাল? এমন কি ঘটলো যার জন্য তোমাকে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে?

'আমি বলতে পারলাম না, আর বুক ভরে তেমন নিঃশ্বাসও নিতে পারছিলাম না। কান্নার মধ্যে আমি টেবিলের ওপর রাখা চিঠিটার প্রতি হেনরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলাম। হেনরী চিঠিটা তার হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলো, হাঁ করে শ্বাস নিলো, তারপর তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। সেই ভয়ঙ্কর হৃদয়বিদারক খবরটা তাকেও খুব বিচলিত করে তুললো যেন।

।। আট ।।

ঃ দানব সকাশে ঃ

আমি একটা ঘোড়া ও গাড়ি ভাড়া করে সঙ্গে সঙ্গে জেনেভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। আমার এ যাত্রা কোনো সুখের নয়, আনন্দের নয়, সারাটা ভ্রমণপথ শুধু দুঃখে ভরা, ভাই হারানোর বেদনায় শুধুই চোখের জল ফেলা আর চোখ মোছা। আমার সেই নিরীহ, নির্দোষ ভাইটির স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার ভাবনা, আর সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ঘটনায় আমার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের কথাটা মনে পড়লেই আমার কষ্টটা যেন আরও বেড়ে যেতে থাকলো।

রাত্রি নামতেই আমি জেনেভার কাছাকাছি এসে পড়লাম, আর এই সময় আমার সব দুঃখ ও বেদনার জায়গায় দেখা দিলো ভয় আর বিষণ্ণতা এবং এক বুক শূন্যতা। রাত তখন দশটা হবে, আমি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এলাম শহরেরপ্রবেশ পথের সামনে। আমি তখন দুঃখে এতোই কাতর হয়ে পড়েছিলাম যে, রাত দশটায় যে শহরের প্রবেশপথের গেটগুলো বন্ধ থাকে ভুলেই গেছিলাম। তাই সেখানে এসে বুঝতে পারলাম। কাল সকালের আগে পর্যন্ত আমি শহরে প্রবেশ করতে পারবো না। তাই রাতটা কাটাবার জন্য লেক জেনেভার কাছে একটা গ্রামে একটা পান্থশালায় আমি একটা ঘর ভাড়া নিলাম। ঘর তো ভাড়া নিলাম, কিন্তু ঘরের ভেতরে একা শোবো কি করে! আমার স্নায়ুগুলো অত্যন্ত দুর্বল, ভীষণ নার্ভাসবোধ করছিলাম। তাই আমি ঠিক করলাম, একটা বোট ভাড়া করে সামনে হ্রদের জলে নৌকো চালিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবো। প্লেনপ্যালাইসের অরণ্যটা ছিল অপর দিকে। যাই হোক, আমার ভাই যেখানে খুন হয়েছিল সেই জায়গাটা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

ওদিকে অদূরে পাহাড়ের ওপর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বৃষ্টির পূর্বাভাস। হ্রদের তীরে পৌঁছতেই

বৃষ্টি নামলো, প্রবলভাবে। দূরে কোথাও বাজ পড়লো। বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়লো পাহাড়ের কোলে এবং তৎসংলগ্ন পাহাড়ের কোলে ও হ্রদের জলে। বিদ্যুতের আলো হ্রদের জলে পড়তেই মনে হলো, যেন আগুন জ্বলে উঠলো সেখানে।

আমার ভাড়া-নৌকোটা হ্রদের ধারে আসা মাত্র অস্পষ্ট পাহাড়ের কোলে একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়লো আমার। ছায়ামূর্তিটা ঘন তরুবীথির পিছন থেকে নড়েচড়ে উঠতেই আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমে বরফে পরিণত হয়ে গেলো, আমি আমার চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম রাতের অন্ধকারে।

এর পরের বিদ্যুৎ চমকের আলোয় ছায়ামূর্তিটা এবার রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার চোখে। তার ভয়ঙ্কর কুৎসিত দৈত্যাকারের চেহারাটা আমার ভয়টাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিলো! ওটাইযে সেই দানব আমার বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না।

আমি তখন ভাবলাম, এ সময়ে কি করছে সে ওখানে? তারপর আর এক ভাবনায় আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আমার ভায়ের খুনের সঙ্গে তার কি কোনো সম্পর্ক আছে?'

এ প্রশ্নটা আমার মনে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমি যেন উত্তরটা জানি। হ্যাঁ! আমি এখন নিশ্চিতভাবে জেনে গেছি, আমার নির্দোষ ভাইটিকে কেবল ওই দানবটাই খুন করতে পারে। অন্য কেউ নয়!'

আমার দাঁতগুলো তখন কিচিরমিচির করে উঠলো, ভয়ে আতঙ্কে দাঁতে দাঁত লেগে যাবার উপক্রম হলো। হাঁটু দুটো অবশ হয়ে যাওয়ার ওপক্রম হলো। আর একটু হলে আমি বোধহয় পরে যেতাম। ঠিক সময়ে একটা গাছের গায়ে আমার কাঁপাকাঁপা শরীরটা এলিয়ে দিলাম পতন রোধ করার জন্য।

পরমুহূর্তেই নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে সামনে পাহাড়ার দিকে তাকাতেই দেখলাম, ছায়ামূর্তিটা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে সেখান থেকে। তাকে অনুসরণ করবার জন্য আমি আবার চলতে শুরু করে দিলাম। আবার একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো, সেই আলোয় দেখলাম পাহাড় সংলগ্ন একটা খাড়াই পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে দানবটা। একটু পরেই পাহাড়ের চূড়ায় অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

একটা গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমার শরীরের সব রক্ত যেন হিমায়িত হয়ে জমাট পাকিয়ে যাচ্ছে বরফের মতোন। স্মৃতির পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে দু'বছর আগের এমনি এক রাতের কথা মনে পড়ে গেলো আমার, যখন আমি এ প্রাণীটার মধ্যে জীবনসঞ্চার করেছিলাম আর তা থেকেই দানবে পরিণত হয় সে। এর জন্য এখন নিজেকে আমার ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছে এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'তবে কি আমি একটা দানব সৃষ্টি করে তাকে এই পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছি যাতে করে সে আমার নিরীহ নির্দোষ ভায়ের মতো নির্বিচারে মানুষ খুন করতে পারে। ছিঃ ছিঃ, এ আমি কি করলাম? লোকে মানুষের জন্ম দেয় সমাজের চোখে ভালো করে তুলে ধরবার জন্য। কিন্তু আমি যে ভালো মানুষের জায়গায় আমি যে একটা দানব সৃষ্টি করে ফেললাম, যে সমাজের কলঙ্ক, শত্রু এবং আতঙ্ক! আমার এই অন্যায়, অলৌকিক কাজ করার জন্য কেউ আমাকে ভালো চোখে দেখবে না। কেউ আমাকে ক্ষমার চোখে দেখবে না। তাই

খবরটা জানাজানি হওয়ার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে ওই হিংস্র জানোয়ারসুলভ মানুষ-দানবকে রুখতে হবে। প্রয়োজন হলে নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবো না আমি, মনে মনে শপথ নিলাম আমি।

সেই পাহাড়টার ধারে, যে আতঙ্ক আমি সৃষ্টি করেছি তার জন্য দুশ্চিন্তায়, আমি ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে রাত্রি কাটালাম। ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর রাতের সব ভয় ও জড়তা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আড়মোড়া ভেঙে এবার আমি জেনেভার পথে এগিয়ে চললাম। আমার মন খুবই ভারাক্রান্ত। জানি না আমার পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থা এখন কিরকম? তাঁরা নিশ্চয়ই একেবারে ভেঙে পড়েছেন। যদি আমার সৃষ্টি করা দানবটাই আমার ভাই উইলিয়ামের হত্যাকারী, এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাঁদের কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? এই যে বাবা তাঁদের এই দুঃসময়ে আমাকে কাছে পেতে চেয়েছেন তাঁর চিঠিতে, তিনি যখন খুনীর প্রকৃত পরিচয় পাবেন, তখন কি তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন? নাকি আমিই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো? এইসব প্রশ্নগুলো এখন আমার মাথায় ভিড় করছে, কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তরই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এর ফলে দানবের ভীতিটা যেন আরও বেশী করে চেপে বসলো আমার মধ্যে। আমি এখন দিশেহারা হয়ে পথ চলছি। জানি এ পথের শেষ কোথায়, জানি না কি আছে এর শেষে!

যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার যা করণীয় সেটা আমি এখন ভাববো বলে ঠিক করলাম। এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, ওই দানবটার পশুর শক্তি খর্ব করার জন্য এখনি পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, প্রসঙ্গটা কি ভাবেই বা তুলবো পুলিশের কাছে? আমি কি বলবো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। আজ থেকে দু'বছর আগে আমি একটা দানব সৃষ্টি করেছি এবং তাকে জীবন দিয়েছি, তারপর গতরাত্রে পাহাড়ের পাশে ওপত্যকা অঞ্চলে সেই দানবটাকে অবাধে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। তাছাড়া, যে মানুষটি বেশ কয়েক মাস ধরে এমন একটা অসুখে ভুগেছে যা প্রায় পাগলামিরই নামান্তর, এ হেন মানুষের মুখ থেকে এমন একটা অদ্ভুত কাহিনী শুনলে কেই বা তাকে বিশ্বাস করবে? আমার এই কথাগুলো যে পাগলের প্রলাপ নয়, সেটাই বা কে বিশ্বাস করবে, কিংবা আমার সমর্থনে কেই বা এগিয়ে আসবে! সেরকম সমঝদার লোকই বা কোথায়? এই মুহূর্তে সেরকম কোনো সহৃদয় ব্যক্তির মুখ তো আমার মনে পড়ছে না।

আমি আবার এও জানি যে, অপরদিকে কেউ যদি আমার কাছে এগিয়ে এসে এই ধরনের কোনো কাহিনী আমাকে শোনায়, তখন এই যে আমি একটু আগে আমার ওই তথাকথিত অদ্ভুত কাহিনীর পক্ষে জোর সওয়াল করছিলাম, সেই আমি তখন তার সেই গল্পের বিরোধিতা করে হয়তো বলবো, সেটা একটা পাগলের ক্রধোন্মত্ত উক্তি বই কিছু নয়! তাছাড়া, ওই যে দানবটা যা করলো আমার চোখের সামনে, পাহাড়ের গা বেয়ে কেমন অবলীলাক্রমে তরতর করে একেবারে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে গেলো, এ হেন জীবকে কোন্ মানুষ তার গতি রোধ করবে কিংবা হাতে নাতে ধরবে। এমন কাল্পনিক আশা কি দুরাশা নয়?.......এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, তাই আমি ঠিক করলাম, নীরব থাকাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে!

।। নয় ।।

ঃ নিরানন্দে ঘরে ফেরা ঃ

তখন ভোর পাঁচটা, আমি আমার পিত্রালয়ে প্রবেশ করলাম। বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই আমি সোজা লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকলাম। পরিবারের কাউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে না তোলার জন্য চাকর-বাকরদের বললাম, ম্যান্টলপীসের সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রিয় মায়ের ছবির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর তার নিচে উইলিয়ামের ফটোটার দিকে তাকিয়ে চোখ রাখতে গিয়ে আমার চোখ যেন ঝাপসা হয়ে উঠলো, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুক ফেটে যেতে থাকলো, অবশেষে দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বাদল নামলো, কিছুতেই চোখের জল সম্বরণ করতে পারলাম না।

আমি আমার প্রিয় মিষ্টি ভাইয়ের ফটোটা দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম স্নেহভরে। তবু কান্না থামাতে পারলাম না। পরক্ষণেই আমার আর এক ছোটভাই আর্নেস্ট লাইব্রেরীতে এসে ঢুকলো এবং চোখভর্তি জল নিয়ে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আমি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। প্রথমে কি বলে যে তাকে সান্ত্বনা দেবো তার ভাষা খুঁজে পেলাম না সেই মুহূর্তে। শুধু তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। আমাদের দু'জনেরই অশ্রুধারা অব্যাহত রইলো।

শেষ পর্যন্ত আমাদের দু'জনের চোখের জল শুকিয়ে গেলে পর আর্নেস্টকে জিজ্ঞেস করলাম আমার বাবা এবং এলিজাবেথ কিভাবে উইলিয়ামের মৃত্যুর শোক সহ্য করছেন!

'ওঁদের মধ্যে বাবা একটু সামলে উঠেছেন, কিন্তু এলিজাবেথ সান্ত্বনার অতীত, ওকে কিছুতেই বুঝিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। উইলিয়ামের মৃত্যুর জন্য ও নিজেকেই দোষী বলে মনে করছিল, প্রকৃত খুনীকে চিহ্নিত করার আগে পর্যন্ত এরকমই ধারণা ছিল ওর। তারপর—'

তাকে বাধা দিয়ে আমি মৃদু চিৎকার করে উঠলাম, প্রকৃত খুনীকে চিহ্নিত করা গেছে? কিন্তু কি করেই বা তা সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়?' আর্নেস্ট পাল্টা প্রশ্ন করে আমার মুখের দিকে তাকালো।

'কারণ গতকাল রাত্রে আমি তাকে পাহাড়ের কোলে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি, আর এখনো সে সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়েছে।'

'জানি না তুমি কি বলতে চাইছো, ভিক্টর,' উত্তরে আমার ভাই হতভম্ব হয়ে বললো, 'খুনী চিহ্নিত হওয়ার পর আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা আরও যেন বেড়ে গেছে।'

'কি রকম?' জানতে চাইলাম।

'কারণ উইলিয়ামের খুনী আমাদেরই অনুগত পরিচারিকা জাস্টিন মোরিজ।'

'জাস্টিন?' আমি হাঁ হয়ে গেলাম। ঢোঁক গিলে বললাম, 'সেটা অসম্ভব!'

'তোমার মতো প্রথমে আমরা কেউই তা বিশ্বাস করতে পারিনি। আর এলিজাবেথ তো এখনো বিশ্বাস করে না, জাস্টিন খুনী হতে পারে। তাছাড়া যে তথ্য প্রমাণে তাকে খুনী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেটা খুবই বিভ্রান্তিকর। মনে হয়, চাকর-চাকরানীদের মধ্যে কেউ একজন আমাদের মায়ের লকেটটা জাস্টিনের অ্যাপ্রনের পকেট থেকে পেয়ে থাকবে। উইলিয়াম যখন খুন হয়, তখন তার গলার হার থেকে লকেটটা চুরি করা হয়ে থাকতে পারে। আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো ভিক্টর?'

'কি সেই আশ্চর্য ব্যাপার আর্নেস্ট?'

'লকেটটা আমাদের পরিবারের, তা সত্ত্বেও সেই চাকরটা লকেটসহ আমাদের কাছে না এসে সোজা পুলিশের কাছে চলে গেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এ বাড়িতে এসে জাস্টিনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তার বিচার শুরু হবে আগামীকাল থেকে!'

'সে নির্দোষ, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত,' সেই পরিচারিকার হয়ে আমি সওয়াল করলাম এই যুক্তি দেখিয়ে, যে, 'কারণ কে যে প্রকৃত খুনী আমি তা জানি।'

এই সময় আমার বাবা আর এলিজাবেথ সেখানে হাজির হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো। তাই আর্নেস্টের পক্ষে আমি যা বললাম সে নিয়ে কোনো প্রশ্নই করতে পারলো না আর্নেস্ট।

বাবা আমাকে সস্নেহে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে অতি দুঃখের সঙ্গে আর্নেস্টের বক্তব্য সমর্থন করে বললেন, 'আমরা সবাই জাস্টিনের নির্দোষিতা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমাদের পরিবারের সঙ্গে সে শুধু বহু বছর ধরে ছিল বলেই না, সেই সঙ্গে তোমার স্বর্গীয়া মা ও উইলিয়ামের প্রতি তার আনুগত্যও কম ছিল না। আমি আশা করি আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করি সে যেন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। বিচারে যেন প্রমাণিত হয়, সে নির্দোষ, পুলিশের সন্দেহ মতো উইলিয়ামকে খুন করেনি সে। বিচারকদের সুবিচার আর আমাদের আদালতের শাসন ব্যবস্থায় অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।'

এলিজাবেথ নীরবে আমার বাবার বক্তব্য শুনছিল। একটা কথাও বলেনি তখন, তবে বাবা তাঁর কথা শেষ করতেই সে তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে অনুরোধ করলো, 'ভিক্টর তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ জাস্টিনের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে অবশ্যই একটা ওপায় খুঁজে বার করতে হবে, এক্ষেত্রে তোমার সাহায্য ভয়ঙ্কর ভাবে প্রয়োজন।'

'কিন্তু জাস্টিনের জন্য এতো কথাই বা বলছো কেন তুমি এলিজাবেথ?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করি।

উত্তরে এলিজাবেথ বললো, 'কারণ মেয়েটিকে আমি খুবই ভালোবাসি। শুধু এর জন্যই নয় কিংবা তাকে ভালোবাসি বলে আমার কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমি একথা বলছি না, আসলে আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, কাউকেই খুন করতে পারে না সে। তাছাড়া যে ছেলেকে তার ছেলেবেলা থেকে সে কোলেপিঠে করে বড় করেছে, তাকে সে নিশ্চয়ই খুন করবে না! করতে পারে বলে কি তোমার মনে হয়?'

এলিজাবেথের বিশ্বাস বা যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। এই মুহূর্তে আমার অন্তত তাই মনে হলো।

।। দশ ।।

ঃ দ্বিতীয় শিকার জাস্টিন মোরিজ ঃ

পরের দিন জাস্টিনের বিচার শুরু হওয়ার আগেই আমার বাবা ও এলিজাবেথের সঙ্গে আদালতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার মাথায় এখন কেবল একটা সম্ভাবনার কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, আর সেটা নিছকই অনুমানভিত্তিক নয়, একেবারে নিজের চোখে দেখা .... পাহাড়ের কোলে দানবটার ঘোরাফেরা......... তার হিংস্র শক্তির কথা আমি বেশ ভালোই জানি। এ দু'টি তথ্যই যেন আমাকে

বলে দিচ্ছে, আমার ভাই উইলিয়ামের হত্যাকারী অবশ্যই ওই দানবটা, জাস্টিন নয়। ওর বিচারের ব্যবস্থা করাটা যেন একটা বিরাট প্রহসন। তাই আমার এখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারপতির উদ্দেশে চিৎকার করে বলি, আমি ভিক্টর, অকপটে স্বীকার করছি আমি আমার ভাই উইলিয়ামের খুনের ব্যাপারে অপরাধী! মি লর্ড জাস্টিনকে ছেড়ে দিন, ও বেচারী নিরাপরাধ। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো আমার এই স্বীকারোক্তিতে জাস্টিনের মিথ্যে শাস্তিটা এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এর পরেও একটা কিন্তু থেকে যায়। যেমন, উইলিয়াম যে সময় খুন হয়েছে আমি তখন জার্মানিতে ছিলাম, তাই আমার এই স্বীকারোক্তি শুনে সম্ভবত কেউই ভাবতে পারে মানসিক দিক থেকে আমার ভারসাম্যের অভাব আছে। এক কথায় আমি পাগল। এ আমার পাগলের প্রলাপ!'

জাস্টিনের বিরুদ্ধে যে তথ্যপ্রমাণ খাড়া করা হয়েছে, সেসবই আনুষঙ্গিক, অর্থাৎ যে প্রমাণ নিশ্চিত বা প্রত্যক্ষ নয়, কেবল অবস্থা বিচার করে লাভ করতে হয়, সে যে দোষী তার কোনো সত্যিকরের প্রমাণ নেই। তাই জাস্টিনের দাবী, যখন সে জানতে পারলো উইলিয়াম নিখোঁজ, তখন তাঁর খোঁজে সাহায্য করবার জন্য দ্রুত প্লেনপ্যালাইসে ছুটে গেছিলো। অনেক ঘণ্টা পরে সে যখন ঘরে ফেরার চেষ্ট করে, তখন রাত প্রায় দশটা, আর সেই সময় শহরের প্রবেশপথের গেট বন্ধ হয়ে যায়। তাই সে কাছাকাছি একটা গ্রামের গোলাবাড়িতে সকাল না হওয়া পর্যন্ত বাকী রাতটুকু অপেক্ষা করে থাকে। তার মনে হয় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে সে, ভোরের দিকে পথচারীদের পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়।

উইলিয়ামের গলা থেকে লকেটটা কি করে যে তার অ্যাপ্রনের পকেটে চালান হয়ে এলো জাস্টিন জানে না। তার অনুমান, কেউ হয়তো সেটা তার অ্যাপ্রনের পকেটে রেখে দিয়ে থাকবে।

'কিন্তু কে সে?' আদালতকে সে বলে, 'এই পৃথিবীতে তার শত্রু বলে কেউ নেই! আর যদি বা কেউ উইলিয়ামকে খুন করে থাকে, তাহলে সে শুধু লকেটটা পাওয়ার জন্যই! আর তাই যদি হয় তাহলে খুনী সেটা আমার পকেটেই বা রেখে গেলো কেন?'

জাস্টিনের চরিত্র যে ভালো সেটা প্রমাণ করার জন্য আদালতে তার হয়ে সওয়াল করার জন্য এলিজাবেথ এগিয়ে এলো। কিন্তু বিচারকের চোখে ক্রোধের আগুন দেখে আমার মনে হলো, তার কোনো প্রয়োজন হবে না। জাস্টিন যে অপরাধী বিচারপতি বেশ ভালোভাবেই বুঝে গেছেন।

এরকম একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে আমি ছুটে আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার নিজের অপরাধের মুখোমুখি হতে পারলাম না। বিবেকের দংশনে আমি জ্বলে পুড়ে মরছিলাম যেন। আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, আমি নিজের হাতে ওই দানবটাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে জীবনদান করেছি, যে কিনা এই ভয়ঙ্কর অপরাধটা ঘটিয়েছে!

একটু পরেই এলিজাবেথ আর আমার বাবা, টলতে টলতে আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। ওঁদের মুখ দু'খানি ফ্যাকাসে সাদা দেখাচ্ছিল।

'ওহো ভিক্টর, এলিজাবেথ কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আমরা যা আশা করেছিলাম, এ যেন তার থেকেও খারাপ।'

'জাস্টিন তার অপরাধ স্বীকার করেছে,' দুঃখ করে বললেন আমার বাবা।

'না,' আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'এ আমি বিশ্বাস করি না।'

ঠিক তারপরেই কোর্ট ক্লার্ক আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে এলিজাবেথকে ডাকলো, 'ওহে মিস ল্যাভেঞ্জা, কয়েদী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

এলিজাবেথ আমার দিকে ফিরে তাকালো। 'জাস্টিনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে, অবশ্য ইতিমধ্যেই সে তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু আমি একা যেতে পারি না। দয়া করে তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

জাস্টিনের মুখোমুখি হবার কথায় আর একবার বিবেকের দংশনে আমার মনটা ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু এলিজাবেথের অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।'

আমরা জাস্টিনকে তার কারাকক্ষে খড়ের গাদায় বসে থাকতে দেখলাম। তার হাতদুটো লোহার চেন দিয়ে বাঁধা ছিল আর তার মাথাটা তার জড়ো করা দুটি হাঁটুর ওপর রাখা ছিল। আমাদের দেখে সে নিজেকে এলিজাবেথের পায়ের ওপর লুটিয়ে দিলো এবং চোখে তার অশ্রুর ধারা নামতে দেখা গেলো।

'ওহো জাস্টিন!' এলিজাবেথ চিৎকার করে উঠলো। 'কেন তুমি আমাদের মিথ্যে বলছো? তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তোমার নির্দোষিতা সম্পর্কে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি, উইলিয়ামকে তুমি খুন করোনি। কিন্তু তারপর আমি জানতে পারলাম, তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছো।'

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করেছি।' জাস্টিন কান্নার মধ্যেই মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'কিন্তু স্বীকারোক্তির প্রক্রিয়াটাই আগাগোড়া মিথ্যে বানানো। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, ওই রকম স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল আমাকে। আমি যদি ওইরকম স্বীকারোক্তি না দিই ওরা আমাকে বলেছিল, মৃত্যুর পর স্বর্গে আমি প্রবেশ করতে পারবো না, আমাকে নরকেই থাকতে হবে। এসব কথা শুনে আমি তখন এতোই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে ওদের কথা মতো কাজ করি। কিন্তু আমি এখন বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। আমি যে আমার অন্তরের প্রিয় উইলিয়ামকে খুন করিনি, একথা আমি আপনাদের বিশ্বাস না করিয়ে আমি কখনো মরতে পারবো না। আমি আপনাদের যা সত্য তাই বলেছি আর এখন আমি শান্তিতে মরতে পারবো। আপনারা জানেন......আর ঈশ্বর জানেন......আমি নির্দোষ!'

দু'জন মহিলাকে এ ওর হাত ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে নিদারুণ যন্ত্রণায় আমি ভেতরে, ভেতরে গোঙাতে থাকলাম। এরা দু'জনেই আমার অতি প্রিয়, সারা জীবনের বন্ধু, কিন্তু ওদের সান্ত্বনা দিতে, ওদের দুঃখ একটু লাঘব করতে পারবো না আমি, নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হলো আমার। জানি না আমার কথা কেউ শুনবে কিনা, কিংবা কোনোরকম গুরুত্ব দেবে কিনা!

তবু তা সত্ত্বেও এলিজাবেথ আর আমি দু'জনেই বিচারপতির মতের পরিবর্তন করাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই জাস্টিন মোরিজকে টাউন স্কোয়ারে নিয়ে যাওয়া হলো এবং একজন খুনী হিসেবে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো তাকে!

আতঙ্কে ও হতাশায় আমার এখন মনে হচ্ছে, আমার অন্ধ উচ্চাশা আর আমার ভয়ঙ্কর সৃষ্টির জন্য শিকার হলো আমার দু'জন প্রিয় পাত্রপাত্রী!

'এর পর আমার বেঁচে থেকেই বা কি লাভ?' হতাশায় ও ব্যর্থতায় আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম। 'আমার পক্ষে আত্মহত্যা করাটাই বোধহয় এর সঠিক উত্তর হবে। কিন্তু যে নিদারুণ দুঃখ-

যন্ত্রণা সহ্য করছে এলিজাবেথ আর আমার বাবা, এর ওপর অসময়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনে ওদের দুঃখটা আরও বাড়িয়ে তুলি কি করে?' তারপর এ কথাও আমার মনে পড়ে গেলো, এই নিষ্ঠুর শয়তান দানবটা আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য মনে মনে কি মতলব আঁটছে আমি জানি না। সে যাই হোক, তাদের রক্ষা কররার ভার যে আমাকেই নিতে হবে! কারণ তাদের ভালোমন্দ দেখার কেই বা আছে আমি ছাড়া!

তারপর আমি স্থির করলাম, আমার সব হতাশা, দুঃখ ও যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে এখন নিজেকেই ওই দানবটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই মনে মনে শপথ নিলাম, 'একদিন এই দানবটাকে আমি ঠিক খুঁজে বার করবোই এবং তার মুখোমুখি দাঁড়াবো। তারপর তার ভয়ঙ্কর অপরাধের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবো!'

।। এগারো ।।

ঃ দানবের মুখোমুখি ঃ

জাস্টিনের মৃত্যুর পর জেনেভায় আমার বাড়িতে আমার হতাশা ও বিষণ্ণতার মোকাবিলা করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠলো। তাই আমি নিজেই ক্যামাউনিক্সের একটা শান্তিপূর্ণ গ্রামে চলে গেলাম। উইলিয়াম আর জাস্টিনের মৃত্যুর পর আমার মনে না ছিল শান্তি, না ছিল চোখে ঘুম।

যাই হোক, টানা একমাস সুন্দর আলপাইন ওপত্যকার মধ্যে দিয়ে শান্ত পরিবেশে দীর্ঘ ভ্রমণ করে এবং সল্ট ব্ল্যাঙ্কের সতেজ পাহাড়ী বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আমার মনটা অনেকখানি যেন হাল্কা হয়ে গেলো। এর ফলে দিনের বেলায় আমি একটু আরাম করতে পারলাম আর রাতে ভালো করে ঘুমতে পারলাম।

একদিন সকালে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, আমার ঘর থেকে সামনে পাহাড়ের যে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য একদিন আমি উপভোগ করে আসছিলাম, বৃষ্টির দাপটে সেটা ঢাকা পড়ে গেছে।

কিন্তু যতোই মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ুক না কেন, পাহাড়ে, আমার প্রিয় জায়গায় আমার প্রতিদিন ওঠার অভ্যাসটা ছাড়তে আমি অস্বীকার করলাম। এই জায়গায় বসে আমি মুগ্ধচোখে দেখলাম হিমবাহ কি অদ্ভুতভাবেই না ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে পাহাড়ের ঢালু পথে গড়িয়ে যেতো।

আমার বাহন খচ্চরটা সাবধানে খাড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠে এলো। ওদিকে মুষলধারায় বড় বড় ফোঁটার আঘাতে পাহাড়ের নিচের ওপত্যকা ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকলো। তখন দুপুর, পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে এলোম। চারদিকে হিমস্রোত, ঠিক করলাম সেটা অতিক্রম করে যাবো। তিন মাইল চওড়া হিমস্রোত, জমাট বরফের মাঝে মাঝে চিড় আর ফাটল ধরেছে। হিমস্রোতের ওপর দিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছিই, ফাটল এড়াতে একটু বাড়তি সময় লাগছিল, সাবধানের মার নেই, ফাটলে একবার পা পড়লে কয়েকমাস উঁচু বরফের নিচে তলিয়ে যেতে হবে। বড় দুর্গম, পিচ্ছিল সে পথ। সেটা পেরোতে টানা দুঘন্টা সময় লেগে গেলো।

এক সময় সূর্যের দেখা মিলতেই শেষ পর্যন্ত বিরক্তিকর বিষণ্ণ বৃষ্টি থেমে গেলো। বরফের

পাহাড়ে সূর্যের আলো পড়তেই ঝলমলিয়ে উঠলো। আমার চারদিকে ঝিলিকের সৌন্দর্য আমার মনের বিষণ্ণতা কাটিয়ে যেন এক অনাবিল আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলো।

হঠাৎ হিমবাহের ওপর দিকে একটা মানুষের মূর্তি দেখেতে পেলাম, বিশাল চেহারার লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল সুপার হিউম্যানের গতিতে। আমি তখন ধীরে ধীরে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে আমার ক্লান্ত দেহটা কোনোরকমে টেনে টেনে নিয়ে চলেছি বরফ পাহাড়ের ওপরে। ছুটন্ত অবস্থায় সে সেই মসৃণ ও পিচ্ছিল বিপজ্জনক বরফের ওপর লাফ দিলো।

দৈত্যের মতো চেহারার লোকটা আমার কাছে আসতেই আমি ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠলাম, তার দু'চোখ দিয়ে ক্রোধের আগুন ঝরে পড়ছিল। ভালো করে তার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, এই সেই শয়তান দানবটা, দু'বছর আগে আমি নিজেই যাকে সৃষ্টি করেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি বুঝে গেলাম, সেখানে থেকে আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে তার মুখোমুখি হবার জন্য এবং তাকে জানিয়ে দিতে হবে, এখন আমি তাকে কতোই না ঘৃণা করি...........আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যত আমাকে তার সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে।

'শয়তান!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'আমার কাছে আসার সাহস পেলে কি করে তুমি? ইচ্ছে করলে আমি একটা ঘুষিতে তোমাকে খতম করে ফেলতে পারি, আর যে দুটি মানুষকে তুমি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছো তাদের জীবন আমি ফিরিয়ে আনতে পারি!

'তোমার এই সম্ভাষণের জন্য আমি একটুও বিস্মিত নই। এরকমই আশা করেছিলাম আমি, শান্তভাবে বললো দানবটা। 'হাজার হোক, আমার মতো এমন এক কুৎসিত জীবকে সবাই ঘৃণা তো করবেই। কিন্তু তোমার দোষেই তো আজ আমার এই কুৎসিত দশা হয়েছে। তুমি তো আমাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছো।'

আমি আমার ক্রোধ আর সামলাতে পারলাম না। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কুৎসিত হলুদ মুখটা দুহাতে চেপে ধরলাম।

কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং তৎপর সে। আমার হাত দুটো সে তার শক্ত হাতদুটো দিয়ে চেপে ধরে শান্ত গলায় উত্তর দিলো, শান্ত হও আমার সৃষ্টিকর্তা, এতো রাগ করলে কি চলে! আমায় খুন করবার জন্য আবার চেষ্টা করবার আগে মন দিয়ে আমার কাহিনী শোনো। আর মনে রেখো, তোমার চেয়ে আমাকে বিশাল আর শক্তিশালী করে তুলেছো। তুমি, হ্যাঁ শুধু তুমিই!'

'তুমি একটা জঘন্য চরিত্রের জীব, তোমার কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না।'

'ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, তুমিই বলো, কি করেই বা আমি তোমার কাছে আমার আবেদন পেশ করতে পারি? আমিও যে কষ্ট পেয়েছি, সে কথাটা কি করেই বা তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারি বলো? আমি এখন দুর্দশাগ্রস্ত এবং নিঃসঙ্গ একা, আমি এখন ছেলে বুড়ো সবারই নিদারুণ ঘৃণার পাত্র, এসবের জন্য তুমিই দায়ী!'

'আর তোমাকে সৃষ্টি করার জন্য আমিও নিজেকে ঘৃণা আর অবজ্ঞা করছি!'

'তাহলে আমি যা বলতে চাই তা তোমার শোনা একটা কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। তারপর তুমি যদি তখনও আমাকে খতম করতে চাও, আর তুমি পারো তাহলে তা করতে পারো। তবে একটা কথা মনে রেখো, তুমি, হ্যাঁ তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো।'

'যেদিন আমি এই জঘন্য কাজটা করেছি, সেই দিনটাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। আর এই যে আমার হাত দুটো দিয়ে সেই জঘন্য কাজ করেছি সে দুটোকেও আমি অভিশাপ দিচ্ছি! যাও, চলে যাও এখান থেকে! এক মুহূর্তের জন্যও তোমার দিকে আমি তাকাতে পারছি না, অসহ্য!'

দানবটা আমার চোখের ওপর তার হাতদুটো রেখে বললো, 'এখন আমার দিকে তাকাতে হবে না তোমাকে।'

আমি আমার মুখের ওপর থেকে তার হাতটা সরিয়ে তার দিকে পিছন ফিরে তাকালাম।

দানবটা তার হাতদুটো ওপর দিকে তুললো এমন করে যেন সে আমার কাছে আবেদন করে বলছে, 'তাহলে আমার দিকে তাকিও না। যেমন আমার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছো, তেমনি থেকে আমার কাহিনী শোনো আর আমার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করো। যদি তুমি সেটা অনুমোদন করো তাহলে আমি তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবো। আর তুমি যদি তা না করো.........ঠিক আছে, এব্যাপারে পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো।'

জানিনা, এটা কোনো কৌতূহল কিংবা ভয় অথবা দয়া দেখিয়ে তার কথা শোনাবার জন্য সে আমাকে রাজী করাচ্ছে। কিন্তু যে কারণই হোক না কেন, আমি ঠিক করলাম আমি তার কথা রাখবো। অতএব আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার মাথা নাড়লাম।

হিমবাহের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বললো, 'আমার কাহিনী এতো বড় যে এখানে এই হিমেল প্রবাহের হিমেল বাতাসে আমরা বসে থাকতে পারবো না। কথা বলা তো দুরে থাক। তাই দয়া করে আমার সঙ্গে এসো। ওই পাহাড়ের ওপরে একটা কুটীর থাকার কথা আমি জানি।'

তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বরফের পাহাড়টা অতিক্রম করবার জন্য যাত্রা শুরু করলো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম, তবে তার দ্রুত চলার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আমার খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

আমি যখন সেই কুটীরের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম, সে তখন কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমি নিজে সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসলাম এবং সে তার কাহিনী বলতে শুরু করলে পর আমি শুনতে থাকলাম।

।। বারো ।।

ঃ দানবের গল্প শুরু ঃ

তুমি যখন প্রথম আমাকে জীবনদান করলে, আমি তখন নবজাত শিশুর মতোই অসহায় বোধ করছিলাম। তবে আর পাঁচটা মানুষের মতোই আমি তখন থেকেই দেখতে পেয়েছি, ঘ্রাণ নিতে পেরেছি, শুনতে পেরেছি, অনুভব করতে পেরেছি এবং স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছি।

এই সব চেতনালাভের ফলে আমি খুবই ভয় পেয়ে যাই, তাই যেমন ভয় পেয়ে শিশু তার বাবার কাছে ছুটে যায়, ঠিক সেইভাবেই আমি তোমার ঘরে ছুটে গেলাম। উল্টে আমাকে দেখে ভয় পেয়ে তুমিই তখন আমাকে ফেলে ছুটে পালালে। আমি তখন খুবই অসহায়বোধ করলাম, কি যে করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

প্রচণ্ড শীতে আমি তখন খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। তাই তোমার ক্লোক দিয়ে আমার শরীরটা

ঢাকলাম ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। আমি তখন বড়ই অসহায় এবং বিষণ্ণতায় ভরা এক হতভাগ্য ব্যক্তি যেন। সেই অবস্থায় সেই রাত্রেই আমি তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় চলেছি আমি তখন জানতাম না, আমার সেই চলার পথের শেষ কোথায় কিংবা আমার শেষ ঠিকানাই বা কোথায় তাও জানতাম না তখন, আর পথের শেষে আমার মতো হতভাগ্য ব্যক্তির জন্য কি যে অপেক্ষা করছে তাও জানতাম না। শুধু মনে আছে, কাঁদতে কাঁদতে আমি পথ চলছিলাম এবং ইঙ্গোলস্ট্যাডের বাইরে একটা অরণ্যে যখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম আমি তখন শরীর ও মন উভয় দিক থেকেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমি তখন আমার ক্লান্ত শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য একটা পুকুরের কাছাকাছি একটা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় শুয়ে পড়লাম।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আমি গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রইলাম এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় আমার ঘুম ভেঙে গেলো। জনবসতিহীন জায়গায় খাবার কোথায়? তাই সামনের নদীর জল পান করলাম। আর মাটিতে কিছু বৈঁচি জাতীয় ফল পড়ে থাকতে দেখলাম, তাই খেলাম। পরে অবশ্য আহারের ব্যবস্থা হলো।

সেই অরণ্যে একটা মাস কাটালাম। চন্দ্র ও সূর্য প্রতিদিন কিভাবে আকাশটাকে বদলে দেয় সেটা লক্ষ্য করলাম সেখানে থেকে। আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিদের সুন্দর কাকলি কিরকম জানতে হবে আমাকে। আমি তাদের সেই কণ্ঠস্বর নকল করবার চেষ্টা করলাম, যেমন কোকিলের ডাক, কিন্তু পারলাম না। আমি আমার মুখ দিয়ে অন্য সব শব্দও করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মিষ্টি শব্দের বদলে যেভাবে রূঢ়, কর্কশ শব্দ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, নিজের কণ্ঠস্বর শুনে আমি নিজেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।

অরণ্যের বাইরে বেড়াতে শুরু করলাম, ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় আমি একটা আগুনের উৎস খুঁজে পেলাম। মনে হয় ভিখারীরা সেটা ফেলে গিয়ে থাকবে। আমি সেই আগুনের তাপ নিতে গিয়ে উষ্ণতার পরশ অনুভব করলাম এবং বরফের অন্ধকারের সেই আগুনের আলো আমাকে অনেকটা পথ দেখালো। আমি সেই কয়লার আগুনে আমার ঠাণ্ডা হাতদুটো ছুঁড়ে দিলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র যন্ত্রণায় হাত সরিয়ে নিতে হলো আমি হতবাক হয়ে গেলাম, কেন এরকম হলো? কোনো জিনিস যা একবার ভালো লাগে, পরেই সেটা আবার খারাপ লাগে, যন্ত্রণা দেয় কেন? এ ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না।

আমি জ্বালানিগুলো যা থেকে আগুনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে জানতে পারলাম, সে আগুন গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী হয়েছে, এ ব্যাপারে হাওয়ার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমি আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, বাদাম, গাছের শিকড় বৃক্ষমূল আগুনে রান্না করে খেলে ভালো স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ওই বৈঁচি জাতীয় ফল ভালো নয়।

অরণ্যে খাবারের বড়ই অভাব। বলাবাহুল্য এই অরণ্যেও আমার খাদ্যের যোগান অচিরেই বন্ধ হয়ে গেলো। তাই সেই অরণ্য ও আগুন ছেড়ে আসতে হলো আমাকে। আমি তখন নিজেকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে আবিষ্কার করলাম। নিচে শ্বেত-শুভ্র বরফের চাদরের ওপর পা ফেলতে গিয়ে ভীষণ কষ্ট পেলাম, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার পা দুটো যে অবশ হয়ে আসতে থাকলো।

একটানা তিনদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে অনাহারে কাটানো, ওদিকে মাথার ওপর কোনো ছাদও ছিল

না। যাই হোক, একদিন প্রথম সকালে একটা ছোট্ট কুটীরের সামনে এনে হাজির হলাম। কুটীরের দরজাটা খোলা ছিল। আমি তখন এতোই ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত যে, কুটীরের মালিকের অনুমতি না নিয়েই টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। একজন বৃদ্ধ একটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে তার প্রাতঃরাশের খাবার তৈরী করছিল। কুটীরের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ স্তব্ধ হতবাক, তার শরীরের সব রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেলো। তারপর ঘটনার আকস্মিকতা কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে কুটীর থেকে বেরিয়ে যায় বাইরে।

আমাকে দেখে বৃদ্ধের ভয় পাওয়ার কারণটা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, বোধহয় আমাকে চোর কিংবা ডাকাত ঠাওরে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কুটীরের একটা আয়নায় নিজের কুৎসিৎ চেহারাটা দেখে আমি নিজেই আঁতকে উঠলাম এবং বৃদ্ধের ভয়ের কারণটা তখন ওপলব্ধি করতে পারলাম।

তবে বৃদ্ধ তার কুটীর থেকে পালিয়ে গিয়ে আমার একটা বিশেষ সুবিধে করে দিয়ে গেলো, তারই তৈরী করা প্রাতঃরাশের খাবার আমি নির্বিবাদে খেতে থাকলাম। তারপর আমেজ করে খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়লাম এবং অচিরেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

দুপুর পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, মাথার ওপর আকাশে সূর্য তখন মধ্যগগনে। তারপর আমার প্রাতঃরাশের অবশিষ্ট অভুক্ত খাবার একটা পাউচে ভরে নিয়ে কুটীরের বাইরে এসে আমি আবার পথে নামলাম, আমার চলার পথের জের টেনে চললাম।

বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর একটা গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমি। সেখানে অনেক ছোটো ছোটো কটেজ এবং বড় বড় বাড়ি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়ির বাগানে শাক-সব্জির ফলন চোখে পড়লো আমার। প্রতিটি বাড়ির জানালার গরবেটে দুধ ও চীজ রাখা ছিল। আমি আমার আগের অভিজ্ঞতা থেকে জেনে গেছি যে, আমার অমন বীভৎস চেহারা দেখে এখানকার মানুষজন রীতিমতো ভয় পেয়ে যাবে। তাই ওইসব বাড়িগুলোর মধ্যে একটি বাড়িতে ঢুকলাম, সেখানকার প্রতিটি লোককে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য। বাচ্চারা যথারীতি আমাকে দেখামাত্র ভয়ে চিৎকার করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো আর মেয়েরা অজ্ঞান হয়ে গেলো।

বাচ্চাদের সেই আচমকা চিৎকার শুনে গ্রামের প্রতিটি লোক সতর্ক হয়ে গেলো এবং সব দিক থেকে লোকেরা জড়ো হয়ে আমার কাছে আসতে শুরু করলো। তারা আমাকে লক্ষ্য করে পাথরের টুকরো ছুঁড়তে শুরু করলো, কেউ বা তাদের হাতের ছোঁড়া, তলোয়ার জাতীয় অস্ত্র শূন্যে ঘোরাতে থাকলো। বেগতিক দেখে আমি সেই গ্রাম থেকে পালিয়ে এলাম। তারপর প্রাণের ভয়ে খোলা মাঠ ধরে রুদ্ধশ্বাস ছুটতে থাকলাম যতক্ষণ না আমার পিছনে ধাবমান গ্রামবাসীরা আমার চোখের আড়াল হয়।

অনেক ঘণ্টা পরে আমি একটা কটেজ সংলগ্ন কাঠের শেডের নিচে এসে দাঁড়ালাম। খানিক আগে একটা গ্রামের বাসিন্দারা আমার সঙ্গে যে রূঢ় ব্যবহার করলো তা মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। তাই সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথায় মাথা রেখেই দ্বিতীয়বার কোনো কটেজে ঢোকার সাহস পেলাম না। কিন্তু আমি সেই কাঠের শেডের নিচে গুটিসুটি মেরে বসে রইলাম। আমার দাঁড়াবার মতো শেডটা তেমন উঁচু ছিল না। আর খুব একটা ভালোভাবে বসতেও পারছিলাম না। তবে তার জন্য আমি কিছু মনে করলাম না। ঘুমবার জন্য যে একটা জায়গা পেলাম তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। শুধু

তাই নয়, এই শেড আমাকে তুষারপাত আর বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবে।........সেই সঙ্গে জনগণের আক্রমণ থেকেও আমাকে রক্ষা করতে পারবে।

পরের দিন দিনের আলোয় ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখলাম চারপাশে একটা শূকরের খোঁয়াড় এবং জলের ডোবা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি। আমি যেখানে গুটিসুটি মেরে বসেছিলাম, শেডের সেই দিকটাই কেবল খোলা ছিল, বাকি দিকগুলো ঢাকা ছিল। এই খোলা দিকটা আমি কাঠ ও পাথর দিয়ে ঘিরে ফেললাম, যাতে করে আমি সেখান থেকে বেরোতে এবং প্রবেশ করতে পারি। কিছু খড়ও সংগ্রহ করলাম যা দিয়ে আমি আমার রাতের বিছানা বানাবো। শেড ও কটেজের মধ্যে একটা কাঠের দেওয়াল ছিল, সেই কাঠের তক্তাটা আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। কাঠের দেওয়ালে একটা বড় ফাটলের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে দেখলাম, কটেজের দিকে একটা খালি ঘর রয়েছে।

শেড থেকে গুটিসুটি মেরে বেরিয়ে এসে আমি এবার সেই কটেজের ভেতরে ঢুকলাম। ভাবলাম, হয়তো সেখানে খাবার জন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে। সেখানে একটা গোটা পাউরুটি পরে থাকতে দেখলাম। পাউরুটির সঙ্গে একটা কাপও ছিল। সামনের ডোবা থেকে এই কাপে করে জল তুলে নিয়ে এলাম পান করার জন্য।

আমি ঠিক করলাম কোনো কিছু কিংবা কেউ যতক্ষণ না জোর করে আমাকে তাড়িয়ে দেয় ততদিন পর্যন্ত এই কাঠের শেডটাকেই আমি আমার ঘর-বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করবো। খোলা মাঠে কিংবা জঙ্গলে বাস করার তুলনায় এটা যেন আমার কাছে একটা স্বর্গ বলে মনে হলো।

এদিকে দিন যতো যায়, আমি জানতে পারি, পাশের কটেজে ডি লেসির সঙ্গে তিনজন ব্যক্তি; তাঁরা হলেন আগাথা নামে এক যুবতী মহিলা, তাঁর ভাই ফেলিক্স এবং তাঁদের বৃদ্ধ ও অন্ধ বাবা।'

তাঁদের পরিবারটা অত্যন্ত গরীব এবং দু'জন যুবক যুবতী তাঁদের প্রিয় বাবার আহার যোগানো ও যত্ন নেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন, এমন কি কখনো বা তাঁরা না খেয়েই থেকে যান যাতে করে তাঁদের বৃদ্ধ বাবার আহারে ঘাটতি না পড়ে। তাদের বাগানে খুব কমই শাক-সব্জি ফলে থাকে এবং তাদের গৃহপালিত গরুর দুধও খুবই সামান্য।

এঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে দয়া-দাক্ষিণ্য এবং স্নেহ ভালোবাসা দেখালেন তাতে আমার জ্ঞানচক্ষু যেন খুলে গেলো। গভীরভাবে আমার মনে প্রভাব ফেললো। এর ফলে ওঁদের কাছ থেকে খাবার আর চুরি করার প্রবৃত্তি হলো না আমার বরং প্রতি রাত্রে আমি জঙ্গলে গিয়ে ওঁদের জন্য ফল ও বাদাম সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে থাকলাম। শুধু তাই নয়, যুবক ফেলিক্সের যন্ত্রপাতি নিয়ে রাত্রের দিকে জঙ্গলে চলে যেতাম ওঁদের কাঠ কেটে আনতে। আমার সংগ্রহ করা ফল, বাদাম, কাঠ ইত্যাদি ওঁদের বাড়ির দরজার সামনে রেখে দিতাম চমক দেবার জন্য। পরের দিন সকালে ওই সব জিনিসের আকস্মিক প্রাপ্তিতে ওঁদের কিরকম আনন্দ হয় তা দেখার জন্য আমি দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ওঁদের আনন্দ ও তৃপ্তি দেখে আমার খুশির ভাবটা ওঁদের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যেতো। তাতেই আমার আনন্দ, আমার তৃপ্তি, সব কিছুই!

আমার আনা কাঠ দিয়ে তাঁরা তাঁদের কটেজে আগুন জ্বালাতেন তাঁদের রান্নার কাজে এবং ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য ব্যবহার করনে। এতে তাঁদের মধ্যে খুশির ভাব দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম। রাত্রে সেই আগুন থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে যুবক যুবতীরা বৃদ্ধকে বই পড়ে

শোনাতেন। তাঁরা যেসব কথাগুলো বলতেন, যেন সেগুলো তাঁদেরই কথা, তাঁদের জীবন-গাঁথা, একটি একটি করে সুতোয় ফুল গেঁথে যেমন করে একটা মালা গাঁথা হয়!

একের পর এক দিন, সপ্তাহ এবং মাস যতোই চলে যেতে থাকে আমার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। নিজের মনে আমি ভাবি, ওঁদের সেই সব কথাগুলো আমিও বলবো। আমার আশা ছিল, একদিন আমি আমার পরিচয় দেবো ওঁদের কাছে এবং ওঁদের ভাষায় কথা বলতে পারবো। আমার ধারণা ছিল, সম্ভবত এভাবেই আমার কুৎসিত রূপটা ওঁদের চোখে চাপা পড়ে যাবে.......ওহো হ্যাঁ, ডোবার জলে আমার চেহারার প্রতিফলন দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম, কি কুৎসিৎই না আমি দেখতে হয়ে গেছি। নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে ভয় হয়। তাই আমাকে দেখে বাইরের লোকেদের ভয় পাওয়ারই তো কথা! তাদের দোষ দিই কি করে বলো।

এর পরের ঘটনা একটু অন্য ধরনের, সেটার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল, যা কিনা ওঁদের মতো অভাবের সংসারে সেটা যেন অন্যভাবে, অন্য রূপে দেখা দিলো, অন্তত আমার তো সেরকমই মনে হয়েছিল। হ্যাঁ, একদিন সকালে এক পরমাসুন্দরী যুবতী ঘোড়ার পিঠে চেপে কটেজে এসে হাজির হলো। ফেলিক্স তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো এবং তিনি তাঁকে সোফি বলে সম্বোধন করলেন। সেফি তাঁর বাগ্‌দত্তা। তিনি এখানে এসেছিলে তাঁকে বিয়ে করার জন্য। তিনি এসেছিলেন দূরবর্তী একটা দেশ তুর্কী থেকে। তবে ফেলিক্সের পরিবারের সদস্যদের মতো এই ভাষায় কথা বলেননি তিনি।

সোফির আসার পর তাদের ভাষা পড়াবার এবং কথা বলার ভাষা শেখাতে ফেলিক্সের বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগলো। কাঠের দেওয়ালে সেই ফুটো অংশে চোখ রেখে আমি ওঁদের আলোচনার কথা শুনতে গিয়ে আমি ওঁদের অনেক কথাই বলতে শিখে গেলাম।

জঙ্গলে আমি প্রায়ই কাঠ কাটতে যেতাম। এমনি একদিন জঙ্গলে গিয়ে দেখি, কিছু পোশাক ও বই সমেত একটা সুটকেস পড়ে রয়েছে সেখানে। সোফির সঙ্গে নিজেকে শিক্ষা দেওয়া আর পড়ার জন্য বইগুলো ব্যবহার করলাম।

সহজ সাধারণ জীবন-যাপন এবং একটা সুখী-পরিবারের সঙ্গে থেকে সারাটা শীতকালে ও বসন্তকালে আমি খুবই আনন্দ ওপভোগ করি। আমি মনে করি সেই পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বলে মনে করি। এই পরিবারের সদস্যরা যেসব কথাগুলো বলে এবং পড়ে আমি সেসবই খুব ভালো করে রপ্ত করতে পেরেছি, তার জন্য আমি রীতিমতো গর্ববোধ করি।

কিন্তু যে ভাষা আমি শিখেছি, সে ভাষায় কারোর সঙ্গে কথা বলবার মতো যখন কেউ আমার নেই তখন সেই ভাষা শিখে কি লাভ বলো? আমি কি কখনো সেই সব মানুষজনের মুখোমুখি হতে সমর্থ হবো, আর তারা আমার কুৎসিত চেহারা দেখে আমার কাছ থেকে ছুটে পালাবে না, এমন কি হতে পারে? ফেলিক্স আর সোফিকে যেমন এ ওর দিকে অনুরাগের চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি, সেরকম কোনো মেয়ে কি কখনো ভালোবাসার চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাবে? আমার ভাগ্যে কি কখনো বন্ধু-বান্ধব কিংবা পরিবার জুটবে? এমনকি যে মানুষটিকে আমি আমার বাবা বলে বিবেচনা করি তুমি, হ্যাঁ তুমি ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আমায় এমন দুর্দশাগ্রস্ত দেখে তুমিও ছুটে পালিয়ে গেছিলে আমার কাছ থেকে। মনে আছে বাবা তিনি বছর আগে তুমি আমার জন্ম দিয়ে যখন আমার

এই কুৎসিৎ চেহারা দেখে ভয় পেয়ে তুমিও তো পালিয়ে গেছিলে, পারো তা অস্বীকার করতে?

তোমার বিরুদ্ধে আমার তিক্ত মনোভাব দৃঢ়তর করে তোলে আর একটা ঘটনা। আমি যখন প্রথম আমার শেডে আমি তোমার শোবার ঘর থেকে তিন বছর আগে নেওয়া তোমার ক্লোকের পকেট থেকে তোমার একটা নোটবুক দেখতে পাই। আমি তখন না পড়তে পারতাম, না তোমাদের ভাষা জানতাম। তাই প্রথমে সেই নোটবুকটা আমার কাছে অর্থহীন বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন একবার পড়তে শিখলাম, আমি তখন আমাকে সৃষ্টি করার আগে তোমার ক্রিয়াকলাপ আর তোমার চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে সব কিছুই জানতে পারি। হ্যাঁ, আমাকে তোমার সৃষ্টি করার কাজ শেষ হওয়া মাত্র আমার কুৎসিত চেহারা দেখে কেন যে তুমি ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলে, তার কারণ এখন আমি বেশ বুঝতে পারি।

কেন তুমি আমার চেহারাটা এমন কুৎসিত করে তুললে, যা দেখে তুমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলে সেদিন? যেদিন তুমি আমার দেহে প্রাণ দিয়েছিলে সেই দিনটির কথা আমি আজও ভুলিনি, আজও আমি অভিশাপ দিই সেই দিনটিকে। আর তোমাকে আমি কি পরিমাণ অভিশাপ দিই তুমি যদি জানতে............

কিন্তু আমি যখন দয়ালু ডি লেসিসের কথা ভাবি, তখন আমার তিক্ত মনোভাব অনেকটা নরম হয়ে যায়।' আমার স্থির বিশ্বাস, ডি লেসিস আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন, আর আমি যখন আমার জীবনের করুণ কাহিনী বলবো ওঁরা নিশ্চয় আমার এই কুৎসিত চেহারা উপেক্ষা করবেন, তখন ওঁরা জানতে পারবেন প্রকৃতপক্ষে আমি একজন ভালো লোক।

তবুও যদি আমি ওঁদের অনুগ্রহ, দয়া আর সহানুভূতি লাভ করার জন্য কামনা করি, তবু আমি ওঁদের কাছে আমার পরিচয় দিতে বিরত থাকি এই ভয়ে যে, ওঁরাও যদি ভয়ে আতঙ্কে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন!

দীর্ঘ এক বছর ধরে শেডের তলায় থাকার সময় আমি মনে মনে পরিকল্পনা করেছি কিভাবে ওই পরিবারের কাছে নিজের পরিচয় দেবো। আমি ঠিক করি, বৃদ্ধ যখন একা থাকবেন তখন আমি কটেজে প্রবেশ করবো। আমি জানি, তিনি অন্ধ, তাই আমার এই কুৎসিৎ চেহারা কোনোভাবেই তিনি দেখতে পাবেন না। এই ভাবে আমি তাঁর কাছে পরিচিত হয়ে উঠবো, আর উনি যেমন একজন দয়ালু ব্যক্তি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাবেন, আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাবেন। সর্বপরি উনি আমাকে পছন্দ করবেন। তারপর আমি ভেবে দেখলাম, যখন ওঁর ছেলে মেয়েরা আমার সঙ্গে মিলিত হবেন, ওঁরা যখন দেখবেন, ওঁদের বাবা আমাকে পছন্দ করেন, আর ওঁরাও তখন আমাকেও পছন্দ করবেন, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবেন, আমার প্রতি সহানুভূতি জানাবেন!

একদিন সকলে ফেলিক্স এবং আগাথা গ্রামের একটা মেলায় গেলে পর, আমি দেখলাম এই সুযোগ। আমি তখন শেড ছেড়ে ডি লেসিসের কটেজের প্রবেশপথের সামনে গিয়ে দরজায় নক্ করলাম। আমার হাঁটু আর হাত অসম্ভব কাঁপছিল।

ডি লেসিস যখন বললেন, 'ভেতরে এসো' আমি তখন একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে দরজা খুলে কটেজের ভেতরে ঢুকলাম। আমি নিজেকে একজন ভ্রমণার্থীর পরিচয় দিয়ে আমার একটু বিশ্রামের

প্রয়োজনের কথা বললাম তাঁকে। বৃদ্ধ মানুষটি আমাকে স্বাগত জানালেন। এমন কি তিনি আমাকে তাঁর খাবার থেকে ভাগ দিতেও চাইলেন।

অনেক ব্যাপারে আমরা দুজনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা করলাম এবং একজন মানুষের বন্ধু পাওয়া যে কত জরুরী এ নিয়েও আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে। আমার সত্যিকারের বিশ্বাস হলো, বৃদ্ধ মানুষটি আমার বন্ধু হয়ে গেছেন। তারপর হাঁটুতে ভর দিয়ে যখন কৃতজ্ঞতায় তাঁর একটা হাত জড়িয়ে ধরলাম ঠিক তখনি কটেজের সদর দরজাটা খুলে গেলো এবং বৃদ্ধের মেয়ে ও তার হবু স্বামী ঘরে এসে ঢুকলেন।

আমাকে দেখে তাঁরা যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তার বিবরণ দেবার ভাষা আমার জানা নেই। সোফি দরজা দিয়ে বাইরে পালিয়ে গেলো এবং আগাথা জ্ঞান হারালো। ওঁদের মধ্যে একমাত্র ফেলিক্সই দৃঢ়তা দেখিয়ে আমার দিকে ছুটে এসেছিলেন, তখন তাঁর দেহ মনে দৈত্যের শক্তির আভাস যেন পেলাম। আমি তাঁর বাবার হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরতেই ফেলিক্স আমাকে তাঁর বাবার কাছ থেকে জোরে ধাক্কা মেরে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

এর ফলে আমি মেঝের ওপরে আছড়ে পড়লাম এবং সেই অবস্থায় ফেলিক্স তাঁর হাতের লাঠিটা দিয়ে আমাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে দিলো। খালি হাতে আমি হয়তো তাঁর দেহটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করলাম না। আমি তখন প্রচণ্ড হতাশ হয়ে কটেজ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম এবং যতক্ষণ না রাত্রি নামে ততক্ষণ পর্যন্ত ছুটতে থাকলাম।

ততক্ষণে আমি গভীর অরণ্যে পৌঁছে গেছিলাম।

আমি তখন এই পৃথিবীতে আবার নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম, কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই, কথা বলার কোনো লোক নেই। আমার মাথায় যেন প্রচণ্ড রাগ যেন চেপে গেছিলো, সীমাহীন সেই রাগ! আমার মস্তিষ্কের কোষগুলো তখন দারুণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রতিহিংসা নেবার নেশায় মেতে উঠেছিল.............পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা................আর আমার সৃষ্টিকর্তা, হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধেও প্রতিহিংসা!

।। ষোল ।।

ঃ খুনের স্বীকারোক্তি ঃ

তারপর থেকে আমি তোমাকে খুঁজতে উদ্যোগ নিলাম। তোমার নোটবুক থেকে জানতে পারি, তোমার বাড়ি জেনেভায়। যেহেতু ভূগোল শিক্ষনীয় বিষয়ের একটা অংশ, এরকমই ফেলিক্স শিখিয়েছেন সোফিকে। আমিও শিখেছি সেটা। আমি জানি, আমাকে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে এগোতে হবে।

আমার হৃদয়টা গভীর ঘৃণায় পূর্ণ। তুমি আমাকে দেহ দিয়েছো, মন দিয়েছো এবং অনুভব দিয়েছো। তারপর আমাকে পৃথিবীর নিদারুণ অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে খাড়া করেছো। আমি শপথ নিয়ে বলছি, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিশোধ নেবোই নেবো, আর তোমার বিরুদ্ধেও।

শীতের দ্রুত আগমনে আমি কেবল রাত্রেই ভ্রমণ করি লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য। চারদিকে তুষারপাত ঘটেই চলেছে এবং আমার পায়ের নিচে বরফের স্তূপ ক্রমশই

বেড়ে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবং শীতেই যে সবচেয়ে বেশী তুষারপাত হয়, তা জেনে সারাটা শীতকাল আমি আমার ভ্রমণ চালিয়ে যেতে থাকলাম। প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার ওপর ক্রোধ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখন পা-সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি গ্রামগুলোকে এড়াবার জন্য সেই পথ ধরেই চলতে থাকলাম এবং যখন ঘুম পায়, তখন খোলা মাঠে শুয়ে পড়ি। আর বসন্তকাল আসা পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে আমার যাযাবরের জীবন। তারপর আমি যখন সুইস সীমান্তে এসে পৌঁছলাম, আমি ঠিক করালম উষ্ণ দিনগুলো ওপভোগ করবো, আর এর জন্য আমাকে দিনের আলোয় পথ চলতে হলো। কিন্তু নিজেকে লোক চোখের আড়াল করতে আমাকে তরুবীথি ঘেরা অরণ্য পথটাই বেছে নিতে হলো।

একদিন দেখলাম আমার চলার পথের সামনে একটি নদী কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে তার আপন ধারায়। সেই নদীটার কাছে যেতেই আমি কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেলাম। সেখান থেকেই একটা যুবতী মেয়েকে ছুটে আসতে দেখলাম। মেয়েটি খিল্‌খিল্‌ করে হাসছিল এমন করে যে, মনে হলো সে যেন লুকোচুরি খেলার মতোন তার পিছন পিছন ধাবমান কারোর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ পা পিছলে মেয়েটি সেই নদীগর্ভে পড়ে গেলো।

খরস্রোতা নদী, মেয়েটি সেখানে পড়তেই স্রোতের টানে তার দেহটা দ্রুত ভেসে চললো নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার জন্য। আমি সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নিজেকে আর গাছের আড়াল করে রাখতে পারলাম না, সেই মুহূর্তে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং আমার আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারলাম। মেয়েটি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সেই অবস্থায় তাকে টেনে-হিঁচড়ে নদী তীরে এনে তুললাম। আর সবেমাত্র যখন তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি তখন এক ব্যক্তি, আমার মনেহয় তিনি তার বাবা হবেন, আমার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিলেন এবং মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত জঙ্গলে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

আমি কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তাদের অনুসরণ করতে থাকলাম। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে মাটিতে বসিয়ে রেখে চটপট আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, আর তখনি তাঁর হাতে একটা বন্দুক দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের নলটা আমার দিকে তাক করে তিনি বেশ কয়েকবার তাঁর হাতের সেই বন্দুকটার ট্রিগার টিপলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। বুলেটগুলো এসে বিঁধলো আমার দেহের মাংসে এবং কাঁধের হাড়ে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মাটিতে পড়ে গেলাম, আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল, যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলাম........বুঝলাম মেয়েটির জীবন বক্ষা করার জন্য এই তাহলে আমার পুরস্কার। আশ্চর্য কি অদ্ভুত মানুষের এই বিচার। এরই নাম কি তাহলে মানুষের সভ্য, ভব্যতা? ভাবলাম, মানুষের ওপকার করার এই যদি পুরস্কার হয় তাহলে এর পর আহাম্মক না হলে কেউ আর কারোর বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না?

আমার ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য কয়েকটা সপ্তাহ জঙ্গলেই কাটাতে হলো। আর সেখানে থাকতে থাকতে ব্যথা ভোলার জন্য এর প্রতিশোধ নেবার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। অবশেষে একদিন আমি আমার যাত্রা চালিয়ে যাবার পক্ষে ওপযুক্ত হয়ে উঠলাম।

দু'মাস পরে সন্ধ্যা তখন সবে মাত্র নামতে শুরু করেছে এই ধরিত্রী তলে, জেনেভার বাইরের

জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। একটা গাছের নিচে বসে পড়লাম একটু বিশ্রাম নেবার জন্য। আমি তখন খুবই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। গাছের নিচে বসে থাকতে গিয়ে ভাবতে থাকলাম কিভাবে তোমার সন্ধান পাবো এবং লড়াইয়ের জন্য তোমার মুখোমুখি হবো।

বসে থাকতে গিয়ে তখন সবে মাত্র একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, ঠিক তখনি একটি ছেলে আমার দিকে ছুটে এলো। আমার মনে একটা আশার আলো জ্বলে উঠলো ঠিক সেই মুহূর্তে। ছেলেটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে নিজের মনে ভাবলাম, এই নিরীহ ছেলেটি সম্ভবত বড়দের মতো কারোর কুৎসিত চেহারা দেখে আতঙ্কিত হবার শিক্ষা পায়নি এখনেও পর্যন্ত। এখনও সে শিশুর মতো নির্দোষই রয়ে গেছে। সম্ভবত এই ছেলেটিই একদিন আমার বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। আমার প্রতি ও সহ:নুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

আমি আমার হাত দুটি বাড়িয়ে ছেলেটিকে ধরতে যেতেই সে ছুটে পালাতে যায়, কিন্তু পারে না। আমাকে সামনা-সামনি দেখতেই সে তার চোখদুটি ঢেকে ফেললো তার দু'হাত দিয়ে এবং চিৎকার করতে শুরু করে দিলো। আমি তার চোখের ওপর থেকে হাত দুটি সরিয়ে দিলাম এবং শান্ত ও নম্র গলায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'শোনো বৎস, তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর কিছু ভাবছো হয়তো। কিন্তু আসলে আমি তোমার মতোই একজন ভালো মানুষ। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে আঘাত করবো না, সেরকম কোনো ইচ্ছেও নেই আমার।'

'তুমি একটা অতি কুৎসিত দানব, আমাকে যেতে দাও!' ছেলেটি চিৎকার করে উঠলো। 'আমাকে যেতে না দিলে আমি আমার বাবাকে ডাকবো। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এই যে তুমি আমাকে ধরে রেখেছো, এই অপরাধে তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন।'

'কি নাম তোমার বাবার?'

'আলফোন্স ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।'

'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন!' তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠলাম। 'তার মানে তুমি আমার শত্রুর ছেলে। হ্যাঁ, শত্রুর ছেলে যখন তুমিও আমার শত্রু! এখন আমার প্রতিশোধ নেবার পালা। তুমি, হ্যাঁ তুমিই হবে আমার প্রথম শিকার!'

ছেলেটি এবার আমার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো এবং চিৎকার করে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব কথা বলতে থাকলো আমার উদ্দেশে। তার চিৎকার শুনে কেউ যদি তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে আসে, তবে আমি আমার ইঙ্গিত লক্ষ্যে আর পৌঁছতে পারবো না। ভেবেছিলাম তোমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমার ছেলেকে দগ্ধে দগ্ধে মারবো, নিমেষে মেরে ফেললে তো আমার মতো এতো যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না ওকে, যেমন তুমি আমাকে সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত দুঃখ ও যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছো। তাই একটুও আর দেরী না করে এবার আমি আমার ইচ্ছাপূরণে ব্রতী হলাম। দু'হাত দিয়ে ওর কণ্ঠনালীটা চেপে ধরলাম সজোরে। ওকে একেবারে নীরব করে দেবার জন্য। কিন্তু বেশীক্ষণ আমার নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করতে হলো না ওকে, দেখলাম পরমুহূর্তেই আমার পায়ের কাছে মৃত অবস্থায় ওর নিস্তেজ দেহটা পড়ে গেলো। আমি তখন ওপলব্ধি করলাম তোমার ছেলের মৃত্যু তোমার জীবনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ যন্ত্রণা এনে দেবে। এতেই আমার সুখ, আমার আনন্দ। হ্যাঁ ঠিক এমনটিই তো আমি চেয়েছিলাম।

তারপর নিচু হয়ে ছেলেটির দিকে তাকাতে গিয়েই দেখলাম। তার গলায় একটা হার ঝুলছে,

সেই হার-এ একটা লকেট ছিল। আমি সেই লকেটটা ওর গলার হার থেকে বিচ্ছিন্ন করে হাতে তুলে নিলাম। লকেটের ভেতরে একটি সুন্দরী রমণীর ফটো ছিল, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, অমন সুন্দরী রমণী কখনো চোখ তুলে আমার দিকে তাকাবে না............সে কথাটা মনে হতেই তোমার বিরুদ্ধে আমার সব রাগ, হিংসা আর একবার ফিরে এলো।

এর পর আর সেখানে থাকা নিরাপদ হবে না আমার পক্ষে, কারণ ছেলেটির অভিভাবক কিংবা তার পরিচারিকা ওকে ফিরতে না দেখে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করে দেবে। তখন তারা আমাকে ছেলেটির খুনী হিসেবে দেখবে নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেবে না। সেরকম একটা ভয়াবহ দৃশ্যের কথা অনুমান করে নিয়ে আমি তখন খুনের জায়গাটা পিছনে ফেলে চলে এলাম। লকেটটা আমার হাতেই রয়ে গেলো। তারপর আমি আবার জেনেভার পথে এগিয়ে চললাম। অচিরেই আমি একটা গোলাবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম সেখানে খড়ের গাদায় একটি যুবতী মেয়েকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম এই ভেবে যে, এই মুহূর্তে সে যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে আমাকে দেখে, সে নিশ্চয় আমার এই কুৎসিত চেহারা দেখে আঁতকে উঠবে এবং পরে সম্ভবত ছেলেটির হত্যাকারী রূপে সে আমাকে অনায়াসে সনাক্ত করতে পারবে।

অবশ্য সে যে তা করবে এ ব্যাপারে আমার নির্দিষ্ট কোনো ধারণা না থাকলেও আমি ঠিক করলাম তাকে আমি প্রাণে না মারলেও তার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করবো যাতে করে তার জীবনে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। আর সে হবে আমার দ্বিতীয় শিকার! তাই এইসব কথা ভেবে তার অ্যাপ্রনের পকেটে লকেটটা চালান করে দিলাম। আমি জানতাম তার পকেটে ছেলেটির লকেটটার সন্ধান পেলেই তাকে ছেলেটির খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

এ কাজটা সমাধা করাব পরেই অদূরে একটা বিরাট গাছের গুঁড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে যতক্ষণ না ছেলেটির মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলাম। পরে আমি জানতে পারি যে ছেলেটিকে খুন করার অপরাধে মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তারপর আমি জেনেভা এবং এই পাহাড়ে ঘুরে বেরিয়েছি, তোমার মুখোমুখি হবার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছি। আর অবশেষে এখন সেই মুহুর্তটি আমার সামনে হাজির!

।। চোদ্দ ।।

ঃ ভয়ঙ্কর অঙ্গীকার ঃ

দানব তার কাহিনী শেষ করে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো।

আমি স্তব্ধ, হতবাক। তার এই জঘন্য অপরাধে আত্মার একটা অংশ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ তখন, আর প্রত্যেকে এবং আমি যেভাবে তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি তার জন্য আমার অপর অংশটা তার প্রতি করুণায় আপ্লুত হয়ে উঠলো। আমি সরাসরি তার ভয়ঙ্কর বীভৎস হলুদ চোখদুটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাহলে আমরা এখন পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তা তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও?'

'আমি একজন বন্ধু চাই..........এমনি একজন যে আমার এই কুৎসিত চেহারা দেখে বিদ্রোহ করবে না, কিন্তু আমার মতো কুৎসিত চেহারার কে হবে.........কেউ একজন যে আমাকে বুঝতে পারবে, আমার এই দুর্দশার জন্য সহানুভূতিশীল হবে। আমি চাই সেই রকম একটি বন্ধু সৃষ্টি করো..............আর সে হবে একটি মেয়ে যে আমার স্ত্রী হওয়ার পক্ষে ওপযুক্ত হবে, ঠিক যেমনটি তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো।'

আমার রাগ তখন চরমে। 'না, কখখ্নো আর না!' রাগে উত্তেজনায় আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি কখনো আর একটা শয়তান জীবন সৃষ্টি করবো না। তুমি যেরকম ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছো, তোমার মতো আর একজনকে সৃষ্টি করে আমার অপরাধের ভাগীদার হতে দেবো না। তুমি আমার ওপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করকে পারো, এমন কি আমকে খতম করার হুমকিও দিতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার সেই জঘন্য কাজের পুনরাবৃত্তি করবো না।'

'আমি তোমাকে কোনোরকম হুমকি দিচ্ছি না।' শান্ত গলায় সে বললো, 'আমার অবস্থার কথা বোঝাবার চেষ্টা করছি তোমাকে। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাদের সবাইকেই আমি ভালোবাসতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা সবাই আমাকে ঘৃণা করেছে, যেমন তুমি করেছো। আমার ওই কুৎসিত চেহারার জন্য আমার কি অপরাধ, দয়া করে তুমি তা বোঝবার চেষ্টা করো।'

'তবুও আমি তা করতে পারি না..........আর আমি তা করবোও না!'

এর পর দানবটার রাগ চড়তে শুরু করলো। সত্যিকারের মানুষের চোখে তার কুৎসিত মুখটা আরও বিকৃত হয়ে উঠলো, তার চোখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারছি না। সে তখন ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, 'আমি শপথ নিয়ে বলছি, তুমি আমকে যেভাবে ধ্বংস করেছো ঠিক সেইভাবেই আমিও তোমাকে ধ্বংস করবো।.........অবশ্য যদি না তুমি আমার দাবী মেটাও!' তার কথার মধ্যে হুমকির আভাস পাওয়া গেলো বেশ স্পষ্ট ভাবেই।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু দানবটা আবার আমাকে অনুরোধ করলো, 'যদি আমি তোমার মতো একজন লোকের কাছ থেকে একটু দয়া পাই আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি সমস্ত মানুষের প্রতি দয়া দেখাবো এবং সহানুভুতিশীল হয়ে উঠবো!'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, তার যুক্তি অগ্রাহ্য করার মতো নয়, এর ফলে কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠলাম। সে এমন একটা জীব, যার মধ্যে মানুষের মতো অনুভব করার ক্ষমতা আছে...........গভীর অনুভূতি। আর নিজেকে আমি প্রশ্ন করলাম, তাকে সৃষ্টি করার পর থেকে আমি কি তার কাছে কিছু ঋণী নই? আমার একটু আগের সব দৃঢ়তা তাঁর প্রতি নিষ্ঠুরতা সব যেন কেমন রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়তে থাকলো।

আমার রাগটা একটু পড়তে দেখে সে তখন তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, 'যদি তুমি আমার জন্য এই মেয়েটিকে সৃষ্টি করতে রাজী হও, দেখবে তখন আমাদের দু'জনের কাউকেই কেউ আর দেখতে পাবে না। আমরা এখান থেকে চলে যাবো। সমুদ্র পেরিয়ে বহু দূরে, দক্ষিণ আমেরিকার এমন একটি জায়গায় যেখানে কোনো জনবসতি নেই। সেখানে গিয়েই থাকবো আমরা। কোথাও কোনো মানুষ কিংবা জন্তু জানোয়ারের কোনো ক্ষতি না করে আমরা দু'জনে মনের সুখে বসবাস করবো সেখানে।'

তার জন্য বর্তমানে তাকে আমি যে জঘন্য জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছি সেই ভুলের

খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে; তাই তার জন্য আমার করুণা হলো, সহানুভূতি জাগলো। কিন্তু তারপর তাকে দেখবার জন্য আমি যখন ফিরে তাকালাম আমার মধ্যে তখন আগের সেই আতঙ্ক ভাবটা আবার ফিরে এলো এবং তার প্রতি আমার ঘৃণা ভাবটা আবার জেগে উঠলো। তারপর আমি যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝালাম, সে যা চাইছে তার সেই দাবীটা যদি আমি মেটাতে পারি তাহলে এই হানাদার দানবটার নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করতে পারবো।

দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে আমি বললাম, 'তুমি যা চাইছো আমি কেবল তা করতে পারি, যদি তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, যে মুহূর্তে আমি তোমার জন্য এই মেয়েটিকে সৃষ্টি করবো, তোমরা দু'জনেই চিরদনের জন্য ইউরোপ ছেড়ে চলে যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি আগেও বলেছি, আবার এখনও অঙ্গীকার করে বলছি, তুমি আমার দাবী মেটালে তোমরা আর কখনো আমদের দেখতে পাবে না!' জোর দিয়ে সে বললো, 'এখনি তুমি তোমার ল্যাবরেটরিতে চলে যাও আর তোমার কাজ শুরু করে দাও। আমি সব সময় তোমার ওপর নজর রাখবো। তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি যখন মেয়েটিকে সৃষ্টি করবে আমি তখন আবার আসবো তোমার কাছে।'

তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলো সেখান থেকে। সম্ভবত সে ভাবছে, আমি হয়তো আমার মত বদল করতে পারি। আমি তাকে পাহাড় থেকে নিচে নেমে যেতে দেখলাম। তার চলার গতি এতোই দ্রুত ছিল যে উড়ন্ত ঈগলের দুরন্ত গতিকেও বুঝি হার মানায়। অচিরেই তুষার ও বরফের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো।

শেষ অপরাহ্ণের আলো এসে পড়েছিল, আমি তখন পাহাড় থেকে নিচে নামতে শুরু করলাম। আমার তখন নিজের ওপর খুবই রাগ হচ্ছিল, একটা ভয়ঙ্কর তিক্ততায় এবং হতাশায় আমি আমার চোখের জল কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না। সারাটা দিন আমরা কথা বলে গেছি, আর নিচে উপত্যকায় পৌঁছতে আমার সারাটা রাত লেগে গেলো।

চ্যামৌনিক্সে এসে যখন পৌঁছলাম তখন ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি জেনেভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম সেখান থেকে। আমি জানি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ কাজটা শুরু করতে হবে।

।। পনেরো ।।

ঃ দ্বিতীয় প্রাণীর সৃষ্টি শুরু ঃ

আমার চেহারার মধ্যে বোধহয় একটা বন্য প্রাণীর ছাপ থেকে থাকবে। তাই আমাকে দেখে আমার পরিবারের সদস্যরা দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। তারা আমার এই পরিবর্তনের ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করলো। কিন্তু আমি তাদের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর না দেওয়াতে তারা তখন আরো সতর্ক হয়ে গেলো। আমি কি করে বলি আমার কি হয়েছে, শুনলে তারা আঁতকে উঠবে। আমি তাদের ভালোবাসি। ওই দানবটার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তাদের আমি শুধু এটুকুই জানি। তাই তাদের কাছে আসল ব্যাপারটা খুলে বলতে চাইলাম না।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তবু আমি আমার নতুন সৃষ্টির কাজ এখনও শুরু করতে

পারলাম না। পারলাম না বললে একটু ভুল হবে না, আসলে এ কাজে যে যথেষ্ট সাহস থাকা দরকার সেটার বড়ই অভাব বলে মনে হলো আমার। সেই আতঙ্কটা যেন আমার দেহ মনে ছড়িয়ে পড়ে। আবার এ কথাও ভাবি, যদি আমি সেই শয়তানটাকে নিরাশ করি সে তখন আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সে যে একটুও দ্বিধা করবে না আমি বেশ ভালো করে জানি বলেই ভীষণ ভয় পেলাম। তবে আমি আবার এ কথাও জানি, এই নতুন কাজ শুরু করবার আগে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে, তার জন্যে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যাবে।

এই কয়েক সপ্তাহে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু হলো। এতে আমার বাবা খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি একদিন আমার কাছে এসে বললে, 'বৎস, আমাদের শোক পালন শেষ করার এটাই সময় এবং আগের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাও। তুমি তো জানো, এ হলো তোমার মায়ের সবচেয়ে বেশী স্নেহপ্রবণ ইচ্ছে। আর আমারও ইচ্ছে তুমি আর এলিজাবেথ একদিন বিয়ে করবে। আর আশা করি সেটা খুবই শীগ্‌গীর হবে। আমার বয়স হচ্ছে, তাছাড়া স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে, তাই তাড়াতাড়ি তোমাদের বিয়েটা হলে আমি জীবিত অবস্থায় দেখে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ বাবা, এলিজাবেথকে আমি ভালোবাসি আর আমি ওকে বিয়েও করতে চাই,' আমি তাকে এভাবেই আশ্বাস দিই। কিন্তু বাবার ইচ্ছে মতো খুব শিগগীর তো বিয়ে করতে পারবো না। কারণ আমার মন যে তখন পড়ে রয়েছে দানবটাকে দেওয়া আমার অঙ্গীকারের কথা। তাই তাকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি আগে রাখতে হবে। আমার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে বিবাহিত জীবন কাটানোর আশ্বাস পেতে হলে আগে তার জন্য একটা বৌ সৃষ্টি করে দিতে হবে আমাকে। যদি আমি তা করতে না পারি তাহলে উল্টে আমার বিরুদ্ধে এমন প্রতিশোধ নেবে যাতে আমার পরিবারের আর আমার জীবনে না বলা দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে।

আমার বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ থাকার সময় মানুষের দেহের ওপর কতকগুলো নতুন লেখা প্রবন্ধ পড়লাম। ইংলণ্ডে জনৈক সার্জন চিকিৎসক মানুষের দেহের ওপর গবেষণা চালিয়ে সেগুলো লিখেছেন। পড়ার পর আমার মনে হলো, আমার পিত্রালয়ে না থেকে বরং ইংলণ্ডে গিয়ে আমার কাজ করাটা বোধহয় ভালো হবে। কারণ সেখানে হাজার রকমের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, যেমন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা..........কিংবা আমার প্রতিক্রিয়া.........অথবা এই বিরক্তিকর জঘন্য কাজ করবার সময় আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারি, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। না, আমি যাদের ভালোবাসি তাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকেই বরং একাজ আমাকে করতে হবে।

তাই আমি আমার বাবাকে বললাম, 'ইংলণ্ডে গিয়ে এখনও কিছু বৈজ্ঞানিক পড়াশোনা করতে হবে আমাকে, আর আমার পড়া শেষ হলেই আমার আগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ফিরে পাওয়ার জন্য আমি কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে বেরোতে চাই। তারপব আমি অবশ্যই এলিজাবেথকে বিয়ে করবার কথা ভাববো।'

আমার বাবা এবং এলিজাবেথ দু'জনেই আমার নতুন মনোভাব দেখে খুবই খুশি হলো এবং যাত্রা শুভ হোক, এভাবেই ওরা আমাকে উৎসাহিত করলো। কিন্তু ওরা এখনও আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন, তাই ইংলণ্ড পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবার জন্য হেনরী ক্লারভালের যাবার ব্যবস্থা করলো।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে হেনরী আর আমি জেনেভা ছেড়ে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ইংলণ্ডে পৌঁছনোর জন্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার আগে ফ্রান্স, জার্মানি এবং হল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো।

মানুষের দেহের ব্যাপারে আমার পড়াশোনার কাজ সারতে লণ্ডনে চারমাস থাকাটাই যথেষ্ট বলে মনে করলাম। এরই মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র আর ডাক্তারী যন্ত্রপাতি কেনাকাটার ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেতে হবে আমাকে।

তারপর আমরা ইংলিশ লেক কান্ট্রি এবং স্কটল্যাণ্ডে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে টানা দু'মাস কাটিয়ে দিলাম। তখন আমি ওপলব্ধি করলাম, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি আমার প্রয়োজনীয় কাজটা শুরু করতে পারিনি। আমার এই বিলম্বের কথা যদি দানবটা জানতে পারে কি হবে তখন? সে কি তখন আমার পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে? কিংবা সে কি হেনরী আর আমাকে অনুসরণ করছে? আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

আমি তখন ভয়ে এমনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম যে, আমার বাবা কিংবা এলিজাবেথের কাছ থেকে দীর্ঘ দিন যে কোনো চিঠি আসেনি, ওঁরা কে কেমন আছেন, এসব কথা যেন ভুলেই গেছিলাম। আমি তখন এমনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, হেনরীর সান্নিধ্য আমি কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলাম না এবং সব সময় তাকেই অনুসরণ করছিলাম যেখানেই থাকুক না কেন সে!

অবশেষে আমি ঠিক করলাম, কেমন করে আর কোথা থেকেই বা কাজ শুরু করবো। আমি তখন হেনরীকে বললাম, 'এখানে স্কটল্যাণ্ডে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গ যথেষ্ট উপভোগ করেছি, আর আমি চাই তুমি এখানে আরও কিছুদিন থেকে যাও। যাই হোক, এখন আমার নিজের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন, সম্ভবত এক কি দু'মাস। তারপর আমি যখন তোমার কাছে আবার ফিরে আসবো, দেখবে আমি তখন আবার তোমার সেই পুরোন বন্ধু হেনরী হয়ে গেছি। আমি অঙ্গীকার করছি, আমি তখন তোমার অনেক ভালো সঙ্গী হয়ে যাবো।'

'সত্যি তাই কি ভিক্টর?' হেনরী তার কথায় প্রতিবাদ করে উঠলো, 'তুমি তো জানো, তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গে থাকতেই চাইবো আমি। তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি ঠিক তোমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকবো। কিন্তু তুমি যদি একান্তই একা থাকতে ভালোবাসো আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবো না। কেবল একটা অনুরোধ করবো, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

তারপর আমি হেনরীকে ছেড়ে দিয়ে ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম, স্কটল্যাণ্ড ওপকূলে অনুর্বর, নীরস কতকগুলো দ্বীপের সমষ্টি এই দ্বীপপুঞ্জ।

একটা ছোট বেদনাদায়ক কুটীর ভাড়া করলাম। দুটি জঘন্য বিবর্ণ ঘর, তালপাতার ছাউনি দেওয়া ছাদ। দেওয়ালের প্লাস্টার খসা একটাই দরজা, দরজার স্ক্রুগুলো ঝুলছে এবং কয়েকটা ভাঙা ফার্নিচার।

কুটীরে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ সেরে নিতে হলো আমাকে এবং একটি ঘরে ল্যাবরেটরি হিসবে ব্যবহার করার ওপযোগী করে তুললাম। আমি আমার কাজ শুরু করে দিলাম অতঃপর।

যাই হোক, নারীর দেহের আকার দিতেই আমি তখন নিজেই নিজের কাজটা প্রতিদিন আরও

বেশী করে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। এক একসময় এমনি হতো যে, এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা দিন ল্যাবরেটরিতে থেকে ইচ্ছে করতো না আসার। অন্য সময় হলে দিন রাত্রি কাজ করে দেহের একটা নির্দিষ্ট অংশ শেষ করে ফেলতাম।

আমার প্রথম সৃষ্টির কথা মনে পড়ে গেলো, মনে পড়ে গেলো তখন আমি কতোই না উৎসাহী ছিলাম। আমার সেই কাজের পরিণাম যে কতো ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক হতে পারে তা জেনেও আমার সেই বাড়তি উৎসাহ অন্ধের মতো এই দিক থেকে আমার চোখদুটিকে যেন অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এখন আমি ঠাণ্ডা মাথায় একটা নির্মম নিষ্ঠুর কাজ সম্পন্ন করতে যাচ্ছি, আমার কর্মরত হাতদুটোর দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

এক সময় আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলাম। আমি নার্ভাস হয়ে উঠলাম, স্নায়ু দুর্বলতায় পেয়ে বসলো আমাকে যেন। ঘন ঘন চোখ তুলে তাকাচ্ছিলাম আমার তখন ভয় হচ্ছিল সেই দানবটা কখন যে আমার সামনে এসে হাজির হয় কে জানে!

তবু এসব সত্ত্বেও আমার কাজের অগ্রগতি বেশ ভালোভাবেই হচ্ছিল। কাজটা প্রায় শেষ করেই এনেছিলাম। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ওঠার পূর্বাভাস অনুভব করলাম, আমার অন্তরটা যেন ভরে গেলো এক ভয়ঙ্কর বেদনায়। কিন্তু কেন? কেন এই পূর্বাভাস। তবে কি কোনো অশুভ ঘটনা ঘটতে চলেছে, এই প্রশ্নটা এখন অহরহ, দিন নেই রাত্রি নেই আমার মনে জাগছে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকটা হাহাকার করে উঠছে। অথচ এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

।। ষোলো ।।

ঃ *দানবের হুঙ্কার* ঃ

একদিন সন্ধ্যায় আমার ল্যাবরেটরিতে বসে আছি, আমি আবার ভাবতে বসলাম যেমন আমি প্রায়ই করে থাকি, তিন বছর আগে আমার প্রথম জীব সৃষ্টির সময়েও এরকম ভাবনা হতো আমার মনে। আমার মনে পড়লো, এই ধরনের শয়তান দানব জীবন লাভ করার পর কোন দিকে মোড় নেবে, এ সম্পর্কে কোনোরকম ধারণা আমার ছিল না তখন।

তারপর হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা যেন আমার মনের আকাশে উদয় হলো। 'আমার এই নতুন প্রাণীটি কিরকম যে হবে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু যদি এই মেয়েটি তার স্বামীর চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দানবী হয়? যদি সে শয়তানিতে এমন কি তার স্বামীর মতো খুন করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমেরিকায় যেতে না চায়? যদি তারা পরস্পর পরস্পরের কুৎসিত চেহারা দেখে এ ওর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে?'

কিন্তু তারপর আরও ভয়ঙ্কর একটা ভাবনা আমার মনে জাগলো। 'ধরা যাক, তারা এ ওকে পছন্দ করে আমার দাবী মতো দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গিয়ে বসবাস করতে থাকে সেখানে, তাদের ছেলে মেয়ে হলে কি ঘটবে তখন? আর সেই সব ছেলে মেয়েরা যদি তাদের বাবার মতো শয়তান হয় আর সভ্য মানুষদের ভয় দেখায়, তাদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে?'

তারপর হঠাৎ আর সেই প্রথম আমার অঙ্গীকারের ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা আমার মনে

জাগলো। আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি জানালার দিকে তাকাতেই সেই দানবটার কুৎসিত মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। শয়তানের চোখ নিয়ে ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়েছিল আমার দিকে, তা কুৎসিত মুখের ততোধিক কুৎসিত ঠোঁটজোড়ার যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল সেটা যেন প্রতিহিংসা নেওয়ারই পূর্বাভাস! পরক্ষণেই তার মুখের ক্রুর হাসিটা বদলে গেলো, তার বদলে খুশির হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে, হয়তো এ হাসি আমার সৃষ্টি করা তার বৌ-এর আংশিক চেহারা দেখে হবে হয়তো!

তার ক্ষণে ক্ষণে হাসির এই রঙ বদলে-যাওয়াটা আমার মোটেই ভালো লাগলো না। আমি তার হাসিতে যে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ছায়া পড়তে দেখলাম। রক্ত হিম করা সেই হাসি এবং পাগল করা তার চোখের দৃষ্টি দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, সে এখন মনে মনে নতুন কোনো কু-মতলব আঁটছে। শয়তানের খেয়াল যাকে বলে আর কি! এই যে আমি আমার অঙ্গীকার রাখতে তার জন্য একটা মেয়েকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, একি কম পাগলামো আমার? জানি না আর কতোই বা পাগল হবো? মনে মনে আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল ল্যাবরেটরির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে তার টুঁটিটা টিপে ধরে খতম করে ফেলি তাকে। কিন্তু সে যে আমার চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী। তাই সে কথা ভেবেই আমি আমার ইচ্ছের হাতটা গুটিয়ে নিলাম।

ভেতরে ভেতরে আমার রাগ পারদের মতো ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠতে থাকে, আমি নিজেই নিজের রাগের নিয়ন্ত্রণ যেন হারিয়ে ফেলতে থাকি। যতক্ষণ না সেই রাগ আমার মন থেমে মুছে ফেলতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার যেন স্বস্তি নেই। আমি তখন ভয়ঙ্কর বেপরোয়া হয়ে উঠেছি, আমার তখন হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। আমার জানা ছিল না, আমি যা করতে যাচ্ছি তার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। আমি আমার অঙ্গীকারের খেলাপ করলে ওই দানবটা আমাকে এবং আমার পরিব'রকে ধ্বংস করে ফেলবে। আমার সৃষ্ট একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রাণীর কি অসীম ক্ষমতা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি কিন্তু আমি বুঝে গেলাম। ওই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দানবটা আমার প্রথম সৃষ্ট প্রাণীটাকে আর বেশী বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ও এখন একা, তাতেই আমার এতো ভয়! তারপর সে যখন আমার দ্বিতীয় সৃষ্টিকে পেয়ে তার ইচ্ছে মতো তাকে বিয়ে করে বসবে তখন, ওদের দু'জনের সম্মিলিত দানবীয় শক্তি আমার, আমার জীবন-সঙ্গিনীকে মুছে দেবে এই পৃথিবী থেকে। ন, আমার এই দ্বিতীয় সৃষ্টি সম্পূর্ণ করার আগেই স্তব্ধ করে দিতে হবে। কথাটা মনে হতেই আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়া জীবটাকে দু'হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করলাম। হাত, পা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি সব কিছুই ছড়িয়ে পড়তে থাকলো ল্যাবরেটরির মেঝের সর্বত্র।

এর পর আমি শেষবারের মতো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দানবটার দিকে তাকালাম তারপর ঘৃণিত ল্যাবরেটরিটা পিছনে ফেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

দানবটা মরীয়া হয়ে উঠে গর্জে উঠলো। আমি তখন প্রাণভয়ে ছুটতে থাকি, সে তখন ঘুষি পাকিয়ে আমার পিছনে আঘাত করলো। তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো।

আমার রাগ প্রশমিত হয়ে যাওয়ার পর আমার জানালার সামনে বিছানায় বসে শান্ত সমুদ্রের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে রইলাম। বেশ কিছু মাছ ধরার নৌকো জলে ভাসতে দেখলাম

এবং জেলেদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুসুলভ কথাবার্তা ভেসে এলো আমার কানে। অস্পষ্ট, বোঝবার ওপায় নেই। বুঝতে না পারলেও ওদের হাবভাবে একটা কথাই পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে, ওরা আর যাই হোক, আমার শত্রু নয়, বরং হয়তো আমার কোনো বিপদ হলে ওরা খবর পেলে আমার দিকে ওদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এটাই আমার কাছে এক নতুন আশার আলো হয়ে দেখা দিলো আমার চোখের সামনে, দানবটার হাত থেকে আমার বাঁচার যেন এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে গেলো।

কিন্তু হঠাৎ একটা নৌকোকে তীব্র গতিতে তীরের দিকে ভিড়তে দেখা গেলো। নৌকোটার তীব্র গতি দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, নৌকোচালক প্রচণ্ডভাবে রেগে গিয়ে নৌকো চালাচ্ছে। নৌকোটা সমুদ্র তীরবর্তী আমার কুটীরের একেবারে কাছাকাছি আসতেই একমাত্র আরোহীর ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। নৌকো থামিয়ে একমাত্র আরোহী লাফ দিয়ে তীরে এসে উঠলো।

আমি আবার ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করলাম। সে যে কে হতে পারে জানতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। আমি পালাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতেই পারলাম না কিংবা একটা পা-ও নড়াতে পারলাম না। মনে হলো, কে যেন আমার পা দু'টো পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে মেঝের সঙ্গে।

মুহূর্তখানেক পরেই দরজাটা খুলে গেলো, মনে হলো দানবটা দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেললো এবং দানবটা ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

'তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করলে কেন?' কৈফিয়ত চাইলো সে। 'এই সময় যখন তোমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, তখন কেন তুমি তোমার কাজ ধ্বংস করে ফেললে, আমার একটি স্ত্রী লাভের আশাটা তুমি কেন, কেন নিজের হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেললে? তোমায় তো আমি আগেই বলেছি, সঙ্গীহীনার জীবন বড়ই দুর্বিষহ। মনের কথা বলার মতো মনের মানুষটিকে কাছে পেলাম না। না, তুমি তাকে আমার কাছে আসতে দিলে না। আমিও তোমার ছেলে আর ছেলের আবদার মেটানো তো সব বাবারই কর্তব্য, বাবা হয়ে সে দায়িত্ব পালন কেন তুমি করবে না? আমি তো বেশী কিছু চাইনি, শুধু একটা সঙ্গিনী একটা ঘরনী, যে আমার সব সুখ-দুঃখের সাথী হতে পারবে, আমাকে ভালোবাসবে। আর আমিও তাকে...........তবে কি আমার সুখ তোমার সহ্য হয় না। বলো, আমার কথার জবাব দাও?'

'আমার মন মেজাজ ভালো নেই, আমাকে এখন একটু একটা থাকতে দাও, প্লিজ!'

'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছো ফাদার। বাবা যেমন ছেলের কাছ থেকে তার অন্যায় কাজের কৈফিয়ত চায়, ঠিক একইভাবে আমিও তোমার জবাব চাই। তোমার জবাব না শুনে আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না। বলো।'

'বলতে পারি, কিন্তু আমার জবাবটা তুমি সহ্য করতে পারবে তো?'

'তোমার জবাব যত কঠোর বা রূঢ়ই হোক না কেন তার পাল্টা জবাব দেবার জন্য আমিও তৈরী হয়ে এসেছি। প্রয়োজন হলে—

'কি করবে তুমি?'

'এক কথা আমি বারবার বলি না, তুমি আমার দাবী না মেটালে...........'এই কথা বলে সে নীরব হলো।

তার না-বলা কথাটা যে কি আমার বেশ ভালোই জানা আছে। আর সে কথাটা মনে করেই আমি ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। তার এই হুমকির জন্য মনে মনে প্রচণ্ড রাগও হচ্ছিল। তাই ভাবলাম আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। তাতে আমার কিংবা আমার পরিবারের যা ক্ষতি হয় হোক। নিজেকে শান্ত সংযত করে ধীরে ধীরে বললাম, 'আমি আমার প্রতিশ্রুতি কেন ভঙ্গ করেছি জানো? কারণ তোমাকে সৃষ্টি করে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি তার কুফল কি? ইতিমধ্যেই তুমি দু'জনকে খুন করেছো। তোমার মতো কুৎসিত চেহারা আর দানব প্রকৃতির প্রাণী, যে কিনা নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে খুন করে, সেরকম প্রাণী আমি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে চাই না!'

'কুৎসিত, হ্যাঁ আমি কুৎসিত স্বীকার করছি! আর আমি এও স্বীকার করছি যে, আমি একটা দানব, শয়তান.........আর এখন!' গর্জে উঠলো সে। 'কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর শক্তিমান বটে.......তোমার থেকেও অনেক বেশী শক্তিশালী আমি, আবার এও জানি যে, আমার সৃষ্টিকর্তা আমার থেকে অনেক অনেক বেশী দুর্বল!'

'হ্যাঁ আমি মানছি, আমার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী তুমি। কিন্তু তোমার হুমকিতে এখন আমি আর ভয় পাই না, বিন্দুমাত্র নয়!'

রাগে উত্তেজনায় দাঁত কড়মড় করতে করতে সে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, 'আমি যখন নিঃসঙ্গ আর দুর্দশাগ্রস্ত তখন আমি তোমাকে কখনো সুখে থাকতে দেবো না। আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবোই নেবো। আজ থেকে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়াটাই হবে আমার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ!'

'শয়তান, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।' রাগে আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি তোমার ওই কুৎসিত মুখ আর কখনো দেখতে চাই না। চলে যাও!'

'ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি,' শান্তভাবে বলে পরক্ষণেই তার গলার স্বর কর্কশ শোনালো, 'কিন্তু মনে রেখো, সব সময়েই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো। প্রতিশোধ নেবার জন্য। আর আমি তোমার বিয়ের রাতেও হাজির থাকবো!'

ভয়ঙ্কর ক্রোধে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম, কিন্তু আমার থেকেও বেশী দ্রুতগামী সে, তাই একরকম ছুটেই সে আমার কুটীর থেকে বেরিয়ে লাফ দিয়ে তার নৌকোয় গিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই দেখলাম তীর ছাড়িয়ে তীরের গতিতে জল কাটিয়ে ছুটে চলেছে মাঝসমুদ্রে।

আমার কুটীর থেকে বেরিয়ে আমি তার পিছু ধাওয়া করে, সমুদ্রতীরে এসে হাজির হলাম। তার শেষ কথাগুলো তখন আমার কানে অগ্নিবর্ষণের মতো মনে হচ্ছিল। '...আমি তোমার বিয়ের রাতেও হাজির থাকবো!'

তার মানে ওই সময় সে আমাকে খুন করার মতলব করছে। তার জন্য আমি ভীত নই। কিন্তু এলিজাবেথের ওপর সেরকম কোনো হামলা হলে আমি সহ্য করতে পারবো না। আমার ভালোবাসার মানুষ কষ্ট পাবে আমি তা চাই না। প্রিয়জনের আসন্ন বেদনায় আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। অনেকদিন পরে আমি আমার চোখে অশ্রু অনুভব করলাম।

সেই মুহূর্তে আমি মনস্থির করে ফেললাম, আমাকে হত্যা করার জন্য আমি আমার শত্রুকে কোনোভাবেই সুযোগ দেবো না......... বিনা লড়াইয়ে তার কাছে কখনোই পরাজয় বরণ করবো না।

আমার প্রাণ থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো তার সঙ্গে লড়ে যেতে এবং তাকে খতম করার জন্য আমি সর্বশক্তি দিয়ে লড়ে যাবো তার সঙ্গে। এ আমার ধনুক-ভাঙা পণ!

।। সতেরো ।।

ঃ খুনী আবার আঘাত হানলো ঃ

পরের দিন সকালে আমি ঠিক করলাম, আমি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবো এবং হেনরীর সঙ্গে মিলিত হবো। তার চিঠি থেকে জানতে পারি, আমাকে দেখার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন সে। সে চায় ফিরে গিয়ে আমি যেন তার সঙ্গে ভ্রমণে বেরোই।

কিন্তু চলে যাবার আগে একটা বিসদৃশ কাজ, যা আমার অপ্রিয় সেটা সারতে হবে। আমার ডাক্তারী যন্ত্রপাতিগুলো প্যাক করতে হবে আর ল্যাবরেটরি পরিষ্কার করে যেতে হবে।

আমি যখন ল্যাবরেটরির দরজা খুললাম, সেই ঘৃণিত ঘরটা আমার কাছে ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর হয়ে উঠলো যেন। আংশিক শেষ হওয়া সেই প্রাণীটির অবশিষ্টাংশ মেঝের ওপর যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিল। ওগুলো আমি সেখানে ফেলে রেখে যেতে যাই না, কারণ আমি চাই না আমার পরে দ্বীপের অন্য কেউ এখানে এসে ওগুলো দেখুক। ওরা এগুলো দেখলে নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হয়ে উঠবে আর তারপর ওদের সন্দেহ হতে পারে, আমি সেখানে কি করছিলাম।

তাই আমি আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি ধুয়ে মুছে এবং প্যাক করে ফেললাম। সেই সঙ্গে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একটা বড় সুটকেসে পুরে ফেললাম। তারপর আমি সুটকেসটা সমুদ্র বীচে নিয়ে এসে সেটার ওজন বাড়ানোর জন্য তার মধ্যে ভারি ভারি কতকগুলো পাথর পুরে দিলাম যাতে করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে নিমেষে তলায় ডুবে যেতে পারে! সুটকেসের ঢাকনাটা শক্ত করে এঁটে একটা ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম।

এই সব কাজ করতে গিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই কুটীরে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে থাকলাম যতক্ষণ না রাতের অন্ধকার নেনে আসে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমি বীচে ফিরে এলাম এবং সুটকেসটা আমার দাঁড় টানা ছোট্ট নৌকোয় তুলে নিলাম। তারপর জলে নৌকো ভাসানো, দাঁড় টেনে ভেসে চলা। সমুদ্রতট থেকে বেশ কয়েক মাইল আসার পর বেশ কয়েকটি মাছধরার নৌকোকে দ্বীপের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো। নৌকোর লোকগুলো আমাকে চিনতে পেরে হাত নেড়ে জানান দিতে গিয়ে মৃদু চিৎকার করে কি যেন বললো, যা আমার শ্রুতিগোচর হলো না, তবে বেশ বুঝতে পারলাম, ওরা জানতে চাইলো কেন আমি দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি! কিন্তু ওদের দিক থেকে এবং সেই সঙ্গে আমার এতদিনের সাথী দ্বীপটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম যাতে করে আমি আমার দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলি। সত্যি, বড় মায়া পড়ে গেছিলো দ্বীপটার ওপর এবং দ্বীপের মানুষগুলোর ওপর।

একটু একটু করে তখন মেঘ জমে উঠছিল আকাশে, ঠিক এমনটিই আমি চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম মেঘ আরও ঘনীভূত হোক, জ্বলজ্বলে চাঁদের আলোটা ঢাকা পড়ে যায়, অন্ধকার ঘনিয়ে আসুক মাঝ সমুদ্রে ধারে-কাছের কোনো নৌকোর আরোহী যেন আমাকে দেখতে না পায়। কারণ আমি আমার পরবর্তী কাজের কোনা সাক্ষী রেখে যেতে চাই না। এক সময় যখন দেখলাম আকাশে

পূর্ণ চাঁদ ও তারাগুলোয় আলো সম্পূর্ণভাবে ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে, আমি তখন তৎপর হয়ে উঠলাম। চারিদিক একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলাম, না, ধারে কাছে কেউ নেই, জনমানব শূন্য সমুদ্র, তাই আমার আকাঙ্খিত কাজটা এখন নির্বিবাদে সেরে ফেলা যেতে পারে। আমি তখন দ্রুত হাতে ভারি সুটকেসটা দু'হাত দিয়ে তুলে নৌকো থেকে নিক্ষেপ করলাম গভীর সমুদ্রে।

সুটকেসটা বুদবুদ শব্দ করে সমুদ্রে ডুবে গেলে পর নতুন করে একটা স্বস্তির ভাব যেন অনুভব করলাম আমি, সেই সঙ্গে বহুদিন পরে একটা শান্তভাব ফুটে উঠলো আমার চোখে মুখে। গভীর সমুদ্রে অশান্ত ঢেউগুলো অনেকটা শান্ত স্তিমিত। আমার শান্তভাব আর সমুদ্রের এই শান্ত-স্তিমিত ভাব মিশে যেতেই আমার অশান্ত মনটা এতোই চিন্তামুক্ত হয়ে গেলো যে, অচিরেই আমার বহু রাত্রি জাগরণের চোখদুটিতে একটা নিটোল ঘুম নেমে এলো।

সারাটা রাত্রি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। পরের দিন সকালের অনেকটা সময় গড়িয়ে গিয়ে আকাশে সূর্যের আলো যখন গনগন করছিল, ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আমি অবশেষে।

তখন প্রচণ্ডভাবে বাতাস বইছিল, এর ফলে সমুদ্রের ঢেউগুলো মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছিল আমার ছোট্ট, দাঁড় টানা নৌকোটির ওপরে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও তীরভূমি চোখে পড়লো না। এর থেকে বেশ বুঝতে পারলাম, আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, প্রবল বাতাস তখন আমর এই ছোট্ট নৌকোটাকে দ্বীপটা থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে এসেছে, যেখানে আমি বাস করে এসেছি। ধারে কাছে কোনো তীরভূমি নেই। আমার আশঙ্কা, সম্ভবত আমি তখন আটলান্টিক মহাসাহরে এসে পড়েছি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে শেষ অপরাহ্নে সমুদ্র ভয়ঙ্কর অশান্ত হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড গরমে আমি তখন ভীষণ তৃষ্ণার্ত, আমার গলা শুকিয়ে আসছিল, ভালো করে ঢোক গিলতে পারছিলাম না। আমার তখন ভীষণ ভয়, সমুদ্রের মাঝখানে হয়তো আমার জীবনে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, হয় সমুদ্রের গভীর জলে ডুবে গিয়ে কিংবা অনাহারে।

যাই হোক, দিনের আলো যখন নিভে আসছিল, ঠিক তখনই চোখে দুরবিন লাগিয়ে দক্ষিণপ্রান্তে কিছু জমির চিহ্ন দেখতে পেলাম। পালতোলা নৌকো আমার। একটাই মাত্র পাল। তাও সেটা আমার পক্ষে নৌকোটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাই আমি আমার পরনের শার্ট দিয়ে আপাতত কাজ চালানোর ওপযোগী আর একটা পাল খাটালাম। এবং অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সেই তীরভূমির দিকে তাকালাম। সেটা একটা ছোট্ট শহর হলেও মনে হলো সম্ভবত সেটা একটা ভালো বন্দর হতে পারে।

তীরে এসে আমি যখন নৌকোটার কাছি তীরভূমির খুঁটিতে বাঁধবার চেষ্টা করছিলাম, তখন শহরের বহুলোক আমার চারপাশে এসে ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অথচ আমি তখন খুবই বিপন্ন, আমি বিধ্বস্ত। মাঝ সমুদ্র থেকে একরকম হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতেই কোনোরকমে প্রাণ হাতে নিয়ে তীরভূমিতে এসে পৌঁছেছি, সূর্যের তেজে গলা শুকিয়ে গেছে। এ হেন অবস্থায় আমাকে সাহায্য করা দূরে তারা অদ্ভুত এক বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে শুরু করে দিলো। তাদের এমন অদ্ভুত ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'শোনো ভালো মানুষের দল, দয়া করে বলবে আমি কোথায় এসে পড়েছি?'

একজন জেলে এগিয়ে এসে কেমন যেন রহস্য করে আমাকে বললো, 'খুব শিগ্গীরই তুমি জানতে পারবে।' তারপর সে তার দলের লোকজনদের দিকে এবং তীরভূমির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠলো, 'হয়তো তুমি এই জায়গাটা পছন্দ করবে না, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ তোমার ভালো লাগলো কি লাগলো না তার জন্য সত্যি সত্যি কেউ এখানে তোয়াক্কা করে না।'

আগন্তুকদের কাছ থেকে এমন রূঢ় ব্যবহার পেয়ে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। তাছাড়া সেই ভীড়ের মধ্যে প্রতিটি লোকের মুখে ক্রুর ভ্রূকুটি দেখে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে, ওরা এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চায়? আমি তখন থাকতে না পেরে ক্রোধোন্মোত্ত হয়ে বলে উঠলাম, 'এই ধরনের বন্ধুসুলভ ইংরাজদের কাছ থেকে আমার মতো এরকম আগন্তুকের প্রতি এ ধরনের অবন্ধুসুলভ মনোভাব আমি আশা করিনি।'

'ইংরাজরা কিভাবে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানায় আমার তা জানা নেই,' লোকটি বলল, 'তবে এটুকু বলতে পারি যে তুমি এখন আয়ারল্যাণ্ডে রয়েছো, আর আমরা আইরিশরা দুর্বৃত্তদের ঘৃণা করি।'

'দুর্বৃত্ত?' আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি কি বোঝাতে চাইছো? দুর্বৃত্তের মতো কোনো কাজ তো আমি করিনি।'

'সেরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ আমার নয় এ কাজ আমাদের এই শহরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিরউইনের। তুমি বরং আমাদের সঙ্গে তাঁর কাছে চলো। গতরাত্রে একজন ভদ্রলোকের খুন হওয়ার ব্যাপারে তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।'

এ কথা শোনার পর আমি তো স্তব্ধ, হতবাক। কিন্তু আমি নিশ্চিত, এখানে কোনো খুনের ব্যাপারের সঙ্গে আমি যে জড়িত নই, এ কথা আমি তাঁকে বেশ ভালোভাবেই বোঝাতে পারবো। তাই আমি তখন বিধ্বস্ত ও ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও, আমি শার্টটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে লোকগুলোকে অনুসরণ করে চললাম মিঃ কিরউইনের বাড়ির দিকে। এই মুহূর্তে যে আতঙ্কটা আমাকে আচ্ছন্ন করতে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আমি খুব কমই জানি!

ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক বয়স্ক এবং বেশ দয়ালু আমার মনে হলো এবং সেটা প্রকাশ পেলো তাঁর পরবর্তী কথাবার্তা আর ব্যবহারে। তিনি সেই সব ক্রুদ্ধ জনগণকে প্রশ্ন করলেন কি কারণে তারা তার বাড়িতে এসে ভীড় জমিয়েছে!

সেই ছেলেটিই প্রথমে কথা বললো, 'স্যার গতরাত্রে আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় চড়ে বেড়িয়েছিলাম যখন প্রবল বাতাস বইতে শুরু করলো, আর তখন আমাদের নৌকোটা সমুদ্রতীরের দিকে ঘোরালাম। তারপর আমরা যখন আমাদের ছোট্ট নৌকোটা বীচের ওপর তুলে আনছিলাম, তখন একটা শক্ত জিনিস আমার পায়ে ঠেকে।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করলো ঃ

'আমার হাতের লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, সেটা একটা মানুষের দেহ, এক সুপুরুষ যুবকের বছর পঁচিশ বয়স হবে। তার দেহটা তখনও বেশ গরম ছিল, তাই সে মৃত নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা তখন ধরাধরি করে তাকে নিকটবর্তী একটা বাড়িতে নিয়ে যাই এবং তার জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করি। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। সে তখন মৃত।'

'প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, হয়তো সে জলে ডুবে মারা গিয়ে থাকবে এবং মৃতদেহটা সমুদ্রের ঢেউয়ে তীরে এসে ভিরে থাকবে। কিন্তু পরে দেখলাম, তার পরনের পোশাক শুকনো। তাই সে জলে নামেনি, এ ব্যাপারে আমরা তখন একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাই।'

'তারপর?' ম্যাজিস্ট্রেট শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, তারপর আমরা যখন তার গলায় কালো আঙুলের ছাপ দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওপলব্ধি করলাম, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে তাকে!'

আমি প্রথমে লোকটার এই কাহিনীতে তেমন মনযোগ দিইনি। কিন্তু সে যখন যুবকটির গলায় আঙুলের দাগের কথা বললো, তখন মনে হলো আমার হাত দুটো কাঁপতে শুরু করলো, আর আমার পা-দুটো অবশ হয়ে যেতে থাকলো। আমার সামনে একটা চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে আমি নিজেই আমার পতন রোধ করলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু তারপর ভীড়ের মধ্যে একজন মহিলা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে জানতে চাইলেন এ ব্যাপারে সে কি জানে!

ভদ্রমহিলা তখন তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো, 'জানেন হুজুর, আমি বীচের কাছে থাকি। খুনের ঘটনার কথা শোনার আগে আমি একটা নৌকোর লোককে চলে যেতে দেখেছিলাম যেখানে মৃতদেহটা পড়েছিল, কিন্তু আমি তাকে ঠিক চিনতে পারিনি।'

আমার দিকে ফিরে মিঃ কিরউইন বললেন, 'যেহেতু তোমাকে একটা নৌকোসহ সমুদ্রতীরে দেখা গেছে মৃতদেহটা তোমার দেখা একান্ত প্রয়োজন, 'এসো আমার সঙ্গে এসো!'

নিহত যুবকটির গলায় আঙুলের দাগের কথা উল্লেখ করেছিল সেই জেলেটি, আর সেই কথাটা শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেছিলাম। আমার সেই মানসিক পরিবর্তনের কথা জেলে নিশ্চয়ই ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে থাকবে। তাই আমার অনুমান, মৃতদেহটা দেখে আমার মধ্যে কিরকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা তিনি নিজের চোখে দেখতে চান। তাই আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। কয়েকজন গ্রাম্য লোক আমাদের অনুসরণ করে গ্রামের একটা পান্থশালা পর্যন্ত এলো। আমরা পিছনের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটা প্রায় খালি, কেবল ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের কফিন ছাড়া।

তারপরেই এলো সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটা..........মুহূর্তটা বলতে গেলে প্রায় ভয়ঙ্কর এমনি ভয়ঙ্কর যে, মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করা যায় না, আর এখন আমার এমনি অবস্থা যে, এক অজানা আশঙ্কায় আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। কাঠের কফিনটার মধ্যে রাখা নিষ্প্রাণ মৃতদেহটা দেখান জন্য যেই না সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

সেই প্রাণহীন দেহটা আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতেই দেখলাম, সেটা আর কারোর নয়, আমার প্রিয় বন্ধু হেনরী ক্লারভালের!

দৃশ্যটা দেখা মাত্র আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার ওপক্রম হলো। তাই দম ফিরে পেতে আমি হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলাম তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই শবদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এ অশ্রু শুধু আমার চোখের নয়, যেন অন্তর থেকে যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা জল হয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা আকার হয়ে। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'প্রিয় বন্ধু, আমার অসৎ পরিকল্পনাই তোমাকে খুন করেছে?' আরও দুটি খুনের জন্য ইতিমধ্যেই আমি নিজেকে দায়ী বলে মনে করি।

প্রিয় হেনরী আমার চিরজীবনের সাথী, জানি না ওই শয়তানটা যেমন তোমাকে দাবী করলো, তোমার মতো আর কতোজন তার শিকার হবে?'

আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারছিলাম না। চিন্তায় আমার দেহটা কেবলি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। যন্ত্রণা এক সময় এমনি চরমে উঠলো যে, জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর আছড়ে পড়লাম।

।। আঠারো ।।

ঃ খুনের দায়ে কারারুদ্ধ ঃ

পরবর্তী দু'মাস আমাকে জেলে কাটাতে হলো। এই সময়ে আমার প্রচণ্ড জ্বর হলো, সেই সঙ্গে প্রবলভাবে প্রলাপ বকতে থাকি এবং আমি তখন প্রায় মৃত্যুর শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে মিঃ কিরউইন আমাকে বললেন, আমার তারস্বরে চিৎকার এবং ক্রোধোন্মত্ত উক্তি জেলারের কাছে অর্থহীন বলেই মনে হয়েছে, এর ফলে তিনি আমাকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করেছেন। আমি নিজেই যে আমার ভাই, আমার বান্ধবী জাস্টিন আর এখন আমার প্রাণ-প্রতিম বন্ধু হেনরীর খুনী হিসেবে বারবার নিজেকে অভিযুক্ত করে গেছি।

একজনকে, যাকে আমি 'শয়তান' বলে থাকি। তাকে ধ্বংস করবার জন্য আমার চারপাশের প্রত্যেককে বললাম আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন যাতে করে এই কাজে আমি সফল হতে পারি। প্রায়ই রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে থাকি, সেই সময় শয়তানটা যেন তার দু'হাতের দশটা আঙুল দিয়ে আমার গলা টিপে ধরেছে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি চিৎকার করে উঠি।

জ্বর ছেড়ে গেলে পর আমার প্রলাপ বকাও শেষ হয়ে যায়। পাগলামোর লক্ষণও আর দেখা যায় না। আমি তখন দেখি একটা চরম দুর্দশাগ্রস্ত কক্ষে শুয়ে আছি, যেখানে একটি মাত্র গরাদ দেওয়া জানলা আর একটা ছোট্ট লোহার দরজা। আমার বিছানার পাশে একটি চেয়ারে বসে একজন বৃদ্ধা ঘুমিয়ে রয়েছেন।

'কে, কে আপনি?' তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম।

'বাছা, তোমাকে ভালো করে তোলার জন্য আমাকে ভাড়া করা হয়েছে।' বৃদ্ধা আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন 'ওরা বলে তুমি নাকি একজন যুবককে খুন করেছো। বিচারে তোমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। তবু তা সত্ত্বেও কেন যে তোমাকে ভালো করে তুলতে চাইলো ওরা, এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না।'

এই সহানুভূতিহীন মহিলার দিক থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তারপর আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম, একজন খুনীর ব্যাপারে কেউ খুব বেশী একটা যত্ন নেবে না। তবে হ্যাঁ, একমাত্র ফাঁসুড়েই সম্ভবত আমার একটু-আধটু যত্ন নিতে পারে, কারণ আমাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবার জন্য সে যে তার পারিশ্রমিত পাবে!

যাই হোক, সুস্থ হয়ে ওঠার পর আমি জানতে পারলাম যে, আমার অসুখের সময় মিঃ কিরউইন আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। আমার চিকিৎসার জন্য তিনি একজন ডাক্তারকে পাঠিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে আমার সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য একজন নার্সেরও ব্যবস্থা করা হয়। তিনি

প্রায়ই দেখতে আসতেন আমাকে। তিনি অন্য একজনকে হেনরীর খুনী হিসেবে সন্দেহ করছেন। এ কথা জেনে আমার রাগ আরও বেড়ে যায়। অপর দিকে আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে যতো কথাই বলি না কেন তাঁকে বোঝানো কঠিন বলেই মনে হলো আমার।

বিছানায় উঠে বসার মতো একদিন যখন যথেষ্ট শক্তি পেলাম আমি তখন বিছানা থেকে নেমে একটা চেয়ারে বসলাম। সেই সময় মিঃ কিরউইন আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরও আরাম পাওয়ার জন্য তুমি আর কোনো সুযোগ-সুবিধা চাও?'

আমি তাঁর দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ চোখদুটির দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ এবং আমার সেই ভালো লাগার আমেজটা থাকতে থাকতে উত্তর দিলাম, 'আপনি যে আমার ভালো-মন্দের জন্য এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন তার জন্য প্রথমেই জানাই আমার অজস্র ধন্যবাদ।' এখানে একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'আপনি আমার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে চাইছেন, ঠিক আছে আপনি যদি একান্তই আমাকে আরও বেশী আরাম দিতে চান তাহলে বলবো, এই ছোট্ট কারাকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমি ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছি স্যার। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে নিয়ে গিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে আমার ফাঁসির ব্যবস্থা করলে আমি অনেক বেশী আনন্দ ওপভোগ করতে পারবো। আমার মনে হয় এখন একমাত্র মৃত্যুই আমার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ও বেদনা থেকে মুক্তি করতে পারবে আমাকে!'

'ফাঁসির কথা তুলছো কেন? আমি বলি কি, মৃত্যুর কথা ভুলে যাও, নিরাশ হয়ো না। আজ আমি তোমাকে একটা আশার কথা শোনাচ্ছি, তোমার পকেট থেকে পাওয়া কাগজপত্র থেকে জেনেছি কে তুমি, আর জেনেভায় তোমার পরিবারই বা কে?'

তিনি আমার পরিবারের নাম করতেই আমি কাঁপতে শুরু করলাম। 'হায় ঈশ্বর!' আমি হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলাম। 'আচ্ছা, তাদের জীবনে কোনো অঘটন ঘটেছে নাকি? আর একটা কোনো খুন..........?'

'না, না ওসব কিছু নয় বৎস, তোমার পরিবারের লোকজন সবাই বেশ বহাল তবিয়তেই আছে,' মিঃ কিরউইন আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন। তারপর এক গাল হেসে বললেন, 'আর একটা সুখবর তোমাকে শোনাচ্ছি ভিক্টর, তোমার অতি প্রিয়জন একজন দেখা করতে এসেছে তোমার সঙ্গে।'

আমি চমকে উঠলাম ভয়ে আতঙ্কে। আমার আশঙ্কা হলো, হেনরীর খুনের খবর দিয়ে শয়তানটা আমার আহত মনটাকে আরও বেশী ক্ষত-বিক্ষত করে তুলতে চাইছে? কথাটা মনে হতেই আমি দু'হাত দিয়ে আমার মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠলাম, 'না, ওকে এখান থেকে নিয়ে যান! ওকে আমার এখানে আসতে দেবেন না, প্লিজ!'

মিঃ কিরউইন দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং আমার কথায় বুঝি বা একটু আঘাত পেয়ে কিছুক্ষণ স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে ধীরে ধীরে বললেন, 'শোনো ভিক্টর, হয়তো তুমি দোষী তাই তোমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে শোনা মাত্র তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলে। কিন্তু আমি মনে করি, তুমি তোমার বাবাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে।'

'আমার বাবা!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়েই মিঃ কিরউইন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন অতঃপর এবং আমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বাবাকে দেখে আমার যে আনন্দ হয়েছিল, এলিজাবেথ এবং আর্নেস্ট ভালো আছে, তাঁর মুখ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে আগের সেই আনন্দটাকেও যেন ছাপিয়ে গেলো এই শুভ খবরটা। যাই হোক, আমি তখনও খুব দুর্বল, তাই প্রথম সাক্ষাতের দিনে বেশীক্ষণ থাকলেন না।

পরবর্তী মাসে মিঃ কিরউইন এবং আমার বাবা ওর্কনি দ্বীপের কৃষকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করলেন। যা থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে রাত্রে হেনরী যখন খুন হয় আমি তখন সেখানেই ছিলাম, আয়ারল্যাণ্ডে নয়। এর ফলে আমার বিরুদ্ধে আনিত সমস্ত অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হলো এবং জেল থেকে আমাকে সসম্মানে খালাস করে দেওয়া হলো।

এর পর আমি কে করবো! আমি জানতাম, যাদেরকে আমি ভালোবাসি তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং আমার সৃষ্ট দানবটাকে খতম করার জন্য এখনি আমাকে জেনেভায় ফিরে যেতে হবে। আমার অমন ভারি অসুখের পরে পরেই অমন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ায় বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমি তখনো খুবই দুর্বল এবং বিধ্বস্ত। আমার সেই আগেকার শক্তি আর নেই এখন, আমার বিশাল শক্ত সমর্থ দেহটা এখন যেন একটা কঙ্কালে পরিণত এবং এখনও আমার ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে, জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থায় রয়ে গেছি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি এখনি আয়ালল্যাণ্ড ছেড়ে জেনেভায় প্রত্যাবর্তনের জন্য জোর দিতে থাকলাম। তাই শেষ পর্যন্ত বাবা আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

আয়ারল্যাণ্ডে আমার সঙ্গে এক মাস থাকার সময় তিনি আমার অদ্ভুত ক্রোধোন্মত্ত চিৎকার শুনেছিলেন। যদিও তিনি সেটা আমার প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা বলে ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হতবাক হয়ে যান এই ভেবে যে, কেনই বা আমি নিজেকে বারবার উইলিয়াম, জাস্টিন এবং হেনরীর খুনী হিসেবে জাহির করতে চাইছি। আমার এই নিজেকে দোষারোপ করাটা তাঁর আদৌ মনঃপুতঃ হলো না।

তাই তিনি আমাকে বললেন, 'প্রিয় বৎস আমার, তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ, ভবিষ্যতে তুমি নিজেকে এভাবে আর অভিযুক্ত করো না কখনো। এইসব ভয়ঙ্কর মৃত্যুর জন্য কোনোভাবেই তুমি দায়ী হতে পারো না, এ আমার বিশ্বাস, এ আমার ধারণা।'

আমি নীরব রয়ে গেলাম। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে আমার সেই আতঙ্কে ভরা কাহিনীটা বলে বাবার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। আমি আমার অনৈতিক ও ভুল কাজটা গোপনই রাখতে চাইলাম পৃথিবীর সর্বজনের কাছে। জানি না কথাটা গোপন রেখে আবার একটা ভুল করে ফেললাম কিনা!

।। উনিশ ।।

ঃ আনন্দোজ্জ্বল বিবাহ ঃ

আয়ারল্যাণ্ড থেকে আমাদের প্রত্যার্পণের দিন এলিজাবেথের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। ও আমাকে নতুন করে ওর ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেও আবার এ কথাও

লিখেছে, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে যদি আমি একান্তই না চাই তাহলে ওকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারে।

অবশ্যই এটা সত্য নয়। আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। ও আমার চিরদিনের, ওর প্রতি আমার ভালোবাসা চিরন্তন। আর আমি আমার জীবনে ওকে বিয়ে করা ছাড়া আর কিছুই চাই না। কিন্তু ওর এই চিঠিটা একটা হুমকির কথা যেন আমাকে মনে করিয়ে দিলো, যা আমি আমার মন থেকে মুছে ফেলেছিলাম। সেটা আবার আমার মনে নাড়া দিয়ে উঠলো......সেই দানবটার হুমকি ঃ .....আমি তোমার বিয়ের রাতেও হাজির থাকবো!'

চিঠিটা টেবিলের ওপরে রেখে আমি ভাবতে থাকলাম, ঃ 'আমাদের সেই বিয়ের রাতটা যদি সেই দানবটা আমার মৃত্যুর রাত হিসেবে পছন্দ করে নিয়ে থাকে তো তাই হোক। বেশ বুঝতে পারছি, সেই রাতে আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই হবে। যদি সেই শয়তানটা জেতে, আমার মৃত্যু হবে, আর সেটা হবে আমার শান্তিপূর্ণ মৃত্যু! তবে যদি আমি জিতি, তাহলে ওই শয়তানটার মৃত্যু হবে আর আমি তখন একজন মুক্ত মানুষ হয়ে যাবো।'

আমি আবার এও ঠিক করলাম, আমাদের বিয়ের পরের দিনই আমি আমার সেই ভয়ঙ্কর গোপন কথা অকপটে স্বীকার করবো এলিজাবেথের কাছে কারণ ওর কাছে আমি আমার কোনো গোপন কথাই চেপে রাখতে চাই না, সে যতোই ভয়ঙ্কর হোক না কেন!

বাবা আর আমি জেনেভায় ফিরে আসা মাত্র আমরা বিয়ের পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিই। প্রথমে আমাদের বিয়ের আয়োজনের কথা শুনে এলিজাবেথ তো খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। কিন্তু অচিরেই আমার প্রতিনিয়ত আতঙ্ক, মন মরাভাব এবং দুঃখ দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলো ও।

একটা ব্যাপার যে আমাকে ভয়ঙ্করভাবে কষ্ট দিচ্ছে ওর কাছে আমি তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। আমি ওকে এও বললাম, 'আমরা যখন আমাদের বিয়ের আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। তখন আমার এই কষ্টটা তোমার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিতে চাই না। তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তুমি আমার স্ত্রী হওয়ার পরের দিনেই আমি আমার সব গোপন কথা খুলে বলবো তোমাকে।' আমার আশা এ কথা শুনে এলিজাবেথ নিশ্চয়ই একটু স্বস্তি পাবে, আরাম পাবে।'

আমাদের বিয়ের আগের সপ্তাহে আমি সেই শয়তানটার আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিলাম। সব সময় একটা ছোরা এবং পিস্তল আমার সঙ্গে রাখতে শুরু করলাম। শয়তানটার ছলচাতুরির বিরুদ্ধে সব সময়েই আমি সতর্ক হয়ে থাকলাম।

আমাদের বিয়ের দিনটা যতো এগিয়ে আসতে থাকলো, আমি শান্ত সংযত হতে থাকলাম এবং তার সেই হুমকিটাকে আমি ভ্রান্ত বলেই ভাবতে শুরু করলাম। চিন্তা করার মতো সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করলাম না।

বিয়ের আসরটা আমাদের পরিবারের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হলো, একটা বিরাট পার্টি দেওয়া হলো। বিয়ের প্রতিটি মুহূর্ত এলিজাবেথও আমাকে প্রভূত আনন্দ দিলো আমাদের যৎপরোনাস্তি সুখী করে তুললো। আর আমাদের খুশী দেখে আমার বাবাও কম খুশী হলেন না। তিনি আরও বেশী খুশী হলেন এলিজাবেথকে বিয়ে করে আমি আমার মায়ের কথা রেখেছি বলে।

এলিজাবেথ ওর পরিবারের কাছ থেকে একটা ভিলার উত্তরাধিকারিণী হয়েছিল। সেখানেই মধুচন্দ্রিমা যাপন করার জন্য আমরা পরিকল্পনা করলাম। জায়গাটা উত্তর ইতালীর সুন্দর লেক কোমোর তীরে ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা ভিলা। ইতালীর সেই ভিলায় যাবার আগে প্রথমে আমরা লেক জেনেভা অতিক্রম করে সেখানকার একটা পান্থশালায় রাত কাটাবো।

গ্রীষ্মের একদিন লেকের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। সৌন্দর্যের যেন কোনো তুলনাই হয় না, চোখদুটি মেলে ধরাটা সার্থক হলো আমার যেন। পিছনে তুষারবৃত মস্ত ব্যাঙ্ক পাহাড়, আমাদের দু'জনের মন এক অপার আনন্দে ভরিয়ে দিলো কানায় কানায়। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম সেই আনন্দটা এলিজাবেথের পিঙ্গল চোখদুটি থেকে নিমেষে উধাও হয়ে গিয়ে জায়গাটা অনুপ্রবেশকারীর মতো বলপূর্বক একটা ভয়ঙ্কর ভয় দখল করে নিলো।

আমি ওর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে হাসলাম, ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ওকে আশ্বস্ত করতে আমি আমার চোখের ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, সব ঠিক আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, শক্ত হও এলিজাবেথ। ওকে আমার স্ত্রী রূপে পেয়ে আমি সুখী ও গর্বিত। কিন্তু অন্তরে আমি ভেতরে ভেতরে ভীষণ আশঙ্কিত। আমি যখন আমার প্রতিশ্রুতি মতো পরের দিন আমি আমার গোপন কথা ওর কাছে প্রকাশ করবো, তখন সে ভয় পাবে না তো? '

পরের দিনটা তখন আসলে আর মাত্র কয়েক সময়ের অপেক্ষা শুধু। ইভিয়ামের তীরে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। আর ওই সূর্যাস্ত মনে হলো আমার নিজের ভয়টাকে ফিরিয়ে আনছে। সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ কণ্ঠস্বরটা আমি যেন আবার শুনতে পেলাম ঃ 'আমি তোমার বিয়ের রাতেও হাজির থাকবো!'

।। কুড়ি ।।

ঃ *বিয়ের রাতে শিকার* ঃ

রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো, অনেক আগেই ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছিলো নীল আকাশটা। চাঁদ আর তারাগুলো ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছিলো, আকাশের আলো নিভে গেলো। মুষলধারায় বৃষ্টি নামতেই পান্থশালায় খদ্দেরদের ভীড় পাতলা হয়ে আসতে থাকে একটু একটু করে।

আমাদের বসবার ঘরের জানালার সামনে বসে হ্রদের ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টির দাপট দেখছিলাম। ভুতুড়ে দমকা বাতাস আর প্রবল ঝড় আর একবার হাজার ভয়ে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। আমার একমাত্র আশা হলো আমার শার্টের নিচে একটা পিস্তল লুকনো আছে।

এলিজাবেথের দৃষ্টি এড়ায়নি ও বোধহয় টের পেয়ে গিয়ে থাকবে, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। নীরবে ও আমার ভয়ার্ত মুখটা লক্ষ্য করতে থাকে। একসময় থাকতে না পেরে অবশেষে ও জিজ্ঞেস করলো, 'প্রিয় ভিক্টর, তুমি এতো ভয় পেলে কি করে?'

'এ এক ভয়ঙ্কর রাত প্রিয়তমা,' আমি ওকে পুনরায় আশ্বস্ত করতে চাইলাম। 'একবার এই ভয়টা কেটে গেলে দেখবে সবকিছুই কেমন ঠিক হয়ে গেছে, চমৎকার হয়ে গেছে।'

তারপর আমি ওপলব্ধি করলাম, যদি এই রাত্রে ওই শয়তান পিশাচ আর আমার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, এলিজাবেথকে আমি তার সাক্ষী থাকতে দিতে পারি না। তাই আমি ওকে অনুরোধ করলম, 'প্রিয়তমা তুমি এখন আমাদের বিছানায় চলে গিয়ে সেখানে বিশাম নাও। আজকের দিনটাতে তুমি খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছো। তুমি যাও, একটু পরেই আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।'

এলিজাবেথ বসবার ঘর থেকে চলে যেতেই পান্থশালার প্রতিটি হলঘরের প্রতিটি ইঞ্চি জমি দিয়ে আমি হাঁটলাম, প্রতিটি কোণায় কোণায় সতর্ক দৃষ্টি ফেললাম। যদি সেখান সেই দানবটা লুকিয়ে থাকে এই ভেবে। কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো না।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি যখন সবেমাত্র বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আমার সত্যিকারের সৌভাগ্য হয়তো তাকে রুখে দিয়েছে, তার হুমকি কার্যকর করতে দেয়নি। ঠিক তখনি হঠাৎ আমি আমাদের শয়নকক্ষ থেকে একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

এই মুহূর্তে আমার একটু আগের সব ওপলব্ধি, সব অনুমান মিথ্যে হয়ে গেলো এবং তার বদলে দানবের সেই হুমকিটাই বুঝি সত্যের প্রতীক হয়ে উঠলো আমার কাছে! আমার সব জল্পনা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্খা, বুঝি ধূলায় মিশে গেলো। আমি শয়নকক্ষে ছুটে গেলাম। দরজার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, ঘরের ভেতরে ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য দেখে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেলো!

বিছানার ওপর এলায়িত দেহটা আমার প্রিয়তমা মিষ্টি মেয়ে এলিজাবেথের নিশ্চল এবং প্রাণহীন। তার মাথাটা বিছানা থেকে ঝুলছিল। চুলগুলো ওর ভয়ে আতঙ্কে পাণ্ডুর মুখের একটা অংশ ঢাকা পড়ে আছে।

দৃশ্যটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলো. মনে হলো আমার শরীর থেকে বুঝি সমস্ত রক্ত ঝরে গেছে, আমার চেতনাহীন শরীরটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো!

আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, আমি আমার বসবার ঘরে একটা সোফার ওপর আমার শরীরটা এলানো, পান্থশালার লোকেরা আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আতঙ্কিত সবার মুখ। সোফা থেকে লাফিয়ে উঠলাম এবং বসবার ঘরের দিকে ছুটে এলাম। এলিজাবেথের দেহটা বিছানার ওপর আরও শান্তিতে শায়িত। ওর মুখ ও গলা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। ওর সুন্দর জীবন্ত মুখখানি আমি আর কখনও দেখতে পাবো না।

কাপড়টি সরিয়ে দিয়ে আমি ওকে আমার হাতে তুলে নিলাম। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হলো ও যেন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু হাতে নিয়ে ওর শীতল ও শক্ত দেহটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো ও মৃত.........আর খুনীর কালোহাতের আঙুলের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো ওর গলায়।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্য দুশ্চিন্তায় আমি আমার চোখদুটো ওপর দিকে তুলতেই জানালায় কুৎসিত দাঁত বার করা মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা গেলো। দানবটা যেন বিদ্রুপের হাসি হেসে তার দানবতুল্য আঙুলগুলো আমার প্রিয়তমা এলিজাবেথের দিকে উঁচিয়ে বিদ্রুপ করতে চাইলো। 'দেখলে তো আমার ক্ষমতার দৌড় কতখানি। আর আমার নিষ্ঠুর হাত কতোই বড় অক্ষত তোমার চেয়ে, আমার সৃষ্টিকর্তার চেয়ে তো বটেই!'

'ওগো আমার প্রভু, আমার সৃষ্টিকর্তা, আমি আমার দাবী মতো তোমার বিরুদ্ধে ঠিকই প্রতিশোধ নিতে পেরেছি,' কর্কশ গলায় সে বললো, 'আমি আমার শপথ রেখে এখানে এসে হাজির হয়েছি,

বলেছিলাম না তোমার বিয়ের রাতে আমি আসবো। কি ঠিক এলাম তো? তোমার সুখের সব আশা-আকাঙ্খা কেমন আমি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নি.াম, যেমন তুমি আমার সুখ কেড়ে নিয়েছো!'

আমি আমার পরবর্তী করণীয় কাজ ঠিক করে নিয়ে জানালার দিকে ছুটে গেলাম। যাওয়ার পথে শার্টের তলা থেকে পিস্তলটা বার করে নিতে ভুললাম না। দানবটাকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার ট্রিগার টিপলাম, কিন্তু ততোধিক দ্রুতগতিতে আমার গুলির রেঞ্জের বাইরে চলে গেলো অনেক দূরে!

জানালার ধার থেকে লাফাতে লাফাতে সে হ্রদের দিকে ছুটে গেলো এবং একটু পরেই জলে ঝাঁপ দিলো সে।

আমার পিস্তলের আওয়াজ শুনে পান্থশালার লোকেরা সেখানে এসে ভীড় জমালো। এর পর আমরা হ্রদের দিকে ছুটে গেলাম। একদল জাল সহ নৌকোয় চড়ে হ্রদের জল তোলপাড় করতে থাকলো। আর অন্যেরা নিকটবর্তী জঙ্গলে অনুসন্ধান করতে থাকলো। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে অনুসন্ধান কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। খুনী আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে তখন।

ভয়ঙ্করভাবে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে আমি এক সময় পান্থশালায় ফিরে এলাম। এখন আমি এলিজাবেথের জন্য আর কিছুই করতে পারবো না, একথা আমি বেশ ভালো করেই জেনে গেছি। এখন আমার চিন্তা আমার পরিবারের অন্য সব জীবিত সদস্যদের নিয়ে। যদিও পিশাচ দানবটা আমার পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার মতলব করে থাকে, তাহলে আমাকে এখনি ঘরে ফিরে যেতে হবে। একথা মাথায় রেখে আমি আমার পরবর্তী করণীয় কাজের বাস্তব রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠলাম অতঃপর।

।। একুশ ।।

ঃ বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধান কাজ শুরু ঃ

আমার বাবা এবং ভায়ের জীবিত ও নিরাপদে থাকার খবর নিতে আমি দ্রুত ফিরে এলাম জেনেভায়। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে একটা দুঃসংবাদ যেন আমাকে চরম আঘাত দিলো, আমার বাবার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে। মৃত্যু যেন তাঁর শিয়রে হাজির আমার ফেরার অপেক্ষায়। পর পর কয়েকজন প্রিয়জন হারানোর ব্যথা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আমার ফেরার কয়েকদিন পরেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নিলেও আমার হাতের ওপর মাথা রেখে মারা গেলেন

এটা আমার কাছে চরম আঘাতও বলা যায়। উইলিয়াম, জাস্টিন, হেনরী ও এলিজাবেথের মৃত্যু আর এখন আমার বাবার মৃত্যুটা আমার দুর্বল মনে এ যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত যা অসহনীয়। আমার তখন পুরোপুরি পাগল হয়ে যাওয়ার ওপক্রম। এর পর হয়তো আমাকে বহু মাস ও বছর ধরে পাগলের চিকিৎসা করানোর জন্য মেন্টাল হসপিটালে থাকতে হবে।

তবে এখনকার মতো সেই ভাবটা কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে আমি যখন একটু ধাতস্থ হলাম, তখন আমি সর্বাত্মক প্রতিরোধ নেবার জন্য আমার মনটাকে সেইভাবে তৈরী করে নিতে প্রস্তুত হলাম। আর এখন আমি কিছু একটা করে দেখানোর জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম।

কিছু একটা করারতো খুব ইচ্ছে আমার। কিন্তু অমন একটা শক্তিশালী চতুর দানবের সঙ্গে আমি একা কি লড়তে পারবো? মনে তো হয় না। এর আগে আমার প্রতিটি প্রিয়জন হত্যার ক্ষেত্রে আমি কোনো প্রতিরোধই গ্রহণ করতে পারিনি, বারবার নিজেকে বড়ই অসহায় বলে মনে হয়েছে। আর আমার এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দাপটে সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে একটা পর একটা খুন করে গেছে। তাই আমি জেনেভায় পুলিশের সাহায্য চাইলাম। এমন কি একজন বিচারপতিকে আমি আমার সমস্ত কাহিনী খুলে বললাম, কোনো কিছুই বাদ দিলাম না। মনে হলো তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। তবে তিনি আবার একথাও বললেন যে, বড্ড দেরী করে ফেলেছি আমি। তাঁর মতে দানবটার অতিমানবিক শক্তির সঙ্গে খুনগুলো করার পর যে সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে কারোর পক্ষে তাকে ধরা অসম্ভব! আর জেনেভা পুলিশেরও ওই একই বক্তব্য, সময়ের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া। অতএব আমি বুঝে গেলাম, তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। পিশাচটাকে ধরবার জন্য আমকে এখন একা একাই পথ চলতে হবে। সে পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। তবু সে পথেই আমাকে চলতে হবে। হয় কিছু একটা করতে হবে, কিংবা মরতে হবে। এই দুয়ের মধ্যে কোনো আপোষ নেই!

তাই আমার কাছে এখন কেবল একটাই গ্রহণযোগ্য পথ হলো, নিজেকে পিশাচটার পিছনে ধাওয়া করতে হবে। এমন কি তার নাগাল পেতে গিয়ে যদি আমাকে আমার জীবনের অবশিষ্ট সময়ের সবটাই খরচ করতে হয়, তাতেও আমি পিছপা হবো না।

আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করে আমি ঠিক করলাম, জেনেভা ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু তারপর? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'জেনেভা ছেড়ে আমি কোথায়, কোথায়ই বা যাবো? দানবটা পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে, তাছাড়া আমি যেখানে যাবো, সে-ও আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে ছুটে যাবে সেখানে।

আমি প্রথমে আমার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করলাম শহর থেকে। রাত নামতেই আমি কবরখানায় গিয়ে হাজির হলাম, যেখানে উইলিয়াম, এলিজাবেথ আর আমার বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। আমি তাদের কবরের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলাম এবং স্বর্গের উদ্দেশ্যে সংকল্প গ্রহণ করলাম, 'আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি সেই পিশাচটার সন্ধান করে ফিরবো, যে কিনা আমার এইসব প্রিয়জনদের প্রাণ নিয়েছে। এরা কিন্তু কেউ কোনো অপরাধ করেনি, সবাই নির্দোষ। বিনা দোষে তাদের খতম করেছে সে, তাছাড়া আইন সে নিজের হাতে তুলে নেবে কেন? সে বিচার করার কে? তার জন্য আদালত আছে, আইন আছে এবং সর্বোপরি বিচারপতি রয়েছেন, যিনি আদালতের শেষ কথা! তার এই অনৈতিক কাজের জন্য শাস্তি তাকে পেতেই হবে!

দৈত্যের মতো বিকট একটা হাসির শব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেলো। একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড়ে সেটা এমনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরলো যে, আমার তখন বধির হয়ে যাওয়ার ওপক্রম হলো। আর সেই হাসির শব্দটা যখন মিলিয়ে গেলো, তখনি ঘৃণামিশ্রিত ও অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর যেন আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো, 'দেখলে তো আমার কথা আর কাজের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না! কেমন তোমার বিরুদ্ধে আমি আমার প্রতিশোধ নিলাম? তোমাকে বলেছিলাম না প্রতিশোধ আমি নেবোই নেবো! আমি তোমার জীবন কেমন দুর্বিষহ করে তুলেছি এখন। ঠিক যেমনটি তুমি করেছো আমার। তাছাড়া এ আর এমন কি

হয়েছে, এ তো সবে শুরু। এর পর তোমার জীবনে আরও বিপর্যয় ডেকে এনে দুর্বিষহের চূড়ান্ত করে ছাড়বো, এ আমি বলে রাখলাম আজ, মনে রেখো!'

কণ্ঠস্বরটা যেখান থেকে ভেসে এলো, আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু কোথায় সেই পিশাচটা? সে তখন এমন দ্রুতগতিতে উধাও হয়ে গেলো যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ পাল্লা দেবার আশা করতে পারে না।

সেই মুহূর্ত থেকেই আমার অনুসরণ শুরু হয়ে গেলো। কেবল মাত্র কয়েকটি ক্লু সম্বল করে মাসের পর মাস ধরে সেই পিশাচটাকে আমি অনুসরণ করে গেলাম ইউরোপ ও আফ্রিকার প্রতিটি দেশে দেশে এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম।

কখনো কখনো ভয়ার্ত কৃষকরা যারা তাকে দেখেছিল, তার যাত্রাপথের ইঙ্গিত দিলো। অন্য সময়ে সে নিজেই এমন কতকগুলো ক্লু রেখে গেলো যা আমাকে তার চলার পথের নিশানা দিলো। মনে হলো সে চায়, আমি তার কাছে যাই বটে কিন্তু তাকে ধরতে পারবো না, এই দুশ্চিন্তা যেন আমি ভোগ করি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে, অন্তত যতদিন আমি বেঁচে থাকি, আমার সেই বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলো যেন মৃত্যু-যন্ত্রণারই সামিল হয়ে যায়!

আমি তার কাছ থেকে দুটি বার্তা পেলাম, একটা গাছের ওপর লেখা এবং অপরটি পাথরের গায়ে লেখা। বিদ্রূপে ভরা সেই সব বার্তা। আমি তাতে একটুও মুষড়ে পড়িনি। বরং সে যতো বেশী বিদ্রূপ করবে আমি ততো বেশী বদ্ধপরিকর হবো প্রতিশোধ নেবার জন্য।

রাশিয়ার উত্তর প্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে আমি তার শেষ বার্তাটি পেলাম, সেটা এই রকম ঃ "ফারের পোশাকে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে কষ্ট সহ্য করবার জন্য তৈরী হও। তোমার প্রতি আমার চিরন্তন ঘৃণার দরুণ তুমি কষ্ট পেলে আমি তাতে খুবই সন্তুষ্ট হবে। আনন্দ পাবো।"

আমি একটা স্লেজগাড়ি আর এক দল কুকুর কিনলাম এবং বিস্ময়কর গতিতে তুষারাবৃত রাশিয়া অতিক্রম করে গেলাম। আমি তার থেকে মাত্র একটা দিন পিছিয়ে ছিলাম। আমি যখন একটা ছোট্ট গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, আগের রাত্রে এক বিরাট আকারের দানব গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে। বন্দুক ও পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তাদের সারা শীতকালের খাদ্য-সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে একটা স্লেজগাড়ি এবং একদল কুকুরও সঙ্গে করে নিয়ে যায় সে তুষারাবৃত জায়গা অতিক্রম করার জন্য।

তারপর থেকে গ্রামবাসীরা ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে, বাড়ি থেকে কেউ বেরোতে চায় না। তারা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'তুমি যেন তাকে অনুসরণ করো না। বরফ-সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য এগিয়ে গেছে সে। সেখানে পায়ের তলায় মাটি বলতে কিছু নেই। বরফ গলে সমুদ্রে ফাটল ধরলে তোমরা দু'জনেই জলে ডুবে যাবে। তারপর বরফ-ঠাণ্ডা জলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য! অতএব এর থেকেই বুঝতে পারছো, কেন আমরা তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছি তোমাকে!'

কিন্তু আমি তাদের সেই সতর্কে কোনো কান দিলাম না। কারণ আমার মাথায় তখন কেবল একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেকোনো মূল্যে তার বিরুদ্ধে আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে!

জানি না কত সপ্তাহ কিংবা কত মাস ধরে বরফের ওপর অবিশ্বাস্য ঠাণ্ডা আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় আমি ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছিলাম। তারপর একদিন সকালে একটা

বরফের পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে নিচে তাকাতে গিয়ে দেখি বরফ সমুদ্রে একটা গাঢ় রঙের চিহ্ন নড়াচড়া করছে। আমি আমার টেলিস্কোপটা চোখে লাগিয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখি সেটা একটা স্লেজগাড়ি। সেই স্লেজগাড়িতে বসে রয়েছে অতি কুৎসিত চেহারার একটা লোক, যাকে চিনতে আমার কোনো অসুবিধেই হলো না। আমার দু'চোখ জলে ভরে গেলো, সে অশ্রু আনন্দাশ্রু। তাকে দেখতে পাওয়ার জয়ের আনন্দে আমি তখন আপ্লুত।

আমি সেই পিশাচটাকে দু'দিন ধরে অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু তার খুব কাছে যেতে পারলাম না, তার আর আমার মধ্যে মাইলখানেকের ব্যবধান আমাদের দু'জনকে আলাদা করে রেখেছিল সব সময়ে।

কিন্তু হঠাৎ আমার সব আশা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলো এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে; আমার স্লেজগাড়ির নিচ থেকে বরফ সরে গিয়ে সমুদ্রের জল ঘূর্ণির মতো পাক খেতে খেতে প্রসারিত হতে থাকলো। সেই সঙ্গে প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ের দাপটে আমি তখন টলমান, যেন আমি তখন একটা টরনেডোর মধ্যে পড়ে গেছি। তারপর একটা ভয়ঙ্কর গর্জন করে বরফের চাঁইটা দু'টুকরো হয়ে গেলো আমার সামনে, জলের নিচে একটা গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেলো। সে এক বিরাট ফাটল ভূকম্পে যেমনটি হয়ে থাকে। এককথায় যাকে সুনামি বলা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সেইসব ফাটলগুলো জলে ভর্তি হয়ে গেলো, এর ফলে সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠলো। সেই সমুদ্র এখন বিচ্ছিন্ন করে দিলো আমাকে, আমি তখন একখণ্ড বরফের ওপর চেপে জলে ভাসছি, আমার সেই ভয়ঙ্কর শত্রু তখন আমার কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে ভেসে গেছে।

একটু পরেই সে আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলো। আর আমি তখন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি। আমার ভবিষ্যৎ ছবিটা যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই মুহূর্তে। আমি তখন বুঝে গেছি। স্লেজগাড়িটা হচ্ছে আমার কফিন আর বরফের এই চাঁই হচ্ছে আমার কবরস্থান।

সেই বরফের চাঁইটার ওপর কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ইতিমধ্যে আমার কুকুরগুলোর মধ্যে একটা ছাড়া বাকী সবগুলোই তখন মৃত। আমার মজুত খাদ্যসামগ্রী তখন উধাও। তারপর আমি যখন প্রায় ডুবতে বসেছি, ঠিক তখনি তোমার জাহাজটা দেখতে পেলাম। কোনো জাহাজ যে সুদূর উত্তর থেকে সেখানে আসতে পারে, এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

যাই হোক, আমি আমার স্লেজগাড়িটা ভেঙে দাঁড় তৈরী করলাম এবং সেই দাঁড় দিয়ে আমার পায়ের নিচের বরফের চাঁইটা কোনোরকমে টানতে টানতে তোমার নৌকোর কাছাকাছি নিয়ে গেলাম। সেই অবস্থায় যদিও আমি তখন অত্যন্ত দুর্বল আর মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তবু আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, যদি তোমার গন্তব্যস্থল দক্ষিণ দিকে হয়, তাহলে আমি তোমার নৌকোয় উঠবো না। আমার তখন কেবল একটাই ইচ্ছে, আমার সেই দানবশত্রুটিকে অনুসরণ করা। জেরা থেকে বিরত হওয়ার চেয়ে বরং সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়ে মৃতুকে বরণ করে নেওয়ার সুযোগটা আমি হাতছাড়া করবো না। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, তুমি উত্তরদিকে যাচ্ছো, তাই আমাকে উদ্ধার করতে দিলাম তোমাকে।

তুমি আর তোমার লোকজন আমার জীবন রক্ষা করেছো। আমি এখন খুবই দুর্বল, হয়তো

এখনি আবার নতুন করে আবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারবো না, তবু আমার অনুসরণের কাজ চালিয়ে যাবার পরিকল্পনাটা আমি ত্যাগ করতে পারিনি এখনও পর্যন্ত।

'আমার বন্ধু রবার্ট এই হলো আমার জীবনের করুণ কাহিনী, আর এখানেই সেটা শেষ। এখন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সেই ভয়ঙ্কর দানবটাকে খুঁজে বার করে তাকে ধ্বংস করার জন্য আমি যেন দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু আমি যদি না পারি.......তাকে খুঁজে পাবার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তোমাকে কথা দিতে হবে, তুমি তাকে খুঁজে বার করবে আর আমার হয়ে তুমি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, যদি সে কোনোদিন তোমার সামনে এসে হাজির হয়, আর সে যদি তোমাকে কিছু বলতে চায় তার কোনো কথা শুনবে না। তার কথায় কান দেবে না। কারণ সেই ভয়ঙ্কর পিশাচটা মানুষকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা রাখে। তাই তাকে বিশ্বাস করো না। দেখা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলবে তাকে। জানো তো, শত্রুর শেষ রাখতে নেই!'

।। বাইশ ।।

ঃ অবশেষে শান্তি....... ঃ

ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর কাহিনীর ইতি এখানেই। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল রবার্ট ওয়াল্টন। এই তরুণ বিজ্ঞানীর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানাবার জন্য মনের দিক থেকে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করলো সে। এখনও তার কৌতূহল যেন মেটেনি। আবার সেটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

'ভিক্টর!' সে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি করে এই অদ্ভুত জীবটা সৃষ্টি করলে আর কি করেই বা তাকে জীবন্ত করে তুললে, এটা জানবার জন্য ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমি, তুমি আমাকে সব খুলে বলবে, ওইরকম আর একটা জীবন তুমি তৈরী করে দিতে পারবে?'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো রবার্ট? তুমি কি জানতে চাইছো নিজেই বোধহয় জানো না। তুমি আমাকে কি করতে বলছো? এরকম আরও একটা দানব তৈরী করতে? যদি কেউ সেরকম একটা ভয়ঙ্কর জীব সৃষ্টি করে, তখন কি ঘটতে পারে সেরকম কোনো ধারণা কি তোমার আছে? যদি আর একটা দানব এই সুন্দর পৃথিবীটাকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে?......না, না আমি কখনোই তা হতে দেবো না। ওই রকম একটা জীব সৃষ্টি করে ইতিমধ্যেই আমি একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে দিতে চাই না আমি। না, না, আমার সেই ভয়ঙ্কর গোপন খবর কেউ জানতে পারবে না! আমার মৃত্যুর সঙ্গে সেটারও মৃত্যু হবে!'

বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো, কিন্তু জাহাজের চারপাশের বরফের কোনো পরিবর্তনই হলো না। ছোট ছোট জাহাজের পক্ষে এইসব বরফগুলো এখনও বিপর্যয়ের হুমকি বলেই মনে হয়।

ওদিকে ভিক্টরের অবস্থা সঙ্গীন, দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে, এমন কি বিছানা ছেড়ে ডেকের ওপর দিয়ে যে তার স্লেজগাড়িটার খোঁজ করবে তাও সে পারছে না, ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে যে একটু মুক্ত বাতাস গায়ে লাগাবে তারও ওপায় নেই, দুর্বল শরীরটা যেন তার সঙ্গে বিরোধিতা করছে।

তারপর একদিন হঠাৎ অদূরে বাজ পড়ার মতো গর্জনের শব্দ শুনে জাহাজের সব নাবিকরা ডেকের ওপর এসে ভীড় করলো। সেই গর্জনের শব্দটা সমুদ্রের ওপর ভাসমান বিরাট বরফের চাঁইয়ের ফাটল ধরে দু'টো ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হবার শব্দ। দু'দিন পরে দেখা গেলো বরফ সরে গিয়ে সমুদ্রের বুকে জলস্রোত বইছে, উত্তাল ঢেউ উঠছে, দীর্ঘ সময় পরে সমুদ্রের বুকে জাহাজ চলাচলের পথ খুলে গেছে। তার মানে তারা এখন মুক্ত, মুক্ত আকাশের নিচে সমুদ্রের জলে তারা এখন অনায়াসে তাদের জাহাজটা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এখন বরফের বাধা আর রইলো না।

জাহাজ চলাচলের পরিবেশ ফিরে আসতে দেখে ক্যাপ্টেন ওয়াল্টন তার নাবিকদের হুকুম করলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নোঙ্গর তুলে জাহাজ জলে ভাসাও। নাবিকদের মধ্যে প্রচন্ড হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে দ্রুত তার কেবিনে নেমে এলো, ভিক্টরকে খবর দিতে হবে। অবশেষে তারা ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছে।

ভিক্টর খুব মন দিয়ে ক্যাপ্টেনের কথাগুলো শুনলো। কথাটা শুনে তার মুখের রঙ যেন কেমন বদলে গেলো।

'না, না তুমি কিছুতেই ফিরে যেতে পারো না।' হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়ে ভিক্টর বললো, 'আমার শত্রুকে খুঁজে বার করতে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

ক্যাপ্টেন দুঃখের সঙ্গে তার মাথা নাড়লো। 'আমি আমার লোকেদের আর কোনো বিপদ ডেকে আনতে পারি না। ভিক্টর দয়া করে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করো। আমার আকাঙ্খা থাকতে পারে, আবিষ্কারের নেশা থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে কোনো আবিষ্কারের নেশায় ভ্রমণ করে কিংবা আমার লোকজনদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে সেই দানবটার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারি না আমি।'

'তাহলে তোমার ফিরে যাওয়াটা যখন এতোই জরুরী, তুমি যেতে পারো। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না। আমার উদ্দেশ্য এখনও সফল হয়নি। আমি জানি, আমি দুর্বল, কিন্তু তা সত্তেও এ কাজে যতো বিপদই আসুক না কেন, আমাকে এখানে থেকে যেতেই হবে।' একথা বলে ভিক্টর তার দুর্বল দেহটা কোনোরকমে টেনে টেনে বিছানা থেকে নিচে নামিয়ে আনলো। তবে তার ওই চেষ্টাটা খুবই মহৎ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বালিশের ওপর পড়ে গেলো সে।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ভিক্টরের এবং আদৌ কথা বলতে পারছিল না সে। জাহাজের ডাক্তারকে তখনি ডাকা হলো। ভয়ঙ্কর অসুস্থ লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখার পর ক্যাপ্টেনকে দুঃসংবাটা দিলো ডাক্তার।

'স্যার, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে সে। আমি দুঃখিত।'

রবার্ট ভিক্টরের বিছানার পাশে বসে থেকে স্থির অচঞ্চল থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইলো, প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকেই যার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে এসেছে সে।

কিছুক্ষণ পরে ভিক্টর তার চোখের পাতাগুলো মেলে ধরলো এবং ফিসফিসিয়ে বললো, 'এসো আমার বন্ধু, আমার কাছে এসো, আরো কাছে.........আমি তো তোমার কাছে যেতে পারবো না, কারণ আমার শরীরে এখন খুব বেশী শক্তি নেই। আমি জানি, আমি এখন মৃত্যুর পথে এগিয়ে

চলেছি। আমি তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই বন্ধু, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা এখন আমার আর নেই।'

'আমি এখন বুঝতে পারছি, আমি আমার সৃষ্টি করা জীবটাকে একা ছেড়ে আসার জন্যই পরবর্তীকালে সে অমন ভয়ঙ্কর হিংস্র নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল, এর জন্য আমিই দায়ী। বাপ যেমন তার স্বাভাবিক ছেলের দেখাশোনা করে থাকে, তেমনি আমার উচিত ছিল সে যাতে ভালোভাবে থাকে, ভালোভাবে জীবন-যাপন করে, সুখী হয় এবং সব মানুষ তাকে ভালোবাসতে পারে। সমাজে বাবার পরিচয় হলো সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর তাকে পরিচিত করার দায়িত্ব ছিল আমার। কিন্তু আমি তা করলাম কই? তার জন্মলগ্ন থেকেই তো আমি তার কুৎসিত চেহারা দেখে দূরে দূরেই সরে রইলাম, অপরিচিতই রয়ে গেলো সে সমাজের কাছে। আর তাই তো সবাই তার বীভৎস চেহারা দেখে তাকে ভয় পায়, তার সঙ্গ এড়িয়ে চলে। এক এক সময় আমার মনে হয় সবার সামনে চিৎকার করে বলি, আমি ওর সৃষ্টিকর্তা, আমি ওর পিতা। তোমরা ওকে ঘৃণা করো না। একটু স্নেহ করো, একটু ভালোবাসো। ভালোবাসার কাঙ্গাল ও। তোমাদের স্নেহ ভালোবাসা পেলে ও সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে, স্বাভাবিক মানুষের মতোই আচরণ করবে তোমাদের সবার সঙ্গে। কিন্তু সে এখন আর হবার নয়, অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন আমার একটা করণীয় কাজ বাকী রয়েছে। সেটা আমার সমস্ত মানুষের কাছে আমার নৈতিক দায়িত্বও বটে! আর সেটা হলো, ওই অদ্ভুত জীবটার চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে আবার একটা খুন করার আগেই রুখে দাঁড়তে হবে ওর বিরুদ্ধে, স্তব্ধ করে দিতে হবে ওকে চিরদিনের মতো! কিন্তু আমি এখন মৃত্যু পথযাত্রী, আমি নিজে সে কাজটা আর করতে পারবো না, তাই আমি তোমাকে আবার অনুরোধ করছি, আমার অক্ষমতার খাতিরে আমার জন্য এ কাজটা তুমি করো, প্লিজ! মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় জানি না। তবে আমার বিশ্বাস মৃত্যুর ওপার থেকে আমি ঠিক দেখতে পাবো তুমি আমার কথা রাখলে কি রাখলে না। না রাখলে মৃত্যুর পরেও মানুষের মতোই আমি ব্যথা পাবো। সেই বুঝে তুমি আমার অনুরোধ রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস। এর পর আমার আর কিছু বলার নেই। বিদায় বন্ধু বিদায়!'

এই কথা বলে ভিক্টর এই পৃথিবীতে তার শেষ বন্ধুর হাতটা আঁকড়ে ধরলো। তাঁর ঠোঁটে একটা নরম, নম্র হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেলো এবং পরক্ষণেই তার চোখদুটি বন্ধ হয়ে গেলো চিরদিনের মতো।

সেদিনই রাত্রে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রবার্ট তার বন্ধুর কথা ভাবছিল, হঠাৎ কেবিন থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, যেখানে ভিক্টরের দেহটা একটা কফিনের মধ্যে শোয়ানো রয়েছে।

ডেক থেকে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এসে তেমনি দ্রুত হাতে কেবিনের দরজা খুলতেই রবার্ট দেখলো, দৈত্যের মতো চেহারার একটা জীব কফিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে, তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বাদল নেমেছিল. তখন, সেই অবস্থায় ভিক্টরের ঠাণ্ডা, শক্ত হাতটা সে তার মুখের ওপর চেপে ধরলো। সে তখন কাঁদছিল, তখন তার অন্তরাত্মা থেকে যেন একটা ভুতুড়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

দরজা পথে রবার্টকে দেখামাত্র দানবটা লাফ দিলো জানালার দিকে।

'অপেক্ষা করো! যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো!' ক্যাপ্টেন রবার্ট চিৎকার করে বলে উঠলো।

দানবটা ভিক্টরের দিকে তার কুৎসিৎ একটা আঙুল দেখিয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠলো, 'সে আমার শেষ শিকার! আমি তার সমস্ত প্রিয়জনকে খতম করেছি। আমি স্বীকার করছি, এই জঘন্য খুনের কাজ করে আমি খুবই অন্যায় করেছি, এ আমার জঘন্য পাপ! আর তাইতো আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে এসেছি তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। সে কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে ন? এভাবে আমাকে আমার প্রায়শ্চিত্য করতে দেবে না?'

এখন রবার্টের প্রথম কাজ হলো মৃত ভিক্টরের শেষ ইচ্ছের কথা অনুসরণ করে এই অদ্ভুত জীবটাকে হত্যা করা। সেই মতো রবার্ট তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার মনে হলো, এই জীবটা কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর হলেও তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আকর্ষণীয়ভাব ছিল যা শুনে তার প্রতি ক্যাপ্টেনের কেমন যেন একটু মায়া হলো এবং তাকে ভালো করে জানার জন্য কৌতূহল হলো। তার কথারই জের টেনে রবার্ট বললো, 'যদি তুমি তাড়াতাড়ি ক্ষমা পেতে চাও.......যদি তুমি প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে খুন করা বন্ধ করো, তাহলে তোমার সৃষ্টিকর্তা ভিক্টর শুধু তোমাকে ক্ষমা করবে না, তোমার মধ্যেই সে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল ধরে, বুঝেছো? এইসব অনৈতিক কাজ তুমি করেছো।'

'আমি যা করেছি তার জন্য আমি ঘৃণা বোধ করি।' উত্তরে সে বললো। 'আমি স্বীকার করছি, আমি বড় স্বার্থপর, আমি কেবল নিজের কথাই ভাবি, আমি নিজে যা ভাবি বা মনে করি সেটাই ঠিক বলে মনে করি। কিন্তু আমি সব সময় এরকম ছিলাম না। আমি আমার জীবন শুরু করি একজন স্নেহবৎসল ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে। আমি চেয়েছিলাম মানুষ আমার বাইরের কুৎসিত চেহারার কথা ভুলে যাক, আমাকে ঘৃণা না করুক; বরং আমার ভেতরে যে একটা ভালো রূপ আছে সেটা বোঝবার চেষ্টা করুক তারা এবং তার জন্য তারা আমাকে ভালোবাসুক। কিন্তু কেউ তা করলো না, কেউ আমার মনের ব্যথাটা বোঝবার চেষ্টা করলো না। ভালোভাবে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচবার সুযোগ দিলো না। তার বদলে সবাই আমাকে যা দেখিয়েছে তা হলো ঘৃণা, অবজ্ঞা, আর অবহেলা...........আর সে সবই আমার এই কুৎসিত চেহারার জন্য। এমন কি যে মানুষটি আমাকে সৃষ্টি করেছিল, যে আমার জন্মদাতা, সেই আমাকে আর পাঁচটা মানুষের মতো ব্যবহার করে গেছে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। শত্রুতা করে গেছে আমার ওপর, এমন কি সে তার নিজের হাতে সৃষ্টিকরা জীবকে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল, আমার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, দেখবো কে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে! এখন তুমি দেখছো তো কে কাকে সরালো? তার ভাবা উচিত ছিল, বাস্তব জগত আর কল্পনার জগত এক নয়! আর আমার সৃষ্টিকর্তার অমন সৃষ্টি ছাড়া ব্যবহারটাই আমার দেহ মনে এই নিষ্ঠুর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।'

'তবু আমি তো জানি, ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইকে আমি অনেক দুঃখ-কষ্ট দিয়েছি। তার সব জ্বালা যন্ত্রণার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। তার জন্য এক সময় আমার খুব মায়া হয়েছিল। বেচারা! কিন্তু আমি যখন জানতে পারলাম যে সে তার বিয়ের পরিকল্পনা করবে, সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখছে, আমার তখন নিজের কথা মনে পড়ে গেলো। আমিও তো আমার মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সেই সুখে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আমারই জন্মদাতা।

আমার ভাবী স্ত্রীকে সৃষ্টি করতে গিয়েও ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সে। সেই সঙ্গে আমার স্ত্রী ভাগ্যকেও! এমন লোককে কি আর মায়া দেখানো যায়? তাই আমার সব দয়া মায়া তখন আমার মধ্যে থেকে উবে গিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার নেশায় পেয়ে বসলো আমাকে। না, সে যে আমার ক্ষতি করেছে তার কোনো ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে আপন মনে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে আমি তখন এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে তার অপসারণের সব রকম প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। আর তারপর থেকেই আমি তার অতি প্রিয়জনকে এক এক করে হত্যা করতে থাকলাম। আমার শিকারের তালিকায় তাদের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে তুমি!'

দানবের প্রতিটি কথা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনলো রবার্ট। প্রথমে তার দুঃখের কাহিনী শুনতে গিয়ে তার প্রতি রবার্টের করুণা হলেও তারপরেই ভিক্টরের সেই সতর্কবাণীটা মনে পড়তেই তার কেমন যেন সন্দেহ হলো। এ তার ছলনা নয় তো? আমার সহানুভূতি আদায়ের জন্যই কি সে তার দুঃখের কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে বললো আমাকে? ভিক্টরের সতর্কবাণী আমার মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে ঃ 'মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মানোর প্রচুর ক্ষমতা আছে তার। আমার বিরুদ্ধে সে তোমাকে প্ররোচিত করতে পারে...........!'

আর তারপরেই রবার্টের নবলব্ধ সন্দেহটা ক্রোধে পরিণত হয়ে গেলো। রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো সে, 'সৎ জঘন্য চরিত্রের জীব কোথাকার। প্রথমে তুমি তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছো, তারপর তুমি এসেছো তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য? তুমিতো জানো না তোমার এই দুঃখপ্রকাশ স্রেফ একটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তুমি কেবল জানো, মানুষকে কি করে ঘৃণা করতে হয়!'

'ঘৃণার ব্যাপারে তুমি কি জানো বলো তো? আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও কেন ফেলিক্সকে ঘৃণা করতে জানো? আমি তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে গেছিলাম। কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে সে আমাকে কুকুরের মতো দূর দূর করে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার অদৃষ্টের পরিহাস এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। আমি একবার এক কৃষকের ডুবন্ত ছেলেকে জল থেকে তুলে এনে অভাবনীয় ভাবে তার জীবন রক্ষা করেছিলাম, প্রতিদানে সে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এমন অকৃতজ্ঞ লোককে আমি ঘৃণা করবো না? তারপর সে আমাকে মারধোর করে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। মানুষকে ঘৃণা করার পক্ষে এইসব কারণগুলোই কি যথেষ্ট নয়? ক্যাপ্টেন, তুমিও আমাকে ঘৃণা করো,................কিন্তু অসহায় নিরীহ যেসব মানষ আমার কোনো ক্ষতি করেনি তাদের খুন করার পর যেমন আমি নিজেই নিজেকে ভীষণ ঘৃণা করতে শুরু করেছি, তার থেকে বেশী ঘৃণা তুমি নিশ্চয়ই করো না!'

'কিন্তু আমি তাতে একটুও ভীত নই। এখন আমি কেবল একটাই খুন করবার মতলব করছি, আমার শেষ শিকার! সে কে জানো? আমি নিজেই নিজেকে হত্যা করতে চাই এখন! আমি তোমার জাহাজ ছেড়ে নিচে বরফের স্তূপে নেমে যাবো। এই বরফের স্তূপটাই আমাকে নিয়ে এসেছে। আর ওই ভাবেই উত্তরের দিকে এগিয়ে যাবো। অত্যন্ত ঠাণ্ডা। পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে সেই জায়গাটা। মনুষ্যবর্জিত জায়গা। যেখানে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত জমে বরফ হয়ে গেলে আর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলেও কেউই আমার ভাবরোক্তি শুনতে পাবে না। আমি বেঘোরে

মারা যাবো। আমার পাপের শাস্তি এর থেকে ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে বলো! হ্যাঁ, আমি চাই, আমার মৃত্যু যেন ঠিক এভাবেই হোক!'

'সেখানে, পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে, আমি একটা আগুনের চুল্লী তৈরী করবো, সেটাই হবে আমার চিতা আর সেই চিতার আগুনেই আমার এই পাপ দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তারপর প্রবল বাতাসে সেই ছাই উড়ে গিয়ে পড়বে সমুদ্রে। আমাদের দেহ কবর দেবারই নিয়ম প্রচলিত। কিন্তু সেই প্রচলিত নিয়মটা ভঙ্গ করে কেন আমি আমার দেহটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চাই জানো? কারণ আমি চাই না আমার দেহের কোনো অংশ কোনোদিন কোনো কৌতূহলী ভ্রমণার্থীর নজরে পড়ে, যে হয়তো সেটা অনুসরণ করে আমার মতো আর একটা ভয়ঙ্কর জীব সৃষ্টি করতে পারে। না, আমি তা চাই না, দ্বিতীয় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি হতে দেবো না আমি।'

এখানে থেমে একটু দম নিয়ে সে আবার বলতে থাকলো, 'আর এখন আমি বলবো, ''বিদায় পৃথিবী!.......... বিদায় ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন! তুমি সুখে-শান্তিতে ঘুমোও, আমি চললাম। ওপরের ডাক শুনে যদি আমার মরণ কখনো আসে দেখা হবে তোমার সঙ্গে সেখানে। বিদায়..........!'

সেই তার শেষ কথা, সেই শেষ দেখা পাওয়া! তারপর দানবটা এক লাফে কেবিনের জানালা পথ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিচে ভাসমান বরফ স্তূপের ওপরে।

ওদিকে রবার্টও ছুটে গেলো জানালার কাছে। কিন্তু দানবটা তখন তার নাগালের বাইরে। ইতিমধ্যেই সে জাহাজ সংলগ্ন বরফ স্তূপের ওপর পৌঁছে গেছিলো। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের তোড়ে বরফ স্তূপটা কেমন করে তাকে উত্তরপ্রান্তে টেনে নিয়ে চলেছে, সেই দৃশ্যটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো রবার্ট।

মুহূর্তে দানবটা বহু দূরে চলে গেলো তখন এবং জমাট কালো অন্ধকারে হারিয়ে গেলো সে চিরদিনের মতো। হয়তো সে ওপারের ডাক শুনতে পেয়েছে, তাই সে চলেছে তার সৃষ্টিকর্তা জন্মদাতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য..........।



~ o ~

রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো

॥ এক ॥

ঃ জলদস্যুদের কবলে ঃ

আমার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যায় আমার জন্মভূমির কথা। ছোট-খাটো হলেও বেশ নামী একটা শহর বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ইয়র্ক শহর। আর সেই শহরেই আমার জন্ম ১৬৩২ সালে। ছেলেবেলা থেকেই আমার বিশ্ব পরিক্রমার খুব সখ, সারা বিশ্ব ঘুরে নানান দেশ দেখা, সেই সব দেশের মানুষদের সঙ্গে আলাপ করা, বন্ধুত্ব করা, খবর আদান-প্রদান করা। আমি মনে করি এতে মনের প্রসারতা বাড়ে, পরকে আপন করে নেওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। কেবল নিজের দেশে বসে থাকাটাকে আমি কুয়োর ব্যাঙ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। তাই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছে, পথকেই চিরসাথী করে তুলতে ভীষণ মন চায়, বিশেষ করে সমুদ্রপথ আমাকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে বলে, মনে দ্বিধা কেন, এবার বেরিয়ে পড়ো!

কিন্তু আমার ইচ্ছেটাই তো শেষ কথা নয়, আমার অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন আছে। আর সেটাই আমার কাছে একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ, আমার প্রধান অভিভাবক আমার বাবার ইচ্ছে ঠিক উল্টোটা। ওঁর ইচ্ছে ছিল ভবঘুরের মতো বাইরে বাইরে ঘুরে না বেরিয়ে দেশে থেকে উকিল হই, আইনের কচকচিতে ডুবে থাকি। তাই আমার সমুদ্র-যাত্রার ইচ্ছের কথাটা জানতে পেরে তিনি বাধা দিয়ে আমাকে অনেক ভালো ভালো সব কথা বলে বোঝালেন, 'দেখো বৎস, তোমার বয়স এখন খুবই কম, এই বয়সে তোমার নিজের বোধশক্তি না থাকাটাই স্বাভাবিক, তাই অমি এর জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি কেবল তোমাকে একটা কথাই বলতে চাই, তুমি যা ভেবেছো সেটা বোকামো বই কিছু নয়, আর এরকম বোকার মতো কাজ করলে আখেরে তোমারি ক্ষতি, ঈশ্বর তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না শুধু নয়, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে চিরদিনের জন্যে। বলো, তুমি কি তাই চাও? নাকি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে চিরসুখ লাভ করতে চাও?'

কিন্তু আমি তখন মরীয়া, আমি আমার ইচ্ছেপূরণ করবোই। তাই আমি একরকম জেদের বশে আমার বৃদ্ধ পিতার কোনো উপদেশই পাত্তা দিলাম না। আমার সামনে তখন সমুদ্রের হাতছানি। রাতে ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে সমুদ্র যেন আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়, বৎস তোমার এই ইচ্ছেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখো না। জাগিয়ে তোলো, বেরিয়ে পড়ো বাড়ি থেকে। এই তো উপযুক্ত সময়। সমুদ্রের সেই ডাক আমি অবহেলা করতে পারলাম না। তাই একদিন বাড়ির কাউকে না

জানিয়েই বাড়ি থেকে পালিয়ে অনির্দিষ্টের পথে বেরিয়ে পড়লাম। শুরু হলো আমার ইচ্ছের যাত্রাপথ। সে পথ যতো অনিশ্চিত, যতো বিপদসঙ্কুল হোক না কেন পাড়ি আমাকে দিতেই হবে, কতো দেশ, কতো মহাদেশ, কতো মানুষজন অজানা-অচেনা ভিন্ দেশের। তাদের কারোর ভাষাই আমার জানা নেই। তাতে কি হয়েছে? বোবারা তো কথা বলতে পারে না। তাই বলে কি তারা অন্য মানুষের কথা বা ভাষা বুঝতে পারে না? হ্যাঁ পারে বৈকি। ভাষাটা তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়, অনুভূতিটাই বড় কথা। অনুভূতি দিয়েই তারা অন্যের ভাষা, কথা সব কিছুই উপলব্ধি করতে পারে, মনের ভাষা, হৃদয়ের ভাষাটাই একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে সেক্ষেত্রে। আর আমি তো কথা বলতে পারি। এটা আমার বড় সুযোগ। এই সুযোগটাই আমি কাজে লাগাবো দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার সময়।

আমার বয়স তখনও কুড়ি পেরোয়নি। ১৯৫১ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর লণ্ডনগামী একটা জাহাজের যাত্রী হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু শুরুতেই একটা দুর্ভাগ্য আমার পিছু ধাওয়া করলো। আকাশে মেঘের কণামাত্র ছিল না, হঠাৎ সারা আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেলো, তার রেশ পড়লো সমুদ্রেও। সামুদ্রিক ঝড়ে আকাশ ছোঁয়া ঢেউ এসে বারবার আছড়ে পড়তে থাকলো আমাদের জাহাজের গায়ে। উত্তাল ঢেউ-এর সামনে জাহাজ কতক্ষণইবা স্থির থাকতে পারে? তাই লণ্ডনে পৌঁছবার আগেই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে আমাদের জাহাজ ডুবি হলো। তবে জাহাজটা সমুদ্রের অতল জলে একেবারে তলিয়ে যাওয়ার আগে নৌকোয় চড়ে আমরা নেহাতই ভাগ্যের জোরে কোনোরকমে তীরে এসে পৌঁছলাম প্রাণ হাতে করে। সেটা ছিল ইয়ারসাউথ বন্দর। সেখান থেকে স্থলপথে যাত্রা শুরু করলাম। আমার বহু আকাঙ্খিত লণ্ডন শহরের উদ্দেশ্যে।

আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রার শুরুতেই একটা অশনি সংকেত পেলাম যেন। বাবার সতর্কবাণীর কথাটা মনে পড়ে গেলো। তবুও আমি এতটুকুও দমলাম না। নিজের মনেই আমি বললাম পথে যখন একবার নেমেছি আর থামছি না, পথ চলতেই আমার আনন্দ। আমার বিশ্বাস, এই পথই আমাকে আগার পরবর্তী পথের সঠিক নিশানা অবশ্যই দেবে। তাই আবার আমি পথে নামলাম পূর্ণ উদ্যমে। অশনি সংকেতের কথা ভুলে গিয়ে।

লণ্ডন শহরে পা দিতে না দিতেই আমার ভাগ্যের চাকাটা বুঝি ঘুরে গেলো। দুর্যোগের দিন কেটে গিয়ে সুদিন এলো আমার জীবনে সে এক বিচিত্রভাবে। এতোটা সৌভাগ্য যে আমার হবে স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। তবে হ্যাঁ আমি যেন এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, স্বপ্ন দেখার নেশাটাই আমার সৌভাগ্য এনে দিলো। লণ্ডন শহরটা বিরাট, সেখানে আমার মতো এক ভিন্‌দেশী যুবককে কেই বা পাত্তা দেবে, কেই বা বন্ধুরূপে বরণ করে নেবে আমাকে। কিন্তু এই সব প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যেও আমি আমার ইপ্সিত সঠিক উত্তরটা ঠিকই পেয়ে গেলাম এক সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে। প্রথমেই একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হলো আমার আর সেই আলাপ শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বে পরিণত হতে খুব বেশী সময় লাগলো না। আগেই বলেছি সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি আমাকে ভালোবেসে ফেললেন অচিরেই। আমার ছেলেবেলার ইচ্ছের কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'ওহো এই কথা! এ আর এমন কি কঠিন কাজ। আমার কাজ হলো একটা বন্দর থেকে অন্য আর একটা বন্দরে পাড়ি দেওয়া। আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমার সঙ্গে আমার জাহাজে

পাড়ি দেবে চলো। তোমাকে বিশ্বভ্রমণ করাবো। তাহলেই তোমায় ইচ্ছাপূরণ হয়ে যাবে। এর জন্যে এক পেনিও লাগবে না তোমার। কি রাজী আছো তো?"

রাজী হবো না এমন একটা উত্তম প্রস্তাবে? এতো আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যাওয়া। তাই আমি তাঁর প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

প্রবাদ আছে, সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গ নরকে বাস। এর উপমা আমি নিজেই। আমি নিজেই বলছি, এ আমার গর্ব, এ আমার আনন্দ, এ আমার বিশ্ব ভ্রমণের শুরুতেই একটা বড় সাফল্য বলা যায়। হ্যাঁ, এই ক্যাপ্টেনের সঙ্গগুণেই আমি একটু একটু করে, একজন দক্ষ নাবিক হয়ে উঠলাম, সেই সঙ্গে ব্যবসা জগতে আমি একজন সফল তরুণ ব্যবসায়ীর সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হলাম। ঠিক করলাম এর পর থেকে আমি ব্যবসায় মনোনিবেশ করবো।

লণ্ডনে ফিরে এসে গিনি উপকূলে নতুন উদ্যমে ব্যবসা ফেঁদে বসলাম। আমি এখন একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠলাম। ব্যবসায় লাভও হতে থাকলো প্রচুর। আমার এই উন্নতির মূলে যিনি জাহাজের সেই ক্যাপ্টেনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আর তিনিও সব সময়েই আমার ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করেন। আমার যাতে ভাল হয় সব সময় সেটাই কামনা করেন। কোন্ ব্যবসা করলে কম পরিশ্রমে বেশী মুনাফা হবে তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন আমাকে।

মানুষের সুখ বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না কখনও। এ যেন অনেকটা দিন রাত্রির মতো। দিনের আলোর পর রাতের অন্ধকার যেমন নেমে আসে এই ধরণীতে, আমার সুখের জীবনেও একটি অসুখ নেমে এলো, সুখ নামে পাখিটা আমার উন্নতির খাঁচা থেকে উধাও হয়ে গেলো হঠাৎ একদিন। সেই সুখ আমার প্রিয় বন্ধু, ফিলোজফার এবং গাইড ক্যাপ্টেন হঠাৎ একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। বন্ধু বিয়োগে আমি বেশ কয়েকদিন ব্যথিত হয়ে থাকলাম। নিঃসঙ্গতার বেদনায় আমি তখন খুবই কাতর। সেই দুঃখে আমার পাশে এসে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো আমার বলতে কেউ ছিল না তখন।

যাই হোক, সেই শোক ভুলে আবার আমি কাজে মন দিলাম। ব্যবসায় তখন বেশ মন্দা যাচ্ছিল। তাই সাময়িক ভাবে ব্যবসা শিকেয় তুলে আমার সেই পুরনো ইচ্ছে জাগিয়ে তোলার জন্যে পরের বার বন্ধু ক্যাপ্টেনের জাহাজ জলে ভাসিয়ে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলাম। মৃত বন্ধু ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে এখন আমিই জাহাজের সর্বময় কর্তা, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হয়ে গেলাম। আমাদের জাহাজের গন্তব্যস্থল এখন ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের দিকে। তখন সবে মাত্র পূব আকাশে প্রথম দিনের লাল আভা একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই সময়ে সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় ওঠার মতো তুর্কী জলদস্যুদের একটা জাহাজ অতর্কিতে এসে হাজির হলো আমাদের জাহাজের সামনে। হাজির হওয়া বললে বোধহয় ভুল হবে, আসলে তারা হানাদার, তাই হানা দিতেই এলো, তারা আমাদের পিছু নিলো। বিপদের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তৎপর হয়ে উঠলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় সেখান থেকে পালাতে শুরু করলাম, সারেঙকে জোড় তাগাদা দিতে থাকলাম যতো জোরে সম্ভব জাহাজ চালিয়ে তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু আমাদের সম্মিলিত সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত। তুর্কী জলদস্যুদের জাহাজ আমাদের জাহাজের সামনে এসে আমাদের গতিপথ স্তব্ধ করে দিলো। তারপর ওরা যথারীতি ওদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের জাহাজে। তবে আমরাও একেবারে চুপচাপ বসে রইলাম না।

আমরা আমাদের সীমিত শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োগ করে লড়াই করলাম তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তারা দলে আমাদের চেয়ে ভারি থাকার দরুণ একটু একটু করে পরাভূত হতে থাকলাম। আমরা সাধারণ নাগরিক, আর ওরা হলো পেশাদার জলদস্যু এবং খুনী। তাই ওদের প্রবল শক্তির কাছে পেরে উঠবোই বা কি করে? এর ফলে আমাদের তিনজন নাবিক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আহতের তালিকায় আরও আট জনের নাম সংযোজিত হলো। আমরা তখন কার্যত সব প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। অগত্যা আমরা তাদের শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম। ওরা আমাদের জাহাজের মূল্যবান সব সম্পদ লুঠ করে আমাদের বন্দী করে নিয়ে গেলো সেলি বন্দরে।

আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে সব কোপ পড়লো আমার ওরপেই। জলদস্যুদের জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে রাখলো।

তবে আমার একটা বাড়তি গুণ ছিল। মাছ ধরতে ওস্তাদ ছিলাম। তাই এ ব্যাপারে আমার দক্ষতা দেখে দস্যু জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাকে মাছ ধরার কাজে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করলো। একটা নৌকো মাছ ধরার উপযোগী করে সেটা আমার হাতে তুলে দিলো। আমার ওপর হুকুম হলো যতো বেশী সম্ভব মাছ ধরে আনতে হবে সমুদ্র থেকে।

ক্যাপ্টেনের হুকুম মতো দীর্ঘ দু'বছর ধরে এক নাগাড়ে মাছ ধরার কাজ করতে গিয়ে ভীষণ এক ঘেয়ে লাগছিল আমার। তাই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম এই দস্যু ক্যাপ্টেনের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে যেভাবেই হোক। হঠাৎ একদিন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। এই মাছ ধরার নৌকোটাকে আমার ইচ্ছে মতো কাজে লাগালে কেমন হয়! কথাটা ভাবা মাত্রই আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। মাছ ধরতে যেতাম শেষ রাতে যখন দস্যুরা সবাই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে থাকতো। আর ক্যাপ্টেনও তখন তার কেবিনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। সকাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ আর জেগে উঠছে না তাদের ঘুম থেকে। ভোর চারটে থেকে সকাল সাতটা। এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জলদস্যুদের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রশস্ত সময়। আর এই সুযোগটাই আমি আমার কাজে লাগালাম। একদিন সেই জলদস্যু ক্যাপ্টেনের নৌকো চুরি করেই আমি তার আস্তা ছেড়ে পালালাম, আমি তখন মুক্ত, স্বাধীন। কে আমাকে ধরে তখন! তবে একেবারে মুক্ত হতে পারিনি তখনও পর্যন্ত। পালাতে গিয়ে আমার ছোট্ট মাছ ধরার নৌকোটা গভীর সমুদ্রের অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন' দস্যু ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে মুক্তি পেলেও প্রকৃতি যেন আমার পূর্ণ মুক্তির পথে বাধ সেদে বসলো। ঠিক সময়ে ব্রাজিলমুখী একটা পর্তুগীজ নাবিক আমার প্রায় ডুবন্ত নৌকোটার সামনে এসে না পড়লে আমার সলিল সমাধি ঘটতো। যাই হোক, সেই জাহাজটা ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো। ভগবানের অসীম দয়া, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন যেন ঈশ্বরের দূত হিসেবেই আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আর পর্তুগীজ জাহাজের সেই ক্যাপ্টেনের বদান্যতায় আর নিঃস্বার্থ সাহায্যের দরুণ ব্রাজিলে নতুন করে একটা ব্যবসার গোড়াপত্তন করলাম। ব্যবসাটা ছিল আখ চাষের।

আমার এই নতুন আখ চাষের ব্যবসা শুরু করার পিছনে সেখানকার অন্য সব আখ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা না পেলে আমি বোধহয় সেখানে আমার প্রতিষ্ঠা কিছুতেই পেতাম না। তারা আমার জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা মন দিয়ে শুনে মর্মাহত হলো, আমিই তাদের বললাম, কিভাবে

গিনি উপকূলে গরীব নিগ্রোদের দিয়ে দাসব্যবসা চালানো হয় আর সস্তায় অতি সহজেই তাদের কেমন আখচাষের কাজে লাগানো হয়। খবরটা তাদের কাছে নতুন। তাই আমার মুখ থেকে শুনে তারা ভয়ে শিউরে উঠলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য তারা মুখে এই দাসব্যবসার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও তারাই আবার এর সুযোগ নিতে ছাড়লো না। আমার মুখ থেকে নিগ্রো দাসেদের কথা শুনে অন্য সব ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে তাদের কাজ হাসিল করার জন্য আমার কাছে একটা প্রস্তাব রাখলো। গিনি উপকূলে সমুদ্র অভিযান চালিয়ে যতো বেশী সম্ভব নিগ্রোদাস কিনে আনার জন্য আমাকে বলা হলো। একথা আমাকে বলা হলো এই যুক্তিতে যে যেহেতু আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তাই তারা এই কাজের ভার আমার হাতেই সঁপে দিতে চাইলো। বিনিময়ে তাঁরা আম্মাকে কয়েকটি ক্রীতদাস উপহার হিসেবে দেবে বলল। শুধু তাই নয় আমার অভিযানের লক্ষ্যে সব খরচই বহন করবে তারা, এর জন্যে এক পেনিও খরচ করতে হবে না আমাকে।

তাদের প্রস্তাবটা খুবই যে লোভনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আবার এও ভাবলাম, এর সঙ্গে একটা মানবতার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আর একই সঙ্গে এ যে বড় ঘৃণ্য কাজ। অথচ এই চিন্তাটা আমার মনে উদয় হলেও এ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করলাম না, কারণ সেই যে কোন্ ছেলেবেলায় দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছেটা আমার জেগেছিল আজও সেটা অব্যাহত রয়ে গেছে। তাই এ নিয়ে আর কিছু না ভেবেই আমি তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। হয়তো মানবিকতার দিক থেকে এ আমার অধঃপতন হতে পারে। কিন্তু এতো সব কথা ভাববার সময় কোথায় আমার? তাই অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই আমি ১৬৫৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর আমার নতুন সমুদ্রযাত্রার সূচনা করলাম, কে জানে হয়তো সেটা অশুভ হতে পারে। হলেও আমার কিছু করার নেই। এই অপ্রিয় সত্যটা আমি তখন বেশ ভাল করেই জেনে গেছি।



আমাদের জাহাজ আফ্রিকার উপকূল ধরে এগিয়ে চলে। ঠিক বারোদিন পরে আমাদের জাহাজ বিষুবরেখা অতিক্রম করলো। এ পর্যন্ত আমাদের যাত্রা বেশ নির্বিঘ্নেই কাটলো কোথাও কারোর তরফ থেকেই কোনো বাধা বা আপত্তি এলো না। কিন্তু আমাদের সমুদ্রযাত্রার ঠিক বারোদিনের মাথায় হঠাৎ এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হলো। আমাদের ভয়ঙ্কর এক সামুদ্রিক ঝড় আছড়ে পড়লো আমাদের জাহাজের ওপর। সাইক্লোনিক ঝড়ের তাণ্ডবে আমরা তখন দিশেহারা, টাল সামলাতে না পেরে আমাদের জাহাজটা যে কোথায় গিয়ে ঠিকরে পড়লো বোঝা গেলো না। সেই তুমুল সাইক্লোনে আমাদের জাহাজটা তখন খেলনার জাহাজের মতো অসহায়ভাবে দুলছিল, যেকোনো মুহূর্তে সেটা উল্টে যেতে পারে এর ফলে জাহাজডুবি হয়ে যেতে পারে। সে একচরম বিশৃঙ্খলার সময় আমাদের। আমরা তখন আমাদের আসন্ন মৃত্যুর প্রহর গুণছি। আমাদের মহান পিতা যীশুর শরণাপন্ন হচ্ছি। আমাদের জীবন নিয়ে প্রকৃতির এই ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করো, আমাদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো। ঈশ্বর বোধহয় আমাদের কাতর আবেদন শুনতে পেয়েছিলেন, কারণ তারপরেই দেখলাম আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে গেলো, প্রকৃতির খেয়ালিপনা

বন্ধ হলো। কিন্তু আমরা তখন দিক্‌বিদিকশূন্য হয়ে দিশেহারা। আমাদের নিশানা কোন দিকে হতে পারে তা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিলাম। কিন্তু আমাদের সঠিক ঠিকানা যে কোন্‌দিকে কেউই তার হদিশ দিতে পারলো না।

এদিকে আবার একটা নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে, আমাদের জাহাজে ফাটল ধরে জল ঢুকছে হুহু করে। এছাড়াও ঝড়-জলের তাণ্ডবে আমাদের জাহাজের অনেক নাবিকই ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাদের কোন্‌দিকে যাবার কথা ছিল অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করার পরেও যখন কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না আমরা তখন অনিশ্চিত জেনেও কারোর না কারোর সাহায্য পাওয়ার আশায় শুধু মাত্র অনুমানের ওপর ভর করে আমরা আমাদের জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

কিন্তু কপালে আরও দুর্ভাগ্য লেখা থাকলে কে খণ্ডাবে? হ্যাঁ, বিপদ কখনও একা আসে না, সঙ্গে করে দোসরও নিয়ে আসে একটার পর একটা করে। তা না হলে নতুন করে আবার ঝড় উঠতে যাবে কেন? দ্বিতীয় একটা ঝড়ের তাণ্ডব আবার আমাদের ভয়ঙ্কর একটা বিপদের মুখে ফেলে দিলো। সেই সর্বনাশা সামুদ্রিক ঝড় যেন আমাদের রেহাই দেবে না, প্রচণ্ড আক্রোশে আমাদের জাহাজটাকে টেনে নিয়ে চললো পশ্চিম দিকে, যেখানে সচরাচর অন্য কোনো জাহাজ চলাচল করে না। এর অর্থ হলো আমরা আমাদের এই বিপদে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কোনো জাহাজ আমাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না।

সেই বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়া পরের দিন সকালেও চলতে থাকলো। বিরামবিহীন সেই ঝড়। সেই সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র উত্তাল। ফেনিল জলরাশিতে দূরের কিছুই তেমন স্পষ্ট নয়। তবু তারই মাঝে হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই আমাদের জাহাজের একজন নাবিক সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, 'ডাঙা, ওই তো দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ওপারের ডাঙায় গাছপালা, বাড়ি-ঘর, সব কিছুই যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে...........'

আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম, তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডেকের ওপর ছুটে এলাম দৃশ্যটা ভালো করে চাক্ষুস করার জন্যে। আমাদের মাথার ওপর ঝলমলে সূর্যের আলো, নিচে জল, সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ এখানে আরও প্রবল। জল যে একটু কম, তা একটু পরেই বোঝা গেলো। আমাদের জাহাজ জলের সামান্য নিচে লুকানো চড়ায় একবার হোঁচট খেয়েই একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘটনাটা হঠাৎই ঘটে যাওয়ার জন্যে আমরা সতর্ক হওয়ার আগেই সমুদ্রের ঢেউ প্রবলভাবে আছড়ে পড়তে থাকলো আমাদের জাহাজের ওপরে জাহাজে ঢেউ-এর জল জমতে জমতে যেন আর একটা মিনি সমুদ্রের সৃষ্টি হতে থাকলো। এর ফলে আবার আমাদের প্রাণ সংশয় দেখা দিলো।

অনিবার্য মৃত্যুর অশনি সংকেত পেয়ে আমরা সেই আকাশ ছোঁয়া উত্তাল ঢেউ-এর হাত থেকে রক্ষা পেতে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম কেবিনের ভেতরে। কিন্তু কেবিন আমাদের জীবনের কোনো প্রতিশ্রুতিই দিতে পারলো না। সমুদ্রের তাণ্ডবলীলার খেলা আগের চেয়ে আরও বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, প্রকৃতির সে খেলা আমাদের প্রাণ নিয়ে খেলা। প্রকৃতি যেন আমাদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলায় মেতে উঠেছে, তার হিংস্রতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে, আমাদের একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে চায়।

।। দুই ।।

ঃ মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসা ঃ

আমাদের সামনে তখন চরম দুঃসময় অবস্থা কতো যে ভয়ঙ্কর উঠছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। জীবন মৃত্যুর সঙ্গে তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জোর লড়াই চলেছে। শেষ পর্যন্ত কে জিতবে, প্রকৃতি নাকি আমরা মানুষরা। লাখ টাকার প্রশ্ন। উত্তর অজানা, আর আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনা। আমাদের ভাগ্য নিয়ে ভগবানের এ কি খেলা? ভীষণ রাগ হলো আমাদের সর্বময় কর্তা ঈশ্বরের ওপর। তিনি কি আমাদের এমন চরম দুরাবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না, নাকি দেখেও দেখছেন না, কিংবা চোখে ঠুলি বেঁধে বসে মজা উপভোগ করছেন?

এদিকে আমাদের জাহাজটা কোথায় এসে যে ঠেকেছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পূব-পশ্চিম কিংবা উত্তর-দক্ষিণ কোন্‌টা যে কোন্‌দিকে বোঝবার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমাদের এমন অসহায় অবস্থায় বাইরেব কেউ বলে না দিলে আমরা ঠাওর করতে পারবো না আমরা কোথায় আছি।

বাতাস আগের মতোই এখনও ঝড়ের বেগে বয়ে চলেছে। কমবার কোনো লক্ষণ তো নেই-ই বরং ক্রমশ তার বেগ যেন বেড়েই চলেছে। আমরা তখন একটা বড় কেবিনে জড়ো হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছি। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। আমাদের মনে তখন কেবল একটাই প্রশ্ন, আমরা বেঁচে থাকতে পারবো তো? উত্তরটা আমরা কেউই কাউকে দিতে পারলাম না। সে এক ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ যন্ত্রণা। আমাদের শিয়রে মৃত্যু। অথচ সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুকে এড়ানোর কোনো ক্ষমতাই নেই আমাদের এখন। তাই আমাদের এখন শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। তবে আশার কথা এই যে, জাহাজটা এখনও ভেঙে পড়েনি।

শত চেষ্টা আমরা সমুদ্রের চড়ে আটকে যাওয়া আমাদের জাহাজটাকে এক চুলও নড়ানো গেলো না। এদিকে সমুদ্রের জল জাহাজে ঢুকে পড়ছে হু-হু করে, যে কোনো মুহূর্তে জাহাজটা জলাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তখন এই জাহাজে থাকাটা আমাদের নিরাপদ হবে না। তাই আমরা ঠিক করলাম জাহাজ খালি করে আমরা পালিয়ে যাবো। কিন্তু যাই বা কি করে? একমাত্র নৌকোয় চড়ে সামনের দ্বীপে পাড়ি দেওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল, হচ্ছে, আমাদের জাহাজে মাত্র একটিই নৌকো রাখা ছিল। যাই হোক, অনেক কষ্ট করে নৌকোটা জাহাজের হ্যাঙ্গার থেকে নামিয়ে জলে ভাসালাম। আর আমরা সর্বমোট এগারোজনই সেই নৌকোয় চেপে বসলাম। এসময় আমাদের মাথার ওপর আর একটা বিপদ ঘনিয়ে এলো। আকাশ-ছোঁয়া একটা বিরাট ঢেউ আমাদের জাহাজের ওপর আছড়ে পড়তেই পিছন দিকটা ভেঙে পড়লো নিমেষে। ভাঙা দিকটা কাত হয়ে পড়লো এবং নিমেষে সেদিকটা জলে চাপা পড়ে গেলো। এখন যদি আমরা ওই ভাঙা বিধ্বস্ত জাহাজে থাকতাম তাহলে পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি ছিল না যা আমাদের বাঁচাতে পারতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আর আমাদের ভাগ্য ভালো যে, এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে রইলাম।

এদিকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউতে আমাদের নৌকো অসম্ভব কাঁপতে কাঁপতে কোনো রকমে জল কেটে চলতে থাকলো। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। প্রতি মুহুর্তেই আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি নৌকোডুবি হয়ে আমরা জলের তলায় তলিয়ে যাবো। যাই হোক, ভয়ঙ্কর টানাপোড়েনে প্রতিমুহূর্তে বিপদের

ঝুঁকি নিয়ে প্রায় পাঁচমাইল জলপথ ভেঙে আসার পর হঠাৎ একটা বিশাল আকাশ ছোঁয়া জলের ঢেউ মানুষের মতো আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে দুরন্ত গতিতে ধেয়ে এসে আছড়ে পড়লো আমাদের নৌকোর ওপর। ছোট্ট একটা কাঠের নৌকো, কতো আর ধকল সইতে পারবে? তাই ওই বিশাল ঢেউ-র ধাক্কায় নৌকোটা টাল সামলাতে না পেরে এবার একেবারে উল্টে গেলো। আমরা তখন ছিটকে পড়লাম সমুদ্রের অশান্ত জলতরঙ্গে। সর্বগ্রাসী হিংস্র সমুদ্র আমাদের নিমেষে গ্রাস করে ফেললো। এখন দেখার বিষয় সমুদ্রের ঢেউগুলো আমাদের মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যায় নাকি ডাঙায় সমুদ্রতটে ফিরিয়ে দেয়। তাই আমরা সবাই মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকলাম। শুনেছি তাঁর অপার করুণার কথা। হয়তো তিনি আমাদের আকুল প্রার্থনার কথা শুনতে পেয়েছিলেন এবং সমুদ্রের নিষ্ঠুরতা অনেকটা প্রশমিত করতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে ঢেউ-এর প্রচণ্ড উন্মত্ততায় টাল-মাটাল হয়ে অবশেষে আছড়ে পড়লাম সমুদ্রতীরের বালির ওপরে। সমুদ্রের নোনা জল নাকে ঢুকে যাওয়াতে নাক বন্ধ হয়ে যায়, এক ফলে ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমার অবস্থা তখন জীবন্ত একটা লাশের পর্যায়ে পড়ে যায়। তবু আমি মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করে যেতে থাকি, তাতে ফল পেলাম। শ্বাসকষ্টটা একটু কমতেই কোনো রকমে ক্লান্ত পাদুটোর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলাম ডাঙার দিকে।

পথ অমসৃণ, চলা অযোগ্য, বিশেষ করে আমার মতো নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা একজন মানুষের কাছে যা ছিল অকল্পনীয়। দু'পা এগোলেই পাথরের ছোট ছোট ঢিবি, পায়ের তলায় পাথরের নুড়ি, তাও নুড়িগুলো আবার ভীষণ ধারালো। একটু অসাবধানে পা ফেললেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। তবু এতো সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বলতে গেলে একরকম মনের জোরেই এবড়ো-খেবড়ো পাথরের এক একটা ঢিবি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘাস-বিছানো ডাঙায় এসে উঠলাম, অনেকক্ষণ পরে যেন জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করলাম, বাঁচার আলো দেখতে পেলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তখনকার মতো রেহাই পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মখমলের মতো নরম সবুজ ঘাসের ওপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর ক্লান্তির ভাবটা কেটে যাওয়ায় পর উঠে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম জল অনেকটা দূর পর্যন্ত সরে গেছে এবং আমাদের ভাঙা জাহাজটা ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠছে। তবে সেটার ওপরে তখনও উন্মত্ত ঢেউ-এর তাণ্ডব নৃত্য সমানে চলছে। ওই অবস্থায় স্বভাবতই আমি অনুমান করে নিলাম, আমার বাকী সঙ্গীদের বেঁচে না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রচণ্ড ঢেউ-এর তোড়ে তলিয়ে গেছে সাগরের অচল জলে। ওদের জন্যে আমার এখন ভীষণ দুঃখ হচ্ছে, আমি এদের প্রাণ রক্ষা করতে পারলাম না। কিন্তু কিই ব' আমি করতে পারতাম? আমি নিজেও তো একজন অসহায় অবস্থায় জলে ডুবে যেতে যেতে কোনোরকমে ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছি এখনও। তবু সহযাত্রীদের জন্যে দুঃখ তো হবেই, মনটা বেদনায় ব্যথিত তো হবেই।

অশান্ত মনটা কোনোরকমে শান্ত করে এবার নিজের পোশাকের দিকে নজর দিলাম, সেগুলো এখন জলে ভিজে একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছে, এগুলো এখনি না বদলালেই নয়। কিন্তু শুকনো পোশাক পাই বা কোথায় এখন! বাড়তি পোশাক থাকা দূরে থাক, একটু খাবার পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে

আসতে পারিনি। অবশিষ্ট যা ছিল সব ফেলে আসতে হয়েছে জাহাজে। বাড়তি পোশাক নেই, খাবার নেই, এখন আমার বেঁচে থাকাটাই যেন একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখন ভাবছি, এর থেকে বোধহয় মরে যাওয়াই ভালো ছিল। উপোসী থেকে কতদিন যে বেঁচে থাকতে পারবো জানি না। দ্বীপটা দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে জনমানবশূন্য। কেই বা আমাকে খেতে দেবে? কে জানে হয়তো কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ারেরই উপাদেয় খাদ্য বনে যাবো আমি। আমার পরিণতি যে এমনটি হতে পারে হয়তো নিয়তিতে এমনি লেখা আছে, খণ্ডাবে কে?

এখন আমার বিষয়-সম্পত্তি বলতে সঙ্গে রয়েছে একটা ছোট ছুরি, একটা তামাকের পাইপ আর ছোট এক বাক্স তামাক। নিজের এমন দুরাবস্থা দেখে মনটা আমার ভীষণ দমে গেলো। কতো স্বপ্ন, কতো আশা আর কতো ভাবনা নিয়েই না বাবার অমতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। বাবার মনে দুঃখ দিয়ে এসেছিলাম বলেই বোধহয় আমার এই করুণ অবস্থা। তারুণ্যের সব উচ্ছ্বাস, সব আবেগ আজ মিথ্যে বলেই মনে হচ্ছে আমার কাছে। এখন মনে হচ্ছে, বাবা ঠিকই বলেছিলেন, এরকম খামখেয়ালিপনা করলে ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসবেন না। আমি তার স্নেহ ভালোবাসা আর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবো। তাই সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ঈশ্বরের দিক থেকে সত্যি সত্যিই আমি বঞ্চিত। তা না হলে তিনি আমার এতো কষ্ট দেখেও এমন চুপ করে বসে থাকবেনই বা কেন? যাই হোক, এখন ঈশ্বরের ওপর দোষারোপ করে কি হবে? দোষ যদি একান্তই দিতে হয় তাহলে সে আমার ভাগ্যকে। আমার ধারণা, ভাগ্যও এখন আমার বিরুদ্ধে বুঝি বা বিরূপ হয়েছেন। কিন্তু ভাগ্যের একি পরিহাস?

ওদিকে সূর্য ডুবে যেতে চলেছে পশ্চিম আকাশে। সূর্য ডুবে যেতে থাকলে একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসবে অচিরেই। আর হলোও তাই। আবছায়া অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে জায়গাটা। অন্ধকার নামা মানেই জন্তু-জানোয়ারদের পোয়াবারো, কারণ রাতের অন্ধকারেই তারা তাদের শিকার ধরতে অভ্যস্ত: আমাকে এমন অস্ত্রহীন শিকার হিসেবে পেলে যে কোনো জানোয়ার তো হাতে স্বর্গ পাবে। বিনাবাধায় হয়তো সে প্রথমে আমার মাথাটা তার মুখে পুরে মহা আনন্দে চিবোবে ঠিক যেমন মানুষ মাছের মুড়ো চিবোয়। কথাটা মনে হতেই আমার প্রাণটা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হলো। না, না এতো দুর্যোগের মধ্যেও যে প্রাণটাকে আমি সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি এখন পর্যন্ত, সেই প্রাণটা আমি জানোয়ারের হাতে বেঘোরে সঁপে দিতে পারি না। তাই বন্য জানোয়ারদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ঠিক করলাম, একটা বিরাট গাছের ওপর উঠে বসবো, ঘন ডালপালা আর পাতার আড়ালে থাকলে নিচ থেকে অতো উঁচুতে কোনো জানোয়ারই আমাকে দেখতে পাবে না। আর এভাবেই রাতটা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দিতে পারবো। রাতটা যদি জীবিত থেকে কাটিয়ে দিতে পারি তাহলে কাল সকালে না হয় ভেবে ঠিক করবো কম যন্ত্রণায় কিভাবে মরা যায়, কারণ এই জনমানব শূন্য সমুদ্রতীরে অনাহারে বেঁচে থাকার কোনো আশাই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তবে খুব বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, আমার আকাঙ্খিত একটা গাছ দেখতে পেয়ে তার ওপরেই উঠে বসলাম। সারাদিন আমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই একটু পরেই রাজ্যের ঘুম এসে বাসা বাঁধলো আমার দু'চোখে। আর সেই ঘুমের মধ্যে এতো আরাম পেলাম তা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। একেবারে এক ঘুমে রাত কাবার।

পরের দিন অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙলো, এমন দেরী এর আগে কখনও হয়নি। আজকের দিনটা একেবারে অন্যরকম। বিশেষ করে কালকের দিনটার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। ঝড় বৃষ্টি থেমে গিয়ে আবহাওয়া এখন শান্ত এবং মাথার ওপর আলো ঝলমলে রোদ্দুর। রাতে জানোয়ারের আক্রমণ থেকে আমি যে বেঁচে গেছি বিশ্বাসই হচ্ছে না। আর একবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললাম না।

ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এলাম। নিচে নেমে সমুদ্রের দিকে তাকাতে গিয়ে একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে যতো না অবাক হলাম তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম আমাদের জাহাজটার কোনো চিহ্নই বুঝি আর কখনও দেখতে পাবো না। কিন্তু আমার সব অনুমান নস্যাৎ করে দিয়ে হয়তো প্রকৃতির দয়াপরবেশেই হবে দেখলাম আমাদের ভাঙা জাহাজটা ঢেউ-এর তোড়ে ডাঙার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। দৃশ্যটা দেখে বাঁচার একটা ক্ষীণ আশা দেখতে পেলাম। এই ভেবে যে, ওই জাহাজে বেশ কিছু শুকনো মাংস, বিস্কুট রুটি আর কাঁচাসবজি রেখে এসেছিলাম। তাই ঠিক করলাম, ভাঁটা পড়লে জল অনেক কমে যাবে, তখন জাহাজে গিয়ে সব খাবার আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর নিয়ে আসবো।

সেই সময়টার জন্যে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হলো আমাকে। দুপুরের কিছু পরে ভাঁটার টানে জল সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ভিজে জামাপ্যান্ট খুলে ফেলে পাড়ে রেখে সমুদ্রে নামলাম, খুব বেশী জল ছিল না, মাথা ডুবে যাওয়ার মতো, অনায়াসে সাঁতার কাটা যায়। সাঁতরে ভাঙা জাহাজের কাছে পৌঁছলাম। ডেকের ওপর থেকে একগাছি দড়ি ঝুলে থাকতে দেখলাম। দড়িটা দেখে হালে যেন পানী পেলাম। সেই দড়ি বেয়ে কোনোরকমে একদিকে হেলে পড়া জাহাজের ডেকের ওপরে গিয়ে উঠলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। তাই খাবারের সন্ধানে প্রথমেই গিয়ে ঢুকলাম ভাঁড়ার ঘরে। প্রথমেই চোখে পড়লো টিন ভর্তি বিস্কুট, খিদের জ্বালায় একটার পর একটা বিস্কুটই খেয়ে ফেললাম বেশ কয়েকটা। বিস্কুটের টিনটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আরও কিছু শুকনো খাবার আর টিনের মাংসও সংগ্রহ করলাম। হাতে সময় খুবই কম, হঠাৎ কখন আবার জোয়ার এসে পড়ে কে জানে! তাই এবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের সন্ধানে একটা কেবিন থেকে আর একটা কেবিনে ঢুঁ মারলাম এবং আমার আকাঙ্খিত সব জিনিস পেয়েও পেলাম।'

কিন্তু এর পর সমস্যা হলো, এতো সব জিনিস ডাঙায় নিয়ে যাবোই বা কি করে। এর জন্যে এখন একটা নৌকোর সন্ধান করতে হবে। কিন্তু আমাদের জাহাজের নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা। আমি বেশ ভালো করেই জানি, জাহাজে একটি মাত্র নৌকোই ছিল, সেটা আবার আমাদের ডাঙায় পৌঁছতে গিয়ে ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে চুরমার হয়ে সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে গেছে। এখন উপায়? স্থলপথে হলে না হয় হেঁটেই মেরে দিতাম। কিন্তু জলপথে তাও আবার অশান্ত সমুদ্রে এতো সব জিনিস সঙ্গে নিয়ে সাঁতরাবোই বা কি করে।

হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এলো। গ্রামে বন্যার সময় নৌকোর অভাবে কাঠের ভেলায় চড়ে বানভাসী মানুষজনকে উঁচু নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যেতে দেখেছি। তা সেইরকম একটা ভেলা তৈরী করলে কেমন হয়। কথাটা ভাবা মাত্র কাঠের তক্তার সন্ধানে জাহাজের স্টোররুমে গিয়ে ঢুকলাম। জাহাজে হঠাৎ ফুটো দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে নিকটবর্তী বন্দরে পৌঁছবার আগেই

সেই ফুটো মেরামত করে ফেলতে হয়। তাই এর জন্যে কাঠের তক্তা, পেরেক, স্ক্রু আর হাতুড়ি ইত্যাদি সবসময় মজুত রাখার ব্যবস্থা থাকে সব জাহাজেই। আর আমাদের জাহাজেও ছিল। এর জন্যে কাজটা আমার খুব সহজ হয়ে গেলো।

প্রয়োজনীয় কিছু কাঠের তক্তা, পেরেক আর হাতুড়ি সংগ্রহ করে তখনকারমতো কাজ চালানোর জন্যে একটা ভেলা তৈরী করে ফেললাম। নাবিকরা কেউই জাহাজে ছিলো না। তারা যে কোথায় কিংবা আদৌ বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। তাই তাদের তিনটে ট্রাঙ্ক খালি করে তাতে পাঁউরুটি, চাল, ময়দা, চীজ, মাখন, নানান রকম মশলা, শুকনো মাংস যা ছিল সব ভরে নিলাম।

এইসব কাজ শেষ করতে বেশ কিছু সময় লেগে গেলো। কাজ শেষ হতেই ডেক থেকে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই আসন্ন জোয়ারের ইঙ্গিত পেলাম জল বাড়তে শুরু করেছে। কাছেই ছিল ডাঙা। ডাঙার পারে যেখানে আমি আমার কোট, প্যান্ট, জামা, ওয়েস্টকোট ছেড়ে রেখে এসেছিলাম, সেদিকে তাকাতেই দেখি জায়গাটা একেবারে ফাঁকা, বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না, সেগুলো সমুদ্রের ঢেউ-এর তোড়ে ভেসে গেছে। কেবল মোজা আর একটা আণ্ডারওয়্যার পরে জল সাঁতরে আমি তাড়াতাড়ি করে জাহাজে এসে উঠেছি। পোশাক ছাড়া চলবে কি করে আমার। তার ওপর প্রচণ্ড শীত নিবারণ করবো বা কি করে?

তাই এই সব কথা ভেবে তাড়াতাড়ি কেবিনে কেবিনে ঢুঁ মেরে বেশ কিছু পোশাক আর কম্বল সংগ্রহ করে নিয়ে সদ্য তৈরী করা ভেলায় চাপালাম। সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিলাম। যেমন, ছুতোরমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতির বাক্স, দুটো পিস্তল, দুটো হাল্কা গাদা বন্দুক, কিছু বারুদ আর একটা থলে ভর্তি কার্তুজ আর দুটো তলোয়ার। সব জিনিসপত্তর তোলা হয়েছে কিনা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে দুটো ভাঙা বৈঠা নিয়ে ভেলায় চড়ে এর পর রওনা হলাম ডাঙার দিকে। বৈঠার খোঁজ করতে গিয়ে স্টোররুমে দুটো করাত, একটা কুড়ুল, একটা কোদাল আর একটা শাবল দেখতে পাই, সেগুলোও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, কে জানে কখন কোন্‌টার প্রয়োজন হয়।

পুরোদমে জোয়ার আসার আগেই দ্রুত হতে ভেলা চালিয়ে দ্বীপের তীরে এসে পৌঁছলাম। তখন শেষ অপরাহ্নের বেলা, সূর্য অস্ত যেতে বসেছে।

এই নতুন অজানা দ্বীপে আমার নতুন জীবন শুরু করার সব সরঞ্জাম আর অন্তত কিছুদিনের জন্যে খাবারও সংগ্রহ করে এনেছি। এখন আমার ভাবনা কিসের?

॥ তিন ॥

ঃ নতুন জীবনের যাত্রা হলো শুরু ঃ

আমার নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করার আগে আমার প্রথম কাজ হলো দ্বীপটার চারদিক ঘুরে দেখে নেওয়া। এখান থেকে ফিরে যাবার কোনো উপায় যখন নেই তখন এখানে বসবাসের উপযুক্ত পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এটা একটা দ্বীপ, নাকি কোনো মূল ভূখণ্ডের একটা অংশ এ নিয়ে আমার মনে শুরু থেকেই একটা দ্বন্দ্ব থেকে গেছে। আমার মনের এই সন্দেহটা কাটাতে হবে।

আরও জানতে হবে, এখানে কোনো বন্য জন্তু জানোয়ার আছে কিনা, আর যদি থাকে তারা

কি ধরনের মানে তারা হিংস্র কিনা, মানুষের ক্ষতিকারক কিনা। আর সব শেষে জানতে হবে এখানে মানুষের বাস আছে কিনা, যদি থাকে তারা আমাকে কি ভাবে নেবে তাদের বন্ধু হিসেবে নাকি শত্রু হিসেবে? তাই এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই একটা পিস্তল, একটা গাদা বন্দুক আর প্রয়োজনীয় কার্তুজ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ খানিকটা দূরে একটা খাড়াই পাহাড় দেখতে পেলাম। পাহাড়ের নিচে উপত্যকায় পৌঁছে মনে হলো, দূরত্বটা মাইলখানেক হবে। চূড়া পৌঁছতে বেশ কষ্ট হলো। চূড়া থেকে দ্বীপটার চারদিক খুব স্পষ্টই দেখতে পেলাম। কিন্তু হতাশ হতে হলো। জায়গাটা সত্যিই আক্ষরিক অর্থে একটা দ্বীপই বটে, চারদিকে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, ফেনিল জলরাশি সমুদ্রতীরবর্তী পাহাড়ের গা থেকে প্রতি মুহূর্তের ধূলো ময়লা কেমন ধুয়ে ফেলে সাফ করে দিচ্ছে, সূর্যের আলোয় সেই জায়গাটা চকমক করছে। দ্বীপে চাষের জমি বলতে কিছুই নেই, যেটুকু জমি খালি পড়ে আছে সে সবই মরুভূমির মতো রুক্ষ বালিতে আর পাথুরে ছোট ছোট স্তূপে ভরা। সেখানে কোনো শস্যই জীবনধারণের রস আহরণ করতে পারে না আর তাই কি এই দ্বীপে মানুষের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না? এই দ্বীপের যা কিছু বাসিন্দা সে সবই বন্য পশু আর পাখিরা।

দ্বীপটার সম্পর্কে মোটামুটি ভাসা ভাসা একটা ধারণা নিয়ে আমার সাময়িক আস্তানায় ফিরে বাক্স-প্যাঁটরা গোছগাছ করে রাত কাটানোর উপযোগী একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেললাম আমি একা নিজের হাতেই। এ কাজ ঘরামীর। কিন্তু জীবনে আমি কখনও ঘরামী ছিলাম না, আমার বংশের চোদ্দপুরুষেও কেউ ছিল না। আমার বাবা আমাকে উকিল করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর অমন সৎ উপদেশ শুনিনি বলেই বোধহয় আমাকে আজ ঘরামীর কাজ করতে হলো। অবশ্য তার জন্যে আমার একটুকু দুঃখও নেই। আমি কেবল একটা কথাই জানি, কোনো শ্রমেরই অমর্যাদা করতে নেই, সব শ্রমই এক, সব কাজই সব মানুষের জেনে রাখা ভালো, কারণ কখন কিসের প্রয়োজন হবে কে বলতে পারে?

এখন আমার একটা চিন্তা অহরহ আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কি করে আহারের সংস্থান করবো। এতো আর কোনো বন্দর-শহর নয়, আর হাতে কোনো রেস্তোও নেই যে, বাজারে কিংবা রেস্তোরাঁয় গিয়ে পেট ভরে খেয়ে আসবো। আর ফল খেয়েও যে পেট ভরাবো তার কোনো উপায় দেখছি না। আর তাই তো এতো চিন্তা। তাছাড়া মাংস খাওয়ার মতো তেমন কোনো প্রাণীটিও চোখে পড়েনি, একমাত্র প্রাণী যা চোখে পড়েছে তা হলো দু'তিনটে খরগোস। খরগোসের মাংস খুবই সুস্বাদু। নিয়মিত খরগোসের যোগান পেলে আপাতত আহারের সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

তবে এসব প্রাণী শিকারের জন্যে ছোট-খাট আরও কিছু হাতিয়ার দরকার। তাই ভেবে দেখলাম, আমাদের ভাঙা জাহাজে আবার ফিরে যেতে হবে। ওখানে কাজে লাগাবার মতো যা যা জিনিস আছে সবই আমাকে নিয়ে আসতে হবে। কোনো কিছু ফেলে রেখে আসা যাবে না। যাই হোক, এ কাজের জন্য পরের দিন আবার জলে ভাঁটা পড়তেই বেরিয়ে পড়লাম জাহাজটার উদ্দেশ্যে।

আবার অল্প জলে অনায়াস সাঁতার কেটে পাড়ি দেওয়া। এবারের সংগ্রহের তালিকায় স্থান পেলো দু'তিন থলে লোহার পেরেক, একটা গজাল, তিনটি গাঁইতি, কয়েকটা ত্রিপল (তাঁবু খাটানোর কাজে লাগবে এগুলো), একটা দোলনা-বিছানা, কয়েকটা বালিশ, বিছানার চাদর আর অবশিষ্ট

একটা গাদা বন্দুক। এগুলো নিয়ে ডাঙায় ফিরে এসেই তাঁবু তৈরীর কাজ শুরু করে দিলাম। কাঠের কয়েকটা খুঁটি পুঁতে তারপর ত্রিপল বিছিয়ে আপাতত থাকার উপযোগী একটা তাঁবু খাটিয়ে ফেললাম। জন্তু জানোয়ারদের আচমকা আক্রমণ ঠেকাবার জন্য করলাম কি ট্রাঙ্ক, খালি কয়েকটা বাক্স আর অন্য আরও কয়েকটা জিনিসপত্তর তাঁবুর চারপাশে স্তূপাকার করে রাখলাম। এর ফলে বাইরে থেকে তাঁবুর অস্তিত্ব দেখাই গেলো না। আর এভাবেই তাঁবুটাকে নিরাপদ করে তুললাম।

এদিকে রাত নেমে এসেছিল। তাঁবুর বাইরে কালো পিচের মতো অন্ধকার থিক্‌থিক্ করছিল। মাঝে মাঝে জোনাকী -জ্বলা আলোয় নামমাত্র অন্ধকার ঘুচলো বটে প্রয়োজনের তুলনায় সে অতি নগণ্য।

এদিকে সারাদিন প্রচণ্ড খাটাখাটুনির দরুণ ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল, রাজ্যের ঘুম এসে যেন আমার চোখদুটিতে বাসা বাঁধতে চাইছিল। শোবার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বালিশের নিচে দুটো পিস্তল মজুত রেখে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম পরম নিশ্চিন্তে।

—

দ্বীপে আসার পর তেরোটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো, আর সেই তেরোদিনে কম করেও এগারোবার আমি সেই ভাঙা জাহাজে গেছি আর এক একবার এক একরকম জিনিসপত্তর নিয়ে এসেছি, সবই প্রয়োজনীয়। সেইসব বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর এ সব তো ছিলই সেই সঙ্গে ছিল ছত্রিশ পাউণ্ডের কারেন্সি নোট, ইউরোপ আর ব্রাজিলের কিছু সোনারূপার মুদ্রা। পাউণ্ডের নোটগুলো পেয়ে হাসি চেপে রাখতে পারিনি এই কারণে যে, এখানে দোকান-বাজার কোথায় যে, ওই টাকা দিয়ে জিনিস কিনবো? যাই হোক, ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওগুলো একটা থলের মধ্যে পুরে সঙ্গে রাখলাম। পরে তাঁবুতে ফিরে এসে ওগুলো যত্ন করে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে তুলে রাখি।

পরের দিন, অর্থাৎ চোদ্দদিনের মাথায় আবার সেই বিধ্বংসী ঝড় উঠলো, সেই ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপটে সমুদ্র উত্তাল, আগের মতো আবার তাণ্ডব শুরু হয়ে গেলো। সারাটি রাত ধরে চললো সেই তাণ্ডবলীলা। পরদিন সকাল হতে না হতেই ছুটে গেলাম সমুদ্রতীরে, আমাদের ভাঙা জাহাজের কোনো পাত্তা নেই। অনুমান করে নিলাম, কাল সারা রাত ঝড়ের তাণ্ডবে আমাদের ভাঙা জাহাজটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বন্যজন্তু-জানোয়ারদের ভয় তো ছিলই, কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশী ভয় দ্বীপের অসভ্য বর্বর আদিবাসীদের অবশ্য সেরকম কেউ যদি থেকে যায়। তবু সাবধানের মার নেই। নিজেকে আরও বেশী সুরক্ষিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলাম। আমার তাঁবুটা ছিল পাহাড়ের গুহা সংলগ্ন। সেই গুহা আর আমার তাঁবুর মাঝামাঝি একটা শক্তিশালী আস্তানা তৈরী করে ফেললাম। পাহাড়ের লাগোয়া অনেকটা সমতলভূমি ছিল, সেটা বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললাম, তাতে আমার তাঁবুটা আরও বেশী শক্তপোক্ত হলো। আমার তাঁবুর ঠিক পিছনে গুহার মতো বিরাট গর্তটা গোপন সিন্দুক হিসাবে ব্যবহার করলাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি অনেক কষ্ট করে সেই গুহার ভেতরে নিয়ে গিয়ে তুললাম। এর পর আর একটা কাজ করলাম, তাঁবুর সামনে অর্ধবৃত্তাকারে পর পর দুসারি ছুঁচলো কাঠের খুঁটি শক্ত করে পুঁতে দিলাম। বেড়াটা প্রায় ছ'ফুট উঁচু আর খুবই শক্তগোছের হলো, যা

কোনো মানুষ কিংবা পশুর পক্ষে সে ভাঙা তো দূরের কথা ডিঙিয়েও ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আমি নিজেও চেষ্টা করে দেখেছি, বার বার ব্যর্থ হয়েছি। তাই নিজের যাতায়াতের সুবিধের জন্যে একটা ছোট-খাটো মই তৈরী করে নিলাম।

এই দ্বীপে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, এখানে অন্য পাঁচ ঋতুর চেয়ে বর্ষা ঋতুর দাপট অত্যন্ত বেশী, বৃষ্টি প্রায় লেগেই আছে। তাই লাগাতার বর্ষার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আর একটা বড় তাঁবু খাটিয়ে নিলাম।

পাথরের মেঝে, বন্য পোকামাকড়ের উপদ্রব তো আছেই, তার ওপর বর্ষার জল তাঁবুতে ঢুকে পড়ে বিছানা দিলো ভিজিয়ে দিলো একদিন। তাই তারপর থেকে মেঝের ওপর বিছানো চিরাচরিত বিছানা গুটিয়ে ফেলে আমি দোলনা-বিছানাটা ব্যবহার করতে থাকলাম। এতে মনে হলো বুঝি আমার সব বিপদ কেটে গেলো।

এখন আমি বেশ নির্ভয়েই আছি। আমার কাজ এখনও অনেক বাকী। এর পরের কাজ হলো আমার তাঁবুর পিছনের গুহার মতো গর্তটা কেটে আরও বড় করে তোলা। শাবল, কোদাল আর গাঁইতি নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। গুহার ভেতরের পাথর আর মাটি কেটে সেগুলো তাঁবুর বাইরে উঠানের বেড়ার কাছে বিছিয়ে দিলাম। প্রায় দেড়ফুট সমান উঁচু হলো। গুহাটা তাঁবুর আড়ালে ছিল বলে বাইরে থেকে কারোর চোখে পড়ার কথা নয়। তাই গুহাটা হয়ে উঠলো আমার এক অতি নিরাপদ দুর্গ।

জন্তু-জানোয়ার আর বন্য আদিবাসীদের আক্রমণের হাত থেকে আমার প্রতিরক্ষার রসদ গোলা-বারুদগুলো বৃষ্টির জলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলো গুহার ফাঁক-ফোঁকরের মধ্যে রেখে এলাম থলের মধ্যে সযত্নে পুরে রেখে। প্রয়োজনে চেনার সুবিধের জন্যে সেই সব ফাঁক-ফোকরগুলোর ওপর সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে রাখলাম। কারণ আমাকে বেঁচে থাকতে হলে যে-কোনো আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে এইসব অস্ত্রের খুবই প্রয়োজন।

এদিকে আবার অন্ন সংস্থানের সন্ধানে প্রতিদিনই নিয়ম করে একবার বন্দুক কাঁধে নিয়ে বনে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়লাম। তা হঠাৎ একদিন ভাগ্য গুণে একদল বুনো ছাগলের সন্ধান পেয়ে গেলাম। ওরা ঘোড়দৌড়ের মতো জোরে জোরে ছোটে, তাই ওদের কাছাকাছি যাওয়া একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হলো আমার। তবে বুদ্ধির খেলায় ওদের হারাতে হবে, ওদের দৌড় বন্ধ করতে হবে। সেই মতো পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে সেখান থেকে নিচে গুলি করতেই ওরা ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। একটা ছাগলের গায়ে গুলি লাগতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং মারা গেলো সে। দলের অন্য সব ছাগল পালিয়ে গেলেও একটা ছোট বাচ্চা মায়ের মৃতদেহের পাশে থুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মৃত ছাগলটা কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হলাম, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, বাচ্চা ছাগলটা আমাকে অনুসরণ করছে। সে আমার আস্তানা পর্যন্ত এলো। তাঁবুতে ফিরে এসে ঠিক করলাম, বাচ্চাটাকে পুষবো। কিন্তু বাচ্চাটা কিছু যে খেতে চায় না, আর কিছু না খেলে সে বাঁচবেই বা কি করে? মা-হারা বাচ্চা মনমরা হয়ে সারাদিন তাঁবুর এক কোণে বসে থাকে। বেচারা, না খেয়ে শেষে মারা যাবে। তাই মনে একটু কষ্ট হলেও একদিন নিষ্ঠুরের মতো বাচ্চাটাকে খতম করে ফেললাম। তারপর ওর কচি মাংস বেশ কয়েকদিন ধরে খেলাম।

দিন আমার মোটামুটিভাবে ভালোই কাটতে থাকলো। কিন্তু একদিন খেয়াল হলো দিন মাস বছর সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। তাই সময়ের হিসেবটা ঠিক রাখার জন্যে কাঠের একটা খুঁটির ওপর লিখে রাখলাম, '১৬৫৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর আমি এই দ্বীপে প্রথম পা রেখেছি।' তবে এখানেই থেকে থাকলাম না। পরের দিন থেকে তার পাশে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে এক একটা দিন যায় আর তার হিসেব রাখতে থাকি এভাবে। আর এভাবেই তৈরী হলো আমার রোজনামচা বা দিনলিপি।

জাহাজে আমাদের একটা পোষা কুকুর ছিল, আশ্চর্য তার কথা একেবারে কেমন ভুলেই গেছলাম। জাহাজ ডুবির সময় আমরা যে যার প্রাণ বাঁচাতে যে যেভাবে পেরেছি সাঁতরে একটা নিরাপদ জায়গায় খোঁজ করেছি। সেই সময় কুকুটাও তখন যে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল আমরা কেউই তা খেয়াল করিনি। যাই হোক, সাঁতরে শেষ পর্যন্ত যে আমার দ্বীপেই এসে উঠেছে বিশ্বাসই করতে পারিনি। কুকুরটা জন্তু হলে কি হবে আমাদের সঙ্গে মানুষের মতোই মিলতো সে, এমন কি ইশারায় সে আমাদের কথাও বেশ বুঝতে পারতো। মুখের কথা খসতে না খসতেই সে আমাদের হুকুম তামিল করতে ছুটে যেতো। খুবই বিশ্বস্ত ছিল সে আমাদের। তাই হঠাৎই তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে দেখে এতো আনন্দ পেলাম যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওকে আমার তাঁবুতেই থাকতে দিলাম। আর কুকুরটাও আমার খুব ন্যাওটা হয়ে উঠলো। ও আমার তাঁবুর বাসিন্দা হয়ে গেলো।

আগেই বলেছি এখানে বছরে বেশীরভাগ সময়টাই বর্ষা, বৃষ্টি প্রায় অবিরত লেগেই আছে, তাঁবুর একটা ত্রিপলে জল ঠিক আটকায় না। তাই থাকার জায়গাটা ঝড়-বৃষ্টি সামলানোর জন্য মাথার ছাদটা আরও বেশী মজবুত করতে করলাম কি লম্বা লম্বা খুঁটি পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে মাচার মতো একটা ছাদ বানিয়ে ফেললাম। মাচাটায় ছাউনি দেবার জন্য শুকনো ডালপালা আর ঘাস এনে ছড়িয়ে দিলাম তার ওপরে। এর ফলে শুধু ঝড়-জলের হাত থেকেই রেহাই পেলাম না। সেইসঙ্গে আমার তাঁবুটা একটা ছোটখাটো দুর্গে পরিণত হয়ে গেলো। আর তাঁবু সংলগ্ন গুহাটাতো আগেই একটা মিনি দুর্গে পরিণত করে ফেলেছিলাম।

সবই তো হলো ঘর সাজানোর মতো আসবাবপত্তরের অভাবে খুবই অসুবিধায় পড়তে হলো আমাকে। বিশেষ করে একটা টেবিল আর চেয়ারের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তাই ঐসবের অভাবই বা রাখি কেন। এ কথা ভেবেই ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি নিয়ে একদিন কাজ শুরু করে দিলাম।

যে-কোনো মানুষের মধ্যে পরিশ্রমী মনোভাব, বুদ্ধি আর ধৈর্য্য থাকলে আমার মতে সে যে-কোনো কঠিন কাজ ঠিকই শিখে ফেলতে পারবে আর তার সব কাজই অতি নিখুঁত হবে। এর জন্যে অভিজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু অধ্যবসায়ের। আমার সম্বল বলতে কেবল সেটাই। আমি ছুতোর মিস্ত্রী নই, জীবনে কখনো ছেনি হাতুড়ি ধরিনি। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, যে কোনো মানুষের ধৈর্য্য থাকলে, সেইসঙ্গে সে তার দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে কেবল চেয়ার টেবিল কেন অনেক কিছুই তৈরী করে ফেলতে পারে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই, তাই এ কাজে সফলও হয়ে গেলাম অচিরেই।

এই একই পদ্ধতিতে চেয়ার টেবিল ছাড়াও কাঠের আলমারি, সেলফ্, বাক্স আর অন্য আরও টুকিটাকি কাঠের কাজ সেরে ফেললাম। প্রয়োজনীয় কাঠের অভাব ছিলো না, জাহাজ থেকে বেশ কিছু কাঠ সংগ্রহ করে এনেছিলাম, এ ছাড়াও জঙ্গলের গাছ কেটেও কোন কিছু কাঠ সংগ্রহ করে ফেললাম। সেসব কাঠ আসবাবপত্তর এবং জ্বালানি সব কাজেই লাগাতে থাকলাম অতঃপর।

।। ছয় ।।

ঃ অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হতে হলো। ঃ

অফুরন্ত সময়, আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। নেই কাজ তো খৈ ভাজ গোছের অবস্থা তখন আমার। ভাঙা জাহাজ থেকে নানান ধরনের জিনিসপত্তর সংগ্রহ করে এনেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে কি যে আছে জানি না। একদিন সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই একটা ছোট থলে আবিষ্কার করলাম। থলের মুখটা খুলে দেখি বেশ কিছু মুরগীর খাবার দানা রয়েছে। মনে হয় কোনো একসময় জাহাজে মুরগী পোষা হতো জবাই করার জন্য। আর তাদের আহারের জন্যই এই শস্যদানা জাহাজে মজুত করে রাখা হয়েছিল। এখানে মুরগীর কোনো বালাই নেই। তাই দানাগুলো এখন আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হলো। এদিকে থলেটা আমার অন্য কাজের জন্য দরকার ছিল। তাই দানাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলাম উঠোনের মাটির ওপর। খালি থলেটা এবার কাজে লাগাবার কাজে মনোযোগ দিলাম। তারপর সেই ঘটনার কথাটা একেবারে ভুলেই গেলাম।

সেই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখে আমি অবাক না হয়ে থাকতে পারলাম না। ইউরোপের বার্লি জাতীয় দশ-বারোটা সবুজ চারাগাছ আমার উঠোনের এক কোণে গজিয়ে উঠতে দেখলাম। এই দ্বীপে এই প্রথম কোনো শস্যের গাছ চারা দিয়ে উঠতে দেখে আমার সে কি আনন্দ, সাত রাজাব ধন মাণিক প্রাপ্তির মতো আবেগে আমার মনটা তখন ময়ূরের পেখম মেলে নেচে ওঠার মতো অবস্থা। এই সুখরবটা শোনানোর মতো কোনো লোক আমার ধারে-কাছে ছিল না। একমাত্র কুকুরটা ছাড়া। তবু তার কাছেই আমার উচ্ছ্বাসের কথাটা বলতে পেরে আমি তখন খুবই খুশী, সে যে আমার কথার এক বর্ণও বুঝলো না তা জেনেও আমি তখন নিজেই নিজেকে বলে উঠি, অন্তত একজনকে আমি আমার আনন্দের কথা প্রকাশ করতে পেরেছি। তাতেই আমার সুখ, তাতেই আমার শান্তি।

চারাগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালাম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে, হে ঈশ্বর, তুমি আমার এই দ্বীপটা নানান শস্যে ভরিয়ে দাও যাতে করে আমি দু'বেলা পেট ভরে আহার সমাধা করতে পারি। যদিও অন্য কোনো শস্যের চারাগাছ গজিয়ে ওঠার কথা চিন্তা করা বাতুলতা, তবু ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনার প্রেরণা একমাত্র এই বার্লির চারাগাছগুলো, কারণ আমার বিশ্বাস আমার এই ঘোর বিপদের দিনে এগুলো ঈশ্বরেরই দান, তিনি আমার অভাব-অনটনের কথা ঠিকই টের পেয়েছিলেন।

কিন্তু দিনকয়েক পরে আমাকে মত বদলাতে হলো। হঠাৎই মুরগীর দানা থলে থেকে ঝেড়ে ফেলার ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। আর সেই ঘটনাটা থেকেই আমি স্পষ্ট বুঝতে

পারলাম, এ ঈশ্বরের দান নয়। কোনো কিছু না জেনে আমি নিজেই যে বার্লির বীজ আমার উঠোনের এক কোণে বপন করেছি। কথাটা আমার একেবারেই খেয়াল হয়নি। তখন ঘোর বর্ষা। তাই অচিরেই সেই সব দানাগুলো থেকে কচি কচি বার্লির চারা গজিয়ে উঠেছে।

জুন মাসের শেষ দিকে বার্লির দানাগুলো পুরুষ্ঠ হয়ে পেকে উঠলো। সেগুলো না খেয়ে আমি বীজ হিসেবে যত্নে তুলে রাখলাম। বার্লির দানার সঙ্গে কিছু ধানের বীজও ছিল, ধানের চারাগাছগুলো বড় হয়ে উঠেছিল, যথা সময়ে গাছে ধান পেকে উঠতেই সেগুলোও ভাত রান্না না করে, বীজ হিসেবে জমিয়ে রাখলাম। আমার শস্যভাণ্ডারে পরের বর্ষায় ধানের সেই বীজগুলো আবার পুঁতে দিলাম উঠোনের মাটিতে। এর পর নতুন নতুন আরও অনেক চারা গাছের জন্ম হলো। আর এভাবেই আমার শস্যের ভাণ্ডার ক্রমে ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো।

–

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি এবং সামুদ্রিক সাইক্লোন হওয়া সত্ত্বেও তার আঁচ আমার তাঁবুকে একটুও স্পর্শ করলো না। কেমন অক্ষত অবস্থায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। তবে তাঁবুর খুঁটিগুলো মনে হলো একটু নড়ে গেছে। ঠিক আছে, ওরকম হয়েই থাকে। খুঁটির গোড়ায় মাটি আর পাথরের কুচি গুঁজে দিলাম শাবল দিয়ে ঠেসে ঠেসে। এবার খুঁটিগুলো বেশ শক্তপোক্ত হলো। শুধু তাই-নয়, তাঁবু থেকে খানিকটা দূরে আরও অনেক নতুন নতুন খুঁটি পুঁতে সেটাকে আড়াল করে খাড়াই একটা উঁচু পাঁচিল তুলে ফেললাম। এর ফলে নতুন পাঁচিলের ওপার থেকে দেখে বোঝবার উপায়ই রইলো না। এপারে আমার থাকার একটা আস্তানা আছে। আমার মতো কেউ যদি দ্বীপে আনতে বাধ্য হয় তাহলে এখানে এসে সে আমার বাসস্থানটা খুঁজেই পাবে না। এক দিক দিয়ে আগের চেয়ে এখন আমি অনেক বেশী নিরাপদ হয়ে গেলাম।

আমার এই কর্মযজ্ঞের কথা কি কেউ কখনও জানতেও পারবে না? ধরা যাক পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে কোনো পর্যটক কিংবা কেউ যদি আবিষ্কারের নেশায় আমার মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এই দ্বীপটা দেখতে আসে। সে আমার পরিত্যক্ত তাঁবুগুলোই দেখতে পাবে, কিন্তু এর নির্মাতা কে, আর কি ভয়ঙ্কর দুর্যোগের পরিস্থিতিতে আমি আমার এই আস্তানাটি গড়ে তুলেছি, তার কথা সে জানতে পারবে না, এমনকি পরবর্তীকালে আরও যারা আসবে তাদের কাছেও আমি একেবারেই অজানা থেকে যাবো। এসব কথা মনে হতেই মোটামুটি এই সময় থেকেই আমি আমার দিনলিপি লিখতে শুরু করে দিই। এখানে কয়েকদিনের দিনলিপি তুলে ধরলাম ঃ

৩০শে এপ্রিল ঃ

জাহাজ থেকে সংগ্রহ করা বিস্কুটের মজুত একটু একটু করে ফুরিয়ে আসছে। তাই এখন আমাকে খুব হিসেব করে বিস্কুট খেতে হচ্ছে। দিনে মাত্র একটা। তবে খরগোস আর ছাগলের মাংসের কোনো ঘাটতি নেই, ঘাটতি নেই চালেরও।

১লা মে ঃ

প্রাতঃভ্রমণ আমার বরাবরের অভ্যাস, দ্বীপে এসেও তার ব্যতিক্রম হলো না। আজ ভোরবেলা সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়াতেই আমাদের যে ভাঙা জাহাজটা সমুদ্রের জলে ডুবে গেছিলো হঠাৎ সেটার দু'একটা টুকরো জলে ভেসে উঠতে দেখলাম। ভাবলাম, কয়েকদিন আগে যে সামুদ্রিক ঝড়

উঠেছিল, সেই সঙ্গে জোয়ারের টানেই হয়তো জাহাজের কিছু ভাঙা অংশ সমুদ্রতীরে ফিরে এসেছে। দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দেখলাম, অদূরে ভাঁটার দরুণ ভাঙা জাহাজটাও কেমন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমুদ্রতীর থেকে সেটা খুব বেশী দূরে ছিল না। তাই ভাঁটার সময় বলতে গেলে একরকম পায়ে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম জাহাজটার কাছে। সেখানে গিয়ে দেখি জাহাজটা বালিতে ভর্তি হয়ে রয়েছে। তা হোক, ঠিক করলাম জাহাজের যতোটুকু অংশ খুলতে পারি সবটুকুই একটু একটু করে তীরে নিয়ে যাবো, তারপর সেখান থেকে আমার আস্তানার উঠোনে নিয়ে গিয়ে তুলবো। কে জানে কখন কোন্ টুকরোটা কাজে গেলে যায়।

৪ঠা মে ঃ

ছেলেবেলা থেকে আমার মাছ ধরা একটা দারুণ সখ। নদী বা পুকুরে ছিপ ফেলে, আবার কখনও বা মাছ ধরা ছোট একটা জাল ফেলে মাছ ধরতাম, তাতে কি যে আনন্দ ছিলে বলে বোঝানো যাবে না। এখানে এসেও মাছ ধরি। আজও মাছ ধরতে সমুদ্রতীরে গেছলাম। কিন্তু আজ আমার দুর্ভাগ্য, খাওয়ার মতো একটা মাছও পেলাম না। ব্যর্থ হয়ে চলে আসছি, সেই সময় একটা বাচ্চা ডলফিন ধরা পড়লো আমার জালে। পরে অবশ্য রোজই কিছু না কিছু মাছ ধরা পড়তে থাকলো আমার জালে যা একদিনে খেয়ে শেষ করা যায় না। তাই বাড়তি মাছগুলো সমুদ্রতীরে শুকনো রৌদ্রতপ্ত বালিতে শুকিয়ে মজুত করে রাখতে থাকলাম। অসময়ে, যেদিন কোনো মাছ ধরা পড়বে না সেদিন শুকনো মাছ খাওয়া যাবে।

১০ই মে থেকে ২০শে মে ঃ

এ কয়েকদিন ভাঁটার সময় ভাঙা জাহাজে গেছি। নাট-বল্টু, লোহার রড, কাঠের তক্তা, পেরেক বা স্ক্রু যা পেয়েছি সবই সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।

২৪শে মে ঃ

মাঝে কিছুদিন বিশ্রামের পর আজ আবার শাবল, কোদাল আর হাতুড়ি নিয়ে গিয়ে ভাঙা জাহাজের পিছনে অনেক পরিশ্রম করলাম। জাহাজের বিধ্বস্ত স্তূপ ঘেঁটে এমন কতকগুলো জিনিস সংগ্রহ করে এনেছি যা দিয়ে চেষ্টা করলেই আমি অনায়াসে একটা ছোটখাটো নৌকো তৈরী করে ফেলতে পারি। এই ভাবনাটা আমি আমার মাথায় গেঁথে রাখলাম। পরে অবসর সময়ে এই পরিকল্পনা কাজে লাগাবো।

১৬ই জুন ঃ

আজ মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রতীরে একটা বিরাট কচ্ছপ ধরেছি। কচ্ছপের মাংস আমার খুবই প্রিয়। এতদিন দ্বীপে এসেছি, কিন্তু এর আগে কখনও কচ্ছপের সন্ধান পাইনি, তাই আজ একটা কচ্ছপ পেতেই খুব আনন্দ হলো, আজকের ভোজটা ভালোই হবে। দ্বীপের অন্যদিকে এরকম কচ্ছপ যে প্রচুর আছে সেটা পরে জানতে পারি, তারপর থেকে যখনই কচ্ছপ খাওয়ার বাসনা জেগেছে, সেদিন চলে গেছি। প্রথম কচ্ছপের মাংস রান্না করতে প্রায় সারাটা দিন লেগে গেলো। এমন সুস্বাদু মাংস দেশ ছেড়ে আসার পর অনেক দিন খাইনি। মন ও পেট দুই-ই ভরে গেলো আনন্দ ও তৃপ্তিতে।

১৮ই ও ১৯শে জুন ঃ

এই দু'দিন ধরে একটানা বৃষ্টি, আকাশ ফুটো করে বৃষ্টি যেন অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছিল। তাই

এই বৃষ্টিতে তাঁবুর বাইরে কোথাও বেরোতে পারিনি। এদিকে শরীরটাও খুব খারাপ। জ্বর হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রবল কাঁপুনি। মনে হচ্ছে আমি বোধহয় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি। দ্বীপের মশাগুলো ঢেউ-পিঁপড়ের মতো বিরাট বিরাট। আমার অজান্তে যখন ঘুরছিলাম সেই সব মশাগুলো হয়তো আমার গায়ে কামড় বসিয়ে থাকবে। তাই এই ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা আর কি?

২৩শে জুন ঃ

আগের চেয়ে শরীর আমার এখন অনেকটা সুস্থ। কোনো রকমে একবার বাইরে বেরিয়ে অনেক কষ্টে একটা ছাগল শিকার করে এনেছি। ছাগলের ছাল ছাড়াতে গিয়ে শরীরের ওপর অনেক ধকল গেছে, সবে জ্বর থেকে সেরে উঠেছি, তার ওপর এই ধকল, কে জানে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বো কিনা। এই ব্যাপারে একমাত্র দয়াময় ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আর কিই বা আমি করতে পারি। কারণ এই মনুষ্যবর্জিত দ্বীপে ডাক্তারই বা পাবো কি করে। তবে এই পরিশ্রমের সুফল আমি হাতে হাতে পেয়ে গেছি, আগুনে পোড়ানো কয়েক টুকরো ছাগলের মাংস খেয়ে শরীরটা আমার এখন খুব ঝরঝরে বলে মনে হচ্ছে। এখন দুচারদিন শিকারে আর যাবো না। যত্ন করে ছাগলটার বেশীর ভাগ মাংস চটের থলেতে পুরে রেখেছি। ওই দিয়েই কয়েকদিন চালিয়ে দিতে পারবো।

২৮শে জুন ঃ

জ্বর আমাকে ছেড়ে গেছে বটে কিন্তু শরীরটাকে খুবই দুর্বল করে গেছে। ভালো করে মাথা তুলতে পারি না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না, জোরে জোরে পা ফেলে চলতেও পারি না। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেলো যা এই নির্জন দ্বীপে খুব কাজে লাগতে পারে। হ্যাঁ যা বলছিলাম, ব্রাজিলের লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে, সে অসুখ যাই হোক না কেন, গরীব দেশ, সেখানকার লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে ওযুধপত্তর না খেয়ে কিংবা ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে শুধুই তামাক পাতা খেয়ে তাদের যেকোনো রকমের অসুখ সারিয়ে ফেলে। তবে তামাক পাতা খেয়ে আমার এ অসুখ কি করে সারবে কিংবা আদৌ সারবে কিনা জানি না। তবু ব্রাজিলীয়দের বিশ্বাস মতো আমিও প্রথমে একটা তামাক পাতা মুখে পুরে চিবোতে শুরু করে দিলাম। আশ্চর্য, একটু পরেই অনুভব করলাম মাথাটা কেমন যেন হাল্কা লাগছে। আমি যে এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি। তামাক পাতার এমন অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখে আমি এখন দারুণ অনুপ্রাণিত শুধু নয়, প্রভাবিতও বলা যায়। আর সেই প্রভাবেই অনেকটা তামাক পাতা জলে ভিজিয়ে রাখলাম বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে। এর ফলে তামাক পাতার রস মিশে গেলো জলের সঙ্গে অনেকটা আর সেই জল আমি ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেললাম। আর সেই ভিজে তামাকপাতাগুলো আগুনে পুড়িয়ে তার তীব্র ঝাঁঝ নাকে ঠেকিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। এতে শরীরে যেন খানিকটা বল পেলাম, সব না হলেও আগের শক্তি খানিকটা ফিরে পেলাম।

২৯শে জুন ঃ

ব্রাজিলবাসী আর তাদের রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিকে ধন্যবাদ। অজানা, অচেনা জায়গায় তাদের এই কবিরাজি চিকিৎসাপদ্ধতি আমার কতো যে উপকার করলো তা বোধহয় এক কথায় বোঝানো যাবে না। এই পদ্ধতি একদিক দিয়ে গরীব মানুষের কাছে ধন্বন্তরি ওযুধ বললে বোধহয় একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। যদি কোনোদিন দেশে ফিরে যাই তাহলে আমি দেশের গরীব মানুষজনকে এই রকম চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করার উপদেশই দেবো।

৩০শে জুন ঃ

আজ সকাল হতে না হতেই আমার মেজাজটা অত্যন্ত খুশ মনে হলো। অনেকদিন পরে সকালটা আমার খুব ভালো লাগলো। এর কারণ আজ আমি পুপোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি। আজ আমি আগের সেই উজ্জীবিত মেজাজটা ফিরে পেয়েছি, কাজে উৎসাহ পাচ্ছি। অনেকদিন পরে আবার শিকারে বেরিয়েছি। আজ আমার শিকারের তালিকায় একটা ছোট বুনো হাঁস আর দুটো সামুদ্রিক পাখি। তাতেই আমি খুশী। অনেকদিন পরে গরম গরম মাংস খেতে পাবো। সত্যি রাতে শুতে যাবার সময় মনে হলো, আজ রাতের নৈশভোজটা দারুণ জমেছিল।

১লা জুলাই ঃ

তামাক পাতার মজুত যা আছে তা বেশ কয়েক বছর কেটে যাবে। তবু এই দ্বীপে তামাক পাতার সন্ধান করতে হবে। কারণ এখানে কতো বছর আমাকে থাকতে হবে কে জানে। হয়তো বুড়ো বয়স পর্যন্ত এখানেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। আর বুড়ো বয়সেই রোগের প্রকোপটা বাড়ে। তাই তামাক পাতা ফুরিয়ে যাবার আগেই নতুন পাতার খোঁজ করতেই হবে।

২রা জুলাই ঃ

তামাক পাতা ভেজানো জল আবার খেয়েছি, আর তামাক পাতা পুড়িয়ে তার ঝাঁঝ নাকেও নিয়েছি। জ্বর ছিল না, তবু এই কবিরাজি পদ্ধতি গ্রহণ করলাম এই কারণে যে, সাবধানের মার নেই। এখন আমি একেবারে নিশ্চিত আমাকে ফিরে আবার জ্বরে আর পড়তে হবে না। সেরকম কোনো লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি না। এখনও যেটুকু শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে, আশা করি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সেটাও উধাও হয়ে যাবে। আর আগের মতো শরীরে সব শক্তি ফিরে পাবো।

।। পাঁচ ।।

ঃ দ্বীপে আমার থাকার বছরপূর্তি ঃ

কতো তাড়াতাড়িই না ৩৬৫ দিন কিংবা বারোটা মাস কেটে গেলো এই দ্বীপে আসার পর থেকে। এই নির্জন দ্বীপে আমার একা থাকার গোটা একটা বছর পূর্ণ হয়ে গেলো। এই বছর পূর্তির কোনো আয়োজন নেই, নেই কোনো উৎসব। কেই বা করবে? এই নির্বান্ধব দ্বীপে আমার আপনজন বলতে কে আছে? যারা আছে, আমি তো স্বেচ্ছায় তাদের ত্যাগ করে এসেছি, বাবার সব নিষেধ অমান্য করে কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। একা থাকার এই জ্বালা। তবে তার জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ বেদনা নেই, কারণ এ তো আমার স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেওয়া। এখন আমার একমাত্র সঙ্গী ওই কুকুরটা। বছর পূর্তির ভোর হতে না হতেই সে আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ে সমুদ্রের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বোধহয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। হয়তো সে বলতে চাইছে, অনেকদিন তো হলো এই দ্বীপে থাকা, এবার দেশে ফিরে চলো। অবলা জীব, কথা বলতে না পারলেও হাবভাবে সে তার মনের কথাই বোঝাতে চাইছে আমাকে। ওর মতো মন কি আমারও চায় না দেশে ফিরে যেতে? কিন্তু সব দেখেশুনে কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, বোধহয় এ জীবনে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই, সে আশা আমি ত্যাগ করেছি অনেক আগেই। তাই এই দ্বীপেই যখন জীবনটা আমাকে কাটিয়ে দিতেই

হবে তখন একই জায়গায় বন্দী না হয়ে থেকে এখানকার অন্য সব অজানা জায়গাগুলো আবিষ্কার করার কাজে মনোনিবেশ করলাম অতঃপর।

একদিন সকালে যে ভেলাটা আমি নিজের হাতে তৈরী করেছিলাম তাতে চড়ে দ্বীপে প্রথম যেদিকটায় পা রেখেছিলাম, সেদিকের খাঁড়ি ধরে এগিয়ে যেতে থাকলাম। মাইল দুয়েক যাওয়ার পরেই সেই অশান্ত ঢেউ-এর তেজ ক্রমশ শান্ত হতে হতে এক সময় একেবারে মিলিয়ে গেলো। মনে হলো আমি যেন তখন ছোট্ট একটা নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছি। নদীর স্রোত খুবই সামান্য, তবে বড্ড বেশী চঞ্চলা, জায়গায় জায়গায় বড় বেশী বেহিসেবী বাঁক নিয়েছে। নদীর দু'পারে সুবিস্তির্ণ মাঠ, যতদূর দেখা যায়, মনে হয় সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে সারা মাঠ জুড়ে। আর সেই মাঠ গিয়ে মিশেছে ঘন তরুবীথিতে ঢাকা এক অরণ্যে।

এই প্রথম আমার সবুজ ঘাসের মাঠ, অরণ্য আবিষ্কার। সেই আবিষ্কারের আনন্দে আমি তখন যেন আত্মহারা। সেই অরণ্যে আমার জন্য যেন আরও চমক অপেক্ষা করছিল। ভেবেছিলাম বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি জঙ্গল। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করে অনেক রকমের ফলের গাছের সন্ধান পেলাম। এখানে না এলে এই সব ফল অবশ্যই অধরা থেকে যেতো আমার কাছে। সবুজ মাটিতে ফলে আছে তরমুজ, আর গাছে গাছে থোকা থোকা আঙুর ঝুলে থাকতে দেখলাম। আঙুরফল টক বলবো না। কারণ গাছগুলো বেশ নিচুই ছিল, তাই হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো আঙুরের থোকাগুলো কেমন ধরা দিলো আমার হাতে। একটা তরমুজ আর কিছু আঙুর নিয়ে সেখানে বসেই ফলাহার সারলাম. অরণ্যে রোদন করতে হলো না আমাকে। ভোজন তো সারলাম, সঙ্গে করে কিছু আঙুরও নিয়ে গেলাম রোদে শুকিয়ে কিসমিস করে রেখে দেওয়ার জন্য। অসময়ে তাঁবুতে বসে সেগুলো খাওয়া যাবে।

সারা অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। অন্ধকারে ভেলায় চড়ে ফিরে যাওয়াটা নিরাপদ বলে মনে করলাম না। তাই রাতটা ওই ফলের বাগানেই কাটিয়ে দিলাম। এই দ্বীপে এসে তাঁবুর বাইরে এই প্রথম আমার রাত্রিবাস। তবে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হলো না।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলো পাখিদের কলকাকলিতে। নাম না জানা কতরকম পাখির ডাক, মিষ্টিমধুর গানের মতো। তবে সারা রাত ধরে একটা জানোয়ারেরও ডাক বা গর্জন শুনতে পাইনি। তাই এ অরণ্যে নিরুপোদ্রবে রাত কাটানো যায়। জায়গাটা আমার এতো ভালো লেগে গেলো যে, সেখানে প্রায় রোজই যেতে শুরু করলাম। একদিন যেতে না পারলে দিনটা কেমন যেন সাদামাটা বলে মনে হতো। তাই সেখানে একটা মনোরম পরিবেশে থাকার উপযোগী একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রথমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চারদিকে শক্ত করে বাঁশের বেড়া দিয়ে ফেললাম। বাঁশের অভাব ছিল না, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করলাম। পরে একটু একটু করে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরও বানিয়ে ফেললাম। কুঁড়েঘরের চারপাশে সুন্দর একটা বাগানও করে ফেলাম, নানান ধরনের ফল ও ফুলের গাছ লাগালাম। যার মধ্যে আঙুর, আপেল, বেদানা আর ন্যাশপাতি ছিল। সব মিলিয়ে সেটা হয়ে উঠলো আমার একটা আদর্শ বাগানবাড়ি। আমার মূল আস্তানা ছেড়ে প্রায়ই এই বাগানবাড়িতে এসে দু'তিনদিন কাটিয়ে যেতে থাকলাম আমি।

যথারীতি আবার বর্ষা আসার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো ঝোড়ো বাতাসে। তারপর ১৬ই আগস্টে হঠাৎ শুরু হয়ে গেলো বর্ষার মরশুম। বর্ষা এবার দীর্ঘায়ত হলো। প্রায় টানা তিন মাস ধরে চললো,

থামলো অক্টোবরের শেষাশেষি। যখন একটানা বৃষ্টি হতো তখন কার্যত আমাকে বন্দী করে রাখতো তাঁবুর ভেতরে। আমি অবশ্য তখন একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতাম না। ছেনি হাতুড়ি, কোদাল-শাবল নিয়ে দিনে দু'তিনঘণ্টা করে পিছনের গুহাটা বড় করে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছি। খনন কাজ চালাতে গিয়ে একদিন গুহার একটা নতুন মুখ তৈরী হয়ে গেলো পাহাড়ের উল্টো দিকের গায়ে। আমার তাঁবুর বেড়ার বাইরে। এই নতুন মুখটা আমি আমার খিড়কি দরজা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলাম। একবার আশঙ্কা হলো, হয়তো এই খিড়কির দরজা দিয়ে কোনো জন্তু-জানোয়ার গুহায় ঢুকে পড়তে পারে। তবে গত এক বছরেরও বেশী সময় ধরে তো এখানে থাকলাম, কই কোনেদিন একটা কোনো জানোয়ার গুহায় বা তাঁবুতে হানা দিতে তো আসেনি। তাই সেরকম ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই বলেই আমার মনে হলো। আমার নিজের চোখে দেখা এখানে বড়গোছের প্রাণী বলতে ওই ছাগল ছাড়া অন্য কোনো পশু নেই।

এই দ্বীপে আমার প্রথম আগমনের বর্ষপূর্তি অনেক আগে হলেও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি ৩০শে সেপ্টেম্বর, সেই দিনটা ছিলো বড় দুঃখের। প্রথম প্রথম সেই সব দুঃখের দিনগুলো পেরিয়ে আজ আমার সুখের দিন। স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রথম বার্ষিকী। আমার সঙ্গে কোনো ক্যালেণ্ডার ছিল না, তবুও তা সত্ত্বেও এক বছর পূর্ণ হলো কি করে জানলাম তার ব্যাখ্যা করছি। কাঠের খুঁটির গায়ে ছুরির আঁচড়গুলো গুণে দেখলাম, তিনশো পয়ষট্টিটা আঁচড় অর্থাৎ পুরো একটা বছর পার হয়ে গেছে এই দ্বীপে আমি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছি। আমার ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী আজ আমি মহান পিতা ঈশ্বরের স্মরণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করলাম। সন্ধ্যায় একটা বিস্কুট আর একথোকা আঙুর খেয়ে শয্যা নেবার ব্যবস্থা করলাম। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।



এর পর আরও ছ'মাস কেটে গেলো। বর্ষা বিদায় নিয়ে শীতের মরসুম শুরু হয়েছিল, সেও প্রায় শেষ হতে চলেছে। বসন্তের আগাম বার্তা শোনা যাচ্ছে বাতাসে। বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা এখন আর নেই, নেই হাড় কাঁপানো সেই ঠাণ্ডা। প্রতিটি মানুষের কাছে এই বসন্ত ঋতু সব চেয়ে বেশী প্রিয়। বসন্তে খুশী মতো বেড়ানো যায়। আর আমিও তো তাই চাই। আগেই বলেছি, গোটা দ্বীপটা ঘুরে দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়। তাই বসন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদিন একটা বন্দুক, আর একটা কুড়ুল আর আমার সাথী কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে ভেলায় চেপে বসলাম। আমার এখন গন্তব্য স্থল হলো আমার বাগানবাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে একটা উঁচু টিলার উঠে দাঁড়াতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো পশ্চিমের সমুদ্র। বসন্তের আকাশ খুবই স্বচ্ছ, পরিষ্কার মাথার ওপর দীপ্তিমান সূর্য, ঝলমলে রোদ্দুর চারদিকে ছড়িয়ে থাকার দরুণ দূরে একটা ডাঙা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওই ডাঙাটা কোনো মহাদেশ, নাকি কোনো দ্বীপের ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এতো দূর থেকে। তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে, জায়গাটা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশ হবে। কিন্তু এ সবই অনুমান মাত্র। অথচ সঠিক ভাবে জায়গাটা চিহ্নিত করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। এ আমার দুর্ভাগ্য। নিজের এই অক্ষমতা আর দুর্ভাগ্যের জন্য আরও একবার ব্যর্থ হয়ে পথ চলতে শুরু করলাম। পথ চলাতেই আমার আনন্দ, আমার সুখ, আমার শান্তি, সব কিছুই।

দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় প্রকৃতি যেন তার সমস্ত রূপ আর সৌন্দর্য-অকৃপণ হাতে উজাড় করে দিয়েছে, যার কোনো তুলনাই হয় না। সবুজ মাঠ-প্রান্তর, চাষ করলে ফলতো সোনা। নানান ফলের গাছে ছেয়ে যাওয়া বাগান এবং অসংখ্য রঙ-বাহার ফুলের গাছগুলো দেখে আমার চোখ যেন সার্থক হলো। নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে আমি ভয়ঙ্কর তৃপ্ত হলাম। অনেকক্ষণ সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না।

আমাকে তখন আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে বসেছিল যেন। সেখান থেকে চলে অন্য একটা জায়গায় চলে এলাম। সেখানকার গাছে অনেকগুলো তোতাপাখি দেখতে পেলাম। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির পর কোনো রকমে একটা তোতাপাখি ধরতে সক্ষম হলাম। সেটা আমার পুরনো আস্তানা তাঁবুতে নিয়ে এলাম পোষ মানানোর জন্য। পাখিটার নাম দিলাম 'পোল'। পোলের মুখে বুলি ফোটাতে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে বেশ কয়েকবছর সময় লেগেছিল আমার। তবে একটা মজার ব্যাপার হলো এই যে, মাত্র একবারই ওকে আমার নাম বলেছিলাম, সেটা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নিয়ে পরে ও আমারই নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিলো। এই মজাটা আমি বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলাম। এর পর তোতাপাখিটার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেলো। তবে আমার সাথী কুকুরটার ওপর বেজায় খাপ্পা ছিল পাখিটা। কারণ বেশ কয়েকবার কুকুরটা তার খাঁচার ওপর থাবা মেরে তাকে আঘাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে আমার নজরে পড়তেই তাকে বেধড়ক পিটিয়ে ছিলাম। আর কুকুরটা তখন 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে ডাকতে উধাও হয়ে গেছলো আমার চোখের সামনে থেকে। তোতাপাখিটা তার চিৎকারটা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে নিয়েছিল। এর পর থেকে কুকুরটাকে দেখলেই ও ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠতো। অবিকল কুকুরের মতো সেই ডাক। সেই ডাক শুনে কুকুরটাতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে যেতো। কান খাড়া করে তোতাপাখির কুকুরের সেই নকল ডাকটা শুনতো আর হয়তো ভাবতো। এই দ্বীপে সেই তো একমাত্র কুকুর। কিন্তু দ্বিতীয় কুকুরটা এলো কোথ্ থেকে? এ সবই আমি লক্ষ্য করেছি। তোতাপাখি আর কুকুরের এই ব্যাপারটা মনে করলে আজও আমার হাসি পায়।



অজানাকে জানতে হবে, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে, এই রকম নেশায় আমি দ্বীপের এক একটা দিকে যেতে থাকলাম। আর এভাবেই একদিন একটা দিকের সমুদ্রের তীরে অসংখ্য কচ্ছপ দেখতে পেলাম। কিন্তু দ্বীপের অপর দিকে গত দেড় বছরে মাত্র তিনটি কচ্ছপ সংগ্রহ করতে পেরেছি। আরও কিছু বিচিত্র দৃশ্য আমার চোখে পড়লো যার মধ্যে কিছু দেখা আর কিছু অদেখাও বটে। যেমন সেখানে প্রচুর পাখি দেখেছি, তাদের মধ্যে একমাত্র পেঙ্গুইন ছাড়া আর কোনো পাখি আমি এর আগে কখনও দেখিনি, আর তাদের নামও জানি না। তবে পরে সেই সব অজানা পাখির মাংস খেয়ে দেখেছি খুবই সুস্বাদু।

নিজের খুশী মতো বেশী করে পাখি শিকার করার সুযোগ পেয়েও করলাম না, কারণ কার্তুজ আর বারুদের মজুত হিসেব করে খরচ করতে হবে। আবেগে বেহিসেবী হলে চলবে না। তাছাড়া পাখির চেয়ে একটা ছাগল মারতে পারলে আমার অনেক লাভ, অনেক মাংস সংগ্রহ করা যেতে পারে।

॥ ছয় ॥

ঃ আমি এক কারিগর ঃ

আমার আস্তানায় ফেরার সময় কুকুরটা হঠাৎ একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলো, দৌড়ে ছুটে গিয়ে একটা ছাগলছানা ধরে ফেললো। ছাগলছানাটার গায়ে কামড় দেবার আগেই ছুটে গিয়ে আমি তাকে কুকুরটার হাত থেকে রক্ষা করে তাঁবুতে নিয়ে এলাম, জবাই করার জন্য নয়, আমার ইচ্ছে ছিল ছাগলের চাষ করা। আর ছাগলছানাটাও আমার খুবই প্রিয় হয়ে উঠলো। সব সময় আমার পাশে পাশেই থাকতো, ডাকলে মানুষের মতো সাড়া দিতো, আমার অনুগত বন্ধুর মতো হয়ে গেছিলো। নাই বা সে কথা বলতে পারুক। মনের মতো একজন সাথী পেয়ে আমি খুব খুশী। আমার খুশীর পালে এখন অনেক সুখের হাওয়া বইছে।



আরও একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেলো। তৃতীয় বছর বর্ষায় ধান আর বার্লির চাষ করলাম। এবার অনেকটা সমতল জায়গা খুঁজে নিয়ে ধান ও বার্লির বীজ বপন করলাম। বীজ তো পুঁতলাম, কিন্তু শস্য যখন ফলবে সেসবের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা তো করা দরকার। হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও করলাম, বার্লি আর ধান ক্ষেতের চারধারে ঝোপঝাড়ের বেড়া লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত।

দ্বীপে বেশীরভাগ সময়টাই বর্ষাকাল। তাই বৃষ্টির সময় বাইরে বেরোনো মুশকিল হয়ে পড়লো। অথচ তাঁবুতে কর্মহীন জীবনযাপন করতেও ভালো লাগে না আমার। তাই তাঁবুর ভেতরেই নানান ধরনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার তোতা- পাখির সঙ্গে কথা বলতাম। ও এখন আমার বেশ পোষ মেনে গেছে। ওকে কথা বলানো শেখাতাম। নিজের ব্যাপারে ও খুবই সচেতন, তার প্রমাণ পেলাম ওর নিজের নামটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে যেতে দেখে। আমাকে দেখলেই চিৎকার করে বলতে থাকে, পোল....... পোল......'। শিশুর মতো ওর সেই কথা বলতে শেখাটা আমার খুবই ভালো লাগতো। দ্বীপে আমার প্রায় তিনবছর পরে এই প্রথম নিজের কথা ছাড়া অন্য কারোর কথা আমি শুনতে পেলাম। এতে আমার কম আনন্দ?

রান্না করার জন্য কিছু পাত্রর দরকার, ধাতব পাত্র পাওয়া বা তৈরী করার উপায় তো এখানে নেই, তাই অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম মাটির বাসন-কোসন তৈরী করলে কেমন হয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেগুলো তৈরীই বা করবো কি করে?

দ্বীপের গরম আবহাওয়া দেখে মাথায় আমার একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। আচ্ছা, মাটির বাসন তৈরী করে সেগুলো রোদে শুকিয়ে নিলে হয়তো পোড়ামাটির মতোই পাকাপোক্ত হয়ে উঠবে। এখন দরকার বাসন তৈরী করার জন্য উপযুক্ত মাটি। দু'মাস ধরে দ্বীপের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে পছন্দ মতো মাটির সন্ধান পেয়ে গেলাম। সেই মাটি দিয়ে অনেক কষ্টে দুটো বিশাল আকারের পাত্র বানালাম, অনেকটা ধোপাদের কাপড় কাচার গামলার মতো দেখতে। এছাড়াও আরও কিছু ছোট ছোট কয়েকটা বাসনও তৈরী করে ফেললাম। কিন্তু মুশকিল হলো কি এই মাটির

বাসনগুলো আগুনের তাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না, আবার জল পড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসন হলে গিয়ে মাটিতে পরিণত হয়ে যেতো।

একদিন মাংস রান্না করার পর আগুন নেভাতে গিয়ে দেখি সেই বাসনের ভাঙা টুকরো আগুনের মধ্যে পড়ে আছে। সেটা ইঁটের মতো লাল আর পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। এর থেকেই আমি মাটির বাসন কি করে পাকাপোক্ত করতে হয় তার একটা হদিশ পেয়ে গেলাম।

এর পর আমার কাজ হলো এই নতুন পথের হদিশটাকে কাজে লাগানো। সেই মতো জঙ্গল থেকে অনেক শুকনো কাঠ, গাছের ডালপালা, পাতা যোগাড় করে ছোট-খাটো একটা ভাটিখানা তৈরী করে ফেললাম। তার মধ্যে ছোটবড় বেশ কয়েকটা মাটির বাসন রেখে তাতে আগুন জ্বেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে ফল পেয়ে গেলাম। পোড়ামাটির বাসনগুলো কতোই না টেঁকসই হয়ে গেলো।

পরে এই বাসনগুলো আগুনে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখলাম কেমন অনায়াসেই তাপ সহ্য করতে পারছে, আর জল লেগে মাটির মতো গলেও যাচ্ছে না। আমার পরীক্ষানিরীক্ষা সফল হতে আমার খুব আনন্দ হলো। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য পোড়ামাটির একটা গামলাজাতীয় পাত্রে মাংস সিদ্ধ করে আগুনের ওপর বসিয়ে দিলাম। এই প্রথম ভালো সিদ্ধ মাংসের ঝোল খেয়ে আমি তৃপ্তি লাভ করলাম।

বর্ষা শেষে মাঠ থেকে ফসল তোলার পর দেখলাম আমার শস্যের ভাণ্ডার বছরে বছরে অনেক বেড়ে গেছে। এখন আর কৃপণের মতো হিসেব করে চলতে হবে না। যতো খুশী খরচ করা যেতে পারে যা কিনা দু'তিন বছরেও ফুরোবে না আর পরবর্তী সেই দু'তিন বছরে আবার নতুন ফসল আমার শস্য ভাণ্ডারে মজুত করতে পারবো।

এদিকে জাহাজ থেকে সংগ্রহ করা বিস্কুটের মজুত অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এর পর ঠিক করলাম বর্ষার সময় বছরে মাত্র একবারই এমনভাবে চাষ করবো যাতে আমার সারা বছরের অন্নের সংস্থান হয়ে যায়।



খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হলেও পোশাক-আশাকের সমস্যাটা আগের মতো সেই একই রয়ে গেলো। এদিকে সামান্য যে কটা পোশাক ছিল, সেগুলো প্রায় সবই ছিঁড়ে এসেছে। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য দর্জির কাজ শুরু করে দিলাম। নতুন পোশাক যে বানাবো তার রসদ পাই কোথায়? হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেলো। জন্তু-জানোয়ারদের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে রোদে ভালো করে শুকিয়ে নিলাম। আর সেই চামড়া দিয়ে প্রথমে একটা বেশ বড়গোছের একটা টুপি বানালাম। চামড়ার লোমগুলো টুপির বাইরে থাকার দরুণ বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই একই পদ্ধতিতে আস্তে আস্তে অনেক পরিশ্রম আর চেষ্টা করে শার্ট ও প্যান্ট তৈরী করে ফেললাম।

পোশাকের সমস্যাটা সমাধান করার পর এবার জন্তু-জানোয়ারের চামড়া দিয়ে একটা ছাতা

তৈরী করে ফেললাম। ব্রাজিলের লোকদের গ্রীষ্মকালে এই রকম ছাতা ব্যবহার করতে দেখেছি। প্রথমে দুটো ছাতা তৈরী করলাম, কিন্তু আমার পছন্দসই হয়নি। তবে তৃতীয় ছাতাটা এক রকম পছন্দ হয়ে গেলো আমার। আগেই বলেছি, দ্বীপে বছরে বেশীরভাগ সময়ই বৃষ্টির দাপট চলে থাকে। তাই এই ছাতা আবিষ্কার করার ফলে রোদ-বৃষ্টির জলে চলাফেরার কষ্ট আমি একেবারেই ভুলে গেলাম।

আমার দুঃখের দিন অবসানের পর এবার সুখের দিনগুলো বেশ আরামেই কাটতে থাকে। এখন আমার মনের কোনো অসুখ নেই। এখন এই মুহূর্তে ভালো মন্দ সব কিছুর জন্যেই আমি প্রস্তুত। ভালো হলে আনন্দ তো করবো, কিন্তু তাই বলে মন্দ হলে যে দুঃখ পাবো তা একেবারেই নয়, মনকে আমি সেরকম ভাবে তৈরীই করিনি। আমার এই ছোট্ট জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, তাই নতুন করে দুঃখ ভোলার দুঃখকে আমি এখন বেশ হাসিমুখেই বরণ করে নিতে পারি।

এর পরের কয়েকটা বছর আমার সহজসরল জীবন বেশ নিশ্চিন্তেই কেটে গেলো। তেমন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি আমাকে। আর এরই ফাঁকে আমি কুমোরের চাকা একটা বানিয়ে তাতে সুন্দর সুন্দর মাটির বাসনপত্তর তৈরী করে নিয়েছি। সেগুলো আমার একার সংসারে বেশ কাজ দিচ্ছে।

ওদিকে উঠোনে আমার পোষা ছাগলটা ক্রমশ বেশ বড় হয়ে উঠেছে, চেহারাও বেশ ডাগরডোগর হয়ে উঠেছে। মাংস খাওয়ার লোভ করে ওকে জবাই করতে আমার মন কখনও চায়নি। ও যেন আমার সংসারেরই একজন হয়ে গেছে, ছেলে-মেয়ের মতো। তাই নিজের হাতে কেউ কি নিজের সন্তানকে হত্যা করে? যাই হোক, অনেক বয়সে একদিন ওর স্বাভাবিক মৃত্যুই ঘটলো। ওর মৃত্যুতে আমি বেশ কয়েকদিন শোকাচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। ওর সঙ্গী কুকুরটা যে একদিন ওর বাচ্চাবেলায় ওর গায়ে থাবা বসাতে গেছলো, সেও কেমন মনমরা হয়ে পড়ে রইলো বেশ কয়েকদিন। বোঝা গেল, কুকুরেরও বোধশক্তি আছে, সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা আছে।

দ্বীপে এসেছি আজ এগারো বছর হলো। এই দীর্ঘ এগারো বছরে আমার খাদ্যের সন্ধানে অনেক শিকার করতে হয়েছে, তার জন্য অনেকগুলো বারুদ খরচ হয়ে গেছে। এর ফলে গুলি ও বারুদের মজুত ফুরিয়ে এলো। তাই এ সবের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে নতুন পথ হিসেবে ফাঁদ পেতে ছাগলদের বোকা বানিয়ে তাদের ধরা শুরু করলাম। এমনিতেই একটা প্রবাদ আছে। প্রাণীদের মধ্যে সব চেয়ে বোকা হচ্ছে ছাগ। আর তাই তো একজন লোক একজন বোকা লোককে ঠাট্টা করে বলে বলে ঃ 'তুই একটা ছাগল!' তাই অতি সহজেই আমার ফাঁদে একটার পর একটা ছাগল ধরা পড়তে শুরু করলো। ওদের জবাই না করে ঠিক করলাম পুষবো, ছাগলের চাষ করবো। দেড় বছরে পোষা ছাগলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো বারোয়। এর পরের দু'বছরে সংখ্যাটা হয়ে দাঁড়ালো তেতাল্লিশে। তবে মাংস খাওয়ার লোভ আমি একেবারে ছাড়তেও পারিনি। তাই দু'একটা ছাগল জবাই করতে হয়েছে।

আমার এতো সব কাজের ধারাবাহিকতা থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, আমি অলসভাবে সময় কাটাইনি। খোঁয়াড়ে প্রতি বছর ছাগলের বংশবৃদ্ধি হওয়ার ফলে তাদের দুধ থেকে মাখন, চীজ ইত্যাদি তৈরী করা থেকে শুরু করে কখনও কখনও বা তাদের মাংসের অভাব হতো না আমার কখনও। এর পরেও যদি আমাকে আরও পঞ্চাশ বছর এই দ্বীপে কাটাতে হয়, আমার ধারণা তা

সত্ত্বেও একটুও অসুবিধায় পড়তে হবে না আমাকে। দেহ ও মনের দিক থেকে সেভাবেই আমি নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছি।

।। সাত।।

ঃ দ্বীপে অচেনা আগন্তুকের আগমন ঃ

দিব্যি আমি একা মনের সুখে বেশ আনন্দেই দ্বীপে জীবন কাটাচ্ছিলাম। আমার সেই সুখের আবার অসুখ করার উপক্রম হলো একদিন। হ্যাঁ সে এক নতুন ঘটনা ঘটলো হঠাৎই, আমি ভয়ঙ্করভাবে বিস্মিত হয়ে গেলাম। তখন দুপুর, পথ চলতে চলতে আমার আস্তানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রতীরে বালির ওপরে একটা খালি পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েই চমকে উঠলাম। হঠাৎ সামনে ভূত দেখার মতোন। আমি তখন স্তব্ধ হতবাক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন ঘোরাফেরা করতে থাকে চারদিকে, তবে কোনো অচেনা লোক আমার চোখে পড়লো না। এমন কি কারোর পায়ে চলার শব্দও শুনতে পেলাম না। এর ফলে আমার মনে একই সঙ্গে ভয় আর সন্দেহ দেখা দিলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমি তখন উদভ্রান্ত, ভেবে পাচ্ছিলাম না কার কাছে গিয়ে আমি আমার এই ভয় আর সন্দেহের কথা প্রকাশ করবো। দ্বীপে মানুষ বলতে একজন আমিই কেবল। আর বাকী সব জন্তু জানোয়ার। আমার তখন মনে হলো, এই মুহূর্তে জানোয়ারগুলোর যদি মানুষের মতো বোধশক্তি থাকতো তাহলে কতো না ভালো হতো, তাদের কাছে আমি আমার আশঙ্কার কথা বলে মনটাকে একটু হাল্কা করতে পারতাম। কিন্তু যা হওয়ার নয় তা নিয়ে মাথা ঘামানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যাই হোক, ভয় বুকে চেপে রেখে কোনো রকমে পাদুটো দ্রুত চালিয়ে ফিরে এলাম আমার আস্তানায়। এটুকু পথ হেঁটে আসতে গিয়ে পথে পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা কোনো গাছ কিংবা গাছের ছায়া দেখলেই মানুষ ভেবে ভুল করেছি, আঁতকে উঠেছি। আমার মাথায় নানান উদ্ভট চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। একটা কথাই বারবার আমার মনে হচ্ছিল, ওই পায়ের ছাপ কার হতে পারে? কে, কে সেই আগন্তুক, অচেনা যাকে আমি চোখে দেখিনি, যার পায়ের ছাপ দেখেছি কিন্তু তার পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাইনি।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি, চোখের পাতা খুব কমই এক করতে পেরেছি, ভালো করে ঘুমই হলো না। যখনই চোখদুটো বন্ধ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, তখনি সেই একটা প্রশ্ন আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, এই নির্জন দ্বীপে একদিন কেবল আমিই তো একা বাসিন্দা ছিলাম, দ্বিতীয়জন এলো কোথ্‌থেকে? আকাশ পথে উড়ে তো আর আসেনি। এখানে এই দ্বীপে আসার একটাই তো পথ, সে পথ জলপথ। আর জলপথ দিয়ে আসতে হলে জাহাজে চড়ে আসতে হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ এগারো-বারো বছরে নতুন কোনো জাহাজ এই দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রতীরে ভিড়তে তো কখনও দেখিনি। যদি সে জাহাজে চড়েই এসে থাকে তাহলে সেই জাহাজী আমার চোখে পড়েনি কেন? সেই জাহাজটা কি তাহলে এই দ্বীপে নামিয়ে দিয়েই ফিরে গেছে? কিন্তু তাই যদি হয় এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আগন্তুকের পায়ের অন্য সব ছাপগুলোই বা গেলো কোথায়? এতো কর্পূর নয় যে, বালির ওপর থেকে উবে যাবে?

ভয়ে আতঙ্কে তিনদিন তাঁবু থেকে আর বেরোলাম না। আমার আস্তানা থেকেই বাইরে নজর রাখতে থাকলাম, যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিন্তু না, তেমন কিছু না ঘটায় আস্তে আস্তে আমি আমার হারানো সাহস আবার ফিরে পেলাম। এই প্রথম আমি ভাবতে বসলাম, ওই পায়ের ছাপটা আমার নিজেরই নয় তো? আর সেটা যাচাই করে দেখার জন্যেই তিনদিন পরে আবার আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

তিনদিন আগে দেখা সেই পায়ের ছাপটা আজও পড়ে রয়েছে বালির ওপরে তেমনি। সেই ছাপটার পাশে নিজের পায়ের ছাপ রাখলাম। ছাপের তুলনায় আমার পায়ের মাপ অনেক ছোট। এতে আমার ভয় আর আশঙ্কা নতুন করে আরও বেড়ে গেলো। সামনে হঠাৎ ভূত দেখার মতো আমি থরথর করে কাঁপতে থাকলাম। আমার সন্দেহটা অমূলক নয়। এ দ্বীপে আমি ছাড়া আরও একজন মানুষ আছে। সেই লোকটা কি রকম হতে পারে? হিংস্র নাকি আমার মতো নিরীহ প্রকৃতির? যদি সে হিংস্র হয় আর আমাকে কখনও হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, তখন আত্মরক্ষার জন্য কোন্ পথ নেবো সেকথা ভাবতে ভাবতে তাঁবুতে ফিরে এলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম আমার তাঁবুর সামনে প্রথম সারির দেওয়ালটার সমান্তরাল আরও একটা দেওয়াল তুলবো। দু'টো দেওয়ালের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা রেখে দেবো যাতে করে আমি অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারি। আমার এই পরিকল্পিত ভাবনার বাস্তবরূপ দিয়ে ফেললাম অচিরেই। দেওয়ালটা হলো ঘন গাছ আর খুঁটির, এতে সেটা যথেষ্ট পাকাপোক্ত হলো। এই নতুন দেওয়ালে আমার হাত ঢুকে যাওয়ার মতো সাতটা গর্ত করলাম। এই সাতটা গর্তে ভাঙা জাহাজ থেকে সংগ্রহ করা সাতটা গাদা বন্দুক ঢুকিয়ে দিলাম। দূর থেকে ঠিক কামানের মতো দেখালো গাদা বন্দুকগুলোকে। বন্দুকগুলোকে কাঠের ফ্রেমে শক্ত করে আটকে দিলাম। সাতটা গাদা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে বড় জোর দু'মিনিট সময় লাগতে পারে। আর কাজটা সহজেই সারা যাবে। কিন্তু এতো সব কাজ সারতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে গেলো। তা লাগুক, আগন্তুকের আক্রমণ তো ঠেকানো যাবে।

এর পরেও আমার আরও কিছু কাজ বাকী রয়ে গেলো। দ্বিতীয় দেওয়ালের বাইরে খানিক জায়গা ছেড়ে চারদিকে গাছ লাগিয়ে দিলাম। ছোট ছোট চারাগাছগুলো কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেলো। সেই অচেনা আগন্তুক কিংবা কোনো শত্রু যদি এই ঘন জঙ্গল পেরিয়ে আমার তাঁবুতে ঢুকতে চায়, তাহলে সামনে ফাঁকা জায়গাটা তাকে পেরিয়ে আসতেই হবে। আর ঠিক তখনি তাকে আমার সাতটা বন্দুকের মুখোমুখি হতে হবে। অতএব আমাকে আক্রমণ করতে এলে তাকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে যেতে হবে না।

এতো সব কাজ করেও আমি কিন্তু পশুপালনের কাজে একটুও অবহেলা করিনি। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাদের দেখভাল করে গেছি। এর মধ্যে আমার স্বার্থও জড়িয়ে ছিল। প্রতিদিন ওরাই তো আমার খাবারের জোগান দিয়ে আসছে। বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ওদের চার-পাঁচটা দলে ভাগ করলাম। তারপর দ্বীপের নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে কয়েকটা পাকাপোক্ত খোঁয়াড় তৈরী করে ওদের এক একটা দলকে এক একটা খোঁয়াড়ে রাখার ব্যবস্থা করলাম। চার-পাঁচটি খোঁয়াড়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করতে আমাকে দ্বীপের নির্জন অঞ্চলে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হলো। এমনি একদিন দ্বীপের পশ্চিম দিকে ঘুরছি। হঠাৎ তীর

থেকে বহুদূরে সমুদ্রে একটা নৌকো ভাসতে দেখলাম। জাহাজডুবি হওয়ার পর নাবিকদের সিন্দুকে একটা টেলিস্কোপ পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেটা আমি সংগ্রহ করে এনেছিলাম। কিন্তু সেটা আমার কাছে না থাকায় বহুদূরের নৌকোটা ভালো করে নিরীক্ষণ করতে পারলাম না।

ধীরে ধীরে এসে দ্বীপের শেষ সীমান্তে এসে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, এখানে রক্তমাংসের মানুষ কিংবা অশরীরী কোনো প্রেতাত্মাই হোক, এখানে তাদরে পায়ের ছাপ পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তবে আমার ভাগ্য খুব ভালো, আর ঈশ্বরের অপরিসীম দয়ায় জাহাজডুবি হয়ে দ্বীপের অন্য প্রান্তে এসে উঠেছি, সেয়ানে নরখাদক বর্বর জংলীরা হানা দেয় না, স্পষ্টতই সেটাকেনিরুপোদ্রব এলাকা বলা যায়। অথচ এখানকার চেহারা একেবারে অন্য রকম বললে বোধহয় অনেক কমিয়ে বলা হবে, বরং ঠিক তার উল্টো। এখানকার প্রতিটি দৃশ্য আতঙ্কে ভরা, তাই স্তম্ভিত না হয়ে থাকতে পারলাম না। সমুদ্রতীরের যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে মরা মানুযের মাথার খুলি, হাত-পায়ের আর দেহের অন্যান্য অংশের হাড়গোড়, মাটির ওপর চোখ রাখতে গিয়েই দেখলাম, সেখানে দাগ কেটে একটা গোলাকার বৃত্ত আঁকা হয়েছে। আর বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নিভে যাওয়া আগুনের ধুনি। এইসব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, জংলী আদিবাসীরা নিশ্চয়ই পশুর মতো মানুষ জবাই করে নরমাংসের ভোজনপর্ব সমাধা করে থাকবে।

এর থেকে আমার আবার এও মনে হলো, আদিবাসীদের মূল ভূখণ্ড ঠিক কোথায় আমি জানিনা, তবে যেখানেই হোক সেখান থেকে ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একটা নৌকোয় চড়ে এই দ্বীপে এসেছে নরমাংসের ভুরিভোজ সারতে। ওদের নরমাংসের ভুরিভোজের আয়োজন বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম, বড় মর্মন্তুদ। নরমাংস খাবার লোভে যে ওরা এই দ্বীপে এসেছিল তা কখনোই নয়, কারণ ওরা বেশ ভালো করেই জানে যে, এই দ্বীপে কোনো মানুষের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। তাহলে এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। হ্যাঁ, নরমাংসের সন্ধান তারা করে নেয় নিজেদের মধ্যে থেকেই। কথাটা বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, শুরুতেই ওদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই দ্বীপে আসাটাও উদ্দেশ্যমূলক কেন বলছি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের পরবর্তী কার্যকলাপে। দ্বীপে এসে শুরুতেই তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়। এ লড়াইয়ে একটা না একটা দল জিতবেই, আর এক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। তারপর বিজয়ী দল ওদের নৃশংস প্রথা মতো পরাজিত দলের বন্দীদের হত্যা করে তাদের ভোজের আয়োজন করেছে। এই অমানবিক নারকীয় নৃশংস ঘটনায় আমি মর্মাহত এবং এতোই ব্যথিত যে, এই মুহূর্তে আমি আকস্মিক সম্ভাবনাময় বিপদের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। লোকমুখে এবং সংবাদ মাধ্যমে মানুষখেকো হিংস্র স্বভাবের মানুষের অনেক খবর আমি শুনেছি। কখনও বা সাময়িক পত্রপত্রিকায় পড়েছি সেই সব বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী, কিন্তু নিজের চোখে সেই সব নারকীয় ঘটনা এতো কাছ :কে চাক্ষুস করতে কখনও দেখিনি। আর দেখিনি বলেই বোধহয় বিশ্বাসে এতো জ্বালা।

নরখাদকদের সেই সব নিষ্ঠুর কাণ্ড-কারখানার কথা মনে করলে গা শিউরে ওঠে। একটু আগে যেসব অধিবাসী একই জায়গায় অভিন্ন হৃদয়ের মানুষ ছিলো, দ্বীপে নৌবিহারে এসে ভিন্ন দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধযুদ্ধ খেলা শুরু করে দেয় হয়তো নিছকই খেলার ছলে। কিন্তু সেই খেলা যে শেষ পর্যন্ত একটা মারণ খেলায় পরিণত হবে তারা কি কেউ ভেবেছিল এই দ্বীপে আসার জন্যে তাদের বাসস্থান থেকে রওনা হওয়ার আগে? তারপর যখন একটা বিজয়ী দল তাদের নৃশংস প্রথা

অনুযায়ী পরাজিত দলের সদস্যদের বন্দী করে নির্বিচারে একে একে সবাইকে হত্যা করতে শুরু করে তখন কি তারা একবারও ভেবে দেখেছে, লড়াই শুরু হওয়ার আগে যারা ছিল একে অপরের নিজের দেশবাসী বন্ধু। কিন্তু পরাজিত হওয়ার পরেই তারা কি করেই বা পরস্পর পস্পরের শত্রু হয়ে যায়? মানলাম যুদ্ধে ভাই বন্ধু বলে কোনো কথা নেই, সবাই সবার শত্রু। তাই একে অপরকে খতম করার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে তারা একে অপরের মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করে মাংসের ভুরিভোজ করবে? এ কোন্ সভ্যতা, নাকি অসভ্যতা, বর্বরতা আর নির্মম নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত পরিচয়?

আমাদের চিরকালের দেখে আসা সভ্যতার সঙ্গে যেন এর কোনো হিসেবেরই মিল হয় না। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেলো আমার। আমি স্তব্ধ, হতবাক।

।। আট।।

ঃ মানুষখেকোদের আগমন ঃ

প্রবাদ আছে সময় মানুষকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, আবার সব কিছু বলেও দেয়, ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছুই। তার বাস্তব প্রমাণ আমি হাতে-নাতে পেয়ে গেলাম আমার জীবনে। তাই বুদ্ধিমান লোকের ধর্মই হলো কোনো ঘটনার আকস্মিকতায় বিশ্বাস না হারিয়ে মনটাকে শক্ত রেখে তার মোকাবিলা করা উচিত, তাহলেই দেখা যাবে সব কেমন ঠিক হয়ে গেছে, সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আগে যেটা আকস্মিক বিপর্যয় বলে মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটাই ভবিতব্য বলে মেনে নিতে হয়েছে। এই যে আমার দ্বীপে হঠাৎ নরখাদকের আবির্ভাব আর তাদের নৃশংস তাণ্ডবলীলা দেখে আমার ভয় পাওয়া, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সব ভয় কেমন উধাও হয়ে গিয়ে একটু একটু করে আমি আমার আগের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছি। তবে আগের মতোই শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে দিন কাটালেও এখন আমি আগের চেয়ে অনেক বেশী সাবধান আর সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তাঁবুর বাইরে বড় একটা বেরোইনা, তবু যখন একান্ত কোনো প্রয়োজনীয় কাজে বেরোতেই হয়, তখন প্রতিটি পা ফেলতে গিয়ে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টিতে অগ্র-পশ্চাৎ দেখে নিতে ভুলি না। সাবধানের মার নেই, কে জানে কখন কোথায় বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে আমার জন্যে।

বিভিন্ন খোঁয়াড়ে ছাগলের চাষ করার দরুণ শিকারের জন্য এখন আমাকে আর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় না, এটা আমার একরকম বড় সৌভাগ্যই বলতে হবে, এ আমার বিরাট প্রাপ্তিযোগ বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি, জরুরী প্রয়োজনে বাইরে যখন না বেরোলেই নয়, তখন, দু'দুটো বন্দুক সঙ্গে করে নিয়ে বেরোই, যদিও দু'টো বন্দুকের একটা গুলিও খরচ করতে হয় না। এছাড়াও জাহাজ থেকে সংগ্রহ করে আনা একটা বড় তলোয়ার পরিষ্কার করে শান দিয়ে পালিশ করে রেখেছিলাম, বাইরে বেরোলে সেটাও সব সময় কোমরবন্ধে রেখে দিই।

এছাড়াও নরখাদকদের শায়েস্তা করতে ঠিক করলাম যেখানে তারা ধুনি জ্বেলে মানুষ নিধনে মেতে উঠেছিল, একদিন সেখানে গিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে তাতে পাঁচ-ছ' পাউণ্ড বারুদ পুঁতে রেখে আসবো। পরে এখানে এসে ওরা আবার যদি কখনো তাদের নৃশংস হত্যালীলা চালাতে আগুন জ্বালালেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সব তছনছ হয়ে যাবে।

কিন্তু এতে যথেষ্ট অসুবিধে আছে। প্রথমত এভাবে পাউণ্ডের পর পাউণ্ড বারুদ খরচ করে যেতে থাকলে দেখা যাবে একদিন জাহাজ থেকে আনা বারুদের মজুত ফুরিয়ে গেছে, তখন কি করবো? এর ফলে অবশ্যই আমাকে বড় একটা সমস্যায় পড়তে হবে যা সমাধান করা সম্ভব নয়। অন্তত এই নির্বান্ধব দ্বীপে তো বটেই। দ্বিতীয়ত, সেই বারুদ বিস্ফোরণে নিষ্ঠুর নরখাদকরা বড় জোর একটু আধটু ভয় পেতে পারে। কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে পালাবে না, আর পরে এই দ্বীপে আসা বন্ধও করবে না। তাই এই সব অসুবিধের কথা চিন্তা করে আমার এই প্রথম মতলবটা বাতিল করে দিয়ে অন্য আর একটা মতলব আবিষ্কার করার কথা ভাবতে থাকলাম।

এবং অচিরেই নতুন একটা মতলব আমার মাথায় এসে গেলো। আর আমার সেই নতুন মতলবটা এই রকম ঃ বর্বর নরখাদকরা পরে আবার যখন তাদের এমন একটা নারকীয় ভোজসভার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে আর সেই আয়োজনের প্রাথমিক পর্বে তারা যখন পরাজিত বন্দীদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠতে যাবে তার আগেই আমার এই নতুন মতলবটা কার্যকর করতে হবে। তাদের ভোজনসভার আশেপাশে কোনো ঝোপঝাড়ে তিনটে গাদা বন্দুক আর তলোয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে আত্মগোপন করে থাকবো। ওরা যখন তাদের বন্দীদের হত্যা করতে উদ্যত হবে ঠিক তখনি আমি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো ওদের ওপর। এরা যদি দলে কুড়িজনও থাকে, আমার বিশ্বাস আমি একাই ওদের খতম করে দিতে পারবো।

তাছাড়া, আমি একটা বাড়তি সুবিধে পেয়ে যাবো। ওদের বন্দীরা যদি দেখে আমি ওদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছি ওদের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, স্বভাবতই ওরা তখন আমার এই কার্যধারা সমর্থন করে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তাতে আমি বাড়তি একটা শক্তি পেয়ে যাবো। মৃত্যুপথযাত্রী পুরো দলটাকে ওদের ঘাতক দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারবো। এটা কি আমার কম সাফল্য?

তাই আমার এই দ্বিতীয় মতলবের বাস্তব রূপরেখা টানতে পরবর্তী কয়েকদিন ধরে পছন্দমতো লুকানোর জায়গা খুঁজে বেড়ালাম। অনেক পথশ্রমের পর অবশেষে একটা জায়গাও খুঁজে পেলাম।

নরখাদকদের আক্রমণ করার সব আয়োজন শেষ করার পর আমার এবার প্রতিদিনের কাজ হলো খুব ভোরে আমার আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা, উদ্দেশ্য একটাই, কোনো নৌকো সমুদ্রের জলে ভেসে আসছে কিনা দেখার জন্যে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততো দূরে চোখদুটি আমার মেলে ধরলাম। প্রথমদিন ওদের আসার একটা সময় অনুমান করে নিয়ে প্রায় তিনঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করলাম, খুব কম সময়ই সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়েছি, কিন্তু কোনো নৌকোরই দেখা পেলাম না। এইভাবে পর পর তিন তিনটে মাস কেটে গেলো। একটা দিনও আমার পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার বিরতি ঘটেনি, কিন্তু মানুষের চরম শত্রু নরখাদকের দেখা মিললো না। তবে এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন দেখলাম অনেকদূর থেকে এক ঝাঁক নৌকো ফিরে চলেছে তাদের আস্তানায় মূল ভূখণ্ডের দিকে। দূর থেকে নৌকোগুলোকে একঝাঁক তিমি মাছের মতো দেখাচ্ছিল, নৌকোর পালগুলো খুবই অস্পষ্ট, অস্পষ্ট নৌকোর আরোহীগুলো। তাদের বড় বড় মাথাগুলো এতো দূর থেকে খেলনা পুতুলের মাথার মতো দেখাচ্ছিল। আন্দাজে মনে হলো সব নৌকোয় মোট পঁচিশ তিরিশজন আরোহী তো হবেই। তাড়াতাড়ি পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নেমে এসে সমুদ্রতীরের দিকে ছুটলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি বালির ওপর রক্ত

থিক্‌থিক্ করছে, বেশীরভাগ রক্ত বালি শুষে নিয়েছে, তবে বালির আসল ধূসর রঙ বদলে গিয়ে লাল রঙে পরিণত হয়েছে। শুধু বালি নয়, সেই সঙ্গে কিছু তাজা নরমাংসের টুকরো আর প্রচুর হাত-পা আর দেহের অন্যসব অংশের হাড়গোড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নরখাদকদের সেই চিরন্তন নারকীয় ভোজের ভয়ঙ্কর সব চিহ্ন যা বিশ্বাস করা যায় না চোখে দেখা যায় না। রক্ত গরম হয়ে ওঠে। আমিও তো মানুষ, তাই সেই নির্মম, নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে ভয়ঙ্কর ক্রোধে আমার সারা শরীর অসম্ভব কাঁপতে থাকলো। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে তখনই মনে মনে শপথ নিলাম, একবার দুবার ওই সব পিশাচ নরখাদকরা না হয় আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তৃতীয়বার আমি ওদের পালাবার কোনো সুযোগই দেবো না। যেভাবেই হোক ওই সব বর্বর জানোয়ারগুলোকে খতম আমি করবোই করবো!

এর পর বহুদিন হলো সেইসব বর্বর নরখাদকদের দেখা পেলাম না। যাই হোক, দীর্ঘ পনেরো মাস পরে আবার ওদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। হ্যাঁ, সশীরে ওদের দেখা হয়, তাতে ওদের নৌকোগুলো আমার চোখে পড়লেও, নৌকোর কোনো আরোহীকেই দেখতে পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। এতো তোড়জোর, আয়োজন সবই বৃথা গেলো। তবে আশঙ্কাটা থেকেই গেলো, বরং আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। তাদের দেখা পেলে ভালো হতো কারণ সামনা সামনি লড়াইকে আমি ভয় পাই না। শত্রুকে চোখে চোখে রাখা যায়। কিন্তু অতর্কিতে পিছন থেকে আক্রান্ত হলে প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পাওয়া যায় না। আমার মাথার পিছনে তো তৃতীয় চোখ আর নেই যে আমার আততায়ীকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যাবো। তাই আতঙ্কিত হয়ে ভয়ে ভয়ে আস্তানায় ফিরতে হলো। আসার পথে রাস্তার দু'ধারের ঝোপঝাড়ের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হলো। কাউকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবো। আর সামনা-সামনি হলে তলোয়ার দিয়ে তার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ছাড়বো। না, কোনোটাই করতে হলো না। নিরাপদে ফিরে এলাম আমার তাঁবুতে। ফিরে এসে আমার বাড়ীর দ্বিতীয় দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকলাম। যথারীতি প্রতিটি গর্তে গাদা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে রাখলাম, শত্রুপক্ষের দেখা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্দুকও গর্জে উঠবে। কোনোভাবেই ওদের আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে দেবো না। এই আমার কঠিন সংকল্প। আর সেই মতো তৈরী হলাম যেকোনো রকমের আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য।

এমনিতে খালি চোখে বেশী দূরের দৃশ্য কিংবা মানুষের মুখ ভলো করে দেখা যায় না, কেবল কাছের জিনিস আর কাছের মানুষকেই দেখা যায়। কিন্তু আমি যাঁদের খুঁজছি, তারা তো আর আমার কাছের মানুষ নয়, তারা আমার শত্রু, তারা আমার চোখের বালি, তারা আমার দু'চোখের বিষ। বিষে বিষক্ষয় বলে একটা কথা আছে। ওই বর্বর নরখাদকরা আমার আর আমাদের মনুষ্য সমাজের শত্রু, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বিষ। আর এই বিষকে নির্বিষ করার জন্যে আমার কাছে তিন রকমের মারাত্মক বিষ আছে, যেমন গাদা বন্দুক, পিস্তল আর লম্বা ধারালো তলোয়ার। চিকিৎসায় ডাক্তার যেমন রোগীর জন্য দু'তিন রকম ওষুধের ব্যবস্থা পত্র লিখে দিয়ে অপেক্ষা করে কোন্‌টা তার কাজে লাগে। তার এই পর্যবেক্ষণের যথার্থতা নির্বাচনের ওপরেই নির্ভর করে রোগীর জীবন

মরণের ব্যাপার। তাই আমাকেও ডাক্তারের রোগী দেখা আর রোগের ধরণ দেখার মতো অপেক্ষা করতে হবে ওই সব নরখাদকদের আগমন পর্যন্ত। তারপর তাদের সহনশীলতার শক্তি দেখে আমাকে ঠিক করতে হবে কোন্ বিষ তথা অস্ত্রে ওদের একেবারে ঘায়েল করা যায়। কিন্তু সেই সব নরখাদক শত্রুদের খালি চোখে খুব কাছে না এলে দূর থেকে তো দেখা যাবে না। আমার আস্তানা থেকে খালি চোখে তাদের দেখার দূরত্বের মধ্যে না আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে, সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নাও থাকতে পারে। তাছাড়া দৃষ্টির বাইরে দূর থেকে নরখাদকরা হঠাৎ যদি কোনো আড়াল থেকে ছুটে এসে আমার আস্তানায় ঢুকে পড়ে উল্টে আমাকে আক্রমণ করে বসে? এই চিন্তায় নতুন করে আমার মনটা আশঙ্কিত হয়ে ওঠার মতো একটা কারণ অবশ্যই দেখা দিলো। তাই দূরকে কাছে আনার যন্ত্রটার কথা ভাবা মাত্রই জাহাজ থেকে আনা টেলিস্কোপটার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে টেলিস্কোপটা নিয়ে এলাম।

কিছুক্ষণ পরে সেই টেলিস্কোপে অনেক দূর থেকে দেখতে পেলাম ওদের। দলে ওরা কম করেও তিরিশজন তো হবেই। আগুনের ধুনি জ্বেলে ওরা আদিবাসীদের জংলী নাচ নাচছে। আর বন-ভোজনের জন্য তারা আগুনে ঝলসানো মাংস তৈরী করে রেখেছে। দলে প্রায় তিরিশজন সদস্য থাকার জন্য তাদের আরও মাংসের প্রয়োজন ছিল। তাই হঠাৎই দেখি, দুজন বন্দীকে তারা হাত ধরে টানতে টানতে ধুনির আগুনের কাছে টেনে নিয়ে এলো। দলের একজন হাতে একটা মুগুর নিয়ে তৈরী হয়েই ছিল। সেই মুগুর দিয়ে একজন ধৃত বন্দীকে সজোরে আঘাত করতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আঘাতপ্রাপ্ত সেই বন্দীটি মরলো কি মরলো না তা দেখার প্রয়োজনই মনে করলো না তারা। তারা তখন নরমাংসের খোঁজে সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পরে তার দেহটা চপার জাতীয় অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটতে শুরু করে দিলো। অন্যেরা সেই সব কাটা মাংস সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে সিদ্ধ করতে শুরু করে দিলো। দৃশ্যটা যে কি ভয়ঙ্কর অমানুষিক আর নিষ্ঠুরতা স্বাক্ষর বহন করছিল তা নিজের চোখে দেখে যেন বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছিল। কোনো মানুষ তাদের বনভোজনের জন্য প্রায় জীবন্ত একটা মানুষের দেহ চপার দিয়ে অমন টুকরো টুকরো করে কাটতে পারে? না, ওরা মানুষ তো নয়, ওরা বর্বর নরখাদক বলেই এটা সম্ভব।

ওদিকে দ্বিতীয় বন্দী তার সাথীর অমন ভয়ঙ্কর দুরাবস্থা দেখে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল ওই সব নরখাদকরা তার অবস্থাও ঠিক অমনি করেই ছাড়বে। তার সাথীর দেহটা সম্পূর্ণ করে কাটা হয়ে গেলেই তারা তারপর তার দিকে নজর দেবে। কিন্তু তার আগেই তাকে এখান থেকে পালাতে হবে, মনে মনে স্থির করে ফেললো সে। কথাটা মনে করা মাত্র হঠাৎ সে মরীয়া হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। সোজা সে ছুটতে শুরু করলো আমার আস্তানার দিকেই। কে জানে হয়তো সে আমার তাঁবুটা দূর থেকে দেখতে পেয়ে থাকবে। আর তাই তার লক্ষ্য এখন আমার তাঁবুর দিকে?' কে জানে হয়তো আমার অনুমান ভুলও হতে পারে।

ওদিকে নরখাদকরাও চুপ করে বসে রইলো না। তিনজন নরখাদক তাড়া করলো তাকে। মাঝপথে একটা খাঁড়ি ছিল। সেখানে পৌঁছে ভয়ার্ত বন্দীটা চোখ-কান বুজে জলে ঝাঁপ দিলো এবং নিমেষে খাঁড়িটা সাঁতরে পার হয়ে এপারে এসে উঠলো। তার পিছু ধাওয়া করা তিনজন নরখাদকের

মধ্যে একজন সাঁতার জানতো না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে ফিরে যেতে হলো। তবে অন্য দু'জন বন্দীর মতো সমান পারদর্শিতায় খাঁড়ি পেরিয়ে এলো।

তাদের আমার আস্তানার দিকে ছুটে আসতে দেখে আমি আমার পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। এ অবস্থায় আমার এখন তাঁবুতে থাকাটা নিরাপদ নয়, এমন কি আমার নিজের তৈরী সুরক্ষিত গুহা-দুর্গেও না! তাই আমি আমার তাঁবুর দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাথরের টিলার আড়ালে আশ্রয় নিলাম। সেখান থেকে ওদের কারোরই আমাকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়, আর হলোও তাই। তাড়া খাওয়া ভয়ার্ত বন্দীটা আমার লুকোনো জায়গাটা পেরিয়ে যেতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকেই মৃদু চিৎকার করে ডেকে উঠলাম, 'কে যায়?' ওহে পথিক বর একটু দাঁড়াও?' সে ঘুরে দাঁড়াতেই আমি তাকে ইশারায় বোঝাতে চাইলাম, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো ওদের মতো আমি নরখাদক নই, আমি মানুষ। প্রকৃত মানুষ, কি কখনও অন্য মানুষের মাংস খায়? তাই আমার তরফ থেকে তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি। তোমার কোনো ভয় নেই। বরং তোমার শত্রুদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারি।

ইতিমধ্যে তার দিকে ধেয়ে আসা সেই দু'জন নরখাদক আমার খুব কাছে এসে পড়েছে। আমি আর নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারলাম না। আমি ছুটে গিয়ে একজন নরখাদককে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করতেই সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। দ্বিতীয় নরখাদকের কাছে তীর ধনুক ছিল। তার লক্ষ্য এখন আমার ওপরে। সে বেশ ভালো করেই জেনে গেছে যে, আমাকে খতম করতে না পারলে সে তাদের শিকার কিছুতেই আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই সে তার একমাত্র অস্ত্র তীর আমার দিকে তাক করার জন্য উদ্যত হওয়ার আগেই আমি একটুও ইতস্তত না করে সরাসরি তাকে লক্ষ্য করে আমার বন্দুকের ট্রিগার টিপলাম। অব্যর্থ আমার লক্ষ্য, গুলিটা গিয়ে বিঁধলো ঠিক তার বুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো সে মাটিতে। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করে তার দেহটা এক সময় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলো। এর ফলে আমি নিশ্চিত হলাম, যাক একটা শত্রু তাহলে নিধন হলো। তবে এর পর আরও বড় ধরনের বিপদের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। এবার তারা দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসবে আমাকে।

ওদিকে ভয়ার্ত বন্দী আদিবাসী লোকটা গুলির শব্দ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলো। আমার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থেকে সে তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। তার আশঙ্কা এবার বুঝি আমি তাকেও খতম করে ফেলবো। তার কাছে আমার হাতের বন্দুকটা ভয়ঙ্কর একটা মারাত্মক অস্ত্র। মাত্র একটি বার শব্দ হতেই তার শত্রু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তার হাতে তীর ধনুক ছিল। কিন্তু সেটা সে কাজে লাগাতেই পারলো না। আর সে তো অস্ত্রহীন, তাকে খতম করতে আমার এক মুহূর্তেরও বেশী সময় লাগবে না। এসব কথাই সে হয়তো ভাবছে এখন। তার এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। তার মতো এমন অবস্থায় পড়লে হয়তো আমিও ঠিক এরকমই ভয় পেতাম। যাই হোক, তাকে অনেক ভালো ভালো কথা বলে বোঝানো হলে সে আমার কাছে এগিয়ে এলো শ্লথ গতিতে। প্রতি দশ-বারো পা এগোতে গিয়ে সে হাঁটু গেঁড়ে বসে তার নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে তার প্রাণরক্ষা করার জন্য বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকলো আমাকে। তারপর আমার একেবারে সান্নিধ্যে এসে মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে আমার পাদুটো জড়িয়ে ধরলো সে এবং প্রতিশ্রুতি দিলো, আজীবন সে আমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

ওদিকে প্রথম নরখাদকটা, যাকে আমি আমার বন্দুকের বাঁটের আঘাতে কাবু করে ফেলেছিলাম, তাকে ধীরে ধীরে উঠে বসতে দেখলাম। আমি তাকে একেবারে খতম করার জন্য গুলি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার একান্ত অনুগত পোষমানা বন্দী লোকটা তার নিজের দুর্বোধ্য ভাষায় কিসব বলে আমাকে আমার সেই কাজ করা থেকে বিরত হতে বললো। সেই সঙ্গে হাতের ইশারায় আমার তলোয়ারটা ধার চাইলো।

এই দ্বীপে আমি কার্যত বন্দী হয়ে আছি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আর এই সময়ে দ্বিতীয় কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাইনি। তাই খুশী হয়ে তলোয়ারটা তার হাতে তুলে দিতেই সে তার শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলো এক পা এক পা করে। তার দু'চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা আর ক্রোধ ঝরে পড়ছিল।

প্রথম লোকটা তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। 'দয়া করো আমকে মেরো না, আমি বাঁচতে চাই। আমার বাড়িতে বৌ, ছেলে মেয়ে আছে। আমি তোমার কাছ থেকে আমার প্রাণভিক্ষে চাইছি বন্ধু.............'

'বন্ধু? এখন বন্ধুত্বের দোহাই দেওয়া হচ্ছে! একটু আগে আমার সঙ্গে শত্রুতা করার সময় তোমার মনে ছিল না? একটু আগে তুমিই না আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে? নেহাত ঐ সৎ মানুষটি দয়া করে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, না হলে এতক্ষণে তুমি আমাকে খতম করে ফেলতে, আমার লাশটা নিয়ে গিয়ে তোমার পেয়ারের লোকেদের সঙ্গে দিব্যি আয়েস করে আমার দেহের মাংস রান্না করে ভুরিভোজ সারতে। বলো, ঠিক বলেছি কিনা?' আমার পোষমানা লোকটা রাগে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকলো। তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, ও দুটো যেন আগুনের চুল্লীর মতো জ্বলছিল তখন।

'ভুল হয়ে গেছে, আমাকে তুমি এ বারের তো ক্ষমা করো। ক্ষমাই তো মানুষের পরম ধর্ম!'

'তোমার মতো নরখাদকের কাছ থেকে আমি নীতিজ্ঞান শিখবো?' খিঁচিয়ে উঠলো সে। 'না কোনো ক্ষমা নয়, তোমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। আর সেই চরম শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড!' এই বলে সে তলোয়ারের এক কোপে তার শত্রুর মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

বিজয়ীরূপে সে যখন ফিরে এলো আমার কাছে, সে কি উল্লাস তার! বিরাট যুদ্ধজয়ের আনন্দে যেন সে ফেটে পড়লো। সেই আনন্দে প্রথমে সে বাক্যহারা। তারপর সে তার রক্তমাখা তলোয়ারটার ওপর চুমু খেলো, বীর যোদ্ধার মতো নিজের কৃতিত্বের জন্য নিজেই নিজেকে বীরের সম্মান দিলো এইভাবে। সব শেষে মাটিতে ঘাসের ওপর রক্তমাখা তলোয়ারটা মুছে ফেলে আমার পায়ের কাছে এমন শ্রদ্ধাসহকারে রাখলো যে, তার সেই অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো যেন সে সেটা নিবেদন করছে তার ঈশ্বরের কাছে। বলাবাহুল্য, তার ঈশ্বর এখন একমাত্র আমি, হ্যাঁ আমিই!

কিন্তু পরক্ষণেই তার দু'চোখে যেন গভীর বিস্ময়ের ঘন মেঘ জমে উঠেছে। এর কারণ, তার দ্বিতীয় শত্রুর আশ্চর্য মৃত্যুতে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। সে এতো দূর থেকে কি করে লোকটাকে আমি খতম করে ফেললাম, সেটা কিছুতেই তার বোধগম্য হচ্ছিল না, তার মতে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কি করে সম্ভবপর হয়ে উঠলো, তার বিস্ময়ের কারণ এটাই!

যাই হোক, সে তার সেই বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাতে সে নিজেই কাছে গিয়ে মৃতদেহটা বার কয়েক নাড়াচাড়া করে দেখলো। তার বুকের ঠিক মাঝখানে গুলির ছোট একটা ক্ষতচিহ্ন, ক্ষতচিহ্নের চারপাশে সামান্য একটু রক্তপাত ঘটেছে। কি আশ্চর্য, সে নিজেই নিজেকে বলে উঠলো, এতো সামান্য রক্তক্ষরণে লোকটা মরে গেলো? এই তিনটে হিসেব মিলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

হিসেব মিলবে কি করে তার? আসলে গোড়াতেই তো গলদ। গোড়ার গলদ সংশোধন না হলে তার পরবর্তী ধ্যান-ধারণাতেও গলদ থেকে যেতে বাধ্য। আর সেই গলদটা হলো, বন্দুক, কার্তুজ, ট্রিগার ইত্যাদি। এসবের ব্যাখ্যা সে কিছুতে বুঝতে পারছিল না। কে জানে, হয়তো আমি নিজেই তাকে এসব বোঝাতে পারছিলাম না। পরে সুবিধে মতো কোনো এক সময়ে তাকে সব বুঝিয়ে দেবো, এই ভেবে ব্যাপারটা তখনকার মতো চাপা দেবার চেষ্টা করলাম, আর সে-ও কেমন সুবোধ বালকের মতো আমার কথায় সায় দিয়ে তখনকার মতো নীরব হয়ে গেলো।

সে এখন আমার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। তা আমার ভক্তটির চেহারা বেশ ভালোই বলতে হয়। দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যবান সব চেয়ে সরল সুন্দর তার চোখদুটি বড় উজ্জ্বল দীপ্তিময়। বয়স আনুমানিক চব্বিশ-পঁচিশ, তবে ছাব্বিশের বেশী নয়। মাথার কালো চুলগুলো বেশ লম্বা। ঝকঝকে শ্বেতশুভ্র-দাঁত। হাসিটা বেশ মিষ্টি। ওর সহজ সরল ভাব দেখে মনে হলো ওকে বিশ্বাস করা যায়। তাই ওকে সঙ্গে করে আমার আস্তানায় নিয়ে এলাম।

দিনটা আজ ফ্রাইডে-শুক্রবার। আজই প্রথম আলাপ, তাই ওর নাম রাখলাম ফ্রাইডে।

এর পর আমার দায়িত্ব অনেক, ওকে মানুষ করতে শুরু করলাম। আমার প্রথম কাজ হলো, ওকে কথা শেখানো। প্রথমে ওকে শেখালাম, 'আমাকে, 'স্যার' বলে সম্বোধন করার জন্য। এখন থেকে ও যেন এই নামেই আমাকে ডাকে। এর পর শেখালাম 'হ্যাঁ' আর 'না' এই দুটো শব্দ। যেমন কোনো ব্যাপারে ইচ্ছে থকলে মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বলবে আর ইচ্ছে না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন মাথা নেড়ে 'না' বলে দেবে।

সারাটা রাত ধরে আমি ওর পাশে পাশেই থাকলাম। এক মুর্হুতের জন্যে ওকে আমার চোখের আড়াল করলাম না আর পাখি পড়ানোর মতো ওর মুখে বুলি ফোটাবার চেষ্টা করলাম।

পরের দিন সকাল হতেই ওকে আমার তৈরী এক সেট পোশাক পরতে দিলাম। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেড়াতে বেরোলাম। একটা উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে তাকাতেই দেখলাম, নরখাদকরা নৌকো নিয়ে পালিয়েছে।

গতকাল ধৃত লোকদুটিকে হত্যা করার পর কবর দিয়েছিলাম। সেই জায়গার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ফ্রাইডে আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে ইশারায় আমাকে বোঝাতে চাইলো, মৃতদেহ দুটো কবর থেকে তুলে তাদের মাংস খেলে সেটা সত্যিকারের সদ্ব্যবহার করা হবে।

ওর এমন জঘন্য মনোভাবের কথা টের পেয়ে আমি ভীষণ রেগে গেলাম। ওর নরখাদক জাতভাইদের স্বভাব পাল্টাবার জন্য আমি ওকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলাম, ওর ওই রাক্ষুসে ক্ষুধা ভুলে যেতে হবে, নরহত্যা করে নরমাংস খাওয়া ভুলে যেতে হবে। ফ্রাইডে আমার সব কথা যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে বুঝলো এবং চোখে মুখে অপরাধের ভাব ফুটিয়ে তুলে সে তার হাবভাবে বুঝিয়ে দিলো, ঠিক আছে এবারের মতো তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে দেখো, ভবিষ্যতে যেন তোমার এই জঘন্য অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

এর পর আমরা দু'জনে দু'জনের হাতে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে আবার চলতে শুরু করলাম। এবার ওকে অস্ত্র কি করে ব্যবহার করতে হয় শেখাতে শুরু করে দিলাম।

ফ্রাইডে তাদের সমাজের আদি-অস্ত্র তীর ধনুক সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল, এ অস্ত্র ব্যবহারে ওরা যথেষ্ট দক্ষ। তাই তীর ধনুক ব্যবহার করার শিক্ষা আমি দিলাম না ওকে। আমি বরং ওকে আমার অস্ত্র বন্দুক আর তলোয়ার ব্যবহার করতে দিলাম। ইতিমধ্যে সে নিপুণ হাতে তলোয়ার যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। অবশ্য আমি জানতাম আদিবাসীদের কাছে তলোয়ার, ছোরা বা ছুরি জাতীয় ধারালো অস্ত্র ব্যবহার নতুন কিছু নয়, এ কোন্ প্রাচীন যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বভাবতই মানুষের সভ্যতার যুগ শুরু হওয়া থেকেই এ সব অস্ত্রের ব্যবহার চালু হয়ে আসছিল। তাই এই সব অস্ত্র নতুন করে তাকে শেখানোর দরকার নেই। কিন্তু এখন এযুগের আধুনিক অস্ত্র বন্দুক, পিস্তল, আর রিভলবার কি করে ব্যবহার করতে হয় সেটাই শিখিয়ে দিলাম। তলোয়ার আর একটা বন্দুক তার কাছেই রেখে দিলাম বন-জঙ্গলে বাস করি, তাই শত্রু আর জানোয়ারদের রুখতে কখন প্রয়োজন হতে পারে কে জানে। আর নিজের আত্মরক্ষার জন্যে দুটো বন্দুক আর পিস্তল রেখে দিলাম। এছাড়া দেওয়ালের পাঁচটা গর্তে যথারীতি পাঁচটা গাদা বন্দুক যেমন কাঠের ওপর আটকানো ছিল তেমনি রইলো।

এর পর আমরা গতকাল নরখাদকরা যেখানে ধুনি জ্বালিয়ে তাদের বন্দীদের মাংস আগুনে উল্লাসে ঝলসিয়ে ভোজ খেয়েছিল, সেখানে পৌঁছে সেই সব বর্বর দৃশ্য দেখে ভয় আর আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঘৃণায় আমার গা ঘিন ঘিন্ করে উঠলো। জায়গাটা চাপ চাপ রক্তে লাল হয়ে গেছে। তিনটি খুলি চার-পাঁচটা হাত আর পা আর অসংখ্য হাড়গোড় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

ফ্রাইডে সেই দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো, ইশারায় সে বলতে চাইলো, এই সব মাথার খুলি আর হাড়গোড় তারই জাতভাইদের, গতকাল পর্যন্ত যারা জীবিত ছিল। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে ওর কান্না থামিয়ে বোঝালাম, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মর্মান্তিক দৃশ্য যতো দেখবে ততোই মন খারাপ হয়ে যাবে তোমার আত্মীয়-পরিজন বিয়োগে ক্রোধ আর ঘৃণা বাড়তে থাকবে। তাই মাথার খুলি আর হাড়গোড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে বললাম।

আমার নির্দেশ মতো সাফাইয়ের কাজ করতে গিয়ে দু'একটা মাংসের টুকরো দেখে লোভ সামলাতে পারলো না ওর বোধহয় খাবার খুব ইচ্ছে হলো। গতকাল পর্যন্ত ও-তো নরখাদকদেরই একজন ছিল, তাই একদিনেই আমি ওর সেই হিংস্র স্বভাব বদলাতে পারবো না। আর এই জঘন্য অভ্যাস বাবা-বাছা বলে কিংবা ভালো কথায় ছাড়ানো যাবে না। তাই এবার আমি একটু কঠোর হবার চেষ্টা করে ওকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলাম, তার জাতভাইদের টুকরো মাংস খাওয়ার চেষ্টা করলে ওকে আমি গুলি করে মারতে বাধ্য হবো। এতে কাজ হলো। কথায় আছে শক্তের ভক্ত। সেই প্রবাদটা ফ্রাইডের ক্ষেত্রে হুবহু মিলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে সে তার ইচ্ছের হাতটা গুটিয়ে নিলো। ভুলেও আর তার লোভের দৃষ্টি ফেললো না সেই মাংসের টুকরোগুলোর দিকে। সে তখন আমার নির্দেশ মতো মাথার খুলি আর হাড়গোরগুলো এক জায়গায় জড়ো করলো। তারপর ধুনির আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলো সেগুলো। সেই আগুন স্থায়ী হওয়ার জন্য তখনো কিছু কাঠ আর গাছের পাতা ফেলে দিলো তাতে ইন্ধন হিসেবে যোগান দেওয়ার জন্য।

কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গেলো।



এ দুদিনে নরখাদকের বংশধর ফ্রাইডেকে অনেকটা শুধরে আনতে পারলাম। একটু একটু করে সে আমার বেশ বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলো, আর মনে হলো আমি যেন তার ওপর আস্থা রাখতে পারি। তবে পুরোপুরিভবে নয়। সেরকম কিছু করার সময় এখনও হয়নি। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, নজর রাখতে হবে তার ওপরে।

পরের দিন ফ্রাইডের শোবার ব্যবস্থা করলাম আমার তাঁবুর কাছেই। আমার তাঁবুর পাশে বেড়া দেওয়া দেওয়াল আর তার সমান্তরাল আর একটা দেওয়ালের মাঝখানে যে অর্ধবৃত্তাকার একফালি ফাঁকা জায়গা ছিল তারই একটা অংশে একটা ছোট আকারের তাঁবু খাটিয়ে দিলাম ওর থাকা আর শোবার জন্য। ওদিকে আমার গুহাটা আরও বেশী সুরক্ষিত করে তোলবার জন্য গুহামুখে নতুন একটা মজবুত কাঠের দরজা লাগালাম। গুহাতে ওঠার জন্য যে মইটা আমি ব্যবহার করি সেটা শুতে যাবার আগে তুলে নিয়ে গুহার ভেতরে রেখে দিই প্রতিদিন প্রতি রাত্রে। তাই রাতে আমি যখন শুয়ে পড়বো, মইয়ের অভাবে প্রথমত সে গুহার প্রবেশ পথে উঠে আসতে পারবে না। আর যদিও বা পারে, মানে দরজা ভাঙার শব্দ পেয়ে, আগে-ভাগেই আমি সতর্ক হয়ে যেতে পারবো। এছাড়াও বাড়তি সতর্কটা হিসেবে রাতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র মায় ফ্রাইডেকে দেওয়া অস্ত্রগুলোও আমি আমার তাঁবুতে মজুত করে রাখি।

তবে আমি এও বুঝতে পারছি, সতর্কতার মধ্যে এতো বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই কারণে যে, একদিন ফ্রাইডে যেরকম আচরণ করেছে, তাতে তাকে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। আবার এও মনে হয় আমার প্রতি সে খুবই অনুগত এবং আমকে খুবই শ্রদ্ধা করতো, আমার ভালো-মন্দের বিশেষ ভাবে নজর দিতো, এমন কি প্রয়োজন হলে আমার জন্যে সে তার প্রাণ দিতেও দ্বিধা করতো না। যাই হোক, এই সব কথা ভেবে কয়েকদিন পরেই ফ্রাইডের প্রতি আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে উঠলাম এবং আমার প্রতি তার ভালো আচরণ আর ব্যবহার বিশ্লেষণ করে ঠিক করলাম ওর প্রতি তেমন সতর্ক আর হবো না।



ফ্রাইডের সঙ্গে কখনও কোনো আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়, বেশীরভাগ কথার অর্থই সে বোঝে না, ওর হাবভাব দেখে মনে হয়, সেসব কথাগুলো আগে কখনও শোনেইনি সে। তাই এর পর ওকে নতুন নতুন অনেক কথাই শেখালাম। শেখালাম মানুষ নয়, নিরীহ ছোট ছোট পশু-পক্ষীর মাংস কিভাবে রান্না করে খেতে হয়। কিন্তু মাংস রান্না করতে হলে যে এখন একটা নিরীহ পশু চাই। এই সময় হঠাৎ আমার একটা খোঁয়াড়ের একটা নিরীহ ছাগলকে গুলি করে মারতে উদ্যত হতে দেখে ও মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপরেই হঠাৎ সে আমার পা জড়িয়ে ধরে অবুঝের মতো বারবার আমাকে অনুরোধ করলো ছাগলটাকে না মারার জন্য। আমিও অবাক চোখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলাম ফ্রাইডের দিকে। বলে কি সে? যাকে আমি আমার হাত থেকে তলোয়ার চেয়ে নিয়ে তার শত্রুকে

নিজের হাতে হত্যা করতে দেখেছি, সেই লোকই এখন সামান্য একটা পশুকে মারতে দেখে আঁতকে উঠছে। ওর এই আকস্মিক পরিবর্তন শুভ লক্ষণ বলা যায়। তবে ছাগলের ব্যাপারে ওর এতো উতলা হওয়াটা যেন একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হলো আমার। তাই ওকে অনেক করে বোঝালাম, ছাগলের মতো ছোটখাটো পশু বা পক্ষী মারা অন্যায় নয় কিংবা মানবিক নয়। আমার কথা মন দিয়ে শুনলো ও এবং আমাকে ছাগল বধ করতে দিলো।

বন্দুকের ব্যবহার কি করে করতে হয় তা বোঝানোর জন্য একদিন ওকে দিয়ে গুলি করিয়ে একটা বুনোপাখি শিকার করালাম। নিজের হাতে ও শিকার করলো বটে কিন্তু তাতে ও আরও বেশী অবাক হয়ে গেলো। ওর এই অবাক হওয়ার কারণ বন্দুক থেকে জ্বলন্ত কার্তুজ বেরোলো কি করে, আসলে ও আমাকে বন্দুকে গুলি ভর্তি করতেই দেখেনি।

তারপর থেকে বন্দুক দেখলেই ভীষণ ভয় পেয়ে যায়, কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করি ওর চোখেমুখে। ও এখন প্রায়ই বন্দুকটার কাছে গিয়ে কাতর মিনতি জানায়, সেটা যেন ওকে না মারে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, বন্দুককে কি ভয়ঙ্কর ভয় পেতো সে। এই ঘটনায় আমি ভীষণ মজা পেতাম।

এবার একটু একটু করে চাষবাসের কাজও শিখিয়ে দিলাম ফ্রাইডেকে। সব কিছু শেখার তাগিদ তো ছিলই ওর। তার ওপর কাজের চাপও সে নিতে পারতো, অক্লান্ত পরিশ্রমে সব রকম কাজে ও আমাকে সাহায্য করতে থাকলো। আর ভালো লাগলো ওর সরলতা আর ওর এই গুণের জন্যই আমি ওকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবেসে ফেললাম।

ফ্রাইডের জানতে খুব ইচ্ছে আমি এই দ্বীপে এলাম কি করে। কিন্তু গোড়ায় ও যখন আমার কথাই বুঝতে পারতো না কি করে বোঝাই আমার জাহাজ দুর্ঘটনার কথা। যাই হোক, ওকে যখন মোটামুটি কথা বুঝতে আর বলতে শেখালাম, তখন আমি ওকে আমার জীবনের সমস্ত দুঃখের কাহিনী শোনালাম! ওকে আরও অনেক গল্পই শোনালাম, যেমন ইউরোপ মহাদেশের গল্প, আমাদের দেশ ইংল্যাণ্ডের গল্প, সেখানকার মানুষের জীবনধারার কথা, সেখানকার মানুষের দয়া-মায়াব কথা, ঈশ্বরের জয়গান গাওয়া, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। সব শেষে এসে বোঝালাম জীবনধারণের জন্যে কিভাবে জাহাজে চেপে দেশ বিদেশে পাড়ি দিয়ে ব্যবসা করি। অত্যন্ত মনোযোগসহকারে ও যখন আমার প্রতিটি কথা শুনতো, দেখতাম ওর সারা চোখেমুখে কি অপূর্ব এক মুগ্ধতা যেন ছড়িয়ে আছে। দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। মন যেন আমার ভরে গেলো তৃপ্তিতে কানায় কানায়।

।। নয় ।।

ঃ আবার আগন্তুক ঃ

ফ্রাইডের সঙ্গে আমার জীবন এইভাবে একটা বছর কেটে গেলো। এই সময়ের মধ্যে বহিরাগতদের কোনো আক্রমণের ঝামেলায় আমাদের পড়তে হলো না। বেশ নির্বিঘ্নেই কাটছিল আমাদের দিনগুলোতে। কিন্তু তারপরেই দ্বীপে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা গেলো, যার জন্যে আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ভোরের আলো তখন সবে মাত্র একটু একটু করে ফুটে উঠতে শুরু

করেছে, আকাশের তারাগুলো এক এক করে নিভে যাচ্ছে। আমি তখনও বিছানায় শুয়ে আছি, ঠিক এমনি সময়ে ফ্রাইডে হন্তদন্ত হয়ে আমার তাঁবুর সামনে ছুটে এসে চিৎকার করে আমাকে সম্বোধন করে ডেকে উঠলো ঃ 'স্যার! স্যার! মনে হচ্চে আমাদের এই দ্বীপে অনেক আগন্তুক ধেয়ে আসছে। আমার ভীষণ ভয় করছে স্যার। আপনি যদি একবার তাঁবুর বাইরে এসে নিজের চোখে দেখেন.........'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি অপেক্ষা করো ফ্রাইডে, আমি এখনি আসছি।' খানিক পরেই গায়ে পোশাক চাপিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে সমুদ্রতীরের দিকে তাকাতেই ফ্রাইডের আশঙ্কার কথাই প্রকাশ হতে দেখলাম। একটা পালতোলা নৌকো তীরের দিকে এগিয়ে আসছে দাঁড় কেটে কেটে। দাঁড়ের টানে জলে ছপ ছপ শব্দও শোনা যাচ্ছিল, অবশ্যই সে শব্দ বড়ই অস্পষ্ট। কিন্তু আগন্তুকদের আগমন মিথ্যে নয়।

আমাদের দ্বীপের নতুন অতিথিরা শত্রু না মিত্র, এখনও কিছুই স্পষ্ট নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অধিকাংশ লোকেরাই মিত্রর বেশে এলেও শেষ পর্যন্ত তারা তাদের খোলস থেকে বেরিয়ে আসে। আর এতেই তাদের সব গোপনীয়তা, নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয়ে যায়। তাই দূর থেকে ওদের নজরে রাখতে হবে এবং সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই ফ্রাইডেকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি কোনো কিছুর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাও।'

তাঁর তাঁবুতে ফিরে গিয়ে টেলিস্কোপটা নিয়ে এসে তাঁবুর বাইরে একটা টিলার ওপর উঠে ভালো করো দৃষ্টি-ফেলতেই দেখলাম, সেখান থেকে প্রায় ছ'সাত মাইল দূরে একটা জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের আকার আর রঙ দেখে মনে হয়, সেটা কোনো ইংরেজ জাহাজ হবে।

ইংরেজ জাহাজ! বুকটা গর্বে ভরে উঠলো, মনটা খুশীতে ভরে গেলো। এর কারণ আমার এখন মনে একটা আশা জাগছে, এবার বোধহয় আমার মুক্তির সময় হয়ে এলো।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে একটা সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করলো, ইংরেজ জাহাজ সমুদ্রের এমন এক অপ্রচলিত জলপথে কিভাবে আসবে, আর কেনই বা আসতে যাবে? আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো।

যাই হোক, নৌকোটা এক সময় ধীরে ধীরে সমুদ্র তীরে এসে ভিড়লো। সেই নৌকো থেকে এগারোজন নাবিক এক এক করে নেমে ডাঙায় এসে উঠলো। তাদের মধ্যে তিনজন বন্দী। তাদের হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল বলেই তারা যে বন্দী সেটাই যেন ইঙ্গিত করছিল। বাকী আটজনের মধ্যে দু'জন নাবিক মাঝে মাঝেই তাদের হাতের তলোয়ার উঁচিয়ে বন্দী তিনজনের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। এতো দূর থেকে তাদের কথা শুনতে না পেলেও তাদের উত্তেজিত হয়ে ঠোঁট নাড়া আর ভাবভঙ্গি দেখে স্পষ্টতই বোঝা গেলো, তারা যেন বন্দীদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। তাদের সেই হুমকির কথা শুনে বন্দীদের শিউরে উঠতে দেখা গেলো। বেচারারা! ওদের এই প্রাণ সংশয়ের সময় ওদের রক্ষা করার কেউ নেই, কোনো অসহায় মানুষের জীবনে এর থেকে চরম দুঃসময় আর কখনই বা আসবে? আমার অন্তত এরকমই মনে হলো। আর বন্দীদের সাহায্য করতে না পারার জন্য আমার বুকটা কেমন হাহাকার করে উঠলো।

নাবিকরা দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলো অতঃপর।

নাবিকরা এই দ্বীপের তীরে যখন উঠে এসেছিল তখন জোয়ার ছিল, সমুদ্রের ঢেউগুলোও ছিল

অশান্ত এবং গর্জনমুখর। কিন্তু তারপর কখন যে ভাঁটা শুরু হয়ে যায় ওরা কেউই টের পায়নি। কারণ সেই সময় দ্বীপটা ঘুরে ফিরে দেখার জন্য ব্যস্ত ছিল, আর সেই সঙ্গে তিনজন বন্দীকে জবাই করে তাদের মাংস খাবার লোভে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। স্বভাবতই কখন জোয়ার এলো আর কখনই বা ভাঁটা পড়লো সে নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই মনে করেনি তারা। এর পরিণাম যা হওয়ার তাই হলো। ভাঁটা পড়ার দরুণ ওদের নৌকোটা চড়ায় আটকে গেলো। ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করলো নৌকোটাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে জলে ভাসাবার জন্য। কিন্তু জলসিক্ত ভিজে বালির ওপর থেকে নৌকোটাকে এক চুলও সরাতে পারলো না। বার বার ব্যর্থতা ওদের হতাশ করে ফেললো। তখন নাবিকদের রীতি অনুযায়ী যা করণীয় তা হলো, পরবর্তী জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করা। শেষ পর্যন্ত এরকমই এক্টা সিদ্ধান্ত নিতে হলো ওদের।



সময়ের হিসেব অনুযায়ী পরবর্তী জোয়ার দশ-বারো ঘণ্টার আগে আসছে না। আর ততক্ষণে রাতের অন্ধকার নেমে আসবে দ্বীপে। এই সুযোগ। তাই আমি যুদ্ধের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো সেই সব নাবিকরা দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য সমুদ্রতীর থেকে চলে গেলো। তবে তারা বন্দী তিনজনকে একটা গাছের নিচে বসিয়ে রেখে গেলো।

আমার যুদ্ধ করার পরিকল্পনা হলো, ওই আটজন নরখাদক জহ্লাদ নাবিকদের হাতে বন্দী তিনজন নাবিকদের উদ্ধার করা। আটজন নাবিক দ্বীপ ঘুরে বেড়াতে চলে গেছে। এই সুযোগে বন্দীদের কাছে গিয়ে জানতে হবে তারা কিভাবে আর কেনই বা বন্দী হলো এবং তাদের মুক্তির জন্য আমার তরফ থেকে তাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা?

এইসব কথা মাথায় রেখে আমি পা টিপে টিপে ওদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। স্প্যানিশ ভাষায় ওদের জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমরা কোথা থেকে আসছো আর তোমরা কোন্ দেশেরই বা লোক বলবে?'

হঠাৎ আমাকে দেখে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালাবার জন্য উদ্যত হতে দেখে আমি ওদের আশ্বস্ত করতে বললাম, 'তোমরা অহেতুক ভয় পাছো, মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো, আমি তোমাদের শত্রু নই, তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে আসিনি। আমি তোমাদের বন্ধু, তোমাদের উপকার করার জন্যে এসেছি এখানে। আমি তোমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই এসেছি।'

আমার এই মর্মস্পর্শী আবেদনে সাড়া দেবার জন্য ওদের মধ্যে একজন তার মাথা থেকে টুপিটা সরিয়ে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'বন্ধু তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি জানো, তুমি যতোই আমাদের বাঁচার আশ্বাস দেও না কেন, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীর কোনো শক্তিই বাঁচাতে পারবে না কারণ আমাদের মৃত্যুর ঠিকানা ইতিমধ্যেই রচনা করা হয়ে গেছে!' তার দু'চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কথায় আছে মানুষের মৃত্যু একবারই হয় দ্বিতীয়বার নয়। আর আমাদের বেলায় বলা যায় যে, মৃত্যু আমাদের ইতিমধ্যেই একবার হয়ে গেছে। তাই বলছি, তুমি আমাদের মৃত্যুর হাত থেকে কি বাঁচাবে? মৃত্যু তো আমাদের একবার হয়েই গেছে। এখন দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কথা আমরা ভাবতেই পারি না।'

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে আবার বললাম, 'আমার সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আছে, তোমাদের শত্রু যতো শক্তিশালী হোক না কেন, আশা করি এই সব অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ দিয়ে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমিই জয়ী হবো। তাই তোমাদের কোনো ভয় নেই, কি হয়েছে তোমাদের এখন সব খুলে বলো আমাকে।'

'সে অনেক কথা, এক কথায় বোঝানো যাবে না। তবুও সংক্ষেপেই বলছি শোনো!' এই বলে লোকটা তার বক্তব্য শুরু করলো এইভাবে ঃ 'জানো, ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি। আমার নাবিকেরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমাকে বন্দী করে এখানে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে আমার একজন মেট আর আমার জাহাজের একজন যাত্রীকে। এখানে আমাদের নিয়ে আসার উদ্দেশ্য আমি জানি, ওরা আমাদের হত্যা করে আমাদের মাংসের ভোজ সারবে বিজয়োল্লাসে।'

'তা ওরা কোন্‌দিকে গেছে দেখেছো?' আমি তাকে আরও জিজ্ঞেস করলাম, জাহাজের ক্যাপ্টেনের বদলে এবার তার মেট জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে উত্তর দিলো, 'সম্ভবত ওরা ওখানে বিশ্রাম নিতে গেছে।'

'ওদের কাছে বন্দুক থাকতে দেখেছো?'

এবারেও মেট জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে মাত্র দুটো বন্দুক আছে।'

'আটজন নাবিকের হাতে মাত্র দুটি বন্দুক। তাছাড়া তোমরা বলছো, জঙ্গলে ওরা বিশ্রাম নিতে গেছে। আর বিশ্রাম নেওয়া মানেইতো ঘুমিয়ে পড়া। অতএব ঘুমন্ত অবস্থায় যখন থাকবে তখন আমার বিশ্বাশ খুব সহজেই আমরা সবাই মিলে ওদের খতম করে ফেলতে পারবো। আমার কাছে কয়েকটা বাড়তি বন্দুক আছে, যা তোমরাও ব্যবহার করতে পারবে। তা তোমরা বন্দুক চালাতে জানো তো?

ওরা তিনজনেই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

'আমি আর আমার সঙ্গী ফ্রাইডেও বন্দুক চালাতে জানি। ওকে আমি নিজের হাতে বন্দুক চালানো শিখিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় অযথা বন্দুক চালিয়ে ওদের হত্যা করাটা ঠিক হবে না। তার ফলে সেটা আমার পক্ষে বর্বরতারই পরিচয় দেওয়া হবে যা আমি চাই না, কারণ আমার বিবেকে বাঁধবে। তার চেয়ে অক্ষত অবস্থায় ওদের বন্দী করাটাই ঠিক হবে। তা ক্যাপ্টেন, তুমি কি বলো?'

আমার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনে ক্যাপ্টেন বললো, 'ওদের মধ্যে দু'জন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক আছে, যারা আমাদের এই সর্বনাশের পাণ্ডা, ওদের বাঁচিয়ে রাখলে পরে ওরাই আবার নিজমূর্তি ধারণ করে আমাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে পারে। তখন হয়তো ওদের সামলানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তাই আমার মতে ওদের একেবারে খতম করাটাই ঠিক হবে।'

'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন, তোমার পরামর্শ মতোই কাজ হবে,' উত্তরে আমি বললাম, 'আমি তোমাদের জীবনরক্ষা করতে পারি দুটি শর্তে। আমার প্রথম শর্ত ঃ এই দ্বীপে তোমরা যতোদিন থাকবে প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতিটি নির্দেশ তোমাদের মেনে চলতে হবে। এ আমার হুকুম বলেও ধরে নিতে পারো। আর দ্বিতীয় শর্ত ঃ যারা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তোমাদের বন্দী করেছে, তাদের হাত থেকে জাহাজটা

উদ্ধার করতে পারি, তাহলে আমাকে আর আমার সঙ্গীকে বিনা খরচে তোমাদের জাহাজে করে ইংলণ্ডে পৌঁছে দিতে হবে। বলো আমার এই দুটি শর্তে তুমি রাজী আছো কিনা ক্যাপ্টেন!'

'রাজী হওয়ার প্রশ্ন তুমি তুলছো কেন বন্ধু!' উত্তরে ক্যাপ্টেন গদগদ হয়ে বলে উঠলো, 'জাহাজটা তুমি উদ্ধার করতে পারলে তুমিই হবে তার ক্যাপ্টেন। 'এ আমার আগাম প্রতিশ্রুতি। তাই তোমার সব শর্তই আমি নিঃসংকোচে মেনে নিচ্ছি।'

'সে তো খুব ভালো কথা, এসো, এবার সবাই মিলে আলোচনা করা যাক, আমাদের পরবর্তী করণীয় কাজ কি হবে।'

আমাদের সেই আলোচনায় স্থির হলো, আমরা সবাই একসাথে ঘুমন্ত নাবিকদের আক্রমণ করবো। প্রথমে ওদের দিকে আমাদের পাঁচজনের বন্দুকের নল তাক করে ফাঁকা গুলির আওয়াজ করবো। তাতে যদি তারা ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করে আমরা তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবো। প্রাণে মারবো না। আর যদি ওরা ওদের গোঁ ধরে থেকে আমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায় তখন বাধ্য হয়ে আমরা সত্যিকারের গুলি ছুঁড়বো, তাতে কারোর মৃত্যু হলে আমাদের বিবেকের যন্ত্রণা বলতে কিছু থাকবে না। এতে তোমাদের কারোর কোনো আপত্তি আছে? আর ক্যাপ্টেন, তোমার কিছু..............'

'তোমার সব নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। কিন্তু—

'কিন্তু কি? থামলে কেন ক্যাপ্টেন, তোমার কথা শেষ করো!'

'পালের গোদা ওই দুজনকে কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া চলবে না, এমন কি তারা যদি ক্ষমাও চায়।'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি ক্যাপ্টেন, ক্ষমাই মানুষের ধর্ম। তাছাড়া তোমাকে আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করলে ওদের কেউই রেহাই পাবে না, আমাদের হাতে মৃত্যু তার অনিবার্য। আর এ কথাও ঠিক যে, ওই পালের গোদা দু'জন বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবে না। অতএব এক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছাই পূরণ হবে। আমি কি বলতে চাইছি এবার বুঝতে পারলে তো?'

'হ্যাঁ, আমি বুঝেছি আর তোমার কথায় আমি খুবই সন্তুষ্ট।'

'বেশ তো, এবার তাহলে রওনা হওয়া যাক,' আমি বললাম, 'তবে তার আগে আমার তাঁবুতে একটু সময়ের জন্যে তোমাদের যেতে হবে। কারণ সেখান থেকে তোমাদের জন্যে আরও তিনটে বন্দুক সংগ্রহ করতে হবে।'

'ঠিক আছে, তাই চলো।'



এর পর আমরা জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে আসছে দ্বীপে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জঙ্গলে অন্ধকার বেশী করে ঘনীভূত হচ্ছে। লম্বা লম্বা গাছগুলোর গুঁড়ি আর বড় বড় ডালপালা। অস্পষ্টভাবে দেখা গেলেও পাতাগুলো রাতের অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আমাদের দলের পাঁচজনের ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আমরা যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে পা ফেলার চেষ্টা করছি, তবু বোধহয় আমাদের কারোর পদক্ষেপ একটু জোরে পড়ে

থাকবে শুকনো ঝরা পাতার ওপর আর তাতেই আমাদের পায়ের শব্দে একজন নাবিকের ঘুম ভেঙে যায়। জেগে উঠে সে চিৎকার করতেই আমরা বিপদের গন্ধ পেয়ে গেলাম। আমরা তৈরী হয়েই এসেছিলাম। তাই কালবিলম্ব না করেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে শুরু করলাম। ফাঁকা আওয়াজ নয়, সত্যিকারের গুলির আওয়াজে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়লো। গাছের ডালে ডালে আধোঘুমে ঘুমিয়ে থাকা পাখিরা জেগে উঠে কলরব করতে শুরু করে দিলো। শুনে মনে হলো, এই মাত্র বুঝি ভোর হলো।

বিদ্রোহী দু'জন পালের গোদার মধ্যে একজন জাহাজের ক্যাপ্টেনের গুলিতে নিহত হলো, আর অপরজন জখম হলো মারাত্মকভাবে। সে তখন তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসার জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন তার বিরুদ্ধে নাবিকটির বিদ্রোহ করায় প্রতিশোধ নিতে তাকে সাহায্য করার বদলে এগিয়ে গিয়ে মাথায় বাঁট দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে করতে বললে, 'আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দরুণ এটা তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বুঝলে হে! যাই হোক, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি শুধু এইটুকুই প্রার্থনা করতে পারি তোমার জন্য, এর বেশী কিছু করতে পারি না। আর করার ইচ্ছেও নেই আমার।'

মৃত্যুপথযাত্রী বিদ্রোহী লোকটা ক্যাপ্টেনের শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না। কারণ তার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম তখনি।

ওদিকে হঠাৎ আমাদের সম্মিলিত আক্রমণে অন্যসব নাবিকরা ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন, তারা তখন একেবারে দিশেহারা, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তবে তারই মাঝে তারা নিজেদের মধ্যে সংক্ষেপে আলোচনা সেরে নিয়ে তাদের কর্তব্য স্থির করে ফেললো। তারা তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্যাপ্টেনের কাছে তাদের সব অপরাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তারা সবাই আত্মসমর্পণ করলো। তাদের কোনো দাবী-দাওয়া নেই, তারা ওদের সব ভাগ্য ক্যাপ্টেনের সুবিচারের ওপর ছেড়ে দিলো।

ক্যাপ্টেন ওদের পরাজিত মনোভাব দেখে নিজের মনেই বললো, এই তো সুযোগ। সে এখন যা বলবে তাই তারা করতে বাধ্য। তাই সে ওদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিলো যে, ভবিষ্যতে ওরা আর কোনোরকম বিরোধিতা করবে না, আর ওরা তার একান্ত অনুগত হয়ে তার দাবী মতো সর্বতভাবে সাহায্য করে যাবে। তারপর জোয়ার এলে জাহাজ নিয়ে রওনা হবে জামাইকার দিকে। ক্যাপ্টেনের এই সিদ্ধান্ত মতো ওরা এ কাজে তাকে সবরকমভাবে সাহায্য করে যাবে, কোনোরকমভাবে তার নির্দেশ অমান্য করবে না বলে অঙ্গীকার করলো।

জাহাজের ক্যাপ্টেন তার কাজে সাফল্য পাওয়ার পর আমার দিকে তাকালো আমার পরবর্তী নির্দেশের জন্য।

আমি ওদের নির্দেশ দিলাম, বন্দীদের আপাতত নিষ্ক্রীয় করার জন্য ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখার জন্য।

এদিকে যখন এতো সব কাণ্ডকারখানা ঘটে যাচ্ছে একের পর এক, আমি তখন আমার পরিকল্পনা মাফিক আমার একান্ত অনুগত ফ্রাইডেকে জাহাজের একজন মেট-এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি নৌকোর দখল নেওয়ার জন্য।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে অন্যসব নাবিকরা যে যেদিকে পেরেছিল পালিয়েছিল। এখন

তারাই আবার ফিরে এসেছে। ক্যাপ্টেনকে মুক্ত অবস্থায় দেখে ওরা একটুও ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে তার বশ্যতা স্বীকার করলো। ক্যাপ্টেন কিন্তু তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে অন্যদের সঙ্গে ওদেরও বন্দী করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করলো, ওরা কেউই প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ করলো না।

যুদ্ধে এমন সহজ ভাবে আমাদের জয় হবে ভাবতেও পারিনি। এ যেন ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া। বিদ্রেহী নাবিকরা সবাই তখন আমাদের হাতে বন্দী শুধু নয়, ওরা সবাই ক্যাপ্টেনের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। ওরা এখন তার একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছে। পালের গোদা ওই দুজন বিদ্রোহী নেতা ছাড়া আর কারোর রক্তক্ষয় হয়নি। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তেমন রক্তপাত ঘটলো না, এ যেন ভাবা যায় না। যাই হোক, এর ফলে তাদের ভাবনা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলো। চিন্তামুক্ত মন নিয়ে তারা এখন তাদের পরবর্তী কাজগুলো আশা করা যায় নির্বিঘ্নেই করতে পারবে, আমি অন্তত তাই মনে করলাম।

।। দশ ।।

ঃ সে এক অভিনব কৌশল ঃ

এখন আমাদের সামনে একটা নির্ভাবনাময় জীবনের হাতছানি, অখণ্ড অবসর। তাই আমি ও ক্যাপ্টেন এবার নিজেদের জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী শোনালাম। ভাগ্যের এ কি খেলা? এই দ্বীপে আমার থাকার কথা নয়, আর না থাকলে ক্যাপ্টেনের কি পরিণতি যে হতো, সে কথা ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। আমার আবার মনে হলো, হয়তো ক্যাপ্টেনের জীবন রক্ষা করতেই এই দীর্ঘ বেশকয়েক বছর আমি এই দ্বীপে অস্বাভাবিক ভাবে বেঁচে ছিলাম হয়তো করুণাময় ঈশ্বরের দয়াতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আমাকে সমর্থন করে ক্যাপ্টেন আমার কথাগুলো ফিরে আবার ভাবতেই তার দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামলো। আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, 'গতশ্চ শোচনা নাস্তি!' অতীতের কথা ভুলে যাও, অতীতের কথা ভাবলে কেবল দুঃখ-বেদনার পাহাড় জমে ওঠে। তাই অতীতের কথা না ভেবে বর্তমানের কথা চিন্তা করো। এর পর আমাদের কি করতে হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছো?'

'তুমি যা ঠিক করবে তাতেই আমার সায় থাকবে। আমার চিন্তা যেন এখন কোনো কাজ করছে না।'

'ঠিক আছে, এখন চলো আমার আস্তানায় যাওয়া যাক। সেখানে বসেই আমরা আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবো।

কাহিনী শেষ হতেই ক্যাপ্টেন আর তার দুজন সঙ্গীকে আমার তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। আর আমার সাধ্যমতো ঘরে যা ছিল তা দিয়েই আমি আমার আপ্যায়ন সারলাম।



বাইরের চারপাশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেনকে বেশ মনোযোগসহকারে, আমার আস্তানাটা দেখতে দেখে বললাম, 'এই হলো একাধারে আমার আস্তানা আবার অন্যদিকে

দুর্গও বলতে পারো। এছাড়া দ্বীপের অন্যদিকে আমি একটা বাগানবাড়িও বানিয়েছি। সময় আর সুযোগ পেলে পরে সেটা দেখিয়ে আনবো তোমাকে। তবে তার আগে আমাদের এখানকার অবস্থানটা সুদৃঢ় করে তুলতে হবে যাতে করে আমাদের শত্রু পক্ষ ফিরে আবার আক্রমণ করতে পারে।'

আমার কথার জের টেনে ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'জাহাজে এখনও ছাব্বিশজন নাবিক রয়েছে। ওদের লোককে আমরা বন্দী করে রেখেছি, খবরটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওদের কাছে চলে গেছে। তাই তাদের উদ্ধার করার জন্যে ওরা এখন মরীয়া হয়ে লড়বে। কারণ তারা জানে, বিদ্রোহের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। দেশে ফিরে সেই শাস্তি ওদের দেবার ব্যবস্থা করা হবে। তাই ভাবছি। আমরা মাত্র এই কয়জন ছাব্বিশজন ক্রুদ্ধ নাবিকের সঙ্গে লড়াই করতে কি পারবো?'

'শরীরের শক্তিতে ওদের সঙ্গে আমরা যে পেরে উঠবো না, এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বুদ্ধির খেলায় আমরা ওদের ঠিক হারিয়ে দেবো সংখ্যায় ওরা যতো বেশীই হোক না কেন। আবার এও ভেবে দেখলাম, দলের অন্য সাথীরা ফিরছে না দেখে একটু পরেই জাহাজের উপস্থিত নাবিকরা চিন্তায় পড়ে যাবে। তখন তারা যদি নৌকো করে তীরে এসে তাদের সাথীদের সন্ধান করে ফেরে তাতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে ওদের লক্ষ্য এখন তীরে পড়ে থাকা নৌকোটার ওপরে। ওদের এই মতলবের কথা আগে-ভাগে অনুমান করে নিয়ে নৌকোটার বেশ কয়েক জায়গায় ফুটো করে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিলাম। বাছাধনরা আর এই ফুটো নৌকো ব্যবহার করতে পারবে না। ওদের টাইট দেবার ব্যবস্থা একেবারে পাকাপাকি করে ফেললাম।

ঠিক এর পরেই জাহাজের দিক থেকে পর পর কয়েকটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে শুনলাম। হয়তো জাহাজের অবশিষ্ট নাবিকরা নৌকো নিয়ে ওদের সহযাত্রীদের ফিরে আসার জন্য গুলির আওয়াজের মাধ্যমে ইশারা করছে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিস্কোপটা চোখে লাগিয়ে দেখি, জাহাজের নাবিকরা ওদের সংকেতের কোনো উত্তর না পেয়ে ওরা এবার জাহাজ থেকে আর একটা নৌকো নামিয়ে দিলো, সেটা আমাদের দ্বীপের তীরের দিকে ভেসে আসছে। নৌকোটা কাছে এলে দেখলাম তাতে কম করেও দশজন নাবিক রয়েছে।

শত্রুপক্ষের লোকবল দেখে ক্যাপ্টেনকে ভীষণ ভয় পেতে দেখলাম। আমি তাকে আশ্বস্ত করতে বললাম, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি তো আছি। বুকে বল আনার চেষ্টা করো।' এতে কাজ হলো, আমার মৌখিক আশ্বাস পেয়ে মনে হলো সে কিছুটা সাহস ফিরে পেলো।

এর পর যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে বন্দীদের মধ্যে যে তিনজনকে ক্যাপ্টেন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বলে মনে করলো তাদের হাত-পা একসঙ্গে বেঁধে ফ্রাইডের সঙ্গে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলাম। সেখান থেকে ফ্রাইডে ওদের তাঁবুর পিছনের গুহায় নিয়ে গিয়ে গুহাবন্দী করে রাখবে। আর অন্য সব বন্দীদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেনের বিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে ওদের সঙ্গী করে নিলাম আমাদের দলের। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুদেরই লেলিয়ে দিতে চাইছি।

তারপর আমার অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে তৈরী হলাম যুদ্ধ শুরু করার জন্য।

এদিকে দ্বীপের পাড়ে এসে নাবিকের দল হৈ চৈ করতে করতে নৌকো থেকে নেমে পড়লো।

পাড়ে নেমেই তারা ছুটে গেলো অন্য নৌকোটার কাছে। আর সেটার ফুটো দিয়ে নৌকোয় জল ঢুকে যেতে দেখে তারা খুবই অবাক হলো। এখন ওদের আশঙ্কা, ওদের সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে থাকবে। এই সব কথা ভেবে ওরা তখন ওদের সহযাত্রীদের নাম ধরে চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'আমরা তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি, তোমরা যে যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের নৌকোর সামনে ফিরে এসো। তারা যে ভীষণ ভয় পেয়েছিল, সেটা পরবর্তীকালে তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখে তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। প্রাণের ভয়ে তীর ছেড়ে কেউ এক পাও নড়লো না। ভয় তাদের জঙ্গলকে, আর জঙ্গলের জানোয়ারদের থেকে দ্বীপের মানুষগুলোকেই যতো ভয় ওদের।

হঠাৎ তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিয়ে বিদ্রোহী নাবিকের দল ওদের নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু ওরা এভাবে ফিরে গেলে তো চলবে না, আমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। শেষে দেখা যাবে, ওরা আমাদের বোকা বানিয়ে আপাতত তাদের দেশে কিংবা অন্যত্র চলে গেছে পরে নতুন উদ্যমে এবং আরও বেশী সংখ্যায় লোক এনে আক্রমণ করবে আমাদের ওপরে। কি করে এখন ওদের এই নতুন পরিকল্পনা বানচাল করা যায়। কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ একটা মতলব আমার মাথায় এসে গেলো। আর সেই মতলবটা বাস্তবায়িত করার জন্য ফ্রাইডে আর ক্যাপ্টেনের মেটকে কাছে ডেকে পরামর্শ দিলাম, আড়াল থেকে ওদের ডাকে সাড়া দেবার জন্য আর এইভাবে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে ওদের প্রতিটি ডাকে সাড়া দিতে দিতে বারবার তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হবে, এই দ্বীপে চলে আসার জন্য। কি সুন্দর এই দ্বীপ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব পরের মুখে ঝাল না খেয়ে এই মুহূর্তে তাদের উচিত হবে, জলের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এই দ্বীপে চলে আসা। আর এইভাবেই গোটা শত্রুপক্ষের দলটাকে এই দ্বীপের ভেতরে নিয়ে আসা যেতে পারে।

আমি আগেই বলেছি, দলে আমরা ভারি না হলেও, এমন কি শক্তিতে ওদের থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে থাকলেও বুদ্ধিতে কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। আর এই বুদ্ধির খেলাতেই আমরা কিস্তি মাৎ করতে চাই।

আমার এই অভিনব কৌশলে কাজ হলো আমাদের বিপক্ষ মহান শক্তিধর ছাব্বিশজন নাবিক আমাদের সেই অভিনব ফাঁদে পা না দিয়ে থাকতে পারলো না। মাত্র দুজন নাবিককে তাদের দ্বিতীয় নৌকোয় পাহারায় রেখে বাকী ছাব্বিশজল নাবিকদের সবাই আমাদের পরিকল্পিত অদৃশ্য ডাক লক্ষ্য করে দ্বীপের অভ্যন্তরের দিকে পা বাড়ালো তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছায়। আর এদের কাছে এটাই স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হলো।

আগেই বলেছি, আমাদের বন্দী শত্রুদের যারা শপথ নিয়ে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই বলে যে, তারা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে এবার থেকে আমাদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কারোর হয়ে কাজ করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপাতত আমরা তাদের ওপর ঠিক মতো আস্থা রাখতে পারলাম না। তাই এখন আমাদের লোকবল বলতে মাত্র এই পাঁচজন। আর এই পাঁচজনের শক্তিকে সম্বল করেই আমরা প্রথমেই অতর্কিতে নৌকোয় এই দুজন প্রহরীকে আক্রমণ করে বসলাম। এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেনের ভূমিকা অপরিসীম। সে নিজেই তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একজনকে নিমেষে ধরাশায়ী করে ফেললো। অবশ্য দ্বিতীয়জনের বিরুদ্ধে কোনো রকম বলপ্রয়োগ করতে

হলো না সে নিজেই ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে তখনি আত্মসমর্পণ করলো শুধু না, সে নিঃশর্তে আমাদের দলে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলো।



ওদিকে ফ্রাইডে আর মেট-এর ডাকের হাতছানি আর ওদের ডাকের প্রত্যুত্তরে অনুসরণ করতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিল ওরা। তাই ভীষণ ক্লান্তিতে জাহাজের নাবিকদের দলের অবশিষ্টরা কোনো রকমে পা টলতে টলতে একসময় ফিরে এলো ওদের পরিত্যক্ত সেই নৌকোটার কাছে। পাহারায় ওরা ওদের দু'জন সহকর্মীকে নৌকোয় রেখে গেছিলো। তাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো ওরা। দুজন নাবিকের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটা ওরা ভালো চোখে দেখতে পারলো না।

এদিকে ভাঁটা পড়ে যাওয়ার দরুণ জল সরে গিয়ে ওদের নৌকো এখন বালির চড়ায় আটকে গেছে। দশ-বারো ঘণ্টা পরে জোয়ার আবার ফিরে না এলে দূরে জাহাজে পৌঁছনো কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু এই দীর্ঘ দশ-বারো ঘণ্টায় তাদের জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দিতে পারে যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। এই সময় ওরা ওদের সেই দু'জন নিরুদ্দেশ হওয়া সঙ্গীর অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলো। তাই ওরা তখন ভয়ার্ত কণ্ঠে হারানো সঙ্গী দু জনের নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিলো, কিন্তু কোনো কাজের কাজ হলো না, ওদের সেই ডাক দ্বীপের পাহাড়ের গা থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে থাকলো।



যেদিক থেকে নাবিকদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, আমি ফ্রাইডে আর ক্যাপ্টেনকে বললাম, সেই দিক অনুসরণ করে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে শত্রুদের একান্ত কাছে গিয়ে পৌঁছতে, তারপর ওদের বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে পেলে সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

আমার পরামর্শ মতো ওরা কিছুক্ষণ একটা টিলার পাশে নিজেদের আড়াল করে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতেই নাবিকদের নেতা তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কিছু না জেনেই অজ্ঞাতসারে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ওরা তাদের খুব কাছে আসতেই ক্যাপ্টেন আর ফ্রাইডে অতর্কিতে লাফিয়ে টিলার উপর উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দলের নেতাকে সরাসরি লক্ষ্য করে গুলি চালালো। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সে আর তার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দ্বিতীয়জন গুলির আঘাতে ভীষণভাবে আহত হলো, আর দলনেতার দ্বিতীয় সাগ্‌রেদ অবশ্য অক্ষত অবস্থায় ছুটে পালিয়ে গেলো সেখান থেকে।

পালিয়ে সে যাবেই বা কোথায়? নিশ্চয়ই সে তার দলের অন্য সব নাবিকদের কাছে ফিরে গেছে। আর তদের কাছে দলনেতার মৃতু ও একজন সঙ্গীর গুরুতরভাবে আহত হওয়ার খবর দিয়ে থাকবে। এর পর নিশ্চয়ই ওরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। সংখ্যায় ওরা আমাদের থেকে অনেক বেশী। তাই ওরা ওদের লোকবলের ওপর ভরসা করে ওদের সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে থাকবে যে সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে ওদের লোকবলের চেয়ে অনেক কম আমাদের। তাই স্বভাবতই আমরা ওদের থেকে খুবই দুর্বল।

সংখ্যাতত্ত্ব! মাথামোটা নাবিকের সংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধে জেতা যায় না। ওরাও পারবে না। তার প্রমাণ তো আমরা শুরুতেই পেয়ে গেছি। এদের চোখের সামনে ওদের দলনেতাকে হত্যা করলাম। আর তার একজন সাকরেদকে গুরুতর ভাবে আঘাত করেছি। আর এসবই সম্ভব হয়েছে লোকবলে নয় বুদ্ধির বলেই।

আর সেই বুদ্ধির বড়াই করবো না, বরং বুদ্ধির জোরে বললেই বোধহয় যথার্থ হয়। হ্যাঁ, এই কারণেই আমি আমার সীমিত লোকবল নিয়ে সেই মুহূর্তে আমি আমাদের দলের অবশিষ্ট নাবিকদের নিয়ে রাতের সেই গাঢ় অন্ধকারেই শত্রুদের আক্রমণ করে বসলাম।

দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই গুলি বিনিময় হলো। এক সময় আমাদের শত্রুপক্ষের তরফ থেকে গুলি বর্ষণ বন্ধ হতেই আমি ও আমার দলের লোকদের অযথা গুলি খরচ করতে নিষেধ করলাম। তারপর আমার দলের একজন নাবিককে বললাম শত্রুপক্ষকে জিজ্ঞেস করো আত্মসমর্পণ করতে ওরা রাজী আছে কিনা।

সে তখন তার একদা সঙ্গী টম স্মিথ নামে একজন নাবিকের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'টম, তোমরা আমাদের হাতে ধরা দিতে রাজী আছো?'

টন জানতে চাইলো, 'কে রবিনসন, তুমি কথা বলছো?'

'হ্যাঁ টম, তুমি ঠিকই ধরেছো,' উত্তরে রবিনসন বলল, 'আমি তোমাদের আর আমাদের সবার ভালোর জন্যেই বলছি, তোমাদের হাতের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে এখনি আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের গুলি ছোঁড়া বন্ধ হতে দেখে মনে হচ্ছে তোমাদের কার্তুজের ভাণ্ডার বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে, ঈশ্বর যা করেছেন সব মঙ্গলের জন্যেই।' রবিনসন এবার যুদ্ধে যেরকম অপপ্রচার করা হয়, ঠিক সেরকম কায়দায় আমাদের প্রকৃত শক্তি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলল, 'শোনো টম, তোমাদের আমি আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পঞ্চাশজনেরও বেশী একটা সশস্ত্র দল রয়েছে। আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

টম এবার আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলো, 'আত্মসমর্পণ করলে ক্যাপ্টেন আমাদের ঠিক ক্ষমা করবেন তো?'

এবার ক্যাপ্টেন নিজেই সরাসরি উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ স্মিথ আমি কথা দিলাম, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমাদের মতো বিশ্বাসঘাতক হবো না। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, একমাত্র উইল অ্যাটকিন্স ছাড়া বাকী সবাইকেই আমি ক্ষমা করে দেবো।'

ক্যাপ্টেনের এমন সর্বনাশা কথা শুনে উইল অ্যাটকিন্স ছোটছেলের মতো হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো, এবং তেমনি কান্না জড়ানো স্বরে বললো, 'আমাকে দয়া করুন ক্যাপ্টেন, আমাকে প্রাণে মারবেন না। অন্যদের আপনি ক্ষমা করে দেবেন বলেছেন। তাই খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, অন্যদের চেয়ে আমি কি এমন বেশী অপরাধ করেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না?'

অ্যাটকিন্সের এমন সাফাই গাওয়ার কথা আদৌ সত্যি নয়। তার অপরাধ অন্য নাবিকদের থেকে অনেক বেশী গুরুতর, যা কিনা ক্ষমার অযোগ্য। হ্যাঁ, সেই প্রথম ক্যাপ্টেনকে বন্দী করেছি। আর তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধবার সময় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিল তাকে। সেসব কথা কি ভুলতে পারে ক্যাপ্টেন? তাই ক্যাপ্টেন তাদের অপরাধের বিচারের প্রসঙ্গটা একটু ঘুরিয়ে এমনভাবে

বলল যাতে তার শত্রুপক্ষরা মনে করে এ ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। 'ঠিক আছে, তোমরা আগে ধরা তো দাও, তারপর এই দ্বীপের যিনি রাজা, তিনিই তোমাদের বিচার করবেন। তখন তুমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ অবশ্যই একটা পাবে।'

দ্বীপের রাজা বলতে এখন ক্যাপ্টেন আমার কথাই বোঝাতে চাইল উইল অ্যাটকিন্সকে। মনে মনে আমি খুব গর্ববোধ করলাম। আর সেই সঙ্গে ভাবলাম, ক্যাপ্টেন তাহলে একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়।

এতে কাজ হলো। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতো বিদ্রোহী নাবিকরা সবাই এবার এক এক করে ধরা দিতে শুরু করলো।

ওরা সংখ্যায় ছিল চব্বিশজন। এদিকে ক্যাপ্টেনের মিথ্যে প্রচার মতো আমার পঞ্চাশজন সৈন্য, আসলে মাত্র আটজন ছিল তখন, তারাই এগিয়ে গিয়ে কৌশলে তাদের বন্দী করে বেঁধে ফেললো এক এক করে। অস্ত্রশস্ত্র যা অবশিষ্ট ছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হলো। এমন কি ওদের নৌকোটারও দখল নিয়ে ফেললো আমাদের লোকেরা।

এই মুহূর্তে আমি প্রকাশ্যে আসতে চাইলাম না। বিশেষ একটা কারণে আপাতত নিজেকে আমি শত্রুপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে রাখলাম। ওদের কাছে আমার এই অনুপস্থিতি নিয়ে আমার লোকেরা কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না, এমন কি ক্যাপ্টেনও নয়। এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের ওপর ক্যাপ্টেনের যে অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা আছে তা তার নীরবতাই প্রমাণ করে দেয়। আমার কোনো কৈফিয়তই দিতে হয় না।

।। এগারো ।।

ঃ এবার ফেরার পালা ঃ

এবার আমাদের ফেরার পালা, আর তার প্রস্তুতি হিসেবে আমাদের এখন প্রথম কাজ হলো নৌকোদুটোকে সারিয়ে নিয়ে জলে ভাসানো। তারপর নৌকোয় পাড়ি দিয়ে জাহাজ দখলের মতলব করা।

ওদিকে বন্দীশিবিরে গিয়ে ক্যাপ্টেন সবাইকে আর একবার মনে করিয়ে দিলো, তারা যে অন্যায় করেছে, তার প্রতি অবিচার করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, রাজার বিচারে তার চরম শাস্তির জন্য তারা যেন প্রস্তুত থাকে।

তবে প্রত্যেক বন্দীই কাতর মিনতি জানালো ক্যাপ্টেনকে, 'আমরা আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার প্রতি আমরা যে অন্যায় করেছি তার জন্যে আমরা অনুতপ্ত। আমরা কি কোনোমতেই আপনার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি না ক্যাপ্টেন?'

উত্তরে ক্যাপ্টেন ওদের বোঝালো, 'তোমরা এখন আর আমার বন্দী নও। আসলে তোমরা এখন এই দ্বীপের রাজার বন্দী। এই দ্বীপের রাজা একজন ইংরেজ। এখন তোমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে সেই রাজার মর্জির ওপর। তিনি যদি মনে করেন তোমাদের ফাঁসি হওয়া উচিত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা কাজে পরিণত করবেন। আর যদি তোমাদের দেখে তাঁর মনে দয়া জাগে তাহলে তিনি তোমাদের প্রাণ বাঁচাতেও পারেন। আর যদি তিনি তোমাদের ক্ষমা করেন, তবুও দেশে ফিরে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের আইন অনুযায়ী তোমাদের বিচার হবে। সেখানে রাজার কোনো

কর্তৃত্ব থাকবে না। তিনি এই দ্বীপের রাজা, তাঁর সব কর্তৃত্বই সীমাবদ্ধ কেবল তাঁর রাজত্বে, অর্থাৎ এই দ্বীপে। এই দ্বীপের বাইরে যদি তোমরা যেতে চাও তাহলে এখানকার রাজার শাসন অবশ্যই তোমাদের মেনে নিতে হবে।'

ক্যাপ্টেনের এই হুমকিতে কাজ হলো। অ্যাটকিন্সসহ সবাই এবার ক্যাপ্টেনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ভঙ্গিমায় ক্রমাগত ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করতে থাকলো, রাজাকে বলে তাদের চিরতরে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আর তারা এ কথাও বললো, ক্যাপ্টেন যেন রাজাকে বলে দেয়, ওরা আর দেশে ফিরতে চায় না। এই দ্বীপেই থেকে যেতে চায় চিরদিনের জন্য।

'ঠিক আছে, তোমাদের অনুরোধ আর ইচ্ছার কথা আমি এই দ্বীপের রাজার কাছে সব খুলে বলবো। দেখি তোমাদের জন্যে আমি কি করতে পারি।'

এর পর ক্যাপ্টেন আমার কাছে এসে নাবিকদের ইচ্ছার কথা সব খুলে বললে আমার তখন বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না, শত্রুপক্ষের জাহাজের দখল নিতে গিয়ে আমাদের খুব একটা বাধা পেতে হবে না। তারপর আমি আমার পরিকল্পনার কথা সব খুলে বললাম ক্যাপ্টেনকে এবং তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'এই পরিকল্পনার কথা আমি আর তুমি ছাড়া কাক-পক্ষীও কেউ যেন জানতে না পারে, বুঝলে ক্যাপ্টেন!'

'হ্যাঁ বন্ধু, বুঝেছি। তোমার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো, আর তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার এই শেষ পরিকল্পনার কথা আমি ছাড়া তৃতীয় পক্ষ কেউ আর জানতে পারবে না।'

'ধন্যবাদ!'



পরের দিন সকালে বন্দীদের কয়েকজনকে প্রথমে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও যখন কোনো কাজ হলো না তখন সরাসরি ভয় দেখিয়ে আমাদের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী করালো ক্যাপ্টেন। এর পর পাঁচজন বন্দীকে সে ধরে নিয়ে এলো আমার কাছে। আমি ওদের প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই তাদের সামনে। তাতেও যখন কোনো কাজ হলো না, তখন আমি তাদের ক্যাপ্টেনের মতো ভয় দেখাতে বাধ্য হলাম। কোনো রকম বাচালতা দেখালেই ওদের সঙ্গীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে।

এটা তাদের কাছে যেন একটা চরম হুমকির মতো শোনালো।

এতে ওরা ভয়ঙ্কর ভয় পেলো এবং ওদের চোখ-মুখ দেখে মনে হলো, বিপক্ষ দলের কাছে এরা বুঝি হার মেনে বসে আছে। ওদের এই চাপা মনোভাবটা ওদের নেতা এক নাবিকের মুখে প্রকাশ পেতে দেখা গেলো। ওদের হয়ে ও জোর গলায় জানালো, ওদের রক্ষাকর্তার বিরুদ্ধে যাবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

যাদের আমরা আমাদের শত্রু বলে ভেবে এসেছি এখন তারা আর আমাদের শত্রু নয়। একটু আগে ওরা অন্তত সেই রকম প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে আমাদের। আর ওদের সহযোগিতা পেলে ওদের জাহাজ দখলের কাজটা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে যাবে তাই এর পর জাহাজ আক্রমণের জন্য আমাদের সৈন্যসজ্জা শুরু হয়ে গেলো।

প্রথমেই আমাদের লোকবলের হিসেব করতে গিয়ে দেখলাম, জাহাজের ক্যাপ্টেন, মেট আর তাদের বন্দী ও সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের প্রতিরোধ বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো মোট বারোজন। ওদিকে গুহায় পাঁচজন বন্দীকে রাখা হলো আমাদের নিরাপত্তার জন্যে।

জোয়ারের সময় এখন। জাহাজ দখলের উপযুক্ত সময় তো এখনই। তাই ওরা কালবিলম্ব না করে দুটো নৌকোয় সাতজন আর পাঁচজনের দুটি দলে ভাগ করে ওরা ভেসে চললো সমুদ্রে জাহাজ অভিযানের পথে। রাতের অন্ধকারে সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রে ছোট ছোট নৌকো দুটোকে খালি চোখে দেখতে পাওয়ার কথা নয় শত্রুপক্ষের। তাই ওরা একরকম বিনা বাধায় মাঝরাত নাগাদ জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

এবার আমাদের বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নির্দেশে রবিনসন জোর গলায় তার জাহাজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'দ্বীপের ঘন জঙ্গলে সাথীরা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছুটির মেজাজে আনন্দ উপভোগ করছিল। অনেক ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত ওদের সবাইকেই খুঁজে পেয়ে একত্রিত করতে পেরেছি, এ আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে। আর ওদের পাওয়া মাত্র জাহাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি দুটো নৌকোয় চেপে।' জাহাজে উপস্থিত অন্য নাবিকদের কাছে ওদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য রবিনসন এইভাবে ওদের মন জয় করার কথা বলতে বলতে নৌকোদুটো জাহাজের গায়ে ভিড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলো।

প্রথম নৌকো থেকে নেমে সবার আগে ক্যাপ্টেন আর মেট অস্ত্রসজ্জিত হয়ে উঠে গেলো জাহাজে। ওরা দু'জন মিলে অতি তৎপরতায় বেশ কয়েকজন নাবিককে ঘায়েল করে ফেললো। এরই মধ্যে দুটো নৌকোর অবশিষ্ট নাবিকরা জাহাজের ডেক-এ উঠে পড়েছিল। ওরা সবাই এবার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগ দিলো ওদের বিপক্ষ দলের নাবিকদের শায়েস্তা করার জন্য।

জাহাজের খোলের ভেতরে যেসব নাবিকরা বিশ্রাম নিচ্ছিলো, তারা যাতে বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে তার জন্য ডেকের পাটাতন-দরজাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্ত করে আটকে দেওয়া হলো।

ক্যাপ্টেন তার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিযান অব্যাহত রেখে একটা বন্ধ কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই কেবিনের ভেতরে তখন আসল বিদ্রোহী নেতা। যে তখন নিজেকে জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে ঘোষণা করে কায়েম হয়ে বসেছিল, খোশমেজাজে ঘুমোচ্ছিল সে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ক্যাপ্টেন ভেবেছিল সে বেশ সুরক্ষিত, কিন্তু সে জানতো না, সে কতখানি বিপন্ন, কেবিনের বাইরে তার মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে। আর তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে দু'জন নাবিক শাবল দিয়ে কেবিনের দরজা ভাঙতে শুরু করলো। ওদিকে দরজা ভাঙার শব্দ শুনে কেবিনের ভেতর থেকে শত্রুরাও চুপ করে বসে রইলো না। এলোপাতাড়িভাবে গুলি চালাতে শুরু করে দিলো। ক্যাপ্টেনের বিশ্বস্তসঙ্গী মেট-এর হাতে গুলি লাগলো, গুলি লাগলো অন্য দুজন নাবিকেরও, অল্পবিস্তর সবাই আহত হলো।

তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই মেট-এর। তার সঙ্গীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য সে চিৎকার করতে করতে অমন আহত অবস্থাতেই সে ঢুকে পড়লো অগ্নিগর্ভ কেবিনের ভেতরে। তারপর একটুও কালক্ষেপ না করে বিদ্রোহী নেতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি গুলি চালালো। গুলিটা গিয়ে বিঁধলো তার কানের ভেতরে, যাকে বলে একেবারে মরমে পশিল। প্রায় নিঃশব্দে তার নিষ্প্রাণ ভারি দেহটা কাঠের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

তাদের নেতার অমন মর্মান্তিক পরিণতি দেখে বিদ্রোহী নেতার সঙ্গীরা ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলো জাহাজের আসল ক্যাপ্টেনের কাছে।

রাতের অন্ধকারে জাহাজ জয়ের অভিযানের পরিসমাপ্তি এখানেই।

এদিকে জাহাজ দখল নেওয়ার পরেই ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সাত সাতটা বন্দুক থেকে একসঙ্গে গুলি ছোঁড়া হলো। এটাও আমার একটা পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। ক্যাপ্টেন যে তার অভিযানে সফল হয়েছে তা জানাবার জন্য এই রকম একটা সংকেত দেবার কথা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। আর আমিও এদিকে সমুদ্রতীরে রাত দুটো পর্যন্ত বসেছিলাম এই সংকেতধ্বনি শোনার অপেক্ষায়। বহু আকাঙ্খিত এই সংকেতটা পাওয়ার পর নিঃসন্দেহে আমি খুবই খুশী হলাম ওদের এই সাফল্যে। আজ সারাটা দিন আমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আমি এতোই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম যে, তাঁবুতে ফিরে বিছানায় শুতেই সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুম ভাঙলো গুলির আওয়াজে। আর সেই গুলির আওয়াজটা বন্ধ হতেই শুনতে পেলাম কে যেন আমাকে ''রাজা'' বলে সম্বোধন করছে। ভালো করে কান পেতে সেই ডাক শুনে এবার আমি ক্যাপ্টেনের গলা চিনতে পারলাম। হ্যাঁ, এ কণ্ঠস্বর আমার বহু পরিচিত, এখন চিনতে আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে সামনে টিলার ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখতেই ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই সে এবার সোল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'বন্ধু তুমি আমার নতুন করে জীবনদান করেছো। আর তার প্রতিদানে আমি এই নির্জন দ্বীপ থেকে তোমার মুক্তির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, ওই যে তোমার জাহাজ তোমার দেশে পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত। তুমিই ওই জাহাজের একাধারে মালিক আর ক্যাপ্টেনও বটে। আর আমরা সবাই তোমার কর্মচারী, মেট আর নাবিক। এখন তুমি জাহাজে চড়ে আদেশ করো কোথায় যেতে হবে।'

ওরা আমার মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে ? ক্যাপ্টেনের কথাগুলো সত্যি, নাকি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। না, তা কি করে সম্ভব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেগে জেগে কেউ স্বপ দেখে নাকি? না, এটাই সত্যি, এটাই বাস্তব। আমার মুক্তির বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে ক্যাপ্টেন।

সমুদ্রতীরের দিকে তাকিয়ে দেখি, জোয়ারের টানে আমার আস্তানার খুব কাছাকাছি নৌকো নিয়ে এসে ভিড়েছে ক্যাপ্টেন, আমাদের আগের জাহাজডুবির পর আমার নিজেরই তৈরী ভেলায় ভেসে ঠিক যেখানে এসে উঠেছিলাম আমি। প্রকৃত বন্ধুর মতোই কাজ করেছে ক্যাপ্টেন। ও আমার মুক্তিদাতা, আমার ত্রাণকর্তা। আসন্ন মুক্তির আনন্দে আমার মনের ভেতরটা এক ভয়ঙ্কর আবেগে যেন আপ্লুত হতে থাকে। আমার মুখে এখন কথা নেই, ভাষা নেই কিছু বোঝাবার। অতি আনন্দে সব মানুষই বোধহয় আমার মতো এমন বাক্যহারা হয়ে পড়ে।

নিঃশব্দে পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। তেমনি গভীর আবেগে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। আর সেও আমার মতোই তার বুকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। অভূতপূর্ব এক আনন্দে আমার শরীরটা তখন দমকে দমকে এমনভাবে কেঁপে উঠছিল যে, ক্যাপ্টেন যদি আমাকে ওভাবে জড়িয়ে না ধরতো তাহলে আমি হয়তো মাটিতে পড়েই যেতাম।

অনেকক্ষণ পরে সমুদ্রতীরের একটা জায়গায় দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। আমার বুকটা তখনও অপরিসীম এক আনন্দে উথাল-পাথাল হয়ে উঠছিল। অন্তহীন আমার চোখের আনন্দাশ্রু। আবেগের

রেশটা একটু একটু করে কেটে যেতেই আমি যেন আবার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলাম। সে আর এক আনন্দের অনুভূতি, আর এক উপলব্ধির ব্যাপার যেন। ঠিক এরকম একটা উপলব্ধি আমি অনুভব করেছিলাম শিশু অবস্থায় প্রথম কথা বলার দিন। অবশ্য সেটা মনে রাখার বয়স নয়। তবে পরবর্তীকালে বড় হয়ে, বোঝবার মতো বয়স যখন হয় তখন অন্য শিশুদের প্রথম কথা বলতে দেখে তাদের মধ্যে সুখানুভূতির ছায়া আমি পড়তে দেখেছিলাম তাদের চোখেমুখে, সেই অভিজ্ঞতায় বলেই আজ এই পরিণত বয়সে অনেকক্ষণ পরে কথা বলার আনন্দের মধ্যে আমি যেন জীবনে প্রথম কথা বলার আনন্দ নতুন করে আবার অনুভব করতে পারলাম।

আমার এই হারানো আনন্দ ফিরে পাওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানালাম ক্যাপ্টেনকে। তাকে এখন আমার মনে হচ্ছে, সে যেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত। আমি ছিলাম এই দ্বীপে নির্বাসিত একমাত্র জীবিত একজন মানুষ। আর বিদ্রোহীদের হীন চক্রান্তের ফলে সে-ও আমার মতো নির্বাসিত হতে যাচ্ছিল এই দ্বীপে। আমরা দুজনেই প্রায় একই দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে ধরেই নিয়েছিলাম, এখান থেকে মুক্তির কোনো আশাই নেই। তবু আমরা মুক্তির স্বাদ পেতে চলেছি। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার এ ধরনের বিচিত্র যোগাযোগটা যেন অলৌকিক, একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সেটা সম্ভব। তা না হলে আমার মতো এই হতভাগ্যকে, যার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গেছিলো এই দ্বীপে, হঠাৎ দীর্ঘ কয়েক বছর পরে এখান থেকে উদ্ধার করতোই বা কে? তাই আমার জীবনের দুঃখের দিনগুলোর অবসান হতে দেখে এই প্রথম আমার কেন জানি না মনে হলো, সত্যিই ঈশ্বর আছেন, আর আমাদের মধ্যেই বিরাজ করেন তিনি প্রতিনিয়ত। অতএব আমার এই মুক্তির জন্য ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ না জানালে আমি অকৃতজ্ঞ থেকে যাবো চিরদিন।



এবার ফেরার পালা। ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপকে বিদায় জানিয়ে উদ্ধার করা জাহাজে উঠে এলাম, যে জাহাজটা আমর বন্ধুবর ক্যাপ্টেন আমাকেই উৎসর্গ করেছে।

বিদায় দ্বীপ, বিদায়! জীবনের প্রায় অনেকখানি অংশ এই দ্বীপেই কাটিয়েছি, তাই ছেড়ে যেতে ভেতরে ভেতরে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল, বুকটা ফেটে যাচ্ছিল এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়, প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথার চেয়েও সে যন্ত্রণা সহ্য করা অনেক বেশী কষ্টকর। যাই হোক, দ্বীপের স্মৃতি হিসেবে সঙ্গে নিলাম আমার চামড়ার টুপি, ছাতা আর প্রিয় তোতাপাখিটাকে।

দ্বীপ থেকে বিদায় নেবার তারিখটা ছিল ১৯শে নভেম্বর, ১৬৮৬। হিসেব করে দেখলাম, এই দ্বীপে আমি নির্বাসিত হয়ে ছিলাম দীর্ঘ আঠাশ বছর. দু'মাস, ষোলো দিন।

ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে বিন্দুমাত্র দিশেহারা না হয়ে আত্মবিশ্বাস, আর আশা সম্বল করে এবং সাহস অটুট রাখার সাফল্য যে কতো

আনন্দের, কতো সুখের আর কতো শান্তির হতে পারে তার বাস্তব প্রমাণ আমি, এই আমি। দ্বীপ থেকে বিদায় বেলায় সেটা আরও গভীরভাবে যেন অনুভব করলাম, আর আশা করি, এই অনুভূতিটাই যেন আমার জীবনে পথ চলার ক্ষেত্রে পাথেয় হয়ে থাকে।

কিং সলোমনস্ মাইলস্

হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

॥ এক ॥

ঃ নতুন বন্ধু—সুলেমান পর্বতমালার রহস্য ঃ

প্রথমেই পরিচয় দিই, আমি অ্যালান কোয়াটার মেইন। আজ থেকে প্রায় আঠারো মাস আগে ডারবানগামী এক জাহাজে স্যার হেনরী কার্টিস এবং ক্যাপ্টেন গুডের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আর পরিচয়টা হয় ডিনার টেবিলে। স্যার হেনরীর ভাই ঘর ছেড়ে নিখোঁজ, তাই তারই সন্ধান তিনি এসেছেন আফ্রিকায়। তাঁর সেই ছোট ভাইটি নেভিল নাম নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর আফ্রিকার পথে পাড়ি দিয়েছিল।

'আমার এই ভাইটির সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?' স্যার হেনরী জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি যতদূর জানি, মানে শুনেছি, সে নাকি রাজা সলোমনের রত্নখনির সন্ধানে যাত্রা করেছে।'

'সলোমনের রত্নখনি মানে?' স্যার হেনরী একটু অবাক হয়েই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কোথায়, জানেন?'

'না, আমি জানিনা। কিন্তু এই রত্নভাণ্ডারের কিংবদন্তী আমার জানা আছে। ইভান্স নামেই এক হাতি শিকারীর কাছে এই 'কিংবদন্তী'র কাহিনী আমি শুনেছি। সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী বটে। তখন আমি তার কথা শুনে সত্যিই অবিশ্বাসের হাসিই হেসেছিলাম। এর ঠিক কুড়ি বছর পরে শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। কি এক পর্তুগীজ একজন লোককে তার সঙ্গী হিসেবে নিয়ে হাজির হয় সেখানে। লোকটির নাম যোসে দ্য সিলভেসট্রা। পনের দিনই পশ্চিমের মরুভূমির দিকে যাত্রা করে সে।"

'এক সপ্তাহ পরে ফিরে এলো সিলভেসট্রা। তার দেহটা তখন একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। জ্বরে শুকিয়ে যাওয়া তার মুখখানা একেবারে হলদেটে হয়ে গেছে।'

'জল, একটু জল দাও,' শুকনো ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো সে। আমি জল দিলাম তার মুখে। এতে তার তৃষ্ণা নিবারণ হলো বলে মনে হলো। তারপর তাঁর জ্বর বেড়ে গেলো প্রচণ্ডভাবে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার মতো করে সে সুলেমান পর্বতমালা, হীরে আর মরুভূমিব কথা বলতে লাগলো। তারপর তার কথা জড়িয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে, গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন ভোরে অবাক হয়ে দেখলাম, সিলভেসট্রা পলকপতনহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে সুলেমান পর্বতমালার সবচেয়ে বড় পাহাড়টার দিকে। সেখান থেকে সেই পাহাড়টার দূরত্ব প্রায় একশো মাইলেরও বেশী।

'ওই তো, ওইখানেই রয়েছে............', প্রায় অচৈতন্য মানুষটি চিৎকার করে উঠলো, 'কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমি ওখানে কোনোদিনও পৌঁছতে পারবো না। কেউ কোনোদিন পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না।'

হঠাৎ একসময় আমার দিকে ফিরে সিলভেসট্রা বলল, 'বন্ধু, আপনি কি এখনো ওখানেই রয়েছেন? আমার চোখে ঘনকালো মেঘের মতো অন্ধকার নেমে আসছে। উঃ কি অন্ধকার। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি কোথায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো আমি এখানে, ভয় কি! আপনি কিন্তু আর একটি কথাও বলবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন, একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন।'

'হ্যাঁ বিশ্রাম নেবো বৈ কি, চিরকালের মতোই বিশ্রাম নেবো। তার আর খুব বেশী দেরী নেই। আমি যেন আমার মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ওই তো শব্দটা বিশাল আকার নিলো। তবে শুনুন বন্ধু, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। একমাত্র ভয় করি ঈশ্বরকে। তাই তিনি যদি আমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন চিরদিনের জন্য, আমি কোনো প্রতিবাদ করবো না, ঈশ্বরের ইচ্ছে বলেই মেনে নেবো। আপনি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। তাই পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে আমি আপনাকে একটা কাগজ দিয়ে যাবো। আমার বিশ্বাস, আপনার বয়স কম, আপনার শক্তি আছে, তাই হয়তো আপনি এই দুস্তর মরুভূমি পেরিয়ে সে দেশে যেতে পারবেন। অন্তহীন এই মরুভূমিই আমার কাল হলো।' এই বলে কাঁপা কাঁপা হাতে সে তার পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে আমার হাতে সেটা দিয়ে বললো, 'এর বাঁধনটা খুলুন।'

বাধনটা খুলতেই বেরোল, এক টুকরো কাগজ।

'পেয়েছেন এক টুকরো কাগজ?' ক্লান্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'শুনুন তাহলে', রোগক্লান্ত মানুষটি বলতে লাগলো, 'বেশী কিছু বলবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে ওই কাগজের টুকরোয় সব কিছু লেখা আছে। বহু বহু বছর আগে আমারই বংশের এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী এই কাগজটা লিখেছিলেন। তিনি বোধহয় প্রথম ও শেষ শ্বেতাঙ্গ যিনি সুলেমান পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁর নামও ছিল যোসে দ্য সিলভেসট্রা। ওই পর্বতেই তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। সে ঘটনা আজ থেকে তিনশো বছর আগেকার। তাঁর ক্রীতদাসই তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল, মৃতদেহের পাশে সে এই লেখাটি পায়। মনিবের এই শেষ লেখাটি নিয়ে সেই বিশ্বাসী ক্রীতদাস দেশে ফিরে আসে। আমাদের পরিবারের লোকেদের কাছে প্রভুর শেষ লেখাটা জমা দিয়ে যায় সে। আমি এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম ওই কাগজের প্রতিটি লেখা। আর এর ফলেই এই দুর্গম দেশে আমার অভিযান। কিন্তু আপনি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। অনেকটা পথ, আমার স্বপ্ন সফল হলো না, সুলেমান পর্বতমালা আমার কাছে অধরাই থেকে গেলো। আপনার বয়স কম, আপনি খুবই সাহসী এবং শক্তিধর পুরুষ। আপনার বুকে সাহস আছে, কাজে উৎসাহ আছে, তাই আমার বিশ্বাস আপনি সফল হবেনই। যদি সেখানে গিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন তাহলে আমি শপথ নিয়ে বলছি, আপনি হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তবান পুরুষ।' এই পর্যন্ত বলে সিলভেসট্রা থামলো। ঘণ্টাখানেক পরেই তার মৃত্যু হয়।

'তা সেই কাগজে কি লেখা ছিল জানতে পারি?' কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে স্যার হেনরী জিজ্ঞেস করলেন।

'লেখাটার একটা ইংরেজী অনুবাদও আমি করেছিলাম। তা সেই ইংরেজী অনুবাদটা আমার সঙ্গেই রয়েছে। আর লেখাটার সঙ্গে একটা হাতে আঁকা ম্যাপও আছে। এই তো সেই লেখাটা, পড়ে দেখুন।'

লেখাটা এই রকম ঃ

'আমি যোসে দ্য সিলভেসট্রা, এখন মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি। আমি এখন একটা গুহার মধ্যে রয়েছি। গুহাটা দুই পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে। আমি এই দুই পর্বতের নাম দিয়েছি 'সেবা'র দুই বক্ষ। হাতের কাছে কালির দোয়াত ছিল না, তাই নিজের লাল রক্তকে কালি হিসেবে ব্যবহার করে আমি এই বিবরণ লিখছি। যদি আমার ক্রীতদাস কখনো আমার মৃতদেহটা খুঁজে পায়, তাহলে সে যেন এক হতভাগ্য পর্যটকের এই শেষ লিপিটা তার নিজের স্বজনদের কাছে নিয়ে যায়। আমার নিজের লোকেরা যেন ব্যাপারটা মহামান্য পর্তুগাল রাজের গোচরে আনে, যাতে করে মহামান্য পর্তুগালরাজ বিজয় অভিযানে কেটা বাহিনী পাঠাতে পারেন। এই বিজয়বাহিনী যদি সীমাহারা ঊষর মরুভূমি এবং উত্তুঙ্গ পর্বতমালার বাধা অতিক্রম করে এদেশে এসে অসম সাহসী কুকুরছানাদের পরাজিত করতে পারে, তাহলে সলোমনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে যতো রাজা রাজত্ব করে গেছেন তাদের মধ্যে মহামান্য পর্তুগাল রাজই হবেন সবচেয়ে ধনী নরপতি। আমি নিজের চোখে 'শ্বেত-মৃত্যুর' পিছনে রাজা সলোমনের রত্নভাণ্ডার দেখেছি। সেখানে অনেক বহুমূল্যবান হীরের টুকরো পড়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু ওইসব দুষ্টু জানোয়ারগুলোর জন্য আমি একখণ্ড হীরেও সঙ্গে করে আনতে পারিনি। কোনোরকমে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। যাত্রাপথের একখানা মানচিত্র সঙ্গে দিয়ে দিলাম। যদি কোনো অভিযাত্রী এই মানচিত্র অনুসরণ করে এদেশে আসতে চায় তাহলে তাকে তুষারাবৃত সেবা'র বামবক্ষে উঠতে হবে। আর এর ঠিক উত্তর দিকেই রয়েছে রাজা সলোমনের তৈরী বিরাট রাস্তা। এই সুদীর্ঘ রাস্তা দিয়ে একটানা তিনদিন পায়ে হেঁটে এগোলেই পাওয়া যাবে রাজার প্রাসাদ। দুঃসাহসী অভিযাত্রী যেন সবার আগে সেই সব দুষ্টু জানোয়ারগুলোকে হত্যা করে, আর আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। বিদায়............' যোসে দ্য সিলভেসট্রা।

আমার পড়া শেষ হতেই বেশ কিছু সময় সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। এক অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করছিল সেখানে। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন গুডই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

'আমি কতবার না পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরেছি, সেখানকার কতো কাহিনীই না শুনেছি, কিন্তু এরকম অদ্ভুত কাহিনী আমি জীবনে কখনো শুনিনি।'

'মিঃ কোয়াটার মেইন,' স্যার হেনরী দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, 'আমি যাবো, ভাই-এর খোঁজে আমাকে যেতেই হবে। আমি সুলেমান পর্বতমালায় যাবো। যদি দরকার হয় তাহলে ওই পর্বতমালার ওপারেও যাবো। যতদিন ভাই-এর সন্ধান না পাই আমার অনুসন্ধান কাজ বন্ধ হবে না। আমি এগিয়ে যাবো, শেষ পর্যন্ত আমি দেখতে চাই। আপনি আমার সাথী হবেন?'

ক্যাপ্টেন গুড আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছেন। হীরে বা অন্য কোনো দামী সম্পদের সন্ধান পেলে তা আপনি আর ক্যাপ্টেন গুড দু'জনে ভাগ করে নেবেন, ওসবে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া যাত্রা শুরু করার আগেই আমি আপনাকে আগাম কিছু দিতে পারলে খুব খুশী হবো। আর একটা কথা আপনাকে আগাম বলে রাখি, যদি অভিযানের সময় ঈশ্বর না করুন আপনার কিছু ঘটে যায়।' তাহলে তখন আপনার পরিবারের সব দায়-দায়িত্ব আমিই বহন করবো।'

উত্তম প্রস্তাব। এর থেকে ভালো প্রস্তাব কেউ কোনোদিন আমায় দেয়নি। স্যার হেনরীকে আশ্বস্ত করে আমি বললাম, জাহাজ ডারবানে পৌঁছবার আগেই আমি তাঁর ওই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার মতামত তাঁকে জানিয়ে দেবো।

।। দুই।।

ঃ উম্বোপা দলে যোগ দিলো ঃ

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ডারবানে পৌঁছতে চার থেকে পাঁচদিন সময় লাগে। পঞ্চমদিন রাত্রে আমাদের জাহাজ যখন ডারবানে প্রবেশ করছে। তখন স্যার হেনরী আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ কোয়াটার মেইন, আপনি আমার প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত কি নিতে পারলেন?'

'হ্যাঁ, পেরেছি,' উত্তরে আমি বললাম, 'ঠিক করলাম, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। তবে আমার কতকগুলো শর্ত আছে।'

'বেশ তো বলুন আপনার কি শর্ত?'

'প্রথমত, এ অভিযানের সমস্ত খরচ আপনাকে বহন করতে হবে। এছাড়াও হাতির দাঁত ও অন্যকোনো মূল্যবান সামগ্রী পাওয়া গেলে তা আমার ও ক্যাপ্টেন গুডের মধ্যে ভাগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অভিযান শুরু করার আগেই আপনি আমাকে পাঁচশো পাউণ্ড দেবেন। তৃতীয়ত অভিযান চলার সময় বলতে নেই যদি আমার কোনো অঘটন ঘটে।' তাহলে আমার ছেলে হ্যারীকেও বছরে দুশো পাউণ্ড দেবেন, আর এটা দিতে হবে টানা পাঁচ বছর ধরে। হ্যারী এখন লণ্ডনে ডাক্তারী পড়ছে। এই হলো আমার শর্ত।

'ঠিক আছে, আপনার সব শর্তই আমি খুশী হয়ে মেনে নিচ্ছি,' স্যার হেনরী বললেন।

'ধন্যবাদ! এতো খুব ভালো কথা,' আমি বললাম, 'কিন্তু একটা কথা আমি আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমার মনে হয় না, সুলেমান পর্বতমালা অতিক্রম করবার চেষ্টা করলে আমরা কেউ প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পারবো।'

আমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনলেন স্যার হেনরী, কিন্তু তাঁর মুখের ভাব একটুও বদলাল না।

'বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে চেষ্টা না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে।' স্যার হেনরী দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন।

'অবশ্যই!' ক্যাপ্টেন গুড তাঁর কথায় সায় দেন।

অগত্যা আমাকেও রাজী হয়ে যেতে হলো।

পরের দিন সকাল থেকেই আমরা অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। স্যার হেনরীর পক্ষ থেকে আমি একাখানা গাড়ি ও কয়েকটা বলদ কিনলাম। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধও কিনলাম। আগ্নেয়াস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না। স্যার হেনরী ইংলণ্ড থেকে অনেকগুলো বন্দুক এনেছিলেন। এছাড়াও আমার হাতি শিকারের বন্দুক ও শিকারী রাইফেলগুলো তো ছিলই। এবার সঙ্গী হিসেবে অনুচরের সন্ধান করতে হবে।

গাড়োয়ান এবং পথ প্রদর্শক সহজেই পাওয়া গেলো। গাড়োয়ান ও পথ প্রদর্শকের নাম যথাক্রমে গোজা আর টম। আর অনুচর হিসেবে পাওয়া গেলো একজন হটেনটটকে। তার নাম ভেণ্টভোগেল অর্থাৎ বায়ুবিহঙ্গ। একজন জুলু অনুচরও জোগাড় হলো। তার নাম খিবা। খিবা বেশ চতুর ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম। ভেণ্টভোগেল পশুর পায়ের চিহ্ন চিনতে পারতো এবং সেই চিহ্ন অনুসরণ করে বন্য পশুদের ডেরায় গিয়ে হাজির হতে পারতো।

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় খিবা এসে জানালো যে একজন লোক নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি লোকটাকে আনতে বললাম। লোকটা দীর্ঘদেহী, বেশ স্বাস্থ্যবান এবং

সুদর্শন পুরুষ। তিরিশের কাছে বয়স হবে তার। গায়ের রঙ হাল্কা, তবে জুলুদের মতো অতো কালো নয়।

সে আসতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি নাম তোমার?'

'উম্বোপা,' খুব আস্তে আস্তে গম্ভীর গলায় আগন্তুকটি উত্তর দিলো।

'তা তুমি কি চাও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মাকুমাজাহন, আমার কাছে খবর আছে, সাগর পেরিয়ে আসা সাদা চামড়ার সর্দারদের সঙ্গে আপনিও নাকি উত্তর দিকে এক বিরাট অভিযানে যাচ্ছেন?'

আশ্চর্য উম্বোপাও আমার এই ডাকনামটা জেনে গেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে এই নামটা দিয়েছিল। 'মাকুমাজাহন' শব্দটির অর্থ হলো, 'এমন মানুষ যে তার চোখদুটি খোলা রাখে।' বোধহয় শিকারে আমার দক্ষতার জন্যই আমার এই নামকরণ করে থাকবে।

'খবরটা কি সত্যি মাকুমাজাহন?' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে উম্বোপা আবার জিজ্ঞেস করলো।

আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, যা শুনেছো তা সত্যি।'

'শুনেছি আপনি নাকি লুডাঙ্গা নদী পর্যন্ত যাচ্ছেন, সে তো গণিকা জনপদ ছাড়িয়ে এক চাঁদের হাঁটা পথ। এ কথাটা কি সত্যি?'

'এ খবরর কেন তুমি জানতে চাইছো?'

'আপনারা শ্বেতাঙ্গরা যদি অতদূরে যান, তবে আমিও আপনাদের ভ্রমণসঙ্গী হতে ইচ্ছুক।'

'কিন্তু তোমার পরিচয় কি, কে তুমি? কোন্ গ্রাম থেকেই বা আসছো তুমি?'

বললাম তো আমার নাম উম্বোপা, আমার বাড়ি সুদূর উত্তরে। খুব অল্প বয়েসেই আমি জুলুদের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। একটু বড়ো হলে পর জুলুদের দেশ থেকে পালিয়ে এসেছি। এসেছি নাটালে, কারণ শ্বেতাঙ্গ জীবনযাত্রা আর তাদের ধরণ-ধারণ দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। এখন আমি নিজের দেশে আমার মানুষজনদের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। ভাববেন না, আমি আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে এসেছি। আমি যথেষ্ট সাহসী। আপনাদের অভিযান পথে আমার খাবারের জন্য যে টাকা আপনাদের খরচ হবে তা বৃথা যাবে না, দেখবেন আমি সেই খরচটুকুর অযোগ্য নই।'

এই পর্যন্ত বলে উম্বোপা থামলো। উম্বোপা তাদের স্থানীয় ভাষায় যা বললো তা আমি ইংরেজীতে অনুবাদ করে স্যার হেনরী ও ক্যাপ্টেন গুডকে বুঝিয়ে দিলাম। এবার স্যার হেনরী উম্বোপাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বললেন। উম্বোপা তাই করলো। তার কোমরে এক টুকরো কাপড় এবং গলায় সিংহের থাবার নেকলেসটা ছাড়া আর দেহের বাকী অংশ সম্পূর্ণ নগ্ন। এখানকার মানুষজনের মধ্যে ওর মতো এমন সুন্দর দেখতে মানুষ আমি এর আগে কখনো দেখিনি দীর্ঘদেহী স্যার হেনরী উম্বোপার আরও কাছে গেলেন এবং তার দিকে পলকপতনহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমাকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগছে উম্বোপা। তোমাকে আমি অনুচর হিসেবে সঙ্গে নেবো,' ইংরেজীতেই কথাগুলো বললেন স্যার হেনরী। উম্বোপা বুঝলো কথাগুলো।

'সে তো আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা,' উত্তরে উম্বোপা বললে। তারপর সে দীর্ঘদেহী স্যার হেনরীর দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বললো, 'আমরা দুজনেই মরদ, আপনি আর আমি।'

॥ তিন ॥

ঃ হাতি শিকার ঃ

জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে আমরা ডারবান থেকে লুডাঙ্গা নদী পর্যন্ত দীর্ঘ এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করলাম। এই দীর্ঘ আসার পথে আমরা বারোটা ছাড়া বাকীসব বলদগুলো হারিয়েছি। বেশীরভাগ বলদই প্রাণ হারিয়েছে আফ্রিকার বিষাক্ত 'ৎসি ৎসি' মাছির কামড়ে। এই মাছিগুলোর কামড় খেয়ে একমাত্র মানুষ আর গাধা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। জীবিত বলদগুলোকে আমরা এক স্কটিশ মিশনারীর হেফাজতে রাখলাম। গাড়োয়ান গোজা এবং পথপ্রদর্শক টমকেও সেখানে রেখে গেলাম পশুগুলোর দেখ্ভাল করবার জন্য। এছাড়া এখান থেকে আমাদের মোট বইবার জন্য ছ'জন কুলিও ঠিক করা হলো।

ইনইয়াতি থেকে যাত্রা করবার পর একপক্ষকাল পরে আমরা ভারী সুন্দর একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড়ের পাদদেশে শুকনো নদীর খাত। নদীখাতের জায়গায় জায়গায় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। জলের পাশ বরাবর নদী কিনারে নানান পশুর পায়ের ছাপ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। পাহাড়ের পাদদেশে সমতলভূমির উপত্যকা। এই সমতলভূমিকে বিরাট একটা 'পার্ক'-এর মতো মনে হচ্ছে। সমতলভূমিতে চ্যাপ্টা মাথা 'মিমোসা'র ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে। যত্রতত্র চকচকে পাতায় ভরা ম্যাকাবেল গাছ। চারপাশে পথবিহীন ঝোপঝাড়ের অন্তহীন সমুদ্র।

ঠিক হলো, আমাদের যাত্রাপথে বিরতি ঘটিয়ে আজ রাতের মতো এখানেই বিশ্রাম নেওয়া হবে। সেইমতো তাঁবু খাটানো হলো। কাঁটাঝোপ কেটে তাঁবুর বাইরে গোল করে সাজিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। আগুন পশুদের কাছে বড় আতঙ্ক, তাই এই আগুনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে কোনো হিংস্র প্রাণী আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না। রাতে আমরা জিরাফের মাংস খেলাম। জিরাফটা শিকার করেছিলেন ক্যাপ্টেন গুড। আহার শেষে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের আরাধনা করা।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে তখনো বেশ কয়েকঘণ্টা বাকী ছিল। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন আর্তনাদ আর ভয়ঙ্কর গর্জনে আমাদের ঘুম ভেঙে গেলো। এ গর্জন নিশ্চয়ই সিংহের হবে। আমরা সবাই তখন বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। নদীখাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারে দেখলাম, একটা হলুদ আর একটা কালো জন্তু মরণপণ লড়াই করছে। আর্তনাদ ও গর্জন একসঙ্গে দুটিই চলছে সমান তালে। একটু পরেই অবশ্য থেমে গেলো সেই আর্তনাদ ও গর্জন।

বাইরে গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট কৃষ্ণসার হরিণ মরে পড়ে রয়েছে আর তার মাথার বাঁকানো শিঙে গেঁথে রয়েছে কালো কেশরওয়ালা এক বিরাট দেহের অধিকারী পশুরাজ সিংহ। ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হয়ে গেলো আমার কাছে। হরিণটা নদীতে জল খেতে এসে থাকবে। আর সিংহ তাকে দেখতে পেয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিণের ধারালো শিঙের ওপর। সিংহের দেহটা গেলো গিঁথে হরিণের ধারালো শিঙে। তখন সে আর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সেরে আমরা হাতির পালের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। একটু পরেই হাতির পালের দেখা পাওয়া গেলো। তাদের দলে সংখ্যায় কুড়ি থেকে তিরিশটা হবে।

আমরা তখন তিনটি বিরাট আকারের পুরুষ হাতি থেকে দুশো গজ দূরে ছিলাম। তাদের মধ্যে একটার বিশাল গজদন্ত। স্যার হেনরী, গুড আর আমি হাতি তিনটের দিকে তাক করে গুলো ছুঁড়লাম। আমার আর হেনরীর গুলোর আঘাতে হাতি দুটো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। কিন্তু গুডের গুলোর আঘাতে আহত হাতিটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ক্রুদ্ধভাবে সোজা ধেয়ে এলো তাঁর দিকে। গুড কোনোরকমে

সরে এলেন সেখান থেকে। আহত ও ক্রুদ্ধ হাতিটা গুডের পাশ কাটিয়ে সোজা ছুটলো আমাদের তাঁবুর দিকে। ওদিকে অন্য হাতিগুলো ভয়ে হতবাক হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে পালালো।

একসময় সন্ধ্যা নেমে এলে আমরা আমাদের তাঁবুর দিকে ফিরে চললাম। দূর থেকে হাতির ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শুনতে পেলাম। দেখলাম, গুড আর খিবা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। যে হাতিটা গুডের গুলোতে আহত হয়েছিল সেটাই ক্রুদ্ধস্বরে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। আমরা হাতিটাকে ফিরে আবার গুলি করতে সাহস পেলাম না, কারণ গুলো হাতিটার গায়ে না লেগে হয়তো ওদের গায়ে লেগে যেতে পারে। আর এর পরেই ঘটলো সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা। গুড মুখ থুবড়ে পরে গেলেন মাটিতে, হাতিটা তখন মাত্র কয়েক গজ দূরে ছিল। আমরা ছুটে গেলাম সেদিকে। সর্বনাশ! তবে কি গুড হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়েই শেষ হয়ে যাবে? হঠাৎ খিবা ছুটে এসে দাঁড়ালো গুড আর হাতির মধ্যিখানে। তার হাতে উদ্যত বর্শা। বর্শাটা সে ছুঁড়লো হাতির মুখ লক্ষ্য করে। একে ক্রুদ্ধ হাতি আরো বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। গুডের কথা ভুলে গিয়ে হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলো খিবাকে। তারপর খিবার দেহটার ওপর সে তার ভারী পা রেখে তার দেহটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো। আমরা তখন অসহায়ের মতো আতঙ্কভরা চোখে সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যটা দেখতে থাকলাম।

যাই হোক, কোনো রকমে নিজেদেরকে সামলে নিয়ে পাগলের মতো গুলো ছুঁড়তে লাগলাম বৃষ্টির ধারার মতো হাতিটার দেহ তাক করে। শেষ পর্যন্ত গুলির পর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে বিশাল জন্তুটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। বিপদ কেটে গেছে দেখে গুড আবার তাঁর ক্লান্ত-বিধ্বস্ত দেহটা কোনোরকমে টেনে টেনে উঠে দাঁড়ালেন। গভীর কৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে ধরলেন তাঁর জীবনদাতা খিবার শরীরের ছিন্ন একটা খণ্ডকে।

ওদিকে উম্বোপা স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো মৃত হাতি ও খিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের দিকে। তারপর সে বিষণ্ণ গলায় বললো, 'খিবা মরলো সত্যিকারের মানুষের মতো। এ যেন বীরপুরুষের মতো আত্মাহূতি দেওয়া।

।। ছয় ।।

ঃ মরুযাত্রা ঃ

হাতির দাঁতদুটো তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটির তলায় পুঁতে রাখলাম। ফেরার পথে বাড়িতে নিয়ে যাবো। তৃতীয় দিন যাত্রা করলাম সিতান্দার বস্তির দিকে। ওখান থেকেই শুরু হবে আমাদের মরুযাত্রা। সন্ধ্যার সময় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। তাঁবু খাটালাম গ্রামের কাছেই। কাছেই একটা নদী প্রবাহমান। নদীর ওপারেই সেই ঢালু জায়গাটা, যেখানে বিশ বছর আগে আমি হতভাগ্য সিলভেস্ট্রাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলাম। স্যার হেনরী আর আমি অদম্য কৌতূহল ভরা চোখে মরুভূমির ওপারে পর্বতমালার দিকে তাকিয়েছিলাম। উম্বোপা এলো আমাদের কাছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কি ওই দেশে যেতে চান ইনকুবু?' ইনকুবু স্থানীয় ভাষায় একটি শব্দ, শব্দটির অর্থ মনে হয় হাতি। স্থানীয় লোকেরা স্যার হেনরীকে ওই নামেই ডাকতো।

'হ্যাঁ উম্বোপা,' জবাবে স্যার হেনরী বললেন, 'আমি ওখানেই যাবো। আমার ভাই ওখানেই গেছে, সে আজ বহুদিন আগের কথা হবে। তারপর থেকে ওঁর কোনো খবর নেই। তাই আমি তার খোঁজেই এদেশে এসেছি।''

'বিশাল মরুভূমি, কোথায় যাবেন আপনি, কোথায় খুঁজবেন আপনার ভাইকে?' ওই বিশাল মরুভূমিতে এক ফোঁটা জল নেই। উঁচু পাহাড়গুলো, বরফে ঢাকা পড়ে আছে। কেউ জানে না, কেউ চলতে পারে না। ওই-পাহাড়ের ওপারে কি আছে। ইনকুবু, এর পর আপনাকে যেতে হবে অনেক, অনেক দূরে। আর সে পথ বড় দুর্গম, বড় ভয়ানক, প্রতি পদক্ষেপে নানান বিপদ আপদের আশঙ্কা রয়েছে।'

'জানি, আর এও জানি যে, মানুষই তো অজানা পথে যাত্রা করে দূরকে নিকট করে, তখন সে পথ আর অজানা থাকে না। যাবোই বলে যদি সংকল্প করা যায়, তাহলে এমন কোনো কাজ নেই যা মানুষ করতে পারে না,' স্যার হেনরী দৃঢ়স্বরে বললেন।

'আপনি খুব একটা দামী কথা বলেছেন ইনকুবু। এটাই তো সত্যিকারের পুরুষের মতো কথা হলো। আমিও যাবো আপনার সাথে, মরুভূমি পেরিয়ে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে।'

'তুমি একটা অদ্ভুত লোক,' বললেন স্যার হেনরী।

উম্বোপা হাসলো। হেসে হেসেই বলতে লাগলো সে, 'পাহাড়ের ওপারে রয়েছে এক রহস্যময় দেশ, সে দেসের মানুষ আজব অদ্ভুত ডাকিনী বিদ্যায় পারদর্শী। আবার সে দেশেই রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস। অনেক বীর পুরুষের বাস সেখানে। সে দেশ অনেক সুন্দর সুন্দর তরুবীথিতে ঘেরা, সেখানে রয়েছে অনেক নদী, বরফে ঢাকা পাহাড় আর বিরাট একটা রাস্তা। এতো গেলো ভালোর দিক, আর খারাপের দিক হলো, সাক্ষাৎ মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে সেই সব পাহাড়ের চূড়ায়। তাই আমি বলি কি, ও দেশে আপনারা যাবেন না। আপনারা ফিরে যান এখান থেকেই বরং এখানে কিছুদিন থেকে হাতি শিকার করুন। তাতে আনন্দ পাবেন অনেক, পাবেন নাম-যশ।' একথা বলে উম্বোপা অভিবাদন ভঙ্গীমায় তার দীর্ঘ বর্শাটা তুলে চলে গেলো তাঁবুর দিকে।

পরদিন চাঁদের মুখ দেখে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। দূরের পর্বতমালার ম্যাপ ছাড়া চলার পথে আমাদের আর কোনো দিশারী ছিল না। চলার পথে যদি আমরা জলের সন্ধান না পাই তাহলেই সর্বনাশ, তৃষ্ণায় দম আটকে মরে যেতে হবে। ম্যাপ থেকে জানা যায়, জল রয়েছে মরুভূমির মাঝামাঝি জায়গায়।

পরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ আমরা একটা সরু পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছলাম। বিরাট একখণ্ড পাথর বেরিয়ে এসেছে পাহাড়টা থেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মরু-সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা সেই ঝুলন্ত পাথরের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আহার পর্ব শেস করে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

আমাদের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা প্রায় তিনটে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সূর্য অস্ত গেলে আমাদের যাত্রার বিরতি ঘটালাম। তারপর চাঁদ উঠলে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পরদিন সূর্যোদয়ে আবার আমরা থামলাম। কিন্তু এবার আমরা আশ্রয় নেবো কোথায়? চারদিকেই তো শুধু ধূ ধূ মরুভূমি। পাহাড় বা গাছপালার এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও। এদিকে পায়ের তলায় বালি এমন তেতে উঠেছে যে, ঠিক গরম চাটুর মতো।

'আবহাওয়া যেমন তেতে উঠেছে তাতে মনে হয় বালির গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। দু একটা কাঁটা ঝোপঝাড় যা পাই তা দিয়েই আমাদের গর্তের মুখটা ঢাকতে হবে।' গুড বললেন। তাঁর পরামর্শ মতো সেরকম ব্যবস্থাই করা হলো। কিন্তু সেই গর্তের মধ্যে গরম আরও বেশী অসহ্য হয়ে উঠলো। বেলা তিনটে নাগাদ আমাদের মনে হলো, এই গর্তের মধ্যে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাদের জীবন্ত কবরের ব্যবস্থা নিজেদেরই করে যেতে হবে, তাই আলো-বাতাসহীন গর্তের মধ্যে থেকে অসহ্য গরম ও পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে আবার যাত্রা শুরু করা অনেক

ভালো। মরুভূমির মাঝখানে জলের উৎসস্থল এখনও বারো-চোদ্দ মাইল দূরে। মরু বুকে সেই জল এখনও আছে নাকি শুকিয়ে গেছে, তাইবা কে জানে?'

অগত্যা আমরা গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়লাম অতঃপর। রাত দুটো নাগাদ আমরা একটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়লাম। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল, পান করলাম সঙ্গে আনা আমাদের শেষ জলবিন্দুটুকু। এর পর একটু বিশ্রাম নেওয়া। শুয়ে শুয়ে শুনলাম উম্বোপা জুলু ভাষায় নিজের মনেই বলে চলেছে, 'জল না পেলে, কাল চাঁদ ওঠার আগে আমাদের গলা শুকিয়ে মরতে হবে।'

।। পাঁচ ।।

ঃ জল! একটু জল! ঃ

উষার প্রথম আলো পূবের আকাশকে আবির-রঙে রাঙিয়ে তুললো। সেই আলোয় সে কি অপূর্ব দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, কি আশ্চর্য, তা দেখে আমরা আমাদের প্রচণ্ড জল-পিপাসার কথাও ভুলে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য। সেই মুহূর্তে আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে রূপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে সেবা'র দুই বক্ষ। তাদের দু'পাশে রয়েছে না জানি কতো শত মাইল জুড়ে বিস্তৃত বিশাল পর্বতমালা। এই সৌন্দর্য আর মহিমার বর্ণনা দেবার মতো ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু বেশীক্ষণ সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো সৌভাগ্য আমাদের হলো না। কারণ একটু পরেই কুয়াশা জমলো দুই বক্ষের চারপাশে। সেই অপরূপ সৌন্দর্য কুয়াশার আড়াল থেকে অস্পষ্ট হয়ে গেলো।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে এতক্ষণ আমি যেন কল্পনার জগতে বিচরণ করছিলাম, এবার বাস্তবে ফিরে এলাম। জল-পিপাসা আরও তীব্র হয়ে উঠলো। অথচ এদিকে কোথাও একফোঁটা জলের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ভেণ্টভোগেল মাটির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে উঠলো।

'কি ব্যাপার, অমন চিৎকার করলে কেন?' আমরাও পাল্টা চিৎকার করে সমবেত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওই তো ওখানে স্প্রিং বকের পায়ের ছাপ পড়ে রয়েছে ওখানে! ভেণ্টভোগেল তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো, 'এরা তো জল থেকে বেশী দূরে যায় না। নাক উঁচিয়ে বাতাসের গন্ধ শুঁকলো ভোগেন। কিছু একটা আন্দাজ করে সে বললো, 'জলের যেন গন্ধ পাচ্ছি, বাতাসে জলের গন্ধ পাচ্ছি।'

'তাহলে বোধহয় পাহাড়ের ওপরে জল আছে কোথাও,' স্যার হেনরী বললেন।

সবার আগে এগিয়ে গেলো উম্বোপা। আমার চললাম তার পিছু পিছু। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'নানজিয়া মামজি!' মানে এই তো জলের উৎস। হ্যাঁ সত্যি সত্যিই দেখা গেলো পাহাড়ের মাথায় রয়েছে একটি জলাশয়। তবে জলের রঙ যেমন কালো, তেমনি আবার দেখতেও বিশ্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সেই বিশ্রী জলই আকণ্ঠ পান করলাম। তারপর পোশাক খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই জলাশয়ে অবগাহন করার জন্য। আঃ, সারা তপ্ত শরীর যেন সেই জলের স্পর্শে শীতল হয়ে গেলো। দিনের অবশিষ্ট সময়টা আমরা পাহাড়ের ছায়ায় আরামে ঘুমোলাম। রাতে জলের পাত্রগুলো ভর্তি করে আমরা দূরের পর্বতমালার দিকে যাত্রা করলাম। পরদিন আমরা পৌঁছলাম পর্বতমালার পাদদেশে। এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে আনা জলের বোতলগুলো খালি হয়ে গেছিলো। আবার সেই অসহ্য জল পিপাসা দেখা দিলো আমাদের।

এই সময় দূরে মরুর বুকে এক টুকরো সবুজের ঝোপ চোখে পড়লো। উম্বোপা এগিয়ে গেলো

সেদিকে। কিছুক্ষণের ম্যধ্যই দেখা গেলো পাগলের মতো নাচছে আর চিৎকার করে কি যেন বলছে। আমরা ছুটলাম তার দিকে। কাছে যেতেই উম্বোপার উল্লাসের কারণটা বুঝতে পারলাম। তরমুজ! হাজার হাজার তরমুজ ফলে রয়েছে বালুচরে। আমার তখন মহানন্দে প্রত্যেকেই গোটা ছয়েক করে তরমুজ খেলাম এবং যতগুলো বহন করা সম্ভব নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। এর পর তিনদিন আমরা খুব বেশী এগোতে পারলাম না। রাতের বেলা রক্ত হিম হয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা। সঙ্গে আনা আমাদের খাবার সব শেষ। শ্বেতশুভ্র বরফের ওপর দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে আমরা পাহাড়ে উঠতে থাকলাম।

পথে হঠাৎ উম্বোপা চিৎকার করে উঠলো, 'দেখুন, দেখুন, ওই দিকটায় তাকিয়ে দেখুন!' ওর আঙুলের নিশালা অনুসরণ করে তাকালাম। দেখলাম দুশো গজ দূরে একটা গুহা রয়েছে। তখন সূর্য ডোবার আর দেরী নেই। আমরা পা চালিয়ে সেদিকে এগিয়ে সেই গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। গুহাটা বেশ ছোটই। গা গরম করার জন্য সারারাত আমরা একে অন্যের গা ঘেঁসে ঘন হয়ে বসে রইলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর খিদেয় সারারাত আমরা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত এক সময় সকাল হলো। সারা শরীর আমাদের তখন অবশ হয়ে গেছে। কোনো রকমে গুহার বাইরে যাবার জন্য এগোলাম। ভেন্টভোগেল কিন্তু নড়লো না, একেবারে অনড়, অকম্পন তার শরীর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রক্ত হিম হয়ে গিয়ে মারা গেছে সে। তার ঠাণ্ডা শরীরটা এখন পাথরের মতোই কঠিন হয়ে গেছে। ওদিকে সূর্যের আলো এবার গুহার পিছন দিকটাকে আলোকিত করেছে। সেখানে আর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। আর এক অনড় মূর্তি দেখা যাচ্ছে সেখানে। মূর্তির মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। আর এক মৃত মানুষের দেহ। সে দৃশ্য দেখে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। কাল বিলম্ব না করে ছুটে বেরিয়ে এলাম গুহার ভেতর থেকে।

।। ছয় ।।

ঃ সলোমনের পথ ঃ

বাইরে এসে কিন্তু নিজেদের কেমন বোকা বোকা বলে মনে হলো, আচ্ছা, এতো ভয় পেলাম কেন?

'আমি আবার ওই গুহার ভেতর গিয়ে দেখে আসছি,' স্যার হেনরী বললেন, 'দ্বিতীয় মৃতদেহটা আমার ভাইয়ের নয় তো?'

সত্যি তো, এ কথাটা তো আমাদের একবারের জন্যও মনে হয়নি। মনে হতেই আমরাও চললাম স্যার হেনরীর পিছু পিছু। যাই হোক, মৃতদেহটি খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে স্যার হেনরী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ আমার ভাই নয়। কিন্তু কে, কে সে?'

মৃতদেহটি একজন দীর্ঘদেহী পুরুষের। তার ঠোঁটের ওপর এক পেল্লাই গোঁফ। পরনে একমাত্র একটা লম্বা 'আণ্ডারপ্যাণ্ট' ছাড়া তার আর কোনো পোশাক ছিল না। মৃতদেহের গলা থেকে একটা হাতির দাঁতের 'ক্রেসিফিকস্' ঝুলতে দেখা গেলো। ক্রসটা হলদে হয়ে গেছে। মৃতদেহটা ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে গেছে।

'এটা কার মৃতদেহ হতে পারে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আন্দাজ করতে পারছেন না?' এ নিশ্চয়ই যোসে দ্য সিলভেসট্রার মৃতদেহ। সে ছাড়া আর কারই বা হতে পারে?' গুড জবাব দিলো।

'অসম্ভব, হতেই পারে না, সে মারা গেছে তিনশো বছর আগে,' আমি বললাম।

'এখানকার হিমশীতল আবহাওয়াই ওর দেহটাকে তিনশো বছর টিকিয়ে রেখেছে অবিকৃত অবস্থায়। তাছাড়া এদিকে কোনো মাংসাশী হিংস্র প্রাণীরও যাতায়াত নেই।'

হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়, ওদের কথাই হয়তো ঠিক। যাই হোক, অতীতের এক দুঃসাহসী অভিযাত্রীর এই পরিণতি আমাদের ভীষণভাবে বিষণ্ণ করে তুললো। মৃত ভেণ্টভোগেলকে। গুহার মধ্যে তেমনি রেখে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আবার পথ চলতে শুরু করলাম। পথ চলাতেই আমাদের আনন্দ। জানি না, এপথ চলার শেষ কোথায়, আর কিই বা আছে শেষে, কে জানে। আমাদের এতো সাধনা, এতো কামনা বা কোথায় গিয়ে মেশে, সেটাই এখন দেখার বিষয় কেবল। আধ মাইলটাক পথ চলার পর আমরা একটা উপত্যকার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। কুয়াশা কেটে যাবার পর দেখলাম, আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে সবুজ ঘাসের ঝোপ। একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে কলকলিয়ে। আর সেই নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছে দশ-পনেরোটা কৃষ্ণসার হরিণ।

আমাদের গুলোর আঘাতে একটা হরিণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এবার দেখা গেলো আর এক নতুন সমস্যা। কাছাকাছি শুকনো ঘাস বা কাঠ চোখে পড়লো না। তাই এখন হরিণের মাংস ঝলসানোর জন্য আগুন পাই কোথায়?

'খিদের মুখে রান্না-বান্নার ব্যাপারে এতো বাছ-বিচার করলে চলে না, তার চেয়ে এসো আমরা আজ না হয় কাঁচা মাংসই খাবো।' বললেন মিঃ গুড।

'হরিণটার হৃৎপিণ্ড আর যকৃৎটা বরফ দিয়ে পরিষ্কার করে আমরা খেয়ে ফেললাম। শুনতে হয়তো খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি প্রচণ্ড খিদের মুখে মনে হলো এর চেয়ে ভালো খাবার আমরা আগে কখনো খাইনি।

আমাদের পিছনে সেবা'র দুই বক্ষ সগৌরবে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেখান থেকে পাঁচ হাজার ফুট নিচে এ দিকে অন্তহীন দিগন্ত প্রসারী সবুজ ক্ষেত আর অন্য দিকে সুদূর বিস্তৃত ঘন অরণ্য। তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা বিরাট নদী। এত উঁচু থেকে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া নদীটাকে একটা রূপোলী সাপ বলে ভ্রম হচ্ছে।

'মানচিত্রে সলোমনের পথের উল্লেখ করা আছে। তাই না?' স্যার হেনরী জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, ওই তো পথ দেখা যাচ্ছে।'

সত্যিই চমৎকার পথ। পাথর কেটে পথটা তৈরী হয়েছে। কম করেও পথটা পঞ্চাশ ফুট চওড়া হবে। এরকম পাণ্ডববর্জিত একটা জায়গায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা করাটা ছেলে খেলা! সেকালের ইঞ্জিনীয়ারদের দক্ষতা ও দূরদর্শিতার তারিফ করতে হয়। দুপুর নাগাদ আমরা অরণ্যের কাছে এসে পৌঁছলাম।

'আর কাঠের কোনো অভাব হবে না, এখানেই রান্না-বান্না করে নেওয়া যাক।' বললেন মি গুড।

কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালা হলো। সেই আগুনে সঙ্গে হরিণের মাংশের রোস্ট বানানো হলো। আয়েশ করে খাওয়ার পর আমরা পাইপে অগ্নি সংযোগ করলাম। এবার একটু নেশা করা যাক। ওদিকে স্যার হেনরী এবং উম্বোপা কথা বলতে লাগলো ভাঙা ভাঙা জুলু আর ইংরেজী ভাষা মিশিয়ে। গুড নদীর ধারে বসে তাঁর পোশাক পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর দাড়ি কামাতে বসলেন।

এই সময় হঠাৎ গুড়ের মাথায় ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে এক ঝলক অগ্নিপিণ্ড ছুটে গেলো। বর্শা! গুড চিৎকার করে উঠলেন। আমার গলা থেকেও বুঝি অজান্তেই বেরিয়ে এলো একটা তীব্র আর্তনাদ। তাকাতে গিয়ে দেখি, অদূরে একদল যোদ্ধা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দলে ওরা জনা কুড়ি তো হবেই। ওরা সবাই রীতিমতো লম্বা, ওদের গায়ের রং তামাটে ধরনের। কারোর মাথায় আবার পাখির কালো পালকের মুকুট। আর তাদের কাঁধের ওপর রয়েছে চিতা বাঘের চামড়ার বেষ্টনী। তাদের মধ্যে থেকে একটি বছর ষোলো সতেরোর তরুণ বীরদর্পে এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকেই। এখন বোঝা গেলো

যে, ওই যুবকটিই হয়ত গুডের দিকে তাক করে বর্শাটা ছুঁড়ে থাকবে। একজন বয়ঃজেষ্ঠ তার হাত ধরে কি যেন বললো, যা এতো দূর থেকে শোনা সম্ভব নয়।

'বন্দুক নামান!' স্যার হেনরী, গুড আর উম্বোপার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন। আমার কেন জানি না মনে হলো, বন্দুকের শক্তি সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই।

'সুস্বাগতম!' বয়স্ক যোদ্ধাটির উদ্দেশ্যে আমি বললাম।

'স্বাগতম' যোদ্ধা উত্তর দিলো নিজের ভাষায়। তার ভাষা বুঝতে আমার আর উম্বোপার কোনো অসুবিধেই হলো না। তারপর সে এক এক করে অনেকগুলো প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কে? কোথা থেকে আসছো? তোমাদের তিনজনের মুখ দেখছি সাদা। কিন্তু চতুর্থজনের মুখ আমাদের মতো কেন?'

ভালো করে দেখতে গিয়ে মনে হলো, সত্যিই উম্বোপার সঙ্গে এই যোদ্ধাটির চেহারার অনেক মিল আছে। অবশ্য এই ব্যাপারটা নিয়ে তখন আমরা খুব বেশী চিন্তা করিনি।

'আমরা তোমাদের বন্ধু, শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। চতুর্থজন হচ্ছে আমাদের অনুচর।'

'মিছে কথা! কোনো আগন্তুকই ওই পর্বতমালা অতিক্রম করতে পারে না। ওই পর্বতে সাক্ষাৎ মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে। কোনো বিদেশীই কুকুয়ানদের দেশে একবার প্রবেশ করলে জীবিত থাকতে পারে না। এটাই হচ্ছে এখানকার রাজার আইন। তাই বিদেশী আগন্তুকরা, তোমরা মরবার জন্য প্রস্তুত হও।'

'লোকটা বলছে কি?' গুড জানতে চাইলেন।

'ও বলছে। আমাদের হত্যা করতে চায়, মৃত্যুর জন্যে আমাদের তৈরী হতে বলছে।'

'হায় ঈশ্বর!' ঘাবড়ে গিয়ে গুড তাঁর বাঁধানো দাঁতের উপরের পাটি বের করে আবার তা খট করে মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘাবড়ে গেলে এরকম করা গুডের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যেন। কিন্তু এর ফলে যা হলো আমাদের পক্ষে সেটা খুবই সৌভাগ্যজনক বলেই মনে হলো।

কুকুয়ানরা আঁতকে চিৎকার করে উঠলো। তারপর দৌড়ে পিছু হটে গেলো। 'দাঁত দাঁত..........মিঃ গুড আপনার দাঁত দেখে ওরা ভয় পেয়ে গেছে।' স্যার হেনরী উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনার বাঁধানো দাঁত আবার বের করে আনুন।'

গুড এবার দু'পাটি দাঁতই মুখ থেকে বের করে আনলেন। লোকগুলো এবার যতো না বেশী ভয় পেলো তার বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠলো। তাই এবার ওরা পিছিয়ে না গিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো।

গুড হাঁ করলেন। দেখা গেলো, তাঁর মুখে একটিও দাঁত নেই, শুধুই রয়েছে লাল মাড়ি।

'কি আশ্চর্য ব্যাপার! দাঁতগুলো গেলো কোথায়?' যোদ্ধারা সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো।

এতে গুডও খুব মজা পেয়ে গেলেন। অভিজ্ঞ যাদুকরের ভঙ্গীমায় নিজের মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। তারপরেই আবার দেখা গেলো তাঁর মুখে দুপাটি দাঁতই আগের মতো কেমন ঝকঝক করছে।

যোদ্ধারা স্তব্ধ, হতবাক। সেই তরুণ যোদ্ধা, যে বর্শা নিক্ষেপ করেছিল, সে এবার মাটির ওপর আছড়ে পরে দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। বৃদ্ধ যোদ্ধার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকলো। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, 'দেখছি আপনারা অন্য জগতের মানুষ, আপনারা আমাদের মতো নন, আমাদের মতে আপনারা দেবতা, আমাদের ক্ষমা করুন।'

এমন একটা চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করার মতো পাত্র আমি নই। বললাম, 'বেশ, আমরা তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। আমরা আসছি অন্য জগৎ থেকে। রাতের অন্ধকারে যে তারাটা সবচেয়ে

বেশী বড় দেখায় আমরা সেখানেই থাকি, আর সেখান থেকেই আসছি আমরা।'

'ওহো, তাই বুঝি!' যোদ্ধারা আবার সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

'আমরা তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছি,' আমি তাদের মন জয় করার জন্য আরও বললাম, 'আমার কথাবার্তা শুনে তোমরা নিজেদের কানেই শুনতে পাচ্ছো, আমি তোমাদের ভাষা শিখে আমি নিজেকে কেমন তৈরী করে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো, তাই তো?'

'তবে এখনো তো তোমরা আমাদের কতো শক্তি তা বুঝতে পারোনি। দূরে পাহাড়ের ওপর ওই জন্তুকে দেখতে পাচ্ছো? এখন বলো, এখান থেকে শুধু গর্জন করে ওই জন্তুটাকে খতম করা কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব?'

'না প্রভু, তা মোটেই সম্ভব নয়,' বৃদ্ধ যোদ্ধা বললো, 'কোনো মানুষ যে এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে, আমাদের তা জানা নেই।'

'তাহলে দেখো আমাদের মতো যাদুকরের খেল্,' কৃষ্ণসার হরিণটার দিকে তাক করে আমি গুলো করলাম।

হরিণটা কেবল একটিবারই শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই ঢলে পড়লো। যোদ্ধার দল দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো।

'এবার বিশ্বাস হলো তো আমি কখনো বাজে কথা বলি না?' এর পরেও আমাদের শক্তি সম্পর্কে যদি কারোর কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সে গিয়ে দাঁড়াক, ওই পাহাড়টার ওপর তারও দশা হবে ওই হরিণটার মতো।'

'ওরা নিশ্চয়ই যাদুকর, ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক, কি বলো?'

'হ্যাঁর তাই হোক্,' সব যোদ্ধাই বৃদ্ধ যোদ্ধার কথায় সায় দিলো।

'তাহলে শুনুন তারার সন্তানরা, শুনুন কাচের চোখের সন্তানরা, শুনুন চলমান দাঁতের সন্তানরা,' বৃদ্ধ যোদ্ধা বলতে থাকে, 'আমি হলাম ইনফাডোজ, আমার বাবার নাম কাফা। তিনি ছিলেন কুকুয়ানদের রাশ। এই যে তরুণ যোদ্ধাকে দেখছো। এর নাম স্ক্রাগ্গা। এ হচ্ছে মহান রাজা তোয়ালার সন্তান।'

'তাই বুঝি!' বুক ফুলিয়ে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তোমাদের রাজার কাছে আমাকে নিয়ে চলো। আমরা নিচু লোক আর তার প্রজাদের সঙ্গে কথা বলি না।'

'কিন্তু রাজার প্রাসাদ যে এখান থেকে তিন দিনের হাঁটা পথ ধৈর্য্য ধরুন,' আমরা আপনাদের সেখানে ঠিকই নিয়ে যাবো,' বৃদ্ধ যোদ্ধা তাকে আশ্বস্ত করে বললো।

'সে তো খুবই ভালো কথা, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনোরকম ছলনা করবার চেষ্টা করলে, তোমাদের আখেরে ভালো হবে না, তোমরা তোমাদের নিজেদের দোষে তোমরাই খতম হয়ে যাবে।'

যোদ্ধারা মাথা নত করে দুটি শব্দ করলো, 'কুম কুম!' পরে জেনেছিলাম, এই শব্দদুটি হলো আগন্তুকদের রাজকীয় অভিবাদন জানাবার ভঙ্গীমা।

এই সময় গুড তাঁর ট্রাউজারটা পরতে যাচ্ছিলেন, বৃদ্ধ যোদ্ধা ছুটে এসে তাঁর কাছ থেকে সেটা এরকম ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে উঠলো, 'না, না প্রভু, আপনি কি আপনার ভৃত্যদের কাছে আপনার এমন সুন্দর পা-দুটো ঢেকে রাখবেন? আমরা কি এমন অপরাধ করেছি যে......'

আমার অবস্থা তখন হাসিতে ফেটে পড়বার উপক্রম হলো। ওদিকে গুডের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। উত্তেজনায় তাঁর দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠলো।

'শুনুন মিঃ গুড,' স্যার হেনরী বললেন, 'মনে রাখবেন, আপনি একটি বিশেষ চরিত্র নিয়ে এ দেশে

এসেছেন। আর এই বিশেষ চরিত্রটি আপনাকে বজায় রাখতে হবে। এখন থেকে আপনাকে ফ্লানেলের শার্ট আর বুট পরেই থাকতে হবে। এর বেশী কিছু নয়। আপনার চোখে থাকবে আইগ্লাস। এখনকার মতো আপনার এক গাল থাকবে কামানো আর অন্য গালে থাকবে ভর্তি দাড়ি।'

মিঃ গুড মুখে কিছু বললেন না, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

।। সাত।।

ঃ কুকুয়ানদের দেশে ঃ

সলোমনের রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। ইনফাডোজ এবং স্ক্রাগগা আমদের সঙ্গী হয়ে চলেছে। ওদের অনুচররা আমাদের পিছু পিছু হাঁটছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ইনফাডোজ, এ রাস্তা কে তৈরী করেছে?'

'এ রাস্তা বহুকাল আগের তৈরী, সে কতো বছর আগে কেউ জানে না। এমন কি গগুলও জানে না।'

'গগুল, সে আবার কে?'

'গগুল আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশী জানে। অত্যন্ত বৃদ্ধা সে। বহুকাল ধরে বেঁচে আছে সে। তার বয়স যে কতো কেউ জানে না।'

'তা কুকুয়ানরা কবে এদেশে এসেছিল?'

বহু যুগ আগে। অন্তত দশ হাজার চাঁদ আগে তো বটেই। সামনে পাহাড়ের বাধা থাকার দরুণ আমাদের পূর্বপুরুষরা এর বেশী আর এগোতে পারেন নি। এ দেশ অত্যন্ত সুন্দর, জমি খুবই উর্বর। তাই তাঁরা এদেশেই থেকে যান। তখন আমরা সাগরপারের বালুকণার মতো অসংখ্য, আমাদের সৈন্যবাহিনী বিরাট।'

'তোমাদের দেশ যদি পাহাড় দিয়ে ঘেরা হয়, তাহলে তোমাদের আর কাকেই বা ভয়? আর তোমাদের এই বিরাট সৈন্যবাহিনীরই কি প্রয়োজন?'

'না প্রভু, আমাদের দেশের উত্তরদিকটা উন্মুক্ত। মাঝে মাঝে সে দিক থেকে আক্রমণকারীরা আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে। তবে তারা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারে না। আমরা তাদের খতম করে ফেলি। আমি যখন যুবক , তখন শেষবারের মতো ওদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে আর কখনো যুদ্ধ হয়নি ওদের সঙ্গে।'

'তাহলে তো তোমাদের যোদ্ধারা শান্তির মুখ দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলো।'

'তবে মাঝখানে একটা যুদ্ধ হয়েছিল বটে। সে যুদ্ধ অবশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে।'

'কি রকম?'

'তাহলে শুনুন প্রভু। আমার বাবা রাজা কাফা মারা গেলে পর নতুন রাজা হলেন আমার বড় ভাই ইমোতু। উত্তরের যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধের পর আমাদের দেশে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। খাদ্যাভাবে দেশবাসী অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তখন গগুল কুকুয়ানদের বললো, 'ইমোতু, আদৌ রাজা নয়।' তারপর সে তোয়ালাকে নিয়ে এলো জনসমক্ষে। তাদের উদ্দেশ্যে সে বলে, 'শোনো কুকুয়ান দেশের অধিবাসীরা, এ হলো ইমোতুর যমজ ভাই তোয়ালা আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী কোনো রাজার যদি যমজ সন্তান হয়, তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে দুর্বল ছেলেটিকে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু আমি তোয়ালাকে মারতে দিইনি, তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে গোপনে একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম বহু বছর ধরে। আজ আমি

তাকে তোমাদের সামনে উপস্থিত করছি।' এই বলে গগুল তোয়ালার কোমর থেকে কাপড় সরিয়ে দিলো। কুকুয়ানবাসীরা দেখলো, তোয়ালার শরীরের মাঝখানে রয়েছে পবিত্র সর্পচিহ্ন। এদেশে প্রথা অনুযায়ী যে ছেলে পরবর্তী রাজা হবে, খুব ছোট বয়সেই তার কোমরের কাছে সাপের চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়।'

'ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত জনসাধারণ সেই পবিত্র সর্পচিহ্ন দেখতে পেলো। তারা ধরে নিলো, ওই চিহ্নই তাদের বাঁচাতে পারবে। ''তারা রাজা, রাজা, রাজা বলে তোয়ালার নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করলো। কিন্তু আমি তো জানি এটা মিথ্যে, সাজানো। কারণ আমার ভাই ইমোতুই বাবার বড় ছেলে, সেই হলো আমাদের দেশের আসল ও বৈধ রাজা।'

একটা আঘাত পেয়ে ইমোতু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সে তার স্ত্রী ও বাচ্চা ছেলে ইগমোমিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

'এখানে এতো গোলমাল কিসের?' তোমরা কেনই বা রাজা রাজা বলে চিৎকার করছো?' ইমোতু জিজ্ঞেস করলো।

'তারপর রাজার নিজের ভাই তোয়ালা তার দিকে ছুটে এলো এবং একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস কাজ করে বসলো, ইমোতুর চুলের মুঠি ধরে তোয়ালা তার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো, শয়তান গগুলের দ্বারা বিভ্রান্ত জনসাধারণ হাততালি দিয়ে জয়োল্লাসের চিৎকার করে উঠলো, 'তোয়ালাই আমাদের আসল রাজা। আমরা ইমোতুকে রাজা বলে আর মানবো না। এখন থেকে তোয়ালাই হবে আমাদের একমাত্র রাজা।'

'রাজা না হয় বদল হলো। কিন্তু ইমোতুর রানী আর তাঁর ছেলে রাজকুমার ইগমোসির কি হলো? তোয়ালা কি তাদেরও খতম করে ফেললো?' আমার কেমন কৌতূহল হতেই জিজ্ঞেস করলাম।

'না প্রভু, রানী তাঁর শিশুসন্তান ইগনোসিকে নিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেলেন কেউ জানে না। তারপর ওঁদের কেউ আর কখনো দেখতে পায়নি।'

'তাহলে এর থেকে কি ধরে নেওয়া যায় যে, সেদিনের সেই শিশু সন্তান ইগনোসি যদি আজও জীবিত থাকে, তাহলে সে-ই হবে কুকুয়ানদের সত্যিকারের রাজা?'

'অবশ্যই। কারণ তার দেহের মাঝখানে রয়েছে পবিত্র সর্পচিহ্ন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেকি আর বেঁচে আছে? হয়তো সে মারা গেছে অনেকদিন আগেই।'

তারপর আমরা এসে হাজির হলাম ছোট্ট একটা গ্রামে। আজ রাতে আমরা এই গ্রামেই থাকবো। উম্বোপা আমাদের পিছনে থেকে অনুসরণ করছিল। ইনফাডোজ যে কাহিনী শোনালো তার প্রতিটি কথা সে নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। তাকে দেখে মনে হলো সে যেন অনেক দিন ভুলে যাওয়া কোনো ঘটনা স্মরণ করবার চেষ্টা করছে। আমরা যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গেই ইনফাডোজ গ্রামের লোকদের কাছে আমাদের আগমনের সংবাদ পাঠিয়েছিল। তার প্রমাণ পেলাম গ্রামের দু মাইলের মধ্যে আসতেই দেখলাম যোদ্ধার দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা একটু ভয় পেয়ে গেলাম। ওরা বুঝি ওদের গ্রামে পেয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসে। আমাদের চিন্তার কারণটা বুঝতে পেরে ইনফাডোজ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ঃ না, না ভয় পাবেন না। আপনাদের অনিষ্ট করার কোনো পরিকল্পনাই আমাদের নেই। আসলে এই সব যোদ্ধারা আমার অনুগত। ওরা আপনাদের স্বাগত জানাতে এসেছে। ওরা জানে, আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি।'

ধুপ.........ধুপ............ধুপ..........

ওরা পা ঠুকে ঠুকে আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল, এটাই নাকি ওদের রীতি। কিন্তু ওদের ভারী ভারী

পায়ের চাপে পৃথিবী যেন কাঁপতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই গ্রামে এসে পৌঁছলাম। একটা গ্রামের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। গ্রামের মাঝখানে একটা বিশাল কুটীরের সামনে ইনফাডোজ থামলো। গ্রামের কুটীরগুলো বড় অদ্ভুত, গম্বুজের আকৃতির মতো।

ইনফাডোজ জনসমক্ষে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'রাতের সবচেয়ে বড় তারকার সন্তানগণ, আজ রাতটা আপনারা এখানেই বিশ্রাম নিন। একটু পরেই আপনাদের রাতের নৈশভোজের খাবার দেওয়া হবে। বেশী কিছু নয়, প্রথমে একটু মধু, একটু দুধ, একটা কি দুটো পুষ্ট ষাঁড়, আর কয়েকটা ভেড়া।'

'সে তো চমৎকার ডিনার হবে,' আমি তার আপ্যায়নের তারিফ করে বললাম, 'আকাশপথে আসাতে গিয়ে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।'

এর পর আমরা কুটীরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ওরা ওদের সাধ্যমতো সব করে রেখেছে। এই সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেলো। ছুটে বাইরে গিয়ে দেখলাম, একদল সুন্দরী রমণী আসছে আমাদেরই কুটীরের দিকে। ওরা সঙ্গে করে নিয়ে আসছে দুধ, মধু আর এক ধরনের রুটি। ওদের পিছনে একটি হৃষ্টপুষ্ট নধর ষাঁড়কে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে কয়েকটি তরুণ। ষাঁড়টাকে আমাদের সামনেই ওরা জবাই করে কেটেকুটে আগুনে ঝলসাবার আয়োজন করলো। আমরা ইনফাডোজ এবং স্ক্রাগগাকে আমাদের সঙ্গে আহার করার আমন্ত্রণ জানালাম।

আহার সমাধার পর আমরা আরাম করে পাইপ ধরালাম। আমাদের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে ইনফাডোজ আর স্ক্রাগগা অবাক চোখে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ইনফাডোজকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, পরদিন সকালে তারা আমাদের রাজধানীর দিকে যাত্রা করার ব্যবস্থা করবে। ইনফাডোজ আর স্ক্রাগ্‌গা চলে গেলো।

।। আট।।

ঃ রাজা তোয়ালা ঃ

পায়ে হেঁটে রাজধানী লু-তে যেতে আমাদের কম করেও দুদিন সময় লেগে গেলো। যাওয়ার পথে দেখলাম একের পর এক সৈন্যদল চলেছে রাজধানীর দিকে। কিন্তু কিসের এই সাজ-সাজ রব? তবে কি ওঁরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছে? না, আমাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে যে সত্যটা প্রকাশ পেলো পরবর্তী পর্যায়ে, তা হলো, আসলে ওরা ওইভাবে বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে চলেছে। দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় আমরা একটা চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। এখান থেকেই দেখতে পেলাম রাজধানী লু নগরকে। রাজধানীর বিস্তার মাইল পাঁচেক হবে। নগরের এ পাশে রয়েছে ঘোড়ার নালের মতো আকৃতি একটি পাহাড়, খুব বেশী উঁচু নয়। শহরের মাঝখান দিয়ে একটি নদী বয়ে যেতে দেখা গেলো। কয়েকটা জায়গায় নদীর ওপর একটি সেতুও রয়েছে দেখলাম। সেখান থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে সমতলভূমি থেকে উঠেছে তিনটি বরফ ঢাকা পাহাড়। সেদিকে আমাদের মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ইনফাডোজ বললো, 'এই যে আমরা যে পথে চলেছি, এটা শেষ হয়েছে ওখানে গিয়ে। জানেন প্রভু, ওই তিনটি পাহাড়কে আমরা নাম দিয়েছি 'তিন প্রহরী'।

'আচ্ছা, পথ ওখানে গিয়েই বা শেষ হলো কেন? আরও তো এগিয়ে যেতে পারতো?'

'জানি না, ওই পাহাড়গুলোর জায়গায় জায়গায় গুহা রয়েছে। পুরাকালের জ্ঞানী-গুণীরা ওখানে যেতেন। তাঁরা এ দেশে যে জন্যে আসতেন তার সন্ধান পাবার জন্য তাঁদের বেশ কিছুদিন এখানে

থাকতে হয়। আর তখন তাঁরা ওই সব গুহার মধ্যে সাময়িকভাবে তাঁদের আস্তনা গড়ে তুলতেন। আমায় এগুলোকে মৃত্যু গুহা বলে থাকি, এই কারণে আমাদের মৃত রাজাদের ওই সব গুহায় সমাহিত করা হয়।'

'তা জ্ঞানী-গুণীরা কিসের সন্ধানে আসতেন বলে মনে হয়?' আমি জানতে চাইলাম।

'জানি না। আপনাদের মতো তারকার সন্তানদের তো তাদের মনের কথা জানা উচিত। আপনারা তো অন্তর্যামী ভগবান।'

এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা গেলো যে ইনফাডোজ যতটুকু বলেছে তা থেকে সে অনেক বেশী কিন্তু জানে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো,' উত্তরে আমি বললাম, 'তারার রাজ্যে শুনেছি, প্রাচীনকালের জ্ঞানী-গুণীরা এই তিন পাহাড়ে আসতেন উজ্জ্বল পাথর আর হলদে লোহা পাবার জন্য।'

'প্রভু, আপনি মহাজ্ঞানী, সে তুলনায় আমি আপনার কাছে শিশুমাত্র। আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে গগুলের সঙ্গে কথা বলবেন। সেও আপনার মতোই জ্ঞানী।' এই বলে ইনফাডোজ এগিয়ে গেলো।

আমি এবার আমাদের সঙ্গীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'ওই পাহাড়গুলোর মধ্যেই রয়েছে রাজা সলোমনের হীরের খনি।'

সূর্যাস্তের পরেই আমরা আহার পর্ব সেরে নিলাম। তারপর চাঁদ ওঠার প্রতীক্ষায় থাকতে হলো। একটু পরে ইনফাডোজ এসে বললো, 'প্রভুরা যদি তৈরী থাকেন, তাহলে এবার আমরী রাজধানী লু-এর দিকে যাত্রা আবার শুরু করতে পারি।' এবার আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম অতঃপর।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছে গেলাম। সারি সারি কয়েকটা কুটীর। ইনফাডোজ বললো, প্রভু, এইসব কুটীরগুলো আপনাদের থাকার জায়গা।'

নিরাপত্তার খাতিরে ঠিক করলাম, আমরা সবাই আলাদা আলাদা কুটীরে না থেকে বরং একটা কুটীরেই থাকবো। একটু পরেই একদল সুন্দরী তরুণী আমাদের খাবার নিয়ে এলো। আহারের পর আমরা বিছানায় আশ্রয় নিতেই সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

পরের দিন বেলায় ঘুম ভাঙলো। দল বেঁধে মেয়েরা এসে গেছে আমাদের তৈরী হতে সাহায্য করার জন্য। বিকেলে ইনফাডোজের সঙ্গে গেলাম রাজবাড়ি দর্শনের জন্য।

একটা বিশাল কুটীরের সামনে এসে আমরা থামলাম। আমরা যে কুটীরে রাত্রিবাস করেছি তার থেকে এটা কম করেও পঞ্চাশগুণ বড় হবে। কুটীরের সামনেই কয়েকটা টুল পাতা ছিল। ইনফাডোজ আমাদের বসতে বললো সেখানে। উম্বোপা দাঁড়ালো আমাদের পিছনে। আট-দশ মিনিট সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল। চারধারে সশস্ত্র যোদ্ধা, অন্তত আট হাজার তো হবেই। ওদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে থাকলাম।

শেষ পর্যন্ত কুটীরের দরজা খুলে গেলো। সেখান থেকে একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার লোক বেরিয়ে এলো। তার কাঁধের ওপর চমৎকার চকচকে একটা চিতাবাঘের চামড়া থাকতে দেখলাম। লোকটির পিছু পিছু এলো স্কাগগা এবং লোমের পোশাক পরিহিত শুকনো বাঁদরের মতো একটা মূর্তি। লোকটি একটা বড় টুলের ওপর বসলো। স্কাগগা তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। শুকনো বাঁদরের মূর্তিটা চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কুটীরের ছায়ায় গিয়ে বসলো।

তখনো সেই নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। এমনি নিস্তব্ধতা যে, মনে হয় একটা ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার লোকটি বাঘের চামড়াটা গা থেকে খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটি

দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত। এতো কুৎসিৎ লোক আমি এর আগে কখনো দেখিনি। লোকটির ঠোঁটদুটো পুরু এবং বিরাট, তার ওপর একটা চোখ কানা, সারা মুখমণ্ডলে ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুরতার ছাপ স্পষ্ট। লোকটির সারা গা বর্ম দিয়ে ঢাকা, ডানহাতে একটা বর্শা। গলায় ভারী সোনার একটা নেকলেস। কপালে বাঁধা বিরাট একখণ্ড জ্বলজ্বলে হীরে। এতো বড় হীরের টুকরো এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

আর ইনিই হলেন সেই রাজা তোয়ালা। রাজা তার হাতের বর্শাটা শূন্যে তুলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেখাদেখি আট হাজার সৈনিকও তাদের হাতের বর্শা শূন্যে তুলে ধরে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো তিনটি শব্দ ঃ কুম......কুম.........কুম।' মনে হলো হাজার হাজার বজ্র যেন একসঙ্গে গর্জন করলো আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। তারপরেই আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে। একজন যোদ্ধার হাত থেকে তার ঢালটা ঝনঝন করে মাটিতে পরে গেলো।

তোয়ালা শীতল দৃষ্টিতে সেই যোদ্ধাটির দিকে তাকালো। তারপরেই সে হুঙ্কার দিলো, 'এই শোন্, এদিকে আয়! তুই কি তারালোকের আগন্তুকদের সামনে আমাকে অপমান করতে চাস?'

বেচারা যোদ্ধা ভয়ে আতঙ্কে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। থর থর করে পা দুটো কাঁপছে। তারপর তোয়ালা স্ক্রাগ্‌গার দিকে ফিরে বললো, 'দেখি তো স্ক্রাগ্‌গা তুমি কেমন বর্শা চালাতে শিখেছো।' গর্জে উঠে সে আবার বললো, 'এই কুকুরাকে এখনই খতম করে ফেলো।'

স্ক্রাগ্‌গা এগিয়ে এলো সামনে। মুখে তার শয়তানের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। আতঙ্কভরা চোখে দেখলাম, শয়তানটা কালবিলম্ব না করে পরমুহূর্তেই বর্শা ছুঁড়ে হতভাগ্য যোদ্ধাটিকে এ ফোঁড় ওফোঁড় করে ফেললো। ওদিকে স্যার হেনরী লাফিয়ে উঠে শপথ উচ্চারণ করলেন এবং সেই শপথের বাস্তবরূপ দিতে উদ্যত হতেই আমরা তাঁকে কোনোরকমে ধরে রাখলাম। এদিকে চারজন সৈনিক এগিয়ে এসে মৃত যোদ্ধাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো সেখান থেকে।

তারপর তোয়ালা আমাদেব দিকে ফিরে তাকালো।

'শ্বেতাঙ্গরা, আপনারা কোথা থেকে যে এসেছেন জানি না। আর আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যই বা কি তা জানি না। তবু আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।'

'কুকুয়ানরাজ তোয়ালা, আমাদের তরফ থেকে আমরাও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,' উত্তরে আমি বললাম।

'কোথা থেকে আসছেন আপনারা, আর কিই বা চান?'

'আমরা আসছি তারালোক থেকে, কি করে এলাম তা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমরা এ দেশ দেখতে এসেছি।' উত্তরে আমি বললাম, 'স্রেফ, দেশভ্রমণ আর কি!'

উম্বোপার দিকে আঙুল দেখিয়ে রাজা এবার জানতে চাইলেন, 'এও কি তারার রাজ্য থেকে আসছে?'

'স্বর্গের অনেকের গায়ের রঙই আপনাদেরই মতোই কালো।' সাবধানে তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'তবে এ নিয়ে আপনি যেন কোনো প্রশ্ন করবেন না। এসব উচ্চস্তরের ব্যাপাব। বললেও আপনি বুঝতে পারবেন না।'

'বাঃ আপনি দেখছি বড় লম্বা লম্বা কথা বলেন। মনে রাখবেন তারার রাজ্য এখান থেকে অনেক দূরে, আর আপনারা রয়েছেন আমার রাজ্যে। এখানে আমিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যে মরাটাকে এইমাত্র এখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো, আপনাদের দশাও যদি ওইরকম হয়? ইচ্ছে করলে আমি কিন্তু আপনাদের হাল ওইরকম করে ছাড়তে পারি।'

'সাবধান রাজা! আপনি যদি আমাদের সামান্য একটুও ক্ষতির চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য। ইনফাডোজ বা স্ক্রাগ্‌গা কি আপনাকে আমাদের ক্ষমতার কথা বলেনি?'

'হ্যাঁ বলেছে, তবে আমার কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। দেখি, এখান থেকে বহুদূরের একটা লোককে আপনি কি করে মারতে পারেন?'

'আমরা অকারণ মানুষের রক্তপাত করি না।'

'কিন্তু একটা মানুষ মেরে যতক্ষণ না আমাকে দেখাচ্ছেন, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি কি করে বলুন!'

'বেশ তো, আপনি তাহলে ওখানটায় গিয়ে দাঁড়ান, অথবা স্ক্রাগগাকেও পাঠাতে পারেন। দেখি আমাদের ক্ষমতা আপনাকে দেখাতে পারি কিনা। একটু আগে আপনার সুপুত্তরটি বেচারা সৈনিকের যে হাল করলো? তাতে ওকে মারবার সুযোগ পেলে আমি খুবই খুশী হবো।'

ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ছটফট করতে করতে স্ক্রাগগা একরকম ছুটেই কুটীরের ভেতরে চলে গেলো একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

তোয়ালা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'ওরে কে কোথায় আছিস্ একটা ষাঁড় নিয়ে আয়, দেখা যাক ওদের কতো ক্ষমতা।'

একটু পরেই একটা হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় নিয়ে এলো দুজন সৈনিক। জন্তুটাকে রাখা হলো আমাদের থেকে অনেক দূরে। স্যার হেনরী লক্ষ্য স্থির করলেন।

'গুড়ুম!'

ষাঁড়টা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। গুলো গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে ষাঁড়টার পাঁজরায়। উপস্থিত জনতা গভীর বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো। এক সঙ্গে, কোরাস সঙ্গীতের মতো।

'কি রাজামশাই, এর পরেও কি আপনারা আমার বা আমার সঙ্গীদের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবেন?' গুলো গিয়ে লেগেছে ষাঁড়টার বুকে, পিঠে সর্বত্র। উপস্থিত জনতা গভীর বিস্ময়ে চিৎকারকরে উঠলো।

'কি রাজামশাই, আমি কি মিথ্যে বলছি?'

'হ্যাঁ তারার সন্তান, দেখলাম, আপনার কথাই সত্য,' তোয়ালা জবাব দিলো, তার কথাগুলো বড় দুর্বল শোনালো যেন।

'শুনুন রাজামশাই, আপনি স্বচক্ষে তো দেখলেন আমাদের কতোই না ক্ষমতা। তবে আমরা আমাদের এ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাই না। আর আমরা কখনোই যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই। আমরা শান্তির দূত হয়ে এসেছি আপনার রাজ দরবারে। আমি এই অস্ত্রটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি, বলতে পারেন এটা আমি আপনার কাছে জমা দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, এ অস্ত্রে আমি আমার যাদুমন্ত্র পড়ে দিয়েছি। কোনো লোককে এ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবার জন্য তুললে, এটা বুমেরাং হয়ে আপনার কাছেই ফিরে যাবে আপনাকেই হত্যা করবার জন্য।'

আমার কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে রাজা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেটা তার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। আর ঠিক সেই সময়েই মর্কট মূর্তিটি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো কুটীরের ছায়া থেকে। সে এসে দাঁড়ালো রাজার সামনে। এবার মূর্তিটা মুখের পশলোমের আবরণটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দেখলাম জানোয়ারের মূর্তির বদলে সে এক অতি বৃদ্ধার মুখ। বয়সের ভারে শুকিয়ে কুঁচকে মুখখানা তার আমসির মতো এতটুকু হয়ে গেছে। ঠিক যেন একটা শিশুর মুখ। সারা মুখে গভীর বলিরেখা ফুটে

উঠেছে। নাকের বালাই বলতে আর কিছু নেই। দেখে মনে হচ্ছে যেন একখানা রোদে-পোড়া মরার মুখ।

মূর্তিরূপী বৃদ্ধা তার হিংস্র পশুর নখরের মতো একখানা হাত তোয়ালার কাঁধের ওপর রাখলো। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর নখ। প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হবে। তারপর সরু অথচ তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো ঃ 'শোনো রাজা, শোনো সবাই.......পাহাড়, সমতল, নদী, সবাই তোমরাও শোনো, শোনো আকাশের সূর্য, গ্রহ, তারা, চন্দ্র.........যারা এখনো বেঁচে আছো বা যারা মরে গেছো, তারা সবাই শোনো..........আমার মধ্যে রয়েছে জীবনের আত্মা............তার মাধ্যমে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি। শোনো, তোমরা সবাই শোনো...........

'রক্ত! রক্ত! রক্ত!' বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলে উঠলো, 'রক্তের নদী বয়ে চলেছে.........সব জায়গাতেই রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে, আমি সেই রক্ত নিজের চোখে দেখছি, নিজের নাক দিয়ে রক্তের ঘ্রাণ নিতে পারছি, মাটির ওপর রক্ত নদীর স্রোত বইছে, শুধু কি তাই,.........আকাশ থেকে বৃষ্টি ধারার মতো রক্ত ঝরে পড়ছে।'

'পায়ের শব্দ.......পায়ের শব্দ........পায়ের শব্দ ওই শোনা যায়! শ্বেতাঙ্গদের পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। ওরা আসছে। অনেকদূর থেকে আসছে। ওদের দাপাদাপিতে কাঁপছে পৃথিবী। পৃথিবী কাঁপছে তার প্রভুর সামনে।'

'আমি বৃদ্ধা......অতি বৃদ্ধা অনেক বয়স হয়েছে আমার! অনেক রক্ত দেখেছি, আরো দেখবো, মরবার আগে আমি আরো অনেক রক্ত দেখবো.........বলো, এদেশে আসবার ওই রাস্তা কে তৈরী করেছিল? জানো না তো তোমরা, আমি কিন্তু জানি। ওই রাস্তা শ্বেতাঙ্গরাই তৈরী করেছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা এদেশে এসে বসতি স্থাপন করার অনেক আগেই এখানে সাদা চামড়ার মানুষের রাজত্ব ছিল। তোমরা কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়, একদিন না একদিন তোমরা শেষ হয়ে যাবেই যাবে, আর তোমরা যখন এখানে থাকবে না, তখন কিন্তু থাকবে সাদা মানুষগুলো।' তারপর শকুনের দৃষ্টি নিয়ে সে আমাদের দিকে ফিরে সেই প্রেতিনীমূর্তি তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো ঃ তারার মানুষেরা, তোমরা কিসের খোঁজে এসেছো এখানে? তা তোমরা কি একজন হারিয়ে যাওয়ার মানুষকে খুঁজছো? কিন্তু সে তো এখানে নেই। অনেক দিন হলো এদেশে কোনো শ্বেতাঙ্গের পায়ের ছাপ পড়েনি। তবে বহুদিন আগে এখানে একজন সাদা চামড়ার মানুষ এসেছিল। সে এদেশ ছেড়ে চলে গেলো মরবার জন্য। আর তোমার এসেছো জ্বলজ্বলে পাথরের খোঁজে এই তো? হ্যাঁ, তোমরা তা পাবে, অবশ্যই পাবে তোমরা, রক্ত যখন শুকিয়ে যাবে ঠিক তখনই তা পাবে। তারপর যে দেশ থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাবে, নাকি আমার সঙ্গে থাকবে এ দেশে? হা হা, হি হি এখানে একটু থেমে বৃদ্ধা আবার বলতে লাগলো ঃ 'আর তুই কালো মানুষটা কে? কি চাস তুই? না, না তুই জ্বলজ্বলে পাথর তো চাস না! মনে হচ্ছে তোকে আমি চিনি তুই যেন আমার খুব চেনা লাগছে, তোর শিরায় প্রবাহিত রক্তের গন্ধ যেন আমি পাচ্ছি, অনেক চেনা গন্ধ, হাঁ, বড় চেনা সেই গন্ধ! তোর কোমর থেকে কাপড়টা সরা......... ...সরা বলছি................'

জীবন্ত প্রেতিনীর মুখটা যন্ত্রণায় আরো কুঁকড়ে গেলো যেন। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। তারপর কুটীরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে।

কাঁপা কাঁপা দেহখানি নিয়ে রাজা উঠে দাঁড়ালো। হাত নাড়লো সে। তারপরেই সমস্ত সৈনিকদের একে একে কুচকাওয়াজ করে বেরিয়ে যেতে লাগলো সেখান থেকে। মিনিট পাঁচেক পরে আমরা ক'জন ছাড়া জায়গাটা একেবারে শূন্য হয়ে গেলো।

তারপর রাজা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তার স্বরে বলল, 'শ্বেতাঙ্গগণ, তোমাদের প্রাণবন্ত সেবার কথা ভাবছি আমি আশ্চর্য, গগুল তো বড় অদ্ভুত কথা বলে গেলো।'

'সাবধান রাজা তোয়ালা! মনে রাখবেন, আমাদের মারা অতো সহজ নয়। ষাঁড়টার কথা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন। আপনি কি জেনে-শুনে নিজের দশা ওই ষাঁড়টার মতো করতে চান?

একথা শুনে তোয়ালাকে কেমন চিন্তায় পড়ে যেতে দেখা গেলো।

'আজ রাতে এখানে বিরাট একটা নাচের আসর বসবে। নাচটা অবশ্যই দেখবেন। কাল না হয় আপনাদের কথা ভেবে দেখা যাবে।'

'সেই ভালো রাজামশাই,' উত্তরে আমি বললাম। তারপর ইনফাডোজের সঙ্গে ফিরে এলাম আমাদের কুটীরে।

।। নয় ।।

ঃ ডাইনী শিকার ঃ

'ইনফাডোজ, তোমার সঙ্গে কথা আছে, ভেতরে এসো।'

'হ্যাঁ, বলুন প্রভু, কি বলতে চান!'

'তোমাদের রাজা তোয়ালার আচার-আচরণ দেখে মনে হলো, উনি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর।'

'হ্যাঁ প্রভু, রাজার এই নিষ্ঠুরতায় আজ আমাদের দেশের সব মানুষ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। আজ রাতে আমাদের এখানে ডাইনী শিকার হবে, রাজার চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যাবে তখন। দেখবেন কারো নিরীহ নির্দোষ লোককে ডাইনী বা ডান হিসেবে সন্দেহ করে মেরে ফেলা হবে। এ দেশে কেউই নিরাপদ নয়, রাজার কোপে পড়লে কারোর আর রেহাই নেই। রাজা যদি কারোর তরফ থেকে তাঁর অনিষ্টের আশঙ্কা করেন বা রাজা যদি কোনো লোকের পশুসম্পদ গ্রাস করার মতলব করে, তাহলে গগুল বা তার শিষ্যরা সেই হতভাগ্য লোকটিকে ডাইনী বা ডান বলে চিহ্নিত করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলা হবে। এই যে আমি এতদিন বেঁচে আছি তার কারণ হলো রাজা আমাকে ঘাঁটাতে চায় না যুদ্ধ বিদ্যাটা আমার ভালো জানা আছে বলে। তাছাড়া আমার অধীনে একদল অনুগত যোদ্ধা আছে। এইসব যোদ্ধারা আমাকে খুবই ভালোবাসে। আমার কিছু হলে তারা রাজাকে ছেড়ে দেবে না। রাজার এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় আমরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি প্রভু।'

'তা ওকে তোমরা রাজপদ থেকে সরিয়ে দিলেই পারো।'

'তাতে লাভ কী প্রভু। তোয়ালা গেলে স্ক্রাগ্‌গা রাজা হবে। নিষ্ঠুরতায় সে তার বাপকেও ছাপিয়ে গেছে। আজ যদি ইমোতুরের ছেলে ইগনোমি থাকতো, তাহলে এতো কষ্ট সহ্য করতে হতো না আমাদের।'

'কি করে জানলে ইগনোমি নেই, সে তো জীবিত থাকতেও পারে।' উম্বোপা প্রশ্ন করলো।

'তুমি আবার এর মধ্যে কথা বলছো কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো ইনফাডোজ।

'শুনুন আপনারা, আমি আপনাদের একটা কাহিনী শোনাচ্ছি। রাজা ইমোতু নিহত হন বহুবছর আগে। তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্র ইগনোমিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই মা ও ছেলে মারা যায়নি। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাজুলুদের দেশে। অনেক বছর রইলেন তারা সেদেশে। একদিন মা মারা যান, তখন তরুণ ইগনোমি ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লো সে দেশ থেকে। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে হাজির হলো সাদা চামড়ার মানুষদের এলাকায়। সেখানে সে একটু আধটু লেখাপড়া শিখলো।'

'এ তো দেখছি বড় মজার গল্প,' ইনফাডোজ তার কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না।

'দীর্ঘদিন ধরে ইগনোমি সাদা মানুষের দেশে ছিল ভৃত্য ও সৈনিকের কাজ করে। মা তাঁকে তার জন্মভূমির কথা বলে গিয়েছিলেন। সে কথা মনে রেখেছিল ইগনোমি। সে বেশ ভালোভাবেই জানতো তার নিজের পরিচয়, জানতো কোথা থেকে এসেছে সে। অনেকদিন অপেক্ষা করার পর একদিন সে জানতে পারলো যে, কয়েকজন সাদা চামড়ার মানুষ সেই অজানা দেশে তার জন্মভূমিতে যাবার পরিকল্পনা করছে। মরুপাহাড় পেরিয়ে সাদা চামড়ার মানুষজন এসে পৌঁছলো কুকুয়ানদের দেশে। ইনফাডোজ তাঁদের সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়েছে।'

'তুমি একটা আস্ত পাগল।' ইনফাডোজ তার কথা উড়িয়ে দিতে চাইলো।

'তোমার কি তাই মনে হয়? আমি তোমায় হাতে হাতে প্রমাণ দেবো কাকা, এই বলে যে আমিই সেই ইগনোমি, আমি কুকুয়ানদের বৈধ রাজা। এই বলে উম্বোপা নিজেই এক ঝটকায় নিজের কোমরের কাপড় সরালো, আমাদের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো সে। 'দেখুন, ভালো করে দেখুন।'

হ্যাঁ আমরা সবাই দেখলাম। উম্বোপার শরীরের মাঝখানে একটা সর্পচিহ্ন আঁকা রয়েছে।

ইনফাডোজ তো দেখে থ। সে বুঝি তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না সে। তারপর এক সময় নতজানু হয়ে চিৎকার করে উঠলো সে, 'কুম! কুম! কুম! হ্যাঁ, এই তো আমার হারানো ভাইপো। এই তো আমাদের দেশের আসল রাজা। রাজার রাজা ইগনোমি।

'কাকা, এখন তো আমার কথা বিশ্বাস হলো আপনার। তাহলে এখন আপনি ঠিক করুন, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন কিনা। ওই জনবিরোধী নিষ্ঠুর তোয়ালাকে রাজপদ থেকে পদচ্যুত করতে আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?'

ইনফাডোজ একটু সময় কি ভাবলো, তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলো, 'ইগনোমি, আমি স্বীকার করে নিলাম, তুমিই আমাদের দেশের রাজা। আমি আজীবন তোমার সঙ্গেই থাকবো, সর্বতোভাবে আমি তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সাহায্য করে যাবো।'

উম্বোপা এবার আমাদের উদ্দেশ্যে বললো, 'শ্বেতাঙ্গগণ, আপনারা কি আমায় সাহায্য করবেন? তোয়ালার সঙ্গে যুদ্ধে আমি যদি জিততে পারি তাহলে আপনারা আপনাদের খুশী মতো যতো পারেন উজ্জ্বল পাথর নিয়ে যেতে পারবেন এ দেশ থেকে।''

'আমি শপথ নিয়ে বলছি।' স্যার হেনরী উত্তরে বললেন, 'নিষ্ঠুর তোয়ালার বিরুদ্ধে আমি তোমার পাশেই দাঁড়াবো।'

'আমিও তোমাকে সাহায্য করতে রাজী, তবে একটা শর্তে আমাকে ট্রাউজার পরতে দিতে হবে।' গুড বললেন।

'আর আপনি?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলো ইগনোমি।

'আমি সবসময়েই প্রকৃত বন্ধুকে সাহায্য করতে রাজী।' উত্তরে আমি বললাম, 'তোমার দেশের উজ্জ্বল পাথর অর্থাৎ হীরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু আমরা তোমাদের দেশে এসেছি স্যার হেনরীর ভায়ের খোঁজে। এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এখন বলো, এ ব্যাপারে তুমি আমাদের সাহায্য করতে রাজী আছো তো?'

'নিশ্চয়ই।' ইনফাডোজের দিকে তাকিয়ে ইগনোমি জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা কাকা, এর আগে কোনো সাদা চামড়ার মানুষ এদেশে এসেছে কি?

'না, রাজা।'

'তাহলে এবার কাজের কথা হোক,' আমি বললাম, 'তুমি কি করে রাজা হবে ইগনোমি? তোয়ালা তো স্বেচ্ছায় রাজপদ ছেড়ে দিতে রাজী হবে না।'

'বলতে পারি না। কাকা, আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে?'

'রাজপুত্তুর, তোমাকে একটা খবর দিই, আজ রাত্রে বিরাট নাচের আসর বসছে, আর সেই সঙ্গে ডাইনী ও ডান-এর খোঁজ করা হবে। আজ অনেক লোকই এর জন্যে তোয়ালার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে। কারণ তাদের অনেকেরই ছেলে, ভাই বা বন্ধু আজ ডাইনী বলে চিহ্নিত হবে, তাদের হত্যাও করা হবে সঙ্গে সঙ্গেই। যদি জীবিত থাকি, তাহলে আজ সন্ধ্যার পর কয়েকজন সর্দারের সঙ্গে আমি কথা বলবো। যদি কোনোভাবে তাদের আমরা আমাদের দলে টানতে পারি তাহলে কাল সকালের মধ্যেই কুড়ি হাজার সৈনিক তোমার পক্ষে চলে আসবে।'

সন্ধ্যায় হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠলো। মাথার ওপর তখন পূর্ণ চাঁদের হাট বসেছে। ইনফাডোজ আমাদের নিয়ে গেলো নাচের আসরে।

দেখলাম তোয়ালা, স্ক্রাগগা আর গগুলকে সেখানে হাজির হতে। সেই সঙ্গে হাজার হাজার সৈন্যও রয়েছে সেখানে। রাজার কাছাকাছি রয়েছে একদল ঘাতক। তাদের হাতে বিশাল বর্শা আর ভারী গদা।

রাজা তার হাতের বর্শাটা শূন্যে তুলে ধরলো। দূরে একজন গান গাইতে শুরু করলো। আর একদিক থেকে ছুটে এলো দশটি অদ্ভুত মূর্তি। এদের বেশীরভাগ অত্যন্ত বৃদ্ধা।

অদ্ভুত দেখতে এইসব মূর্তিগুলোর সাদা চুলে মাছের নাড়িভুড়ি, তাদের মুখগুলো সাদা আর হলুদ রঙে রাঙানো। তাদের পিঠ থেকে ঝুলছে সাপের খোলস, কোমরে জড়ানো রয়েছে মানুষের হাড়ের মালা। মূর্তিগুলোর প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট লাঠি। তাদের মধ্যে একজন গগুলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা—মা...... জয় মা, এই তো আমরা এসে গেছি।'

'ভালো, ভালো, ভালো..........তোমাদের চোখের দৃষ্টি না জানি কি তীক্ষ্ণ। ইসানুমিস (ডাইনি ডাক্তার) , তোমরা কি অন্ধকার জায়গা দেখতে পাও? তীক্ষ্ণস্বরে গগুল বললো।

'হ্যাঁ, পাই মা পাই বৈ কি।'

'তোমরা কি রক্তের গন্ধ পাও?'

'পাই মা পাই।'

'রাজার সম্পর্কে যারা খারাপ চিন্তা করে, সেই সব শয়তানদের হাত থেকে তোমরা তোমাদের দেশকে মুক্ত করতে পারবে তো?

'হ্যাঁ, পারি মা।'

'তাহলে যাও, যাও শকুনীরা,' গগুল তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

সমবেত কণ্ঠে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ জান্তব চিৎকার করে গগুলের শিষ্যরা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। এর পরেই শুরু হলো তাদের উদ্দাম নৃত্য। নাচতে নাচতে একজন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়লো। তাকে বলতে শুনলাম, 'পাচ্ছি, হ্যাঁ গন্ধ পাচ্ছি, রাজার শত্রু খুব কাছেই রয়েছে।'

হঠাৎ নাচ থামিয়ে সে একেবারে স্থির, অচঞ্চল হয়ে গেলো, তারপর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছুটে গেলো একদল সৈন্যের দিকে। সে তার হাতের লাঠিটা দিয়ে স্পর্শ করলো একজন সৈনিককে। তারপরেই দুপাশের যোদ্ধারা বেচারা সেই হতভাগ্য সৈনিককে টেনে নিয়ে এলো রাজার সামনে। এমনি সে অসহায় যে, একটুও বাধা দিলো না সে। ঘাতকেরা পরবর্তী নির্দেশের জন্য তাকালো রাজার দিকে।

'ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না, খতম করে ফেলো এখনি!' রাজার কঠোর আদেশ। রাজার মুখের

কথাটা খসতে না খসতেই বেচারার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। আর তারপরেই শুরু হলো অন্য সব শত্রু নিধন যজ্ঞ। গগুলের শিষ্যরা খুঁজতে লাগলো রাজার শত্রুদের। কিছুক্ষণের মধ্যে শ'খানেক লোকের লাশ পড়ে গেলো আমাদের সামনে। মাঝরাতে হত্যালীলার বিরতি ঘটালো গগুলের শিষ্যরা। ভাবলাম, এবার বোধহয় সেই বীভৎস হত্যালীলার পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু এক সময় দেখা গেল গগুল নিজেই নাচতে শুরু করে দিলো। তেমনি নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো সে আমাদের দিকে। তখন উপস্থিত সবার দৃষ্টি গগুলের দিকে।

গগুল ছুটে এলো, সে তার হাতের জাদুযন্ত্রটি দিয়ে স্পর্শ করলো উম্বোপাকে। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ঃ 'আমি পেয়েছি, গন্ধ পেয়েছি, খুঁজে পেয়েছি রাজার সবচেয়ে বড় শত্রুকে। ওকে আর বাঁচিয়ে রেখো না। এখনি মেরে ফেলো। না হলে এদেশে রক্তগঙ্গা বইবে, রাজা হুকুম করো।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠে বললম, 'রাজা এ আমাদের অনুচর। এর রক্তপাত ঘটানো আর আমাদের রক্তপাত ঘটানো একই কথা। আমরা আপনার অতিথি। তাই আমাদের রক্ষা করার দায়িত্বও আপনার।'

'আমি নিরুপায়,' রাজা উত্তরে বললো, 'গগুল যখন বলছে তখন ওকে তো মরতেই হবে।'

'না, ও মরবে না, ও বেঁচে থাকবে, আর আমরাই ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, 'যে ওকে স্পর্শ করবে সে-ই উল্টে মরে যাবে।'

'ধর, ধর ওকে!' ঘাতকদের উদ্দেশ্যে তোয়ালা গর্জন করে উঠলো।

'সরে যা কুত্তার দল,' ঘাতকদের দিকে বন্দুক তাক করে আমি বললাম, 'যে মুহূর্তে তোরা আমাদের অনুচরকে স্পর্শ করবি, সেই মুহূর্তে তোদের রাজার জীবনে ইতি পড়ে যাবে।'

এর পর আমি আমার বন্দুকের নলটা রাজার দিকে তাক করলাম সরাসরি। তোয়ালা এবার সত্যি সত্যি খুবই চিন্তিত হলো।

'দয়া করে আপনার এই যাদুনলটাকে সরান,' ভীত রাজা বলে উঠলো, 'আপনারা আমার অতিথি, তাছাড়া আপনি যখন অনুরোধ করছেন তখন ওকে ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তাই বলে এই মনে করবেন না যে ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

আমরা বিজয়ীর মতো কুটীরে ফিরে এসে পাইপ ধরালাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম ইনফাডোজের প্রত্যাবর্তনের জন্য।

।। দশ ।।

ঃ গ্রহণ ঃ

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, ছ'জন সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে ইনফাডোজ আমাদের কুটীরে এসে হাজির হলো, ইগনোমি সর্দারদের সেই পবিত্র সর্পচিহ্ন দেখালো, তারপর তার কাহিনী বললো। একটু থেমে সর্দারদের উদ্দেশ্যে ইনফাজোড বললো, 'আপনারা যে যার নিজের চোখে দেখলেন, আর শুনলেনও সব কথা। ওই নিষ্ঠুর তোয়ালার অমানুষিক অত্যাচারে সারা দেশের মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছ। তাই সময় হয়েছে এ ব্যাপারে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। তাই বলছি ভায়েরা, এবার ঠিক করুন আপনারা ইগনোমিকে সমর্থন করবেন নাকি ওই নিষ্ঠুর অত্যাচারী তোয়ালার পক্ষেই থেকে যাবেন?

সর্দারদের মধ্য সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, 'রাজভ্রাতা ইনফাডোজ, এ কথা খাঁটি

সত্য যে, সারা দেশের মানুষ আজ রাজা তোয়ালার অত্যাচারে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এই তো আজরাতেই আমার নিজের সহোদর ভাইকে অকারণ হত্যা করা হলো, কিন্তু তুমি যা বললে সে তো বিরাট ব্যাপার ভাই। আর আমরা কি করেই বা জানবো যে, এই লোকটিই আসল রাজপুত্তুর ইগনোমি কিনা? সাদা চামড়ার মানুষগুলো হরেক রকমের জাদুমন্ত্র জানে, আর এই লোকটিই হচ্ছে সাদা মানুষদেরই বন্ধু স্থানীয় লোক। এই লোকটিই যদি সত্যি সত্যি বৈধ রাজা হয়, তাহলে সে এমন কোনো প্রমাণ দেখাক যাতে আমাদের মন থেকে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি তো প্রমাণ দেখিয়েছি আর সেটা হলো পবিত্র সর্পচিহ্ন, যা কেবল ভাবী রাজার গায়েই দেখা যায়, রে পরেও কি আপনারা.........' ইগনোমি বয়স্ক সর্দারের দিকে তাকালো তার সিদ্ধান্ত জানার জন্য।

'প্রভু, ওটাই যথেষ্ট নয়, ওই চিহ্ন তো পরেও কেউ আপনার দেহে এঁকে দিতে পারে। অন্য একটা প্রমাণ দেখান আমাদের। নইলে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।'

বয়স্ক সর্দারের আপত্তির কথা আমি, মিঃ গুড আর স্যার হেনরীকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম। আর ভাবতে লাগলাম, এখন কি করা যায়। 'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' সব শুনে হঠাৎ মিঃ গুড বললেন, 'কাল তো ৪ঠা জুন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে আমি বললাম।

ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিঃ গুড বললেন, কাল রাত্রে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ. গ্রহণ শুরু হবে হয়ত দশটায়। এখান থেকে পূর্ণগ্রাসই দেখা যাবে।'

'তাতে কি হলো?'

'তুমি সর্দারদের বলে দাও যে. কাল রাতে তুমি উজ্জ্বল চাঁদের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার করে দেবে।'হ্যাঁ, এতে একটু বাড়তি ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে,' স্যার হেনরী মন্তব্য করলেন।

আমি এবার সর্দারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কুকুয়ান দেশের মহান সন্তানগণ, আমরা যখন-তখন আমাদের ক্ষমতা দেখানো পছন্দ করি না। আর প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকেও বদলে দিতে চাই না। কিন্তু এটা যে দেখছি একটা বিরাট ব্যাপার। রক্তচোষা তোয়ালার অত্যাচারে আমরা তার ওপর ক্ষেপে গেছি, ক্ষেপেছি ওই জীবন্ত প্রেতিনী গগুলের ওপর। তাই ঠিক করেছি আমাদের ক্ষমতার প্রমাণ দেখাবো তোমাদের। এসো বাইরে এসো, অদ্ভুত একটা জিনিস দেখাবো তোমাদের।' বাইরে এসে সে জিজ্ঞেস করে, 'কি দেখছো পশ্চিমের আকাশে?'

'দেখছি চাঁদ অস্ত যাচ্ছে,' সর্দারেরা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলো।

'এবার বলো, কোনো মানবীর সন্তান কি চাঁদ পুরোপুরি ডোবার আগে চাঁদকে নিভিয়ে দিতে পারে?'

'না প্রভু, এরকম ক্ষমতা কারোর আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'তা হলে বলে রাখি, আমরা সেই অসাধ্য সাধনই করবো। অর্থাৎ আগামীকাল রাতে ডোববার আগেই চাঁদকে একেবারে নিভিয়ে দেবো। এর ফলে পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আর এটাই কি আমাদের ক্ষমতার যথেষ্ট পবিচয় নয়? আমাদের সঙ্গী যে সত্যি সত্যি তোমাদের আসল রাজা এটাই হবে তারও একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। এ প্রমাণে খুশী হবে তো?'

'অবশ্যই!' বৃদ্ধ সর্দার মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'চমৎকার! আজ সূর্যাস্তের পর নাচ হবে! তোয়ালা আপনাদের সেই নাচ দেখার জন্য আমন্ত্রণ

জানাবে। যারা নাচবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী রমণীটিকে স্ক্রাগ্গা হত্যা করবে। মেয়েটির প্রাণ উৎসর্গ করা হবে তিন ডাইনীর উদ্দেশ্যে,' ইনফাডোজ বললো। 'হ্যাঁ প্রভুরা যদি আপনারা চাঁদকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারেন, তাহলে সবাই নিশ্চয়ই সেটা বিশ্বাস করবে।'

'রাজধানী লু থেকে মাইল ছয়েক দূরে বাঁকা চাঁদের মতো একটা পাহাড় আছে। সেখানে আমার আর এই সর্দারদের সৈন্যদল অপেক্ষা করবে। প্রভুরা যদি পৃথিবীকে ঢেকে দিতে পারেন তাহলে আমি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবো। আর ওখান থেকেই আমরা তোয়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো,' ইনফাডোজ বললো।

এর পর আলোচনার যবনিকাপাত ঘটলো। ইনফাডোজ এবং সর্দাররা চলে গেলো।

সেদিনই সেই সন্ধ্যায় রাজধানীর সামনের খোলা জায়গাটায় কাতারে কাতারে সৈনিকরা এসে হাজির হয়ে গেলো। তাদের ভীড় উপচে পড়লো। তবে যোদ্ধারা কাল রাতের মতো অতো বিষণ্ণ নয়।

'সুস্বাগতম তারকালোকের শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকগণ,' তোয়ালা ধীরে ধীরে বললো, 'এবার তাহলে নাচ শুরু করা যাক।'

পরমুহূর্তেই একদল মেয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে এলো। ওদের মাথার চুলে সুন্দর সুগন্ধী ফুল গোঁজা, হাতে তালপাতা। ওরা গাইতে শুরু করলো, ভারী মিষ্টি গলা ওদের। তারপর ওদের মধ্যে একটি সুন্দরী তরুণী নাচ করতে শুরু করলো। কি অপূর্ব নাচ। গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরা নাচছে। পাশ্চাত্যের যে কোনো ওস্তাদ ব্যালে নর্তকীকে লজ্জা দিতে পারে আফ্রিকার এই অখ্যাত নাম-না-জানা মেয়েটি। এর পর আরও কয়েকটি মেয়ে সামনে এসে তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করলো। রাজা শূন্যে তার হাত তুললো। সঙ্গে সঙ্গে তারা নাচ থামালো।

'আমার শ্বেতাঙ্গ অতিথিগণ এখন বলুন, এদের মধ্যে কোন্ মেয়েটি সবচেয়ে বেশী সুন্দরী? তোয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

'প্রথম মেয়েটি,' কোনরকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বললাম।

'তাহলে ওকে মরতে হবে।'

'হ্যাঁ, ওকে মরতেই হবে!' রাজার কথার জোরালো প্রতিধ্বনি তুললো গগুল।

'কেন রাজা, মেয়েটি তো চমৎকার নাচ করেছে। ওর নাচ দেখে আমরা খুব খুশী হয়েছি। তাহলে? কি অপরাধে ওকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে?'

'এটাই আমাদের দেশের প্রথা। ওই মেয়েটিকে হত্যা না করলে আমার ওপর নেমে আসবে চরম দুর্ভাগ্য। মেয়েটির প্রাণ উৎসর্গ করা হবে তিন ডাইনীর উদ্দেশ্যে। স্ক্রাগ্গা মেয়েটিকে নিয়ে এসো এখানে, আর তোমার বর্শার ফলায় ধার দাও।'

ওরা তাকে ধরতে আসার আগেই মেয়েটি চিৎকার করে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। দু'জন যোদ্ধা তাকে নিয়ে এলো রাজার সামনে। মেয়েটির চোখে জল ফেলে যাচ্ছে, তখনো ধস্তাধস্তি করছে যোদ্ধাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

স্ক্রাগ্গা তার হাতের বর্শাটা তুললো। এই সময় দেখলাম। মিঃ গুডের হাত তাঁর নিজের রিভলবারের ওপর। ততক্ষণে মেয়েটির ধস্তাধস্তি থেমে গেছে। তার সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে।

'তোর নাম কি?' তীক্ষ্ণ গলায় গগুল জিজ্ঞেস করলো। চাপা কান্নায় মেয়েটি বললো, 'ফুলাটা, মা আমাকে সত্যিই কি মরতে হবে? কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।'

'দুঃখ করছিস কেন? তোর খুবই সৌভাগ্য এই যে, তোর জীবন উৎসর্গ করা হচ্ছে তিন ডাইনীর উদ্দেশ্যে।'

'একি নিষ্ঠুর খেলা!' সুন্দরী মেয়েটি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। কিন্তু তাতে রাজা, গগুল বা স্ক্রাগ্‌গা কেউই এতটুকু বিচলিত হলো না। মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়েছিল রক্ষী। তার এবং সর্দারদের মুখেও দেখা গেলো করুণার চিহ্ন। মেয়েটিও তা লক্ষ্য করলো। সে আরও দেখলো, মিঃ গুড তার দিকে এগোবার উপক্রম করছেন। তা দেখে ছুটে এগিয়ে এসে গুডের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটি। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, 'আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও ওই সব নিষ্ঠুর জল্লাদদের হাত থেকে।'

'ঠিক আছে, তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার হাতের তুলে নিলাম।' গম্ভীরভাবে তোয়ালার ইঙ্গিতে স্ক্রাগ্‌গা বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে গেলো।

'শুনুন রাজা,' এবার আমি হুমকি দিলাম, 'মেয়েটিকে মারতে পারবেন না। আমরা ওকে মারতে দেবো না কিছুতেই। ওকে অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে দিন।'

রাজা বিস্মিত এবং ক্রোধে ফেটে পড়ে লাফিয়ে উঠলো তার আসন ছেড়ে। তেমনি উত্তেজিত ভাবে সে বললো, 'কি বললি, ওকে মারতে পারবো না? সাদা কুত্তার দল। তোরা সিংহের গুহায় এসে ঘেউ ঘেউ করছিস! তোরা কি পাগল হয়ে গেলি? আমি তোদের সতর্ক করে দিচ্ছি, এর পরেও যদি তোদের বাচালতা করতে দেখি, তাহলে তোদের দশাও ঠিক ওই মেয়েটির মতোই হবে। দূর হয়ে যা এখান থেকে! স্ক্রাগ্‌গা তুমিই বা এতো দেরি করছো কেন? রক্ষীরাই বা হাঁ করে কি মজা দেখছে? আমি হুকুম করছি, ওই সাদা কুত্তাগুলো এখন আর আমাদের অতিথি নয়, ওরা এখন আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। ওদের আটক করো!'

'থামো!' এবার আমি গর্জে উঠলাম। 'এক পা-ও এগিয়েছো কি আকাশের ওই জ্বলজ্বলে চাঁদটাকে এখনি নিভিয়ে দেবো। তখন দেখবে, তোমাদের দেশে কেমন ঘন অন্ধকার নেমে আসবে আর বুঝবে আমাদের জাদুমন্ত্রের জোর কতখানি।'

এভাবে ভয় দেখানোয় কাজ হলো। রক্ষীরা থামলো, স্ক্রাগ্‌গার হাতের বর্শা হাতেই রয়ে গেলো, ছোঁড়া আর হলো না।

'মিথ্যেবাদীটা বলে কিরে? ওরা নাকি আমাদের চাঁদকে নিভিয়ে দেবে। বেশ তো নেভা না, দেখি তোদের ক্ষমতার দৌড় কতখানি। যদি সত্যিই নেভাতে পারিস, তাহলে মেয়েটাকে মারবো না, মুক্তি দিয়ে দেবো। কিন্তু যদি না নেভাতে পারিস, তাহলে মেয়েটার সঙ্গে তোদের কোতল করে ছাড়বো, বুঝলি কুত্তার দল।'

চাঁদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, চন্দ্রগোলকের প্রান্তে ক্ষীণ ছায়াপাত। চাঁদেব দিকে হাত বাড়ালাম। আমার দেখাদেখি মিঃ গুড এবং স্যার হেনরীও তাই করলেন। আমি ছেলেবেলায় পড়া একটা আবৃত্তি করতে শুরু করলাম। আমার দেখাদেখি স্যার হেনরীও করতে লাগলেন বাইবেলের স্তোত্র। আর মিঃ গুড? তিনিও চুপ করে রইলেন না, জঘন্য ভাষায় রাজা আর তার চামচাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে লাগলেন।

একটু পরেই ধীরে ধীরে কালো ছায়াটা ছড়িয়ে পড়তে থাকলো চন্দ্রমণ্ডলের ওপর। কুকুয়ানরা বিস্ময়ে স্তব্ধ, হতবাক।

'দেখুন রাজা, দেখো গগুল, দেখো সর্দারেরা, দেখো তারালোকের সাদা মানুষেরা তাদের কথা রেখেছে কিনা। এবার বলো, আমরা কি মিথ্যেবাদী?'

সমবেত জনতা আর্তনাদ করে উঠলো। ওদিকে রাজা তার সিংহাসনে বসে থাকলে কি হবে, তার চোখেমুখের অবস্থা দেখে স্পষ্টতই মনে হলো, সেও যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,

তবে আবার এও দেখলাম যে, তাদের মধ্যে একমাত্র গগুলেরই সাহস রয়েছে তখনো। তাই সে কেমন নির্ভয়ে বললো ঃ

'অন্ধকার ঠিক কেটে যাবে, আমি বলছি, এ অন্ধকার বেশীক্ষণ থাকবে না। আমি আগেও এরকম অনেকবার ঘটতে দেখেছি। মানুষের সাধ্য নেই চাঁদকে নিভিয়ে দেয়। এসবই প্রকৃতির খেয়াল। এরকম হয় এক এক সময় ছায়া নেমে আসে চাঁদের ওপর। সে ছায়া আবার সরেও যায় একসময়। তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় পেও না, আমি গগুল বলছি ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ নেই।'

'বেশ তো দেখোই না এর পর কি হয়,' আমি বললাম।

এদিকে চাঁদ ক্রমশই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, তার আলোর জ্যোতি কমে আসছে। নেমে আসছে আঁধার কালো করা রাজ্যের অন্ধকার। চারদিকে আতঙ্ক ঘন নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান-খান করে সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠলো ঃ চাঁদ সত্যি সত্যিই সরে যাচ্ছে। সাদা চামড়ার জাদুকররা চাঁদকে মেরে ফেলেছে। এবার অন্ধকারের মধ্যে আমরা সবাই মরে যাবো।'

আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গিয়ে স্ক্রাগ্‌গা স্যার হেনরীর বুক লক্ষ্য করে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়লো। কিন্তু ভুলে গেছিলো, স্যার হেনরী যে বুকে লোহার বর্ম পরে রয়েছেন। তোয়ালাই এই বর্ম দিয়েছিলেন আমাদের। আমরা সবাই পোশাকের নিচে লোহার বর্ম পরে ছিলাম। তাই বর্শাটা ঠিকরে পড়লো স্যার হেনরীর বুক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটা তুলে নিয়ে তিনি সেটা ছুঁড়ে মারলেন স্ক্রাগ্‌গার দিকে। বর্শা-বিদ্ধ স্ক্রাগ্‌গার রক্তাক্ত দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো তার।

এসব দেখে মেয়েরা ভয়ে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো। ও দিকে রাজাও কয়েকজন সর্দার আর গগুলকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত কুটীরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

রাজাকে পালিয়ে যেতে দেখে আমি এবার বীরদর্পে বলে উঠলাম ঃ 'সর্দারগণ, আমরা আমাদের ক্ষমতার যথার্থ প্রমাণ দিয়েছি। যদি তোমরা এই প্রমাণে খুশী হয়ে থাকো তাহলে তোমরা যে পাহাড়ের কথা বলেছিলে, সেখানে আমাদের নিয়ে চলো।'

'বেশ আসুন তাহলে,' ইনফাডোজ বললো।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে ইনফাডোজ আর কয়েকজন সর্দারের সঙ্গে আমরা এগিয়ে চললাম বাঁকা-চাঁদ পাহাড়ের দিকে। আর আমাদের সঙ্গে চললো সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি, যার নাম ফুলাটা।

।। এগারো ।।

ঃ প্রাক্ যুদ্ধের সময় ঃ

ইনফাডোজ এবং সর্দারদের কাছে পথঘাট সব চেনা তাই অন্ধকার পথ দিয়ে আমাদের যেতে খুব একটা অসুবিধে হলো না। পাহাড়ের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন গ্রহণ ছেড়ে যাচ্ছে, চারপাশে আলো আবার ফুটে উঠছে, আলো ঝলমল হয়ে উঠছে। পাহাড়টা লম্বায় প্রায় ছ'মাইল হবে, উচ্চতা প্রায় দুশো ফুট। পাহাড়ের মাথা সমতল, আকৃতি বাঁকা চাঁদের মতো। পাহাড়ের সেই সমতল জায়গায় হাজার হাজার যোদ্ধা। আমাদের থাকার জন্যে একটা কুটীরেও তৈরী করা হয়েছে। দেখলাম, ইনফাডোজ আমাদের জিনিসপত্র সব কুটিরে রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছে আগেই। মিঃ গুডের ট্রাউজারটাও নিয়ে আসা হয়েছে। খুশীর মেজাজে মিঃ গুড ট্রাউজারটা পরতে লাগলেন। তাতে ইনফাডোজ বুঝি বা একটু বিষণ্ণ হলো। সে আর তারার প্রভুর সাদা পা দুখানি দেখতে পাবে না।

কুড়ি হাজার যোদ্ধার সামনে ইনফাডোজ ইগনোমির জীবনের করুণ কাহিনীর বর্ণনা দিলো। তারপর বললো নিষ্ঠুর রাজা তোয়ালার কু-শাসনে দেশবাসীর দুরাবস্থার কথা।

ইনফাডোজের কথা শেষ হলে ইগনোমি বলতে শুরু করলো, 'আমি তোমাদের বৈধ রাজা। আমার দেহে অঙ্কিত রয়েছে পবিত্র সর্পচিহ্ন। তোমরা যদি আসন্ন যুদ্ধে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আর সে যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হতে পারি তাহলে বিজয় আর সম্মান আমরা ভাগাভাগি করে নেবো। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি আমার পিতৃপুরুষদের সিংহাসনে বসলে এদেশে আর কখনো রক্তপাত হবে না। ডাইনী-খোঁজারুরা আর তোমাদের রক্তপান করতে পারবে না। তোমরা তখন নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে ঘুমোতে পারবে। এই দেশে ন্যায় ও সুবিচারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। শক্তিমান সর্দারগণ, বীর্যবান সেনাধ্যক্ষগণ, রণনিপুণ যোদ্ধাবাহিনী, মুক্তিকামী দেশবাসীগণ, তোমরা কি মনস্থির করলে?

'আমরা ঠিক করেছি, আপনিই হবেন আমাদের আসল রাজা, এখন থেকে আপনি হবেন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তোয়ালা হবে অবৈধ দখলদার,' উত্তাল জনসমুদ্র থেকে সমবেত এই উত্তরটা ভেসে এলো।

'বেশ, এবার তোমরা কুটীরে ফিরে যাও। আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।'

এর পর আধঘণ্টা পরে আমাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা সভা বসলো। সর্দারদের ধারণা, তোয়ালার অধীনে রাজধানীতে প্রায় পঁয়তিরিশ হাজার সৈন্য রয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে আরও হাজার পাঁচেক সৈন্য বাইরে থেকে এসে তার দলে যোগ দেবে। আর আমাদের পক্ষে রয়েছে কুড়ি হাজার বাছাই করা সৈন্য। এরা হলো, এদেশের সবচেয়ে রণনিপুণ সৈন্য।

ইনফাডোজ এবং সর্দারের ধারণা হলো, আজ রাতে রাজার তরফ থেকে আর কোনোরকম আক্রমণ হবে না। তোয়ালা আক্রমণ শুরু করতে পারে কাল সকালে। এই অবসরে বাকী রাতটুকু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতেই কেটে গেলো।

পরদিন অনুমান মতো সকালে নয় সন্ধ্যায় দেখলাম রাজধানী লু-এর দিক থেকে কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই। ওদের একজনের হাতে তালপাতা। ওদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ হলো, সে আসছে দূত হিসেবে।

পাহাড়ের কাছে এসে লোকটা চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমরা রাজার দূত। রাজা বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা আত্মসমর্পণ করুন, নইলে চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে আপনাদের জীবনে।'

'তা আত্মসমর্পণের শর্তগুলো কি জানতে পারি?' আমি জানতে চাইলাম কৌতুহলবশত।

'আমাদের রাজা মহানুভব ও দয়ালু। তিনি বলেছেন, "আমি এদের করুণা করবো। তবে আমার তৃপ্তির জন্য একটু রক্ত চাই। প্রতি দশজন সৈনিকদের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হবে। বাকী সৈনিকদের কোনোরকম শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হবে। কেবল আমার পুত্রহন্তা ইনকুবু আর আমার বিদ্রোহী ভাই ইনফাডোজকে রীতিমতো যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হবে।" এই শর্তগুলো মানতে রাজী আছেন তো আপনারা?'

'ভাগ কুত্তা। ফিরে গিয়ে তোদের রাজাকে বল যে, দুদিনের মধ্যেই তার মৃতদেহ নগর তোরণে ঝুলে থাকতে দেখা যাবে। তারপর এদেশের পরবর্তী রাজা হিসেবে ইগনোমির অভিষেক হবে।'

দূতদলের নেতা হো-হো করে হেসে উঠে বললো, 'এই বীরত্বটা দেখিও সাদা চামড়ার মানুষ।' এই বলে সদর্পে চলে গেলো রাজার দূতের দলটা, সূর্য তখন অস্তাচলে।'

পরের দিন সকাল হতে না হতেই ইনফাডোজ আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। সে খবর দিলো, শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও রণসাজে সজ্জিত হলাম। স্যার হেনরী সাজলেন কুকুয়ান সেনাধ্যক্ষের সাজে। তাঁর বর্মের ওপর চিতা বাঘের চামড়ার বহিরাবরণ, মাথায় উটপাখির ভালো পালকগুচ্ছ। স্যার হেনরীর এক হাতে বিশাল একটা গোলাকার ঢাল, আর

অপর হাতে সুদীর্ঘ একটা রণকুঠার। কুঠীরের হাতলটা গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরী। ইগনোমিও রণসাজে সজ্জিত হলো। এদের দুজনকেই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওদিকে ইনফাডোজকে ঘিরে রেখেছে তার নিজস্ব সৈন্যদল। এ দলের নাম "গ্রে"। সারা দেশে এরাই সেরা সৈন্যের দল। এ দলে আছে সাড়ে-তিন হাজার সৈন্য। আপাতিত এদের কাজে লাগানো হচ্ছে না। বিশেষ প্রয়োজনেই এদের কাজে লাগানো হয়।

ওদিকে তোয়ালার তিনদলে সৈন্য তিনদিক থেকে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের দিকে। প্রতিদলে প্রায় এগারো হাজার সৈন্য আছে। নগরতোরণ পেরিয়ে একটা দল বাঁদিকে এবং আর একটি দল ডানদিকে মোড় নিলো। আর মাঝখানের দলটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে।

'মনে হচ্ছে, ওরা একই সঙ্গে তিন দিক থেকে আক্রমণ করবে আমাদের।' চিন্তিতভাবে বললো ইনফাডোজ।

'হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এই ত্রিমুখী আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে আমাদের,' আমিও গভীর ভাবে চিন্তা করে বললাম।

।।বারো।।

ঃ আক্রমণ ঃ

একটু পরেই তোয়ালার সৈন্যবাহিনী এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। স্যার হেনরী, আমি আর মিঃ গুড মাঝখানের সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলো চালাতে শুরু করলাম। আমাদের বাঁ-পাশ ও ডান-পাশ থেকেও হৈ চৈ পড়ে গেলো। আমাদের দুপাশ থেকে দ্বিমুখী আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

'তোয়ালা! তোয়ালা! তোয়ালা! চিয়েলি! চিয়েলি! (অর্থাৎ যুদ্ধ! যুদ্ধ!)', আক্রমণকারীরা সমবেত কণ্ঠে গর্জে উঠলো।

আমাদের সৈনিকরাও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ঃ 'ইগনোমি! ইগনোমি! ইগনোমি! চিয়েলি! চিয়েলি!'

তারপর প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পর পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্যার হেনরী তাঁর হাতের বিশাল রণকুঠার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেলেন শত্রু বাহিনীর দিকে। রণসাজে সজ্জিত তাঁর বিরাট চেহারা দেখে আমাদের সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'নানজিয়া ইনকুবু, (এই তো হাতি এসে গেছে), চিয়েলি! চিয়েলি! যুদ্ধ! যুদ্ধ!)

বাঁ-পাশের আক্রমণকারীরা পরাজিত। তবে ডানপাশে আমাদের সৈন্যরাও পিছু হটেছে। ইনফাডোজের বাছাই করা সেরা সৈনদের নিয়ে ইগনোমি ছুটলো ডানপাশে। আমিও তাকে অনুসরণ করে ছুটলাম সেদিকে। আমার চারপাশে যুদ্ধের কোলাহল। দুপক্ষের ঢাল, তলোয়ার আর বর্শায় সংঘাত হচ্ছে। বোঁ বোঁ করে উড়ে যাচ্ছে ধারালো ছুরি আর বর্শা। সূর্যের তীব্র আলোয় ছুরি আর বর্শার ফলাগুলো ঝলসে উঠছে। রক্তাক্ত বর্শা হাতে নিয়ে ছুটে এলো তোয়ালার একজন সৈন্য। আমি তার পায়ের সামনে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। ওদিকে ছুটে আসা সৈনিক টাল সামলাতে না পেরে লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর। সে ফিরে আবার ওঠবার আগেই রিভলবারের গুলোতে তার দেহটা ঝাঁঝরা করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর ওপারে চলে গেলো সে। কিন্তু একটু পরেই আমার মাথার পিছনে প্রচণ্ড আঘাতজনিত যন্ত্রণায় কাতরে উঠলাম। তারপর যুদ্ধের ব্যাপারে আমার আর কিছু মনে নেই।

এবার জ্ঞান যখন ফিরে পেলাম তখন দেখলাম মিঃ গুড ঝুঁকে আছেন আমার ওপর। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন এখন?'

'ভালো।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমিতো ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি শেষ হয়ে গেছেন, আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেললাম।'

'যাই হোক, ওদিকে যুদ্ধের ফলাফল কি?'

'প্রাথমিকভাবে আমরা ওদের রুখে দিয়েছি। আর আমাদের দু'হাজার সৈন্য খতম হয়ে গেছে। আর তোয়ালার কম করেও হাজার তিনেক সৈন্য খতম হয়ে গেছে।'

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। গুডের কাঁধে ভর দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, স্যার হেনরী, ইগনোমি এবং সর্দাররা যুদ্ধের বর্তমান গতি-প্রকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করছে।

'আপনি এসে গেছেন মিঃ কোয়াটার, ভালোই হয়েছে! ইগনোমি কি যে করতে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমরা ওদের আক্রমণ রুখে দিয়েছি। ওদিকে তোয়ালা নতুন সৈন্যদল পেয়েছে। সে আমাদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে।''

'কথাটা ঠিক,' ইনফাডোজ সায় দিয়ে বললো, 'এ পাহাড়ে মোটে একটা জলের কুঁয়ো আছে। আমাদের সঙ্গে খাবার-দাবার বলতে কিছুই নেই। তোয়ালা এমন শিক্ষা পেয়েছ যে, সে আর আমাদের আক্রমণ করবে না। আমরা না খেয়ে শুকিয়ে মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।'

'তাহলে এবার ইগনোমিকেই ঠিক করতে হবে আমরা কি করবো,' আমি বললাম।

একটু চিন্তা করে ইগনোমি বললো, 'আমরা তোয়ালার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো আর তা আজই। আমাদের আক্রমণের পরিকল্পনার কথা শুনুন এবার। দেখছেন এ পাহাড়টা কিরকম বাঁকা। পাহাড়ের বাঁকে সমতলভূমি ঢুকে গেছে একটা সবুজ জিভের মতো।'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' উত্তরে আমি বললাম।

'ঠিক আছে, এখন তো দুপুর। আমাদের সৈন্যরা আহারের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে নিক। তারপর কাকা, আপনি আপনার বাহিনী আর একদল সৈন্য নিয়ে ওই সবুজ জিভের মতো সমতলভূমিতে চলে যান, আপনাদের খতম করবার জন্য তোয়ালা তার সৈন্যদের পাঠাবে। কিন্তু যেহেতু প্রবেশপথ অতি সংকীর্ণ, তাই একসঙ্গে বেশী সৈন্য আপনাদের আক্রমণ করতে পারবেনা। এই সুযোগে আপনি তাদের একের পর এক দলকে খতম করবেন। ইনকুবু আপনার সঙ্গে থাকবেন। তোয়ালার সৈন্যদের নজর থাকবে আপনাদের ওপর। এরই ফাঁকে আমাদের দু'দল সৈন্যবাহিনী নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে তোয়ালার সৈন্যবাহিনীর ডান ও বাঁপাশ আক্রমণ করবে। এরকম সাঁড়াশি আক্রমণে তোয়ালার সৈন্যদল দিশেহারা হয়ে পড়বে। আমি তখন আমার সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো তোয়ালার টুঁটি টিপে ধরবার জন্য। আমার সঙ্গে থাকবেন মাকুমাজাহন। বুগওয়ান (গুড) যাবেন আমাদের ডানদিকের বাহিনীর সঙ্গে। ওঁর এই একটা উজ্জ্বল চোখ আমাদের সৈন্যদের সাহস যোগাবে। আমার বিশ্বাস, এই পরিকল্পনা মাফিক এগোলে আজ আমাদের জয় সুনিশ্চিত।' এই বলে ইগনোমি নীরব হলো।

।। তেরো ।।

ঃ হাতের মুঠোয় জয় ঃ

ইগনোমির পরিকল্পনা ও নির্দেশ মতোই কাজ করা হলো। তোয়ালার সেনাবাহিনী দিশেহারা, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। তবে আমাদেরও কম ক্ষতি হলো না। যেমন ইনফাডোজের তিন হাজার সেরা যোদ্ধাদের মধ্যে দেখা গেলো যুদ্ধের পর মাত্র পঁচানব্বই জন সৈন্য বেঁচে রয়েছে।

ওদিকে ইগনোমি এগিয়ে গেছে লু নগরীর তোরণদ্বারে। সেই সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম। ইগনোমি অঙ্গীকার করেছে, তোয়ালার পক্ষের সৈন্যরা অস্ত্রত্যাগ করলে তাদের ক্ষমা করা হবে। তাতে সৈন্যরাও সাড়া দিয়েছে। তারা নামিয়ে দিয়েছে নদী পারাপারের সেতুটা। বিজয়ী সেনাবাহিনী প্রবেশ করলো রাজধানী নগরে। রাজ প্রাসাদের খোলা জায়গাটায় আমরা এসে দাঁড়ালাম। আজ সে জায়গাটা ফাঁকা। এক প্রান্তে নিজের কুটীরের সামনে ক্লান্ত বিধ্বস্ত তোয়ালা বসে রয়েছে। আজতার সঙ্গে একটি মাত্র অনুচর ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই অনুচরটি আর কেউ নয় সেই জীবন্ত প্রেতিনী গগুল।

তোয়ালার সামনে দিকে আমরা হাজির হলাম। ধীরে ধীরে মাথা তুলে ইগনোমির দিকে তাকিয়ে সে বিদ্রুপের সুরে বললো ঃ 'স্বাগতম রাজা! আমার সেনাবাহিনীকে তো পরাস্ত করেছো, এবার নিশ্চয়ই আমার পালা, বলো আমার ভাগ্যে কি আছে? দেখতেই পাচ্ছো, আমি কাপুষের মতো পালিয়ে যাইনি, তোমার বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি। বলো—'

'আমার বাবার ভাগ্যে তুমি যা ঘটিয়েছিলে, আজ তোমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে,' দৃঢ়স্বরে ইগনোমি উত্তর দিলো।

'সেতো খুব ভালো কথা। আর আমিও তোমায় দেখিয়ে দেবো কি করে রাজার মতো মরতে হয়, কিন্তু ঘাতকের হাতে নয়। আমি যুদ্ধ করে মরতে চাই।'

'ঠিক আছে, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। এখন বলো কার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে চাও।'

আমাদের সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে তোয়ালা বললো, 'ইনকুবু তুমি কি বলো? যে লড়াই আজ আমরা শুরু করেছিলাম তা কি চালিয়ে যাবে? নাকি তোমাকে একজন কাপুরুষ শ্বেতাঙ্গ বলে মনে করবো? আর তাছাড়া তুমিতো আমার পুত্রহন্তা............'

'হ্যাঁ, আমি লড়বো তোমার সঙ্গে। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কাপুরুষ বলার সাহস পায়নি। চলে এসো আমি তৈরী।'

তোয়ালা হাসলো, তার হাসিটা কেমন কুৎসিত দেখালো, স্যার হেনরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলো তোয়ালা। তারপর দুই যোদ্ধাই যে যার রণকুঠার তুলে নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো অতঃপর।

স্যার হেনরী সামনে লাফিয়ে তোয়ালাকে প্রচণ্ড জোরে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হলেন। তোয়ালাও তৎপর ছিল। চকিতে এক পাশে সরে গেলো। এবার সে স্যার হেনরীর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে কুঠার চালালো। তা দেখে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। ভাবলাম, এখানেই বোধহয় যুদ্ধের যবনিকাপাত হলো। কিন্তু স্যার হেনরী চমৎকারভাবে তোয়ালার আঘাতের মোকাবিলা করলেন। অপর দিকে স্যার হেনরীর পরবর্তী আঘাত তোয়ালা রুখে দিলো ঢাল দিয়ে, বাঃ দুজনেই দেখা যাচ্ছে অতি নিপুণ যোদ্ধা। সৈন্যরাও দু'জনের যুদ্ধ দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু হঠাৎ তোয়ালা অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাত হানলো স্যার হেনরীর ওপর। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর হাত থেকে রণকুঠার ছিটকে বেরিয়ে গেলো। তা দেখে আমাদের সৈন্যরা হতাশায় হায় হায় করে উঠলো। তোয়ালা অনুপ্রাণিত হয়ে গর্জন করে ছুটে এলো। সহ্য করতে না পেরে আমি চোখ বুজলাম। এখনি স্যার হেনরী শেষ হয়ে যাবেন। কিন্তু যখন আবার চোখ মেলে তাকালাম, তখন দেখলাম স্যার হেনরী তোয়ালার কোমর জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর দু'হাত দিয়ে। যেন দুই কুস্তিগিরের মধ্যে প্রচণ্ড কুস্তির লড়াই শুরু হলো। মাটির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে দুই যোদ্ধা। তারই মাঝে কোনোরকমে ছুরি বের করে তোয়ালা স্যার হেনরীর বুকে আঘাত করতে চাইলো। কিন্তু তোয়ালার উপহার দেওয়া বর্মই স্যার হেনরীকে মোক্ষম আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলো। তোয়ালা আবার ছুরি তুললো। এই সময়

স্যার হেনরী হাতে পেয়ে গেলেন তাঁর ছিটকে যাওয়া কুঠারখানা। তিনি এবার তাঁর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন তোয়ালার গলা লক্ষ্য করে। সৈন্যরা উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠলো। তোয়ালার মাথাটা যে লাফিয়ে উঠলো তাঁর কাঁধ থেকে। তারপর মাটির ওপর দিয়ে বলের মতো গড়াতে গড়াতে তোয়ালার ছিন্ন মুণ্ডটা এসে থামলো ইগনোমির পায়ের কাছে। ক্লান্ত ও রক্তপাতে অবসন্ন স্যার হেনরী অজ্ঞান হয়ে গেলেন অতঃপর।

ওদিকে তোয়ালার মুণ্ডহীন মৃতদেহের ওপর নৃত্য করতে করতে সমবেত যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে ইগনোমি বললো ঃ 'আনন্দ করো, স্ফূর্তি করো তোমরা। আজ থেকে অবসান হলো তোয়ালার সব নিষ্ঠুরতা। তোমরা এখন থেকে নির্ভয়ে, বসবাস করতে পারো। এখন আমিই তোমাদের রাজা তোমাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবো আমি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রাজা! আমরা আপনাকে আমাদের দেশের বৈধ রাজা বলে মেনে নিলাম। সৈন্যরা সমবেত কণ্ঠে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়ে দিলো।

আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময়ের আগে যা বলেছিলাম তাই হলো শেষ পর্যন্ত। তোয়ালার মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাথরের মতো শক্ত হয়ে পড়ে রইলো তার নিজেরই কুটীরের দরজায়।

।। চোদ্দো ।।

ঃ এখানে মৃত্যুর হাওয়া ঃ

যুদ্ধ শেষ। তারপরেও আরো পাঁচদিন আমরা বিশ্রাম নিলাম। প্রচণ্ড জ্বরে মিঃ গুড অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তাই আমরা তাঁর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফুলাটা নামের সেই মেয়েটি দিনরাত গুডের রোগশয্যার পাশে বসে থেকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকলো। পঞ্চম দিনে গুডের জ্বর ছাড়লো। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হলাম।

কয়েকদিন পরে ইগনোমি কুকুয়ানা দেশের সমস্ত সর্দারদের নিয়ে একটা সভা করলো। সর্দাররা সবাই আনুগত্য জানালো ইমোতুর পুত্র ইগনোমির প্রতি। তারপরেই হলো ইগনোমির রাজপদে অভিষেক। অভিষেকের দিন ইনফাডোজের সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট জীবিত পঁচানব্বইজন সৈনিককে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সামনে পুরস্কৃত করা হলো। রাজা ইগনোমি তাদের অজস্র ধন্যবাদ জানালেন।

অভিষেক উৎসেবর পর আমরা একদিন ইগনোমির কাছে জানতে চাইলাম, সলোমনের রত্নভাণ্ডারের রহস্যের ব্যাপারে কিছু জেনেছে কিনা সে।

উত্তরে ইগনোমি বললো, 'কেবল ওই শয়তানী গগুলই সেই রত্নভাণ্ডারের রহস্য জানে। যদি সেই রহস্য ভাণ্ডারের সন্ধান কখনো পাওয়া যায়, তাহলে আপনাদের ইচ্ছে মতো যতো খুশী হীরে নিয়ে যেতে পারেন।'

'কিন্তু গগুল যদি সেই রত্নভাণ্ডারের পথ না দেখায়?'

'না বললে তাকে মরতে হবে। সেই পথ দেখাবার জন্যেই তো এখনো পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

•

তিনদিন পরে আমবা এসে পৌঁছলাম সেই "তিন ডাইনী" পর্বতমালার পাদদেশে। আমদের দলে আমরা তিনজন, ফুলাটা, গগুল, ইনফাডোজ এবং তিনজন ভৃত্য। ভোরের প্রথম সূর্যের আলোয় সেই তিন-শৃঙ্গ পর্বতমালাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তুষারাবৃত পর্বত-শৃঙ্গ রক্তাভ-নীল। সলোমনের পথ পাহাড়ের

শৃঙ্গের পাদদেশে। যাই হোক, অবশেষে আমরা সলোমনের রত্নভাণ্ডারের কাছে এসে পড়লাম। পাহাড়ের পথ বেয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। আমাদের পরিক্রমায় পথ শেষ হলো একটা বিরাট বৃত্তাকার গর্তের সামনে। গর্তের পাশগুলো ঢালু। বিরাট গর্তটা প্রায় তিনশো ফুট গভীর এবং আধমাইল চওড়া।

'এ আবার কি?' স্যার হেনরী বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

উত্তরে আমি বললাম, 'বুঝতে পারছেন না? আপনি বোধহয় হীরের খনি এর আগে কখনো দেখেননি। এই হলো রাজা সলোমনের হীরের খনি।'

সামনে তিনটি বিরাট প্রস্তরমূর্তি। দুটি পুরুষ ও একটি নারী মূর্তি। এই তিনটি মূর্তি কুকুয়ানদের কাছে অতি পবিত্র। প্রতিটি মূর্তি উচ্চতায় প্রায় কুড়ি ফুট। প্রাচীন কালের ভাস্করদের অপূর্ব ভাস্কর্য।

ইনফাডোজ জিজ্ঞেস করলো, 'এর নাম 'মৃত্যুগুহা' তা আপনারা কি এখনি মৃত্যু-গুহায় প্রবেশ করবেন? গগুল আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো।'

ইনফাডোজ বাইরেই রইলো। তবে ফুলাটা কিছুতেই গুডের সঙ্গ ছাড়তে চাইলো না। তাই সেও মৃত্যু-গুহায় আমাদের সঙ্গী হলো।

গগুল আমাদের নিয়ে গেলো একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে। পঞ্চাশগজ এগিয়ে আমরা থামলাম। উঁচু সিলিং-এর একটা ফাটল দিয়ে এক চিলতে ম্লান আলো আসছে। সেই নিষ্প্রভ আলোয় দেখলাম কতকগুলো বিশাল বিশাল বরফের স্তম্ভ। ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে বরফ স্তম্ভগুলোর ওপর, আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই বেড়ে যাচ্ছে বরফগুলোর আকার। সেই স্বল্প আলোকিত গুহার মধ্যে দিয়ে গগুল আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। গুহার আর এক প্রান্তে একটা দরজা ছিল। দরজার সামনে গিয়ে গগুল থামলো।

'মৃত্যু-গুহায় ঢুকবে?' আমাদের ভয় দেখাবার জন্যেই বোধহয় ভয় দেখালো গগুল।

'অবশ্যই!'

দরজা পেরিয়ে আমরা আর একটা ছোটগুহায় গিয়ে ঢুকলাম। এখানেও বরফের স্তম্ভ। এখানে আলো এতো কম যে, প্রায় কিছুই দেখা যায় না। গুহার মাঝখানে একটা বিরাট পাথরের টেবিল। টেবিলের এক প্রান্তে একটা নিশ্চল সাদা মূর্তি। টেবিলের চারপাশেও সাদা মূর্তি। একসময় অন্ধকার চোখ সয়ে এলে দেখলাম টেবিলের ওপর একটা বাদামী জিনিস পড়ে রয়েছে। আমি ভয় পাবার লোক নই। কিন্তু হঠাৎ ওই বস্তুটাকে দেখামাত্র গুহা থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলাম। স্যার হেনরী আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমাকে থামালেন। তবে স্যার হেনরী যখন সেই বস্তুটাকে নিজের চোখে দেখলেন, তখন তিনিও ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগলেন, আর ফুলাটা গুডের গলা জড়িয়ে ধরে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আর্ত চিৎকার করে উঠলো।

'হাঃ—হাঃ, হিঃ—হিঃ..........জীবন্ত প্রেতিনী গগুল হেসে উঠলো, কি বিকট পৈশাচিক হাসি!

সে এক ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্য। টেবিলের ধার ঘেঁষে একটা বিরাট নরকঙ্কাল। আর সেই নরকঙ্কালের অস্থিময় হস্তে সুদীর্ঘ একটা বর্শা। বিরাট কঙ্কালটা একটু ঝুঁকে আছে, তার ভাবখানা এই রকম যে, এই বুঝি সে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়লো বলে। কঙ্কালটা যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। মণিহীন দুটি শূন্য অক্ষিকোটর আমাদের এই ধৃষ্টতা দেখে যেন স্তব্ধ, হতবাক।

'হাঃ—হাঃ, হিঃ—হিঃ।' গগুল খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'এটা মৃত্যু-গুহা! এখানে একবার যারা ঢোকে, তাদের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়, জীবিত অবস্থায় তারা কখনো ফিরে যেতে আর পারে না। হাঃ—হাঃ, হিঃ —হিঃ!'

তারপর গগুল টেবিলের ওপর রাখা জিনিসটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করলো, আরে এতো দেখছি, ছিন্নমুণ্ড তোয়ালার দেহ! মৃতদেহের ওপর পাতলা বরফের আস্তরণ। সিলিং থেকে টুপ্ টুপ করে জল ঝরে পড়ছে তোয়ালার ছিন্ন কণ্ঠের ওপর। তোয়ালার মৃতদেহটা একটু একটু করে পরিণত হতে চলেছে একটা বরফের স্তম্ভে। এর থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝলাম, অন্য সব বরফস্তম্ভগুলোও হচ্ছে আসলে অতীতের এক একটা রাজাদের মৃতদেহ। কুকুয়ানরা এমনি করেই তাদের রাজাদের মৃতদেহই সংরক্ষণ করে থাকে।

॥ পনেরো ॥

ঃ সলোমনের রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার ঃ

সময় নষ্ট করতে চাইলাম না, এই মৃত্যু-গুহায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমরা। তাই গগুলকে তাড়া দিয়ে বলে উঠলাম, 'গগুল, তাড়াতাড়ি আমাদের সেই রত্নভাণ্ডারে নিয়ে চলো।'

'প্রভুরা, আপনারা ভয় পাননি তো? ভয় যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আলো জ্বেলে ভেতরে চলুন।'

গুহার দেওয়ালে ঝুঁকে পড়লো গগুল। আমি আলো জ্বালালাম। কিন্তু কোথায় ঢুকবো, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাদের সামনে দৈত্যের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্ত পাথরের দেওয়াল।

'এই যে এই পথে,' গগুলের কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত হাসি।

সেই মুহূর্তে দেখলাম, পাথরের দেওয়ালটা একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। দেওয়ালটার ওজন কুড়ি থেকে তিরিশ টন হবে। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গগুল হয়তো কোনো যন্ত্রে চাপ দিয়ে থাকবে, যার ফলে ওই ভারী পাথরের দেওয়ালটা কেমন একটু একটু করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এ যেন এক দারুণ রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, আশা-নিরাশায় আমরা থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। কি আশ্চর্য, রাজা সলোমনের রত্নভাণ্ডারের দরজা খুলে গেছে আমাদের চোখের সামনে। রত্নগুহায় ঢুকে দেখলাম, একদিকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত থরে থরে সাজানো রয়েছে অত্যন্ত চমৎকার হাতির হাঁত। এর মধ্যে কম করে পাঁচশো খানা দাঁত খুব উৎকৃষ্ট জাতের। গুহার আর একদিকের দেওয়ালে কতকগুলো বিশাল কাঠের সিন্দুক, একটা সিন্দুকের ডালা ভাঙা, মনে হয় দ্য সিলভেসট্রাই ভেঙে থাকবে। সিন্দুকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলাম হীরে নয়, এক মুঠো সোনার টাকা।

'প্রভুরা, যদি উজ্জ্বল পাথর চান, তাহলে ওই অন্ধকার কোণটা দেখুন,' গগুল বললো।

অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি, আরও তিনটে সিন্দুক রয়েছে সেই অন্ধকার কোণে। পাথরের সিন্দুক, একটা সিন্দুকের ডালা খোলা। সিন্দুকের ভেতরে তাকালাম। বড় বড় আকারের উজ্জ্বল হীরক খণ্ডে সিন্দুকটা বোঝাই রয়েছে। উঃ এতো হীরে!

'এই পৃথিবীতে এখন আমরাই সবচেয়ে ধনী।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমি বললাম!

'এতো উচ্ছ্বাস ভালো নয়,' স্যার হেনরী আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আগে এই হীরেগুলো আমাদের সভ্যজগতে নিয়ে যাই তবে তো!'

'হাঃ—হাঃ, হিঃ—হিঃ!' গগুল তার সেই পৈশাচিক হাসি হাসলো। 'অনেক, অনেক সাদা পাথর আছে এখানে, সাদা মানুষেরা সাদা পাথর খুব ভালোবাসে, খাও এগুলো, পান করো ওগুলো। হাঃ—হাঃ, হিঃ—হিঃ!'

আরো দুটো সিন্দুকও হীরেয় ঠাসা। বড় বড় হীরের খণ্ড, ডিমের মতো বেশ বড় বড় আকারের।

হীরে বোঝাই সিন্দুকগুলো নিয়ে আমরা যখন ব্যস্ত, তখন গগুলের দিকে আমরা কেউই নজর দিইনি। আর সেটাই পরবর্তীকালে হয়ে উঠলো একটা মারাত্মক ভুল। গগুল নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়

রত্নগুহার থেকে। হঠাৎ একসময় বাইরে থেকে ভেসে এলো একটা আর্ত চিৎকার। ফুলাটারা গলা না?

'বুগওয়ান (গুড) চলে আসুন শীগ্‌গীর পাথর নেমে আসছে।'

'এই মেয়েটা চিৎকার করছিস কেন? তুই নিজে পালিয়ে বাঁচ, আর আমাকে যেতে দে।'

'বাঁচাও! বাঁচাও! ও আমায় ছুরি মেরেছে! উঃ কি যন্ত্রণা!'

দৌড়ে এলাম। এদিকে গগুল আর ফুলাটা ধস্তাধস্তি করছে। যখন দরজাটা মাটি থেকে মাত্র তিনফুট ওপরে, তখন গগুল মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। বড্ড দেরী হয়ে গেছে তখন। পাথরের ভারী দরজাটা তার শুকনো দেহের ওপর এসে আছড়ে পড়লো। মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ উঠলো। গগুলের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো নিমেষে। বিরাট ভারী দরজাটার চাপে গগুলের দেহটা পিষে গুঁড়িয়ে গেলো।

তারপরেই আমার দৃষ্টি পড়লো ফুলেটার দিকে। তার মায়া শরীর রক্তাপ্লুত হয়ে গেছে। অবস্থা দেখে মনে হলো, ও আর বাঁচবে না।

'বহুওয়ান, আমি মরে যাচ্ছি, মাকুমাজাহন কি আছেন এখানে? অন্ধকার; আমার চোখের সামনেটা ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। আমি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...........!'

'ফুলাটা, এই যে আমি এসে গেছি।'

'মাকুমাজাহন, আমার শেষ কথাগুলো একটু বুঝিয়ে বলুন বুগওয়ানকে তিনি তো আমার ভাষা বুঝতে পারবেন না। প্রভু বুগওয়ানকে বলুন যে আমি তাকে ভালোবেসেছি, আমার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবেসেছি ওঁকে। মরতে আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ আমি জানি, তাঁর জীবনে আমার মতো মেয়ের কোনো স্থান হতে পারে না। বুগওয়ান, আমায় ধরুন, জীবনের শেষ মুহূর্তে আমি আপনার হাতের পরশ পেতে চাই। অন্তত একটিবারের জন্য। উঃ.......উঃ।

তারপরেই ও নীরব হলো। ওর দেহটা নিথর, স্তব্ধ হয়ে গেলো, 'ও মারা গেছে, ফুলাটা মারা গেছে।' দুঃখের সঙ্গে গুড বললেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বাদল নামলো অতঃপর। ক্যাপ্টেন গুড কাঁদছেন।

'এদিকে আমাদের হলো জীবন্ত কবর,' স্যার হেনরী হতাশ গলায় বলে উঠলেন। 'ডাইনী গগুল নিজে তো মরলোই, সেই সঙ্গে আমাদেরও মেরে গেলো। এই ভারী দরজার পাল্লা খোলবার কৌশল আমাদের জানা নেই।'

।। ষোলো ।।

ঃ বাঁচার কোনো আশা নেই ঃ

আমরা নিশ্চিত জীবন্ত কবরের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমরা জেনে গেছি, মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত হবেই। এ এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক, যার বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। একি নিষ্ঠুর পরিহাস! আমাদের চারপাশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ থরে থরে সাজানো রয়েছে আমাদের জন্যে। তবে এ সম্পদ আমরা এখনি ছেড়ে দিতে পারি বাইরে বেরুতে পারবার বিনিময়ে। আমাদের সঙ্গে করে আনা আলো নিভে গেছে। আমাদের চারপাশে এখন নিরন্ধ্র অন্ধকার থিক থিক্ করছে। মিঃ গুড খুব জোরে চিৎকার করতে শুরু করেছিলেন। এই আশায় যদি বাইরে থেকে ইনফাডোজ শুনতে পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে আসে। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে একটা দিন কেটে গেলো। সঙ্গে যেটুকু খাবার আর পানীয় ছিল তাই খেলাম এবং পিপাসা মেটালাম। হঠাৎ আমার

খেয়াল হলো। নিজের মনেই বললাম, 'এ কি রকম? এখানকার বাতাস তো বন্ধ নয়, বেশ টাটকা ও তাজা বাতাসই তো বইছে এখানে, আর তাই তো আমরা শ্বাস নিতে পারছি এখনো।'

আমি আমার অনুমানের কথা বলতেই মিঃ গুড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ 'আরে, তাই তো, এটা তো ভাবিনি। এ বাতাস ওই বন্ধ দরজার দিক থেকে আসতে পারে না। এ বাতাস নিশ্চয়ই আসছে অন্য কোনো জায়গা থেকে। ঠিক আছে। দেখা যাক এ বাতাস কোথা থেকেই বা আসছে!'

এ থেকে আমাদের মনে বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা গেলো।

ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টা-চরিত্র চালানোর পর হঠাৎ একটু দূর থেকে মিঃ গুডের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'আসুন এদিকে আসুন আপনারা!' তাঁর সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে আমরা এগোলাম।

'কোয়ার্টার মেইন, যেখানে আমার হাতটা রয়েছে সেখানে হাত রাখুন তো।'

ওঁর নির্দেশ মতো হাত রাখলাম। 'আরে, আমার আঙুলে ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পাচ্ছি!'

'এবার কান খাড়া করে শুনুন' মিঃ গুড মেঝেতে পা ঠুকলেন। না, মেঝের এখানটা যে ফাঁপা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাঁপা কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বালালাম। আমরা রত্নভাণ্ডারের একটা কোণায় এসে পড়েছি। এখানে মেঝেতে একটা পাথরের আংটা দেখতে পেলাম। মিঃ গুড ছুরি দিয়ে আংটার চারপাশে খোঁচাতে লাগলেন। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার দরুণ আংটাটা এমনভাবে মেঝেতে জমে বসে গেছে যে, ওটা তোলাই এখন শক্ত। তবে বেশ কিছুক্ষণ কসরৎ করবার পর আংটা এবং সেটার সংলগ্ন বিরাট এটা চ্যাপ্টা পাথর উঠে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে রত্নগুহায় ঢুকে পড়লো বাইরের টাটকা তাজা বাতাস।

আবার দেশলাই জ্বালালাম। সেই আলোয় দেখলাম, একটা পাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

'অতঃ কিম্?' মিঃ গুড জিজ্ঞেস করলেন।

'এই সিঁড়ি ধরে এগোব। দেখি এই সিঁড়িটা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।'

'তা এই হীরেগুলোর কি বিলি-ব্যবস্থা হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জাহান্নামে যাক ও হীরে!' স্যার হেনরী বিরক্ত হয়ে বললেন।

কাছের সিন্দুকটা থেকে মুঠো মুঠো হীরে নিয়ে আমি পকেটে চালান করে দিলাম। মিঃ গুড তখন শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন মৃত ফুলাটাকে।

তারপর আমরা সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললাম। এক সময় সিঁড়ির ধাপ শেষ হলো। আবার দেশলাই জ্বালালাম। আমরা একটা সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে এসে হাজির হলাম। কিছু দূর যাবার পর দেখলাম সুড়ঙ্গটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। এখন সমস্যা হলো, কোন্ পথে যাবো আমরা?

'যেদিক থেকে বাতাস আসছে সে পথেই এগোন যাক,' স্যার হেনরী নির্দেশ দিলেন।

হ্যাঁ, তাঁর নির্দেশ মতোই আমরা এগোলাম। কয়েকঘণ্টা ধরে সুড়ঙ্গের নানা শাখা-প্রশাখার গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। এগুলো নিশ্চয়ই প্রাচীন হীরের খনির পথ হবে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য আমরা আমাদের যাত্রার বিরতি ঘটালাম। আর তখনি নিস্তব্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে শুনতে পেলাম একটা মৃদু শব্দ।

'জলস্রোতের শব্দ! উঠুন উঠুন আর বিশ্রাম নয়,' উত্তেজিতভাবে মিঃ গুড বলে উঠলেন

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল আমরা সেদিকে এগিয়ে চললাম। জলস্রোতের শব্দ এবার স্পষ্ট হলো। আমরা ক্রমশই জলের কাছে একে পড়লাম। হঠাৎ ঝপাং করে একটা শব্দ হলো। মিঃ গুড জলে পড়ে গেছেন।

'মিঃ গুড! আপনি কোথায়?' আমরা দুজনে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম।

'আমি ঠিক আছি, একটা পাথরের টুকরো আঁকড়ে ধরেছি। আপনারা আমায় তুলে ধরুন।'

স্যার হেনরী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর সবল হাত দিয়ে মিঃ গুডের হাত দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে জল থেকে তুলে আনলেন। ভীষণ জল পিপাশা পেয়েছিল, আমরা আকণ্ঠ জলপান করলাম। কি সুন্দর মিষ্টি জল। এমন কি সেই ঠাণ্ডা জলে প্রায় স্নানটাও সেরে ফেললাম আমরা। তারপর একটু সময় বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে এগোতে লাগলাম। সবার আগে স্যার হেনরী ছিলেন।

হঠাৎ স্যার হেনরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন, 'সামনে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি আমার দেখার ভুল?'

এ কথা শুনে আমি সামনের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে একটা নিষ্প্রভ আলো যেন দেখা যাচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমরা সেই আলোটা লক্ষ্য করে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। এবার হু হু করে বাইরের খোলা বাতাস বয়ে আসছে। সেই বাতাসে আমাদের তপ্ত শরীর যেন শীতল হয়ে গেলো।

একসময় হঠাৎ সুড়ঙ্গটা সংকীর্ণ হয়ে এলো। আমরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম। সুড়ঙ্গ টা আরও সংকীর্ণ হয়ে গেলো। পথ এখানে আর পাথরের নয়, সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের একটা দেওয়াল মাটির। স্যার হেনরী তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে কোনোরকমে গুটিসুটি মেরে সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এলেন অবশেষে। তারপর বেরোলেন মিঃ গুড। সমার শেষে আমি।

একটা নিচু পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে আমরা এসে পড়লাম নিচের সমতলভূমিতে। আমাদের মাথায় এখন আকাশভরা তারা জ্বলজ্বল করছে।

আনন্দে আমরা চিৎকার করে উঠলাম। কোনোরকমে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহগুলোকে টেনে নিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম গুহা মুখে। এই পথেই আমরা হীরের খনির ভেতরে ঢুকেছিলাম। আমাদের চোখের সামনে সলোমনের সুদীর্ঘ পথ। কয়েকজন লোককে আগুনের পাশে বসে থাকতে দেখলাম। একজন লোক উঠে দাঁড়ালো। আমাদের দেখলো, তারপর একটা আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

'ইনফাডোজ, ইনফাডোজ, আমরা আমরা তোমার বন্ধুরা, তারকালোকের সন্তানরা, কোনো ভয় নেই। আমরাও সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম।'

ইনফাডোজ উঠে দাঁড়ালো। ছুটে এলো আমাদের কাছে। আমাদের দিকে তাকালো, তার চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। তখনও তার ভয় কাটেনি, থরথর করে কাঁপছে।

'তাই তো, এঁরা তো সেই তারকালোকের প্রভুরা, আপনারা তাহলে ফিরে এসেছেন মৃত্যুর গুহা থেকে? ওরে দেখ সবাই, আমাদের প্রভুরা ফিরে এসেছেন মৃত্যুপুরী থেকে, যেখানে মৃত্যুর ছায়া অহরহ কাঁপছে।'

বৃদ্ধ যোদ্ধা স্যার হেনরীর হাঁটু জড়িয়ে ধরলো, তারপর সে আর স্থির থাকতে পারলো না। কান্নায় ভেঙে পড়লো। এ কান্না কোনো দুঃখের বা বিষাদের নয়। এ কান্না আনন্দের, সুখের ও শান্তির।

।। সতেরো ।।

ঃ বিদায় বন্ধু বিদায় ঃ

"মৃতের জগৎ" থেকে ফিরে আসার পর দশদিন কেটে গেল লু নগরীতে। ফুলাটার আকস্মিক

মৃত্যুতে মিঃ গুড যে কতখানি শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন এবার তা উপলব্ধি করতে পারলাম। উনিও ভালোবেসে ফেলেছিলেন মেয়েটিকে। বেচারী। হয়তো তিনি ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্নও দেখেছিলেন। সলোমনের রত্নভাণ্ডারে আর আমরা কখনো ফিরে যাইনি। তবে সমাধি গুহায় আমরা আর একবার গিয়েছিলাম।

এবার আমাদের বিদায় নেবার পালা। রাজা ইগনোমিকে আমরা আমাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা সব খুলে বলেছি। জীবন্ত প্রেতিনী ডাইনী গগুলের মৃতুসংবাদও আমরা দিয়েছি রাজকে। রাজা আবার তার দেশবাসীদের সে খবর শুনিয়েছে। এ সংবাদ শুনে একজন বৃদ্ধ মন্তব্য করে, 'এতদিনে দেশের সংকট কাটলো, আমরা অভিশাপ মুক্ত হলাম।'

রাজা ইগনোমির কাছ থেকে বিদায় চাইলাম আমরা।

রাজা ভীষণ দুঃখ পেলো আমরা চলে যাবো শুনে।

রাজা বিষণ্ণ গলায় বললো, 'কেন আপনারা চলে যেতে চাইছেন? আমি কি এমন দোষ করেছি যে আপনারা আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

'রাজামশাই, ঘরে ফেরার জন্য আমাদের মন এখন ভীষণ ছটফট করছে। দেশের জন্য মন এখন আমাদের আকুল হয়ে উঠেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজা ইগনোমি বললো, 'আপনাদের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি। আমি যতোই বলি না কেন, আপনারা ঠিক যাবেন। বুঝতে পারছি, আমার মনে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কি বলুন? এদেশে কোনো সাদা চামড়ার মানুষকে আমি আসতে দেবো না; কিন্তু আপনাদের তিনজনের জন্য আমাদের দেশের দরজা সবসময়েই খোলা থাকবে।' এখানে একটু থেমে সে আবার বললো, 'কাকা ইনফাডোজ একদল সৈন্য নিয়ে আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি আপনাদের অন্য পথে নিয়ে যাবেন। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো আপনাদের জন্য।' পরদিন খুব ভোরে ইনফাডোজ এবং তার বাহিনীর সঙ্গে লু নগরী ছেড়ে এলাম। পথের দুপাশের এদেশে দেশবাসীরা আমাদের অভিবাদন জানালো। মেয়েরা পুষ্পবৃষ্টি করে আমাদের বিদায় জানালো।

মরুপ্রান্তে এসে আমরা একটু সময়ের জন্য দাঁড়ালাম। ইনফাডোজের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। বিদায় বেলায় কান্নায় ভেঙে পড়লো বৃদ্ধ যোদ্ধা। মিঃ গুড তাঁর চোখের রঙীন চশমাটা উপহার দিলেন বৃদ্ধ যোদ্ধাকে।

আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কয়েকজনকে দিয়েছিল ইনফাডোজ। তাদের নিয়ে আমরা মরুপথে যাত্রা শুরু করলাম অতঃপর। তিনদিন পথ চলার পর সূর্যাস্তের আগে আমরা এসে পৌঁছলাম একটা মরুদ্যানে। আমাদের পায়ের নীচে সবুজ ঘাস আর মাথার ওপর তাল-খেজুর গাছের শান্ত শীতল ছায়া।

।। আঠারো ।।

ঃ খুঁজে পেলাম তারে ঃ

এর পরবর্তী অংশে যে অত্যাশ্চর্য কাহিনী অপেক্ষা করছিল, এবার তারই অবতারণা করছি। মরুদ্যানের ছোট্ট নদীটির ধার দিয়ে একা একা হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমার চোখদুটো স্থির নিবদ্ধ হলো ডুমুর গাছের ছায়ায় ছোট্ট একখানা কুঁড়েঘরের ওপর। এ কার কুটীর? তারপরেই যেন যন্ত্রচালিতের মতো কুটীরের দরজা খুলে গেলো। একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে এবং গুডও ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন।

স্যার হেনরী দেখলেন, দেখলেন মিঃ গুডও সেই খুঁড়িয়ে চলা শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে। তারপর হঠাৎই চিৎকার করে স্যার হেনরী ছুটে গেলেন সেই সাদা চামড়ার লোকটির কাছে। 'ঈশ্বরের এ কি অসীম করুণা! এ তো, এ তো আমার হারিয়ে যাওয়া ভাই জর্জ!'

বাইরে চিৎকার শুনে কুটীরের ভেতর থেকে পশুচর্মের পোশাক পরিহিত আর একটি লোক বেরিয়ে এলো।

'মাকুমাজাহন! আপনি আমায় চিনতে পারছেন না? আমি জিম, জিম, শিকারী জিম। আমরা প্রায় দু'বছর হলো এই কুটীরে রয়েছি' জিমের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

'ঈশ্বরের অপার করুণা, তাই তোকে আমি আবার ফিরে পেলাম জর্জ।' গাঢ়স্বরে বললেন স্যার হেনরী। 'কিন্তু তুই এখানে কি করে এলি?'

'প্রায় দু'বছর আগে আমি পাহাড় ডিঙোবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে একটা পা আমার ভেঙে যায়। তাই না পারলাম এগোতে, না পারলাম পিছোতে। তারপর থেকেই আমি এখানেই রয়েছি।'

সেদিন সেই সন্ধ্যায় তাঁবুর আগুনের সামনে আরাম করে বসে জর্জ কার্টিস তাঁর সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শোনালেন। জর্জের বলা শেষ হতেই স্যার হেনরী আমাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বললেন সবিস্তারে। আমি জর্জকে আমার আনা হীরের টুকরোগুলো দেখালাম।

হীরেগুলো দেখে জর্জ আক্ষেপ করে বললেন, 'তবু ভালো, আপনারা কষ্টের বদলে কিছু পেয়েছেন।'

আমি জর্জের কথাটা মন দিয়ে ভাবলাম। তারপর মিঃ গুডের সঙ্গে আলোচনা করে জর্জকে বললাম, 'এ হীরের টুকরোগুলোর এক তৃতীয়াংশ আপনার।'

প্রথমে জর্জ হীরের ভাগ নিতে অস্বীকার করলেন। তবে শেষ পর্যন্ত একরকম জোর করেই আমার প্রস্তাবে জর্জকে রাজী করিয়ে ছাড়লাম।

।। উনিশ ।।

ঃ আমার কথার ইতি এখানেই ঃ

ডারবানের কাছে আমার বাড়ীতে ফিরে এসে এ কাহিনী লিখছি। ইংল্যাণ্ড থেকে স্যার হেনরী চিঠি লিখেছেন। অনেক কিছুই লিখেছেন তিনি। তারই মধ্যে তিনি একটা জরুরী খবর দিয়েছেন, মিঃ গুড বর্তমানে খুবই বিব্রত। কোনো বদলোক তাঁর ''সুন্দর সাদা পা''-এর কাহিনী লণ্ডনের একটি পত্রিকায় প্রকাশ করে দিয়েছে। তিনি আর একটা খবর দিয়েছেন, হীরেগুলো খুবই উৎকৃষ্ট ধরনের এবং দামী। জর্জের ভাগের মাত্র সামান্য একটা অংশ বিক্রী করে একশো আশী হাজার পাউণ্ড পাওয়া গেছে।

স্যার হেনরী আমাকে কিছুদিনের জন্য ইংল্যাণ্ডে যেতে অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি, আমি যাবো। সেখানে গেলে অনেক দিন পরে আমার ছেলে হ্যারীকেও দেখতে পাবো। আর একটা ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডে যাবার খুব ইচ্ছে আছে আমার। লজ্জা না করেই বলছি, আমার এই রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রকাশ করবার মতো কোনো প্রকাশকের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টাও একবার করে দেখবো বৈকি!

—o—

অলিভার টুইস্ট

চার্লস ডিকেন্স

সে আজ প্রায় একশো বছর আগের ইংলণ্ড। এক গভীর রাতে লণ্ডন শহর থেকে প্রায় ষাট-সত্তর মাইল দূরে জনশূন্য রাস্তায় এক যুবতী একা নিঃসঙ্গ। তার গন্তব্যস্থল কাছেই একটা বড় শহরে। বহু দূর থেকে সে আসছে। একটা ভারী বোঝা বহন করে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পথের মধ্যে দিয়ে। এর ফলে তার পথের নিশানা প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে। তবু তারই মাঝে তাকে পথ চলতেই হচ্ছে। শরীর অবসন্ন, পা ক্ষতবিক্ষত, একেবারে পঙ্গু হওয়ার আগে তাকে শহরে পৌছতেই হবে।

কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দূর থেকে একটা ভ্রাম্যমান লণ্ঠণের আবছায়া আলো দেখতে পেলো মেয়েটি। এবার সে তার চলার গতি দ্রুত করলো। একটা ক্ষীণ আশার আলো তার চোখের সামনে। নিজের জন্যে তার চিন্তা নেই, এখন তার একমাত্র চিন্তা কি করে তার ভাবী সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানো যায়। কিন্তু তার পা আর চলে না। হঠাৎ এটা অস্ফুট আওয়াজ করেই তার ভারি দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অসহ্য যন্ত্রণা, তা সত্ত্বেও শরীরটা ঘেঁষটে ঘেঁষটে কিছুটা পথ এগোবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু একটু পরেই জ্ঞান হারিয়ে মাঝপথেই পড়ে রইলো সে। তার সারা দেহ তখন রক্ত আর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে।

ওদিকে একটু পরেই সেই লণ্ঠনের আলোটা এগিয়ে এসে যুবতীর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো। মেয়েটির অবস্থা এক লহমায় দেখে নিয়ে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে লণ্ঠনের মালিক সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো শহরের দিকে। শহরের একেবারে এক প্রান্তে এক অন্ধকার গলির ভেতর এক জরাজীর্ণ প্রায় পোড়ো বাড়ি। দরজায় একটা কাঠের খণ্ডের ওপর লেখা, "গৃহ-হারাদের আশ্রম।" মৃত্যুপথযাত্রী যুবতীটিকে নিয়ে আনা হলো সেখানে। বারান্দায় তাকে ফেলে রেখে লোকটি ছুটে গেলো আশ্রমের ডাক্তারের সন্ধানে। তার হাঁকডাক শুনে আশ্রমের আশ্রিতা অনাথা শ্যালীবুড়ি ছুটে এলো সেখানে। প্রয়োজন হলে এই শ্যালীবুড়ি আবার কখনো কখনো ধাইমার কাজও করে থাকে। আর সেই শ্যালীবুড়ির ছোট্ট কুটীরে জ্ঞান হারানো যুবতীটি আশ্রয় পেলো। শ্যালীবুড়ির আন্তরিক সেবা-শুশ্রুষার ফলে একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে এলো মেয়েটির। ডাক্তার নিশ্চিত হয়ে শ্যালীবুড়ির জিম্মায় তাকে রেখে ডাক্তার অন্য রোগীকে দেখতে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সন্তানসম্ভবা মেয়েটির পেটের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠলো। প্রসব যন্ত্রণা! আর তখনি সে একটি শিশুর জন্ম দিলো। সদ্যজাত শিশু-সন্তানটির মায়ের রক্তহীন বিবর্ণ ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠলো। মেয়েটি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'বাছাকে আমার কাছে একবার নিয়ে এসো! মৃত্যুর আগে আমি আমার সন্তানকে একবার দেখতে চাই।' এই বলে সে নিজেই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কোনোরকমে হাতে ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুলে পাশেই তার সদ্যজাত শিশুর কপালের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরে পরক্ষণেই এলিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এসে পালস্ দেখে বলে দিলেন, 'বেচারী, আর বেঁচে নেই!'

মেয়েটির আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত বলতে ধারে কাছে কেউ নেই তখন। তাই তার এমন আকস্মিক

মৃত্যুর কথা শুনে শোক প্রকাশ করার কেউ ছিল না। বেওয়ারিশ লাশ, তাচ্ছিল্যের মতো লাশটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। চলে যেতে গিয়ে ডাক্তারবাবু থমকে দাঁড়ালেন। 'বেচারী মেয়েটি কোথা থেকে এসেছিল জানো কিছু?'

উত্তরে শ্যালীবুড়ি বললো, 'তা তো বলতে পারবো না ডক্টর। তবে রাতেই রাস্তা থেকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ওকে কুড়িয়ে আনা হয় এখানে। জুতো আর পায়ের হাল দেখে মনে হয়েছে, বহু দূর থেকে আসছিল আর কোথায়ই বা যাচ্ছিল তা জানা যায়নি, মানে মেয়েটি বলার মতো অবস্থায় ছিল না।'

ডাক্তার বিরক্তি প্রকাশ করলেন। 'ওঃ, কি জ্বালা! তোমার উত্তরে নতুনত্ব কিছু নেই, সেই গতানুগতিক।'

মা তো আর বেঁচে নেই। ডাক্তার চলে যেতেই শ্যালীবুড়ি এবার তার সদ্যজাত শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে শিশুটি হাঁপিয়ে উঠেছিল। নবজাতক শিশুর প্রথম মুখ দেখার জন্য এমনিতে যতো গরীব হোক না কেন ঠাকুমা-দিদিমা, মাসী-পিসী, কাকীমা-জেঠিমারা ছুটে আসে, সে বালাই নেই এই শিশুটির বেলায়। এমন কি তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য কোনো ডাক্তারও মাথা ঘামাতে চাইল না। কিন্তু কথায় আছে রাখে হরি মারে কে! শত অনাদরে অযত্নে শেষ পর্যন্ত এ যাত্রায় বেঁচে গেলো সে। এখন তার একমাত্র ভরসা অনাথ আশ্রমের আর এক অনাথা শ্যালীবুড়ি আর অনাথদের বিধাতা পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সেই হাতুড়ে ডাক্তারটি।

অতো অবহেলা আর অনাদরের পরেও শিশুটি যখন মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েএই নিষ্ঠুর পৃথিবীর ততোধিক নিষ্ঠুর মানুষগুলোর চোখের সামনে বেঁচে থাকার একটা স্থায়ী আন পাকাপাকি ভাবে করে নিলো, তখন আশ্রমের কর্মকর্তারা বাধ্য হয়েই আশ্রমের রেকর্ড-বুকে তা নাম লেখানা ঃ অলিভার টুইস্ট।' তবে তার প্রতি যথারীতি অনাদর আর অবহেলা অব্যাহত রইলো, অনাথ-আশ্রমে একটা অবাঞ্ছিত বোঝা হিসেবেই বিবেচিত হতে থাকলো সে। কর্তৃপক্ষ কেবল এখানেই থেমে থাকলো না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু অলিভারের পরনে মোটা পোশাক। চাকর-বাকরদের মতো তার ভাগে জুটলো আধ-পেটা খাওয়া, সেই সঙ্গে কিলচড়-লাতি আর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। এই সব অত্যাচার সত্ত্বেও যারা বেঁচে থাকে, যারা সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়, কেউ যাদের প্রতি করুণ দেখায় না, অনাথ-আশ্রমের সেই অসহায় শিশুদেরই একজন হয়ে অলিভার চুরিস্ট বড় হতে থাকে।

মাত্র দশমাস বয়সে শিশু অলিভারকে পাঠানো হলো তিন মাইল দূরে অনাথ আশ্রমের অন্য আর এক কর্মকেন্দ্রে। যেসব শিশু অপরাধী পুলিশের হাতে ধরা পড়তো তাদের এই কর্মকেন্দ্রে বন্দী করে রাখা হয় চরিত্র সংশোধনের জন্য। ওইরকম পঁচিশ-তিরিশজন কিসোর অপরাধী নিষ্পাপ শিশু অলিভারের সঙ্গী হলো সেখানে।

মিসেস ম্যান ছিলেন এই কর্মকেন্দ্রের পরিচালিকা। শিশুদের দেহ ও মন কিভাবে কতো সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই অনাথ-আশ্রমের কর্তৃপক্ষ কিশোর অপরাধীদের ভার তাঁর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ওইসব কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কতোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না চালাতেন মিসেস ম্যান, বিশেষ করে খুব কম আহার আর খুব কম পোশাক পরিয়ে কি করে তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায়, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সেদিকেই। এ ব্যাপারে তাঁর নিয়ম অত্যন্ত কড়া ছিলল। কোনো ছেলে-মেয়ে দাবী করতে পারবে না, বরাদ্দ খাবারের চেয়ে এক কণাও বেশী খেতে পেয়েছে কোনোদিন। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে পিছু প্রতি সপ্তাহে সরকারের কাছ থেকে তিনি পেতেন সাড়ে-সাত পেনি। তাঁর যুক্তি ছেলেমেয়েরা যদি বেশী খাওয়া-পরা পায় তাহলে তাঁরা বিগড়ে যাবে। তাই কি তিনি তাদের কম খাবার আর কম পোশাক দিয়ে বরাদ্দ অর্থের একটা মোটা অংশ নিজের তহবিলে

জমা দিতেন। তবে অনাথ ছেলেগুলো ছিল বড্ড বেয়াদপ মিসেস ম্যানের বদনাম করার জন্য তাদের মধ্যে বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার আগেই মারা যেতো হয় অনাহারে, নয়তো অসুখে বিনা চিকিৎসায়। এতো সব অন্যায় অবিচারের পরেও যদি তাদের মধ্যে কোনো রকমে কেউ মরতে মরতেও বেঁচে থাকতো, তাহলে সেক্ষেত্রে কতো কম আহারে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বের সামনে তাকে তুলে ধরা হতো।

মিসেস ম্যানের তৈরী নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত আধ-পেটা আহার করে অলিভার যখন নটা বছর পেরিয়ে এলো, তখন তার রোগাটে শীর্ণ ছোটখাটো চেহারা আর তার অস্বাভাবিক সাদা চামড়ার দিকে তাকিয়ে কারোর সন্দেহই হতো না, তার দেহে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত আছে। মিসেস ম্যান তার স্বাস্থ্য ও শক্তি হরণ করলেও বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বা প্রকৃতির দেওয়া এমন একটা জিনিস সে পেয়েছিল তার দেহে ও মনে, যা মিসেস ম্যান শত চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেননি। তার মুখখানি এমনি সুন্দর, সরল ও নিষ্পাপ যে, তার দিকে তাকালেই সকলেই তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারে না।

অলিভারকে তার নবম জন্মদিনের দিন সারাটা দিন তার দু'জন কিশোর সঙ্গীর সঙ্গে কয়লা রাখার ছোট্ট কুঠুরীতে পুরে বাইরে থেকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখার হুকুম দিলেন মিসেস ম্যান। ওদের অপরাধ অলিভারের জন্মদিন বলে ওরা সেদিন নাকি বড্ড বেশী খাই খাই করেছিল। আর ঠিক এই দিনেই হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সেখানে এসে হাজির হলেন অনাথ-আশ্রমের প্রধান পরিচালক মিস্টার বাম্বল। তাঁর আবির্ভাবের কথা শুনে মিসেস ম্যান রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি তখনি একজন পরিচারিকাকে ডেকে হুকুম করলেন। অলিভার আর দুই সঙ্গীকে কয়লা-কুঠুরী থেকে বের করে ভালো করে গা ধুইয়ে দোতলায় নিয়ে আসার জন্যে। তাঁর আশঙ্কা হলো মিস্টার বাম্বল যদি অলিভারদের কয়লা-মাখা অবস্থায় দেখে তাহলে তাঁর বদনামের ভাগীদার হতে বাধ্য তিনি।

মিসেস ম্যান খুবই খাতির যত্ন করলেন, মিস্টার বাম্বলকে খাবার টেবিলে বসে মিস্টার বাম্বল জানালেন, কুড়ি পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও অলিভারের বাবা-মায়ের কোনো পরিচয় কিংবা খোঁজ পাওয়া যায়নি। অথচ ওর বয়স এখন বেড়েছে বলে ওকে আশ্রম কর্তৃপক্ষ প্রধান কর্মকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে কাজ করে খাবারের মতো করে গড়ে তুলতে চায়। আর তাই তো তিনি অলিভারকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

এ খবর শুনে মিসেস ম্যান অলিভারকে নিয়ে এসে হাজির করলেন মিস্টার বাম্বলের সামনে। মিসেস ম্যানের নির্দেশে অলিভার করমর্দন করলো মিস্টার বাম্বলের সঙ্গে।

মিস্টার বাম্বল অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে বৎস, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত?'

অলিভার ঠিক এমনটিই চাইছিল, অত্যাচারিণী মিসেস ম্যানের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। তাই সে চটপট জবাব দিতে যাচ্ছিলো, হ্যাঁ, তার সঙ্গে যেতে রাজী সে। কিন্তু কথাটা তার মুখেই আটকে গেলো মিসেস ম্যানের চোখে চোখ পড়তেই। অলিভার দেখলো, মিসেস ম্যান মিস্টার বাম্বরের চেয়ারের পিছনে সরে গিয়ে চোখ লাল করে ঘুষি দেখাচ্ছেন তাকে। এতে ভীষণ ভয় পেলো অলিভার। সে তখন তোতলাতে তোতলাতে মিসেস ম্যানের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তা উনিও কি আমার সঙ্গে যাবেন?'

মিস্টার বাম্বল বললেন, 'না, না উনি যাবেন কেন? কেবল তুমিই আমার সঙ্গে যাবে।'

পরিস্থিতি বুঝে অলিভার বুদ্ধি করে অভিনয় করলো, মিসেস ম্যানকে ছেড়ে যেতে হবে বলে

কেঁদেকেটে চোখে জল ভাসিয়ে দিলো। অলিভারের নিখুঁত অভিনয়ের গুণে মিসেস ম্যান তার চোখের জলে গলে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও ভুললেন না। এভাবে দু'জনের মধ্যে নিষ্প্রাণ ভালোবাসার অভিনয় জমে ওঠার পর অলিভার তার বিগত ন'বছরের আশ্রয় ছেড়ে মিস্টার বাম্বলের সঙ্গে ফিরে চললো অনাথ আশ্রমের প্রধান কর্মকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। বিদায় বেলায় তার ডান হাতে জুটলো মিসেস ম্যানের দেওয়া একটুকরো ছোট্ট একটা বাদামী রঙের টুপি। পিছন ফিরে একবার তাকাতে গিয়েই অলিভারের দু'চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেলো। যে আশ্রমে থাকার সময় অলিভার কখনও স্নেহভরা কথা কারও মুখ থেকে শোনেনি, যেখানে উঠতে-বসতে সব সময় পেয়েছে কেবল লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, যেখানে খিদের সময় খাবার চাইতে গিয়ে খাবারের বদলে পেয়েছে কেবল তাড়না, সেই মিসেস ম্যানের আশ্রম ছেড়ে আসার সময় তার চোখে-মুখে নেমে এলো শোকের ছায়া। এই শোক তার অনাথ বন্ধুদের জন্য যাদের সে রেখে এলো সেখানে। তাদের দুঃখের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সে হাঁটছিল। সে এখন বেশ বুঝে গেছে, এই বিশাল জগতে এখন থেকে তার পথ চলা হবে একা একা, এই অচেনা পথ কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, সে পথ সুখের নাকি দুঃখের হবে সেই চিন্তায় তার মন এক অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে উঠলো।

।। দুই ।।

অলিভার নেহাতই এখন বালক, তাকেই হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন মিস্টার বাম্বল। একসঙ্গে এতো দীর্ঘপথ এর আগে কখনো হাঁটতে হয়নি তাকে। তাই পথের ক্লান্তিতে প্রায়ই তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল। এর ফলে সে মিস্টার বাম্বলের থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। মিস্টার বাম্বল বেশ কয়েকবার ধমক দিয়েছিল তাকে। শেষে রেগে গিয়ে কানমলা আর পিছন থেকে গুঁতো দিয়ে দ্রুত পথ চলতে তাকে সচেতন করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু বেচারা না খেতে পাওয়া রোগা লিকলিকে চেহারা নিয়ে একজন বলিষ্ঠ চেহারার বয়স্ক পুরুষের হাঁটার গতির সঙ্গে পাল্লা দেবেই বা কি করে! তাই মিস্টার বাম্বলের হুমকি কোনো কাজেই লাগলো না। তবে মিস্টার বাম্বলকে খুশী করার জন্য অলিভার সাধ্য মতো চেষ্টা করে তার রোগা হাড়ে ভেল্কি খেলিয়ে তাঁর পিছন পিছন দৌড়তে থাকলো। এইভাবে বেচারা অলিভারকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে মিস্টার বাম্বলে যখন সেই অনাথ আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আশ্রমের কর্মকর্তাদের সভা তখন শুরু হয়ে গেছে, তাই সভাপতি মিস্টার লিম্বকিন এখন অলিভারকে মিস্টার বাম্বলের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কথাটা শোনামাত্র মিস্টার বাম্বল অলিভারসহ টানতে টানতে দ্রুত সভায় গিয়ে হাজির হলেন।

কর্মকর্তাদের সভার হাজির হয়ে, অলিভার দেখলো দশজন কর্মকর্তা একটা মস্তবড় টেবিলের সামনে বসে নিজদের মধ্যে কিসব আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন মধ্যমণি হয়ে একটা উঁচু চেয়ারে বসে আছেন।

অলিভারকে টেবিলের সামনে ঠেলে দিয়ে মিস্টার বাম্বল তাকে বললেন, 'দেখো অলিভার, এঁরাই তোমার রক্ষাকর্তা, এতোদিন এঁরাই তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছেন। এঁদের অভিবাদন জানাও।'

সকাল থেকে অলিভারের পেটে কিছু পড়েনি, খিদের জ্বালায় আর পথশ্রমে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অলিভারের দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। চোখের জল মুছে সে টেবিলের সামনে গিয়ে জনে জনে কর্তাদের অভিবাদন জানালো।

উঁচু চেয়ারে বসে থাকা মানুষটি হলেন সভাপতি মিস্টার লিম্বকিন। তিনি অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি বাছা?'

লিম্বকিনের সঙ্গে অবশিষ্ট কর্মকর্তারাও তার দিকে এক দৃষ্টে তাকানোর দরুণ অলিভার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। ভয়ে আতঙ্কে তার পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল গলা শুকিয়ে আসছিল। তাই অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে জড়ানো গলায় যা বললো তা উপস্থিত সবার মধ্যে কেউই শুনতে পেলেন না।

কর্মকর্তাদের অনেকেই মন্তব্য করলেন, 'ছেলেটা ভরপেট খেতে পেয়ে চোখে সরষের ফুল দেখছে। একেবারে একটা গাধা বনে গেছে। ওর মাথার ঘিলু মোটা হয়ে গেছে।'

বেগতিক দেখে মিস্টার বাম্বল এর পর অলিভারের পিছনে দাঁড়িয়ে, দু'দুবার খোঁচা দিলেন। এর ফলে অলিভার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তার কান দুটো খাড়া করে। সভাপতির পরবর্তী প্রশ্ন শোনবার জন্য।

মিস্টার লিম্বকিন আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, তুমি একজন অনাথ?'

'হ্যাঁ জানি বৈকি! কিন্তু তাতে কি হয়েছে?' উত্তরে অলিভার বললো।

এবার কর্মকর্তারা হেসে ফেটে পড়লো। এর পর অলিভার যে সত্যি সত্যি একটা আস্ত গাধা, সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের আর কোনো সন্দেহই রইলো না। আর একবার তার নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ পেলেন তাঁরা।

মিস্টার লিম্বকিন অলিভারের উদ্দেশ্যে আবার বললেন, 'এর পর তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। চিরদিন কেউ তো আর অনাথ থাকতে পারে না। তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্যে। তোমার কাজ হবে দড়ি পাকানো, কাল ভোর ছ'টা থেকে তোমায় কাজে লেগে যেতে হবে, বুঝলে?'

অলিভার আর একটা কথাও বলতে পারলো না। এদিকে মিস্টার বাম্বল আর কালবিলম্ব না করে অলিভারের কলার ধরে টানতে টানতে একটা বড় হলঘরে নিয়ে এলেন এবং সেই ঘরেরই এক কোণে একটা নোংরা ময়লা বিছানায় তাকে শুইয়ে দিলেন। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো কেউ তার খোঁজ করলো না। এমন কি খাবার জন্য কেউ তাকে ডাকতেও এলো না।

এদিকে আশ্রমের কর্মকর্তারা সেই সভায় নিয়মকানুনের ব্যাপারে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনলেন। তার মধ্যে একটা হলো, অলিভারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কিছু কর্মকর্তা মত প্রকাশ করে, বেশী খাওয়ার ফলে তার বুদ্ধিশুদ্ধি নাকি মোটা হয়ে গেছে, ভালো করে কথা বলতেও পারে না। বেশী খাওয়া? শোনো কথা: না খেতে পেয়ে বেচারার স্বাস্থ্য একেবার ভেঙে পড়েছে, অথচ কর্মকর্তারা বলছেন, ও নাকি বেশী খেয়ে মাথা মোটা করে ফেলেছে! কি আর করা যাবে। কর্মকর্তারা নিজেদেরকে খুবই জ্ঞানীগুণী বলে জাহির করে থাকে। তাঁদের অনুমান, অনাথ ছেলেমেয়েরা অধিক পরিমাণে আহার করে অনাথ-আশ্রমকে তাদের অলস আড্ডাখানা করে তুলেছে। তাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। তাই তাদের শোধবাতে আর খিদের জ্বালায় যাতে করে কাজকর্মে মন দিতে পারে, সেই জন্যে তাদের আহারের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে জলের সরবরাহ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব হলো। আর তাদের খাবারের বরাদ্দ হলো এই রকম ঃ ছাতুর তৈরী পাতলা লপ্‌সি, সপ্তাহে দুবার একটি করে পেঁয়াজ এবং প্রতি রবিবার আধখানা রুটি বরাদ্দ করা হলো অতঃপর।

এই নতুন ব্যবস্থায়, অনাথ-আশ্রমের প্রথম দিকে খরচ অনেক বেড়ে গেলো। কারণ অনাথ ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো খেতে না পেয়ে তারা রোগা হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের পোশাক-আশাক বড় বেশী ঢিলে-ঢালা হয়ে গেলো। তাই তাদের পোশাক বদলাতে বাড়তি খরচ বহন করতে হলো কর্তৃপক্ষকে। তাছাড়া খাদ্যাভাবে অনাথ ছেলেমেয়েরা বেশী সংখ্যায় মরতে থাকলো বলে বাড়তি অনেক খরচ হলো, কারণ একজনের কয়েক বছরের খাবার খরচের চেয়ে তাকে কবর দেওয়ার খরচ বাড়লো অনেক বেশী।

কর্মকর্তারা আবার খাঁটি খ্রিস্টান তাই খরচ কমাতে কবর দেওয়ার বদলে লাশগুলো যে জলে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তাই পারলেন না, কারণ তাতে ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।



প্রথম তিনমাস খাদ্যে ঘাটতি হওয়ার দরুণ অলিভার আর তার সঙ্গীরা অনাহারের জ্বালা মুখ বুজে সহ্য করলো। খেতে বসে সকলেই বরাদ্দ মাত্র এক হাতা ছাতুর লপ্‌সি খেয়ে আঙুল চুষতো দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু কেউ সাহস করে এক হাতা বাড়তি লপ্‌সি চাইতে পারতো না লাঞ্ছনার ভয়ে। তাই খিদের জ্বালায় তারা খাবারের থালা চেটে চেটে চক্‌চকে করে তুলতো। তাতে তাদের থালা ধোয়া-মোছার ঝামেলা ছিল না। দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে শেষে তারা তাদের মাথা ঠিক রাখতে পারলো না। একদিন একটা অনাথ ছেলে তো প্রকাশ্যে বলেই ফেললো, খাবারের বরাদ্দ না বাড়ালে সে তার সঙ্গী ছেলেটাকে হয়তো জ্যান্ত চিবিয়েই খেয়ে ফেলবে। তার অমন অশুভ কথা শুনে অন্যসব ছেলেমেয়েরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলে। তারা তখন নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করে শেষ পযন্ত ঠিক করলো, এর পর তারা বাড়তি এক হাতা ছাতুর লপ্‌সির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করবে। আর তাদের সেই দাবী পেশ করার জন্য তারা অলিভারকেই তাদের নেতা হিসেবে বেছে নিলো। ঠিক হলো, অলিভারই এক হাতা বাড়তি লপ্‌সি চাইবে। তারপর অন্য সব অনাথরা তাকে অনুসরণ করে সেই দাবী নিয়ে এগিয়ে যাবে।

সেদিনই সন্ধ্যায় পরিকল্পনামাফিক অলিভার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে বাড়তি আর এক হাতা ছাতুর লপ্‌সি চেয়ে বসলো। অনাথ-আশ্রমের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো অনাথ এরকম অন্যায্য দাবী করেনি। পরিবেশক চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে হাতার বাঁট দিয়ে অলিভারের মাথায় দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে মিস্টার বাম্বলের কাছে হাজির হয়ে জানালো ঃ 'স্যার, এদিকে একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে। অলিভারের কি স্পর্ধা. বাড়তি এক হাতা লপ্‌সি চেয়েছে।'

মিস্টার বাম্বল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ঃ 'হ্যাঁ, ছোকরার এতো বড় স্পর্ধা? এতো দেখছি একটা খুদে শয়তান হয়ে উঠেছে। অকৃতজ্ঞ বেইমান...........' রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মিস্টার বাম্বল ঘুষি পাকিয়ে অলিভারের দিকে তেড়ে গেলেন। অলিভার কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। বরং বাড়তি এক হাতা লপ্‌সির দাবীতে সে অটল রইলো। ওর এই ঔদ্ধত্য দেখে মিস্টার বাম্বল আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চোখ লাল করে চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'তোর বড্ড বাড় হয়েছে! আবার যদি এ ধরনের অন্যায় দাবী করিস তো তোকে চাবকে লাল করে দেবো।"

অলিভার তখনও নির্বিকার, অবিচল, সে তার দাবী থেকে এক চুলও নড়ে এলো না, কিংবা বশ্যতা স্বীকার করলো না। এর ফলে রাগে গড়গড় করতে করতে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলো অনাথ-আশ্রমের সভাপতি মিস্টার লিম্বকিনের কাছে। মিস্টার লিম্বকিন তখন ইজিচেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন।

'স্যার,' কোনো ভূমিকা না করেই উত্তেজিত গলায় মিস্টার বাম্বল অভিযোগ করলেন অলিভারের বিরুদ্ধে। 'এই ছোকরা তার জন্য বরাদ্দের অতিরিক্ত এক হাতা লপ্‌সি বেশী চেয়েছে।'

অভিযোগটা শোনামাত্র মিস্টার লিম্বকিনের ঘুমের আমেজ ছুটে গেলো। অবাক চোখে কিছুক্ষণ অলিভারের দিকে তাকিয়ে থেকে আশ্রমের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে অলিভারের বিদ্রোহের মাত্রাটা যে কতখানি সেটা বোধহয় প্রথমে যাচাই করে নিতে চাইলেন। তারপর যেন কিছুই শোনেননি কিংবা

বুঝতে পারেননি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে এক টিপ নস্যি নিয়ে তিনি মিস্টার বাম্বলকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'এ আপনি কি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি,' উত্তরে মিস্টার বাম্বল বললেন, 'গলা টিপলে এখনও দুধ বেরোয়?'

মিস্টার লিম্বকিন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'এ হেন বাচ্চা ছেলে আশ্রমের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে বাড়তি এক হাতা লপ্‌সি চাইছে? এ তো তাহলে বিদ্রোহেরই সামিল! তাই এ হেন বিদ্রোহী অপরাধীকে কড়া শাস্তি দিতে হয়?'

'হ্যাঁ স্যার,' উত্তরে মিস্টার বাম্বল বললেন, এই ছোকরা হলো দলের পাণ্ডা! তাই একে উপযুক্ত শাস্তি না দিলে এর দেখাদেখি এর দলের অন্য ছোকরারা বিগড়ে যাবে, এর ফলে অনাথদের জন্যে আশ্রমের সমস্ত প্রচেষ্টা পুরোপুরি বানচাল হয়ে যাবে।'

মিস্টার বাম্বলের এ হেন আশঙ্কার কথা শুনে মিস্টার লিম্বকিন ঘাবড়ে গেলেন। আজীবন সেবার আদর্শ নিয়ে অনাথদের সেবক হিসেবে আশ্রমের এই কঠিন কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু একটা অবাধ্য ছেলের জন্যে এই অনাথ-আশ্রমের এতোবড় ক্ষতি হবে তা তিনি জেনেশুনে সহ্য করবেন কি করে। তাছাড়া ছেলেদের বেশী খাবার দেবার অভিযোগ পেয়েছেন তিনি মিস্টার বাম্বলের কাছ থেকে। কে বলতে পারে বেশী খাবার খেয়ে তারা তাদের শক্তির অপচয় করতে চাইছে এরকম বিদ্রোহের মাধ্যমে? তাই এইসব কথা ভেবেই তড়িঘড়ি কর্মকর্তাদের সভা ডেকে বসলেন মিস্টার লিম্বকিন সে রাতেই। সভার বিচার্য বিষয় হলো, বাড়তি এক হাতা লপ্‌সি চেয়ে অলিভার টুইস্ট নামে এক বালকের আশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে!

দীর্ঘ আলোচনার পর মিস্টার লিম্বকিন হুকুম করলেন, সেদিন থেকে অলিভারকে একটা অন্ধকার সেল-এ বন্দী করে রাখা হোক। তারপর অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অনাথ-আশ্রমের কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। অলিভারকে আশ্রমে আর থাকতে দেওয়া হবে না এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে।

পরের দিনই অনাথ-আশ্রমের সদর দরজায় একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সেই নোটিশের বয়ান হলো এই রকম ঃ 'কেউ যদি অলিভারকে তার নিজের কাজে লাগাবার জন্য নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।'

তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেলো, কিন্তু কেউ এলো না অপরাধী বালককে নিয়ে যেতে। অগত্যা অন্ধকার সেল-এ বন্দীদশায় অলিভার কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভাসিয়ে দেয় সেই ঘরের মেঝেটা।'

সেদিন সকালে চিমনি-পরিষ্কারক গারফিল্ড অনাথ-আশ্রমের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকমাস বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ে গেছলো তার, এর ফলে বাড়িওয়ালা কদিন ধরে বাড়ি ভাড়ার টাকার জন্য খুব তাগাদা দিচ্ছিল। গারফিল্ড ভাড়ার টাকা যোগাড় করতে না পেরে খুবই চিন্তায় পড়েছিল তখন। হঠাৎ অনাথ-আশ্রমের সদর-দরজায় সেই নোটিশটা ঝুলতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। এই মুহূর্তে অলিভারকে তার ভীষণ দরকার, সে তাকে তার সহকারী হিসেবে পাওয়ার জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালো। সেইসঙ্গে নগদ পাঁচ পাউণ্ড দেওয়ার কথাও বললো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে সাড়ে-তিন পাউণ্ডের বেশী দিতে রাজী হলো না। যাই হোক, গারফিল্ড তাতেই রাজী হয়ে গেলো। তখন অলিভার আর গারফিল্ডকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ছুটলেন মিস্টার বাম্বল, কারণ তাঁর অনুমতি ছাড়া অলিভারকে চিমনি পরিষ্কারের কাজে লাগানো যাবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে অলিভার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বলে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলে।

কিন্তু বেঁকে বসলো অলিভার। গারফিল্ডের চ্যাপটা মুখ দেখে এমন ভয় পেলো যে, সাফ জানিয়ে দিলো তার সঙ্গে যাবে না সে। অগত্যা ম্যাজিস্ট্রেটও অলিভারের পক্ষেই সায় দিলেন অবশেষে।

অলিভারকে ফিরিয়ে এনে আশ্রমের সেই অন্ধকার কক্ষে আবার বন্দী করে রাখা হলো। পরদিন অনাথ-আশ্রমের সদর-দরজায় আর একটা নোটিশ টাঙানো হলো এই ভাবে ঃ 'অলিভারকে ভাড়া দেওয়া হবে। আর যে ভাড়া নেবে তাকে নগদ পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।' কিন্তু এই নোটিশেও কেউ সাড়া দিলো না। তখন কর্তৃপক্ষ তাকে বিদেশে কোথাও ছোকরা চাকর হিসেবে চালান করে দেবার চেষ্টা করতে বললো মিস্টার বাম্বলকে। মিস্টার বাম্বল তখন লণ্ডনে গিয়ে জাহাজী-ব্যাপারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু এবারেও তিনি ব্যর্থ হলেন। হতাশ হয়ে আশ্রমে ফেরার পথে হঠাৎ তাঁর দেখা হয়ে গেলো মিস্টার সোয়ারবেরীর সঙ্গে। তাঁর পেশা হলো কফিন তৈরী করা এবং মৃতদেহ কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কথায় কথায় মিস্টার বাম্বল তাঁকে অলিভারের ব্যাপারে ব্যর্থতার কথা বললেন। মিস্টার বাম্বল এক সময় একজন পাদরী ছিলেন, পাদরীর সাহায্য পেলে কফিনের ব্যবসায় বেশ ভালো রকম ব্যবসা জমানো যায়। তাই ব্যবসার খাতিরে মিস্টার সোয়ারবেরী মিস্টার বাম্বলকে খুশী করার জন্য অলিভারকে কাজে নিতে রাজী হয়ে গেলেন তখনি।

এর পর মিস্টার বাম্বল ছুটে গেলেন মিস্টার লিম্বাকিনের কাছে শুভ খবরটা দিতে। ঠিক হলো কাল বিলম্ব না করে সেদিনই সন্ধ্যায় অলিভারকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে মিস্টার সোয়ারবেরীর বাড়িতে।

সেদিনই সন্ধ্যার পর রাত নামতেই জানালা পথে মিস্টার বাম্বলের সঙ্গে অলিভারকে আসতে দেখে মিস্টার সোয়ারবেরী তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'শুনছো, একবার এখানে আসবে?' এই বলে তিনি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন অলিভারকে গ্রহণ করার জন্য।

একটু পরে মিসেস সোয়ারবেরীও বাইরে বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। অলিভারকে দেখেই তিনি বললেন, 'এ যে দেখছি খুবই ছোট, একেবারে বালক মাত্র!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' এই বলে মিস্টার বাম্বল এমনভাবে তাকালেন অলিভারের দিকে, যেন ছোট হওয়ার জন্যে সে খুব অপরাধ করে ফেলেছে। তারপর মুখ বিকৃত করে মিস্টার বাম্বল বললেন, 'এখন ছোট আছে বটে, তবে একদিন তো ও বড় হবেই।'

'তা হবে, তার ওপর আমাদের খাওয়া-দাওয়ার একটা আলাদা গুণ বলে কথা আছে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, আশ্রমবাসীদের দিয়ে যতোটা কাজ পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী, খরচ হয় ওদের পুষতে।' বললেন, মিসেস সোয়ারবেরী। তারপর অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে মিসেস সোয়ারবেরী দোতলায় উঠে একটা অন্ধকার রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলেন। পরিচারিকা শার্লটিকে বললেন অলিভারকে কিছু বাসি মাংস খেতে দেবার জন্য।

মাংসের নাম শুনেই অলিভারের জিভে জল এলো। অনাথ-আশ্রমে মাংস খাওয়া দুরে থাক চোখে পর্যন্ত কোনোদিন দেখেনি সে। নিমেষে অলিভারের মাংস খাওয়া শেষ হলে পর মিসেস সোয়ারবেরী আঁতকে ওঠার মতো করে বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ, একি করলি তুই? সবটা খেয়ে ফেললি!' ভবিষ্যতে অলিভারের খাওয়ার বহর যে কি দাঁড়াতে পারে, মনে মনে তার একটা হিসেব করে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন তিনি। তারপর তিনি একটু বিরক্ত হয়েই অলিভারকে একটা দোকান-ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওই টেবিলটার তলায় তোকে ঘুমোতে হবে, যা ওখানে গিয়ে ঘুমো। পাশে অনেক কফিন রয়েছে। ভয় করলেও ওখানেই তোকে ঘুমোতে হবে, কিছু করার নেই।'

মিসেস সোয়ারবেরী বেরিয়ে যেতেই অলিভার দোকান-ঘরের দরজা গিয়ে কফিনগুলোর দিকে নজর পড়তেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে গিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে ঘরের দরজায় ঘনঘন লাথির আওয়াজ শুনে অলিভারের ঘুম ভেঙে গেলো। তখন ভোর হয়ে গেছে। দরজা খুলতেই একজন মস্তান ধরনের ছেলে মাখন-মাখানো রুটি খেতে খেতে দোকানঘরে এসে ঢুকলো। তাকে একজন খরিদ্দার ভেবে একটা সহজ সরল প্রশ্ন করে বসলো, 'আপনি কি কফিন কিনতে এসেছেন?'

ছেলেটা এ কথা শুনে ক্ষেপে লাল। 'ভবিষ্যতে যদি আবার এরকম কথা বলিস তো তোকেই একটা কফিনে শুইয়ে ছাড়বো। আমার পরিচয় কি জানিস? আমি নোয়া ক্লেপোল, তোর বস বুঝলি!' এই বলে সে অলিভারের গায়ে পা চালিয়ে দিলো।

ঠিক সেই সময়েই শার্লটি এলো সকাল বেলার প্রাতঃরাশ নিয়ে। নোয়ার জন্যে সে তার মনিবের খাবার থেকে চুরি করে কিছু টাটকা মাংস এনেছে, আর অলিভারের জন্যে এনেছে শুধুই একবাটি চা।

প্রাতঃরাশ সারতে গিয়ে অলিভারের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো নোয়া। শার্লটিকে শুনিয়ে সে বললো, 'ব্যাটাকে দুনিয়ার সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে, এর বাপ-মায়েরও কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।' ছিঃ ছিঃ..........'

নোয়াও অনাথ-আশ্রমে থেকে বড় হয়েছে। তবে অলিভারের মতো অজ্ঞান-কুলশীল নয়, তার মা ছিল ধোপানী, আর বাবা যুদ্ধ-ফেরত বিকলাঙ্গ মাতাল সৈনিক।' এতদিন পর্যন্ত প্রতিবেশী ছেলেদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করে এসেছে নোয়া কারণ সে ছিল তাদের চেয়ে অনেক নিম্নশ্রেণীর ছেলে।' আজ নিজের চেয়েও হীন, পরিচয়হীন অসহায় একটি ছেলেকে নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে সে তার এতদিনে পুষে রাখা সমস্ত রাগ অভিমানের জ্বালা অলিভারের ওপর মেটাবার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলো না।

আর পরিচারিকা শার্লটিও এ ব্যাপারে নোয়ার দোসর বনে গেল। সেও সুযোগ পেলেই অলিভারকে নানানভাবে উত্যক্ত করতে লাগলো। তবে অলিভারও অনেক দুঃখ-জ্বালা পাওয়া ছেলে। তাই সবার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যেতে থাকলো এই আশায় যে, একদিন তার ভালোদিন আসবে, সুখের মুখ দেখতে পাবে সে তখন। যাই হোক, এরই মধ্যে এতো সব দুঃখ-যন্ত্রণা, নির্যাতনের মাঝে একটা আশার আলো অলিভারের সামনে দেখা দিলো, তার মনিব কিন্তু অন্য মানুষ বলেই মনে হয়, তাকে তিনি বেশ ভালোচোখেই দেখে থাকেন। কফিন বিক্রী এবং কবর দেওয়ার কাজের ঝামেলা অনেক। একা মানুষ সব দিক সামলাতে পারছিলেন না। তাই তিনি মাঝে মাঝে অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁর কাজে সাহায্যের জন্যে! ওদিকে মনিবকে সাহায্য করার জন্যে অলিভার আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে থাকে। মিস্টার সোয়ারবেরী বেশ বুঝতে পারলেন যে, অলিভার বাস্তবিকই কাজের ছেলে এবং তার ওপর কাজের ভার নিশ্চিন্তভাবেই দেওয়া যায়।

মাসখানেক অলিভারের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মিস্টার সোয়ারবেরী একদিন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'অলিভার ছেলেটি দেখতে বেশ, কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়ে থাকতে দেখা যায় তার মুখে সব সময়।'

স্বামীর মুখে অলিভারের প্রশংসা শুনে মিসেস সোয়ারবেরী কিন্তু আদৌ খুশী হতে পারলেন না। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, স্বামীর সব কাজেরই সমালোচনা করে থাকেন কড়া ভাষায়। তাই স্বভাবতই অলিভারের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। অলিভারের ব্যাপারে স্বামী যে খুব বাড়াবাড়ি করছেন কথাটা তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না।

এদিকে মিস্টার সোয়ারবেরীর সুনজরে আসার দরুণ অচিরেই অলিভারের পদোন্নতি হয়ে গেলো।

কফিন ক্রেতাদের শবযাত্রায় শোক প্রকাশ করার জন্যে একজন লোক দিতে হতো মিস্টার সোয়ারবেরীকে, তাতে কফিন বিক্রীর ব্যবসায় সুবিধে হতো। অলিভারকে সেই পদে উন্নীত করলেন তিনি।

এই যে কিছুদিন ধরে অলিভারের ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে আসছিল নোয়া, তার এই পদোন্নতির নোয়া আরও হিংস্র হয়ে উঠলো। এর ফলে তার অত্যাচারের মাত্রাও অনেকগুণ বেড়ে গেলো।



একদিন হলো কি রান্নাঘরে অলিভার আর নোয়া আহারের জন্যে বসেছিল। তাদের খাবার পরিবেশন করার কথা শার্লটির। কিন্তু মালকিনের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলো সে

ছুতো পেলেই নোয়া অলিভারের ওপর অত্যাচার করতো। তাই সেদিনও সে অলিভারের পাশে চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। অলিভারকে রাগাবার জন্যে খাবার টেবিলের ওপর তার ঠ্যাং তুলে দিলো। অলিভার তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় ওদিকে নজরই দিলো না। এতে নিজের পরাজয় দেখে নোয়া ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে এবার অলিভারের চুল ধরে সজোরে টান দিয়ে তার কান মুলে দিলো। তা সত্ত্বেও অলিভার কিন্তু একটুও কাঁদলো না, কিংবা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলো না। এর পরেও যখন সে অলিভারকে রাগাতে পারলো না; তখন সে অলিভারকে কুৎসিত ভাষায় প্রশ্ন করলো, 'ওরে বেজন্মা, তোর মার খবর কি বল?'

'তিনি মারা গেছেন,' অলিভার প্রতিবাদ করে উঠলো, 'আমাকে বেজন্মা বলবে না, আর মায়ের সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।' কথাটা বলে অলিভার তার চোখের জল আর সামলাতে পারলো না।

অলিভারের চোখে জল দেখে নোয়া খিঁচিয়ে উঠলো, 'আমি কি এমন কথা বলেছি যে, তোর চোখে জল এসে গেলো? আর সাবধান, আমাকে ভয় দেখাস না। তোর মায়ের সম্পর্কে আমি ঠিকই বলেছি, আবার বলছি। তোর মা ছিল একটা বদ মেয়েছেলে!'

'কি বললে?' অলিভার এবার সরাসরি নোয়ার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

নোয়া বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে আরও জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তোর মা ছিল বদ মেয়েছেলে, তার চরিত্র ঠিক ছিল না। মরেছে খুব ভালো হয়েছে, আপদ বিদেয় হয়েছে।'

অলিভার এবার রাগে ফেটে পড়লো। চেয়ার টেবিল উল্টে ফেলে দিলো। তারপর আরও রেগে গিয়ে নোয়ার টুঁটি টিপে ধরে পাগলের মতো ঝাঁকানি দিতে শুরু করলো সে।

'মেরে ফেললো, অলিভার আমাকে মেরে ফেললো! শুনছেন শার্লটি! কর্তারা! ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচান! অলিভার পাগল হয়ে গেছে, ক্ষেপে গিয়ে ও আমাকে খুন করতে চাইছে!' মৃত্যুপথযাত্রীর মতো প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে থাকে সে।

তার সেই চিৎকার শুনে প্রথমে ছুটে এলেন মিস্টার সোয়ারবেরী, আর তাঁর পিছন পিছন এলো শার্লটি।

'এই গুণ্ডা বদমাস. এ তুই কি করছিস?' শার্লটি ছুটে এসে অলিভারকে চেপে ধরলো। 'বেইমান, খুনে গুণ্ডা!' গালাগাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকলো। তার মুখে, বুকে যেখানে পারলো মিসেস সোয়ারবেরীও একহাতে অলিভারকে চেপে ধরে অপর হাত দিয়ে খিমচে আঁচড়ে তার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে থাকলেন। নোয়াও পিছিয়ে থাকলো না, অলিভারের পেটে এলোপাথারি

ঘুষি মারতে থাকলো। এক সময় অলিভারকে মারতে মারতে সবাই হাঁপিয়ে পড়লো। সেই অবস্থায় তারা কোনোরকমে তাকে ধরে বেঁধে কয়লা কুঠুরীতে চালান করে দিলো। তারপর মিসেস সোয়ারবেরীর নির্দেশে নোয়া ছুটলো অনাথ-আশ্রমে মিস্টার বাম্বলের কাছে খবরটা দেওয়ার জন্য।

নোয়ার মুখ থেকে অলিভারের ক্ষ্যাপামির কথা শুনে রাগে গজরাতে গজরাতে তখনি নোয়ার সঙ্গে চলে এলেন মিস্টার বাম্বল। এসেই কয়লা-কুঠুরীর দরজায় লাথি মেরে মিস্টার বাম্বল হাঁক দিলেন, অলিভার, আমি!'

'কোনো কথা নয়, আগে দরজা খুলে দিন!' ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠলো অলিভার।

'আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছো?' মিস্টার বাম্বল জিজ্ঞেস করলেন।

'বিলক্ষণ চিনতে পারছি।'

'এর পরেও তোর ভয়ডর বলে কিছু নেই?'

'না! কেনই বা থাকবে?' ডাকাবুকোর মতো জবাব দিলো অলিভার।

অলিভারের এরকম উত্তর আশা করেননি মিস্টার বাম্বল। তিনি এখন রীতিমতো ভীতসন্ত্রস্ত।

মিসেস সোয়ারবেরী ফোড়ন কাটলেন ঃ 'ও এখন ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে উঠেছে, ওর কথাবার্তা শুনে সেরকম মনে হচ্ছে না? আপনার মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা দেখেছেন?'

'না, না, ক্ষ্যাপা কুকুর নয় মিসেস সোয়ারবেরী, এ হলো মাংস আর ভালোমন্দ খাবার পাওয়ার পরিণাম। মাংস খেয়েই হিংস্র জানোয়ারের মতো তেজ বেড়ে গেছে ওর।' ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মিস্টার বাম্বল।

কথাটা মিসেস সোয়ারবেরীর মনে দারুণ ভাবে দাগ কাটলো। দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন, 'হায়! আমরা ভালোমানুষের পরিচয় দিয়ে পরিণামে এই পেলাম?'

মিস্টার বাম্বল সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, 'হতাশ হবেন না মিসেস সোয়ারবেরী, ওই বেয়াদপ জানোয়ারটার তেজ কমানোর উপায় একটা আছে। সময় থাকতে থাকতে ওকে কিছুদিন খেতে না দিয়ে কয়লা কুঠুরীতে বন্দী করে রাখুন। তাহলেই দেখবেন ওর তেজ কমে গেছে। আর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তখন ওকে বাইরে বার করে এনে রোজ স্রেফ এক হাতা করে লপ্‌সি খেতে দেবেন। ভয় পাবেন না। কম খেয়ে মারা যাবে না ও। ওর জান খুব কড়া, তাড়াতাড়ি মরবে না। ওর মতো ওর মায়ের জানও ছিল খুব কড়া। ডাক্তার আর নার্সরা বলেছিল, ওর মা প্রসব যন্ত্রণায় যতোটা কষ্ট সহ্য করে বহুদূরের পথ হেঁটে এখানে এসেছিল তার সামান্য একটুও ভদ্রঘরের কোনো মেয়ে সহ্য করতে পারতো না।

ওদিকে মায়ের সম্পর্কে এমন হীন মন্তব্য শুনে অলিভার কয়লা-কুঠুরীর ভেতরে ফুঁসে উঠলো। পারলে এখনি বেরিয়ে এসে মিস্টার বাম্বলের টুঁটি টিপে ধরে।

এই সময় মিস্টার সোয়ারবেরী বাড়ি ফিরে এসে সব শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠে কয়লা-কুঠুরীর দরজা খুলে জামার কলার চেপে ধরে অলিভারকে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর মুখে সজোরে একটা ঘুষি মেরে কৈফিয়ত চাইলেন, 'এই বুঝি তোর ভালোমানুষের নমুনা? বল, নোয়াকে মেরেছিস্ কেন?'

অলিভার পাল্টা অভিযোগ করলো, 'ও আমার মায়ের নামে শুধু শুধু কলঙ্ক রটালো কেন?'

স্বামীর হয়ে মিসেস সোয়ারবেরী এবার জবাব দিলেন, 'রটালোই বা কি? সে তো সত্যি কথাই বলেছে, তোর মা তো সত্যিই কলঙ্কিনী ছিলো।'

'না ছিলো না। মিথ্যে কথা!' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো অলিভার।

একটা বাচ্চা ছেলে, সে কিনা বাড়ির চাকর, তাঁর মুখের ওপর তাঁকে একবকম মিথ্যুক বলে অপবাদ দিলো! মিসেস সোয়ারবেরী রাগে-দুঃখে অভিমানে চোখের জল সম্বরণ করতে পারলেন না।

স্ত্রীর চোখে জল দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে মিস্টার সোয়ারবেরী অলিভারকে বেধড়ক পেটালেন। মিসেস সোয়ারবেরী তাতে খুবই খুশী হলেন।

সেদিন সারা রাত ধরে অন্ধকার কয়লা-কুঠরীতে কাঁদলো বেচারা অলিভার। পরের দিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অলিভার তার সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে মিস্টার সোয়ারবেরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে।

।। তিন ।।

সোয়ারবেরীদের এবং তাঁর লোকজনদের নাগালের বাইরে চলে এসেছে বলে অলিভার নিশ্চিন্ত হলো। তখন সে একটা মাইল-স্টোনের ওপর বসে এই প্রথম সে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসলো, এখন কোথায় গেলে ভালো হয়, আর কি ভাবেই বা সে বাঁচার পথ দেখতে পাবে। যে মাইলস্টোনের ওপর সে বসেছিল, সেটার দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে অলিভার দেখলো তাতে লেখা ছিলো, 'এখান থেকে লণ্ডন শহর সত্তর মাইল দূরে।'

লণ্ডন শহরের নাম দেখেই বালক অলিভারের মনে নতুন করে যেন একটা আশার সঞ্চার হলো। মস্তবড় লণ্ডন শহরে একবার যেতে পারলেই বিশাল জনস্রোতে হারিয়ে যেতে পারবে, তখন কেউ এমন কি মিস্টার বাম্বলও তাকে কখনোই খুঁজে পাবে না। তাছাড়া সেখানে নানান ধরনের কাজের সুবিধে আছে। এই সব কথা ভেবে সে আবার হাঁটতে শুরু করলো।

মাইলের পর মাইল হেঁটে আসার পর সে ভীষণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো, সঙ্গে আনা এক টুকরো রুটিটা খেয়ে কোনোরকমে সে তার ক্ষুধা নিবারণ করলো তখনকার মতো। তার হাতে এখন মাত্র একটা পেনি রয়েছে। কবর দেবার পর এই এক পেনি সে দান হিসেবে পেয়েছিল, সেটাই এখন একমাত্র সম্বল তার। কিন্তু এই শীতের রাত্রে আরও প্রায় পয়ঁষট্টি মাইল পথ সে কি করে পাড়ি দেবে, সেই চিন্তায় সে এখন দিশেহারা। রাতে অন্ধকার নেমে এলে খোলা মাঠের মাঝে একটা খড়ের গাদায় আশ্রয় নিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো।

পরের দিন সকালে খিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছিল। সে তখন বাধ্য হয়ে সেই এক পেনি দিয়ে একটা ছোট পাউরুটি কিনে পেটের জ্বালা খানিকটা কমালো। তারপর আবার পথ চলা, পথ চলাতেই যেন তার আনন্দ। পথ চলে পা দুটো তার ক্ষত-বিক্ষত, তবুও তার পথ চলার বিরাম নেই। পথে এক চলন্ত গাড়ি থামিয়ে তাকে পাহাড়ী চড়াই উৎড়াই পথ পার করে দেবার জন্য কাতর অনুরোধ করলেও চালক ভ্রূক্ষেপই করলো না। গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলার সময়ে অলিভারের সবচেয়ে মুশকিল হলো কুকুরগুলোর জন্যে। একে সে এখানে অপরিচিত। তার ওপর তার ছেঁড়া ময়লা পোশাকে তাকে দেখে গ্রামের ছেলেরা চোর মনে করে তার বিরুদ্ধে কুকুর লেলিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তাড়া করতে শুরু করলো।

তাছাড়া সে যে ভিক্ষে করে খাবে তারও উপায় ছিল না, কারণ রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় সাইনবোর্ডে লেখা ভিক্ষাবৃত্তি বে-আইনি, আইনলঙ্ঘনকারীকে জেলে পাঠানো হবে। একথা জেনে না খেতে পেয়ে মরলেও পরের কাছে হাত পাতার সাহস আর পেলো না সে। যাই হোক, একজন দয়াময়ী বৃদ্ধা এবং একজন গেট-কীপারে অযাচিত ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে অলিভার সে যাত্রায় বেঁচে গেলো। তা না হলে পথেই তাকে মরে থাকতে হতো। এভাবে সাতদিন পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে এক ভোর সকালে অলিভার এসে পৌঁছলো বার্নেট শহরে। তখন তার পাদুটো প্রায় অচল হয়ে গেছে। অগত্যা যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে একটা বাড়ির দোরগোড়ায় বসে পড়লো সে।

এই সময় অদ্ভুত দেখতে একটি ছেলে তার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। পরনে তার ঢিলে ঢালা শতছিন্ন মলিন পোশাক। তোবড়ানো গাল। অলিভারের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অযাচিতভাবে সে তার খোঁজ-খবর নিলো ঃ 'এই ছেলেটা, তোর বাড়ি কোথায় রে?'

'আমার তো কোনো বাড়ি-ঘর নেই।'

ছেলেটি এবার তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বললো, 'বুঝেছি, মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ পেটে কিছু খাবারও পড়েনি বোধহয়।'

এ কথায় অলিভার কেঁদে ফেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ 'না। খিদের জ্বালায় এক পাও আর নড়তে পারছি না।'

'কাঁদিস না, আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে খেতে দেবো। এখন থেকে তোর সব ভার আমি নিলাম, কি খুশী তো?' এই বলে সে অলিভারের হাত ধরে প্রথমে একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে রুটি-মাংস কিনে খাওয়ালো তাকে। এই সময় কথা প্রসঙ্গে ছেলেটি জেনে নিলো, অলিভার একজন অনাথ বালক, খাওয়া-দাওয়ার জায়গা কোথাও নেই ওর। অলিভারের পিঠে হাত দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে বললো, 'চিন্তা করিস না, এই লণ্ডন শহরেই আমি তোর থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবো। কথা দিলাম।'

ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় অলিভারের মন ভরে উঠলো।

সেদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে অলিভার তার সেই নতুন বন্ধু জ্যাক ডকিন্স ওরফে 'ধান্দাবাজ'-এর সঙ্গে লণ্ডন শহরে এসে হাজির হলো। ফিল্ড লেনের কাছাকাছি একটা সরু এদোপড়া গলির ভেতরে একটা ভাঙা জীর্ণ বাড়িতে অলিভারকে নিয়ে এলো জ্যাক। বাড়িতে ঢুকেই খুব জোরে একটা শিস্ দিয়ে উঠলো সে। বাড়ির ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর দিলো, 'কে এলো?'

জবাব দিলো ধান্দাবাজ, 'আমি ধান্দাবাজ। আর তুমি নিশ্চয়ই 'ঢ্যারস'?'

'ধান্দাবাজ', 'ঢ্যারস', মনে হয় এসবই সাংকেতিক বাক্য হবে, অলিভার ভাবলো। পরক্ষণেই গলির অপর প্রান্তে মোমবাতির একটা ম্লান আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেলো, সেই আলোয় একজন পুরুষের মুখ ভেসে উঠলো। সে জানতে চাইলো, 'সঙ্গী ছেলেটি কে?'

'ধান্দাবাজ' অলিভারকে তার দিকে ঠেলে দিয়ে সংক্ষেপে বললো, 'আমাদের নতুন বন্ধু, গ্রীণল্যাণ্ড থেকে আসছে। ফ্যাগিন কি ওপরে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।' জবাব এলো ওপর থেকে।

জ্যাক তাকে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে এলো। নিচু ছাদের নোংরা একটা ঘর। টেবিলের ওপর বোতলবন্দী একটা মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছে। টেবিলের ওপরে এক টুকরো রুটি, মাখন আর একটা ছুরি। জ্বলন্ত উনুনের ওপর সস্প্যানে কি যেন ভাজা হচ্ছে। তার কাছে খুন্তি হাতে একজন বৃদ্ধ ইহুদী দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের এক কোণে একটা আনলায় বেশ কয়েকটা রেশমের রুমাল ঝুলছে। ঘরের মধ্যে কয়েকটা পুরোনো চটের বিছানা পাতা রয়েছে। টেবিলের চারপাশে বসে কয়েকটি উঠতি বয়সের ছেলে পাইপ টানছে আর মদ গিলছে। জ্যাকেরই সমবয়সী হবে তারা।

জ্যাক বৃদ্ধ ইহুদীকে নিচু গলায় কি যেন বললো। তারপর অলিভারকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ফ্যাগিন, এ হলো আমার নতুন বন্ধু অলিভার টুইস্ট।'

ফ্যাগিন আর তার দলের ছেলেরা প্রথম সাক্ষাতেই অলিভারকে তাদের একজন বন্ধু হিসেবে বরণ করে নিলো। এর পর খাবার খেয়ে নিয়ে চটের বিছানায় শুয়ে পড়লো অলিভার, মুহূর্তে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লো অলিভার।

পরদিন সকালে অনেক বেলায় অলিভারের ঘুম ভাঙলো। তবুও ঘুম ভাঙার পরেও ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে তেমনি শুয়ে রইলো অলিভার। মাঝে একবার চোখ খুলে আড়চোখে তাকাতে গিয়ে অলিভার দেখলো, সে আর ফ্যাগিন ছাড়া আর কেউ ঘরে নেই। কিছুক্ষণ পরে অলিভারের নাম ধরে কয়েকবার ডাকলো ফ্যাগিন। কিন্তু এবারেও অলিভারের তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। সে নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমোচ্ছে, এবং এই ফাঁকে সে তার নিজের গোপন কাজ সেরে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কেউ না থাকলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে চুপি সাড়ে কাজটা সেরে ফেলে সবার অজান্তে। আজ অলিভার ঘরে থাকলেও সে ঘুমুচ্ছে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাঠের মেঝে সরিয়ে একটা ছোট্ট খুপরীর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু চোরাই জিনিস বার করে আনলো। ছেলেদের সে আশ্রয় দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের তো আর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। মানুষের মন বলে কথা, বদলাতে কতক্ষণ! তাই সে তার চোরাই জিনিসগুলো ঠিক ঠিক আছে কিনা মিলিয়ে দেখে নিলো হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, কিছুই খোয়া যায়নি, মানে চোরের ওপর বাটপারি করেনি কেউ।

ওদিকে অলিভার পাশ ফিরে আড়াচোখে দেখলো, ফ্যাগিন কতকগুলো সোনার ঘড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি অলঙ্কার ছড়িয়ে রয়েছে তার সামনে। সেগুলো সে একটার পর একটা দেখছে আর বিড়বিড় করে করে কি যেন বলছে। এরই মাঝে বাইরে সামান্য শব্দ হতেই তার কানদুটো খাড়া হয়ে উঠছে। হিসেব মিলে যেতেই সেই সব চোরাই জিনিস যথাস্থানে রেখে দিলো সে। তারপর রুটি-কাটা ছুরিটা হাতে তুলে নিতেই অলিভার ভয়ে আতঙ্কে আঁতকে উঠলো। ফ্যাগিনের নজর এড়াতে পারলো না সে। ছুটে গিয়ে ফ্যাগিন অলিভারের ঘাড় ধরে বিছানা থেকে তুলে ধরে তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'ঠিক করে বল, কতক্ষণ ঘুম থেকে উঠেছিস?' ঘুম-জড়ানো সুরের ভান করে অলিভার উত্তরে বললো, 'এই এখনি!'

'ঠিক বলছিস? দেখ, আমার সঙ্গে চালাকি করলে আখেরে তোর ভালো হবে না বলে রাখছি।'

এবার অলিভার দৃঢ়স্বরে বলো, 'আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি না।'

নেহাতই উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অলিভার প্রাণে বেঁচে গেলো ফ্যাগিনের হাত থেকে। তা না হলে হয়তো নদীতে তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যেতো।

এর পর ফ্যাগিনের হুকুম মতো ঘরদোর সাফ করলো অলিভার। এই সময় জ্যাক ফিরে এলো সেখানে, তার সঙ্গে এলো চার্লি বেটস। গত রাত্রে চার্লিকে এই ঘরে মদ খেতে দেখেছে অলিভার।

চারজনে প্রাতঃরাশ সারতে বসলো অতঃপর। অলিভারের দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ফ্যাগিন জ্যাককে জিজ্ঞেস করলো, 'সকালে ধান্দার কাজে বেরিয়ে কিছু পেলে ধান্দাবাজ?'

'দু'খানা পকেট বই' এই বলে জ্যাক বইদুটো পকেট থেকে বার করে দেখালো, লাল আর সবুজ রঙের বই।

'আর চার্লি তুমি?' ফ্যাগিন এবার চার্লিকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি কেবল চারখানা রেশমের রুমাল পেয়েছি,' এই বলে চার্লি তার পকেট থেকে রুমালগুলো বের করে ফ্যাগিনের হাত তুলে দিলো।

ফ্যাগিন রুমাল গুলো পরীক্ষা করে বললো, 'রুমারগুলো মন্দ নয়। তবে মার্কা দেওয়া রয়েছে দেখছি। মার্কাগুলো তুলে ফেলতে হবে। ছুঁচ দিয়ে কেমন করে মার্কা তুলতে হয়, তা আমরা অলিভারকে শিখিয়ে দিলে আশাকরি কাজটা ভালোভাবেই করতে পারবে।

এই সময় ন্যান্সি আর বেট্ নামে দুটি তরুণী এসে হাজির হলো সেখানে। মাথায় একগাদা চুল, মুখে তারা রঙ মেখেছে। খুব একটা সুন্দরী নয় তারা, তবে দুজনেই বেশ স্বাস্থ্যবতী, হাসিখুশী ভরা মুখ।

তাদের মদ খেতে দেওয়া হলো। তারপর চার্লি তাদের সাংকেতিক ভাষায় বলে উঠলো, 'ক্ষুরে প্যাড লাগাবার সময় হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে ধান্দাবাজ এবং মেয়ে দুজন ফ্যাগিনের কাছে থেকে তাদের রাস্তা খরচের টাকা নিয়ে নতুন কোনো ধান্দায় বেরিয়ে পড়লো।

ওদিকে অলিভার তার নতুন আস্তানার রকম-সকম দেখে খুবই অবাক হয়েছে, বুঝতে পারছে না। তার কাজ হলো রেশমের রুমাল থেকে ছুঁচ দিয়ে মার্কা তুলে ফেলা। অবাক হয়ে সে ভাবে রোজ রোজ এতো রেশনের রুমাল কোথা থেকে আসে। আর কেনই বা মার্কাগুলো তুলে ফেলা হয়। কাজ করতে গিয়ে এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে সে। তখন তার খুব ইচ্ছে হয়, চার দেওয়ালের আবদ্ধ থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত বাতাস বুক ভরে নেয়। কিন্তু বুড়ো ফ্যাগিন যে তাকে বাইরে বেরোতে দেও না।



একদিন চার্লি আর জ্যাকের সঙ্গে বাইরে বেরোবার অনুমতি পেয়ে গেলো। তবে একটা শর্তে, বেরোবার সময় তার সঙ্গীরা তাকে পাখি পড়ানোর মতো বলে দিলো বাইরে বেরিয়ে যা দেখবে তা নিয়ে কোনো কথা সে বলতে পারবে না। বাইরে বেরিয়েই অলিভার অবাক চোখে দেখলো, পথের ধারের দোকানগুলো থেকে আপেল আর পেঁয়াজ চুরি করে পকেট ভর্তি করলো চার্লি। তার পকেটগুলোতে এতো জিনিস ধরে যে, দেখে মনে হচ্ছিল, তার সারা জামাটাই যেন পকেটে ভর্তি।

পথ চলতে চলতে একটা সরুগলির মুখে জ্যাককে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অলিভার কৌতূহল আর চাপতে পারলো না, জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো, থামলে কেন?'

'চুপ!' মুখে আঙুল ঠেকিয়ে জ্যাক ফিসফিসিয়ে বললো, 'ওই লোকটাকে দেখতে পাচ্ছো? ওই যে বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছে?'

'রাস্তার ওপারে, ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো? হ্যাঁ, বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি ওঁকে।' উত্তরে অলিভার বললো।

'বেশ মোটা সাঁসালো মাল উনি!' মন্তব্য করলো চার্লি বেটস।

চার্লি আর ধান্দাবাজ রাস্তা পার হয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ালো। হতবাক অলিভার এর পর কি করবে বুঝতে না পেরে ওদের অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একখানা বই নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছিলেন। অলিভার দেখলো, হঠাৎ জ্যাক একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো তার একটা হাত আলতো করে ঢুকিয়ে দিলো বৃদ্ধের জামার পকেটে। হাতটা বার করতেই একখানা রেশমের রুমাল বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সে চালান করে দিলো চার্লির কাছে। তারপর কাজ হাঁসিল করেই দুজন ছুটতে শুরু করলো। এই প্রথম অলিভার বুঝতে পারলো কোথা থেকে আর কিভাবে ফ্যাগিনের ঘরে রোজ রোজ অতো রেশনের রুমাল আসে। তাহলে এরা চোর, পকেটমার! কথাটা মনে হতেই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো অলিভারের মুখ। ওদের দেখাদেখি সেও প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে দিলো।

ঠিক তখনি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের খেয়াল হতেই পকেটে হাত দিয়ে টের পেলেন, তাঁর রেশমের রুমালটি চুরি হয়ে গেছে। পিছন ফিরে তাকাতেই তিনি দেখলেন একটা বাচ্চা ছেলে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। ভদ্রলোক ব্যাপারটা আন্দাজ করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'চোর! চোর! ধর! ধর ওকে!'

সঙ্গে সঙ্গে সারা রাস্তায় পথচারীরা 'চোর! চোর! ধর! ধর!' বলে ছুটতে শুরু করে দিলো। জ্যাক আর চার্লি পাকা চোর, এ লাইনে অনেকদিন রয়েছে তারা। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝে গেছে,

এ সময়ে ছুটলে সবাই তাদরেই চোর বলে সন্দেহ করবে এবং তাদের তাড়া করবে। তাই তারা দুখানা বাড়ি পেরিয়েই থেমে গেলো এবং স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে থাকলো। কিন্তু বেচারা অলিভার এ লাইনে তার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ মিথ্যে চোর বদমাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তখনও সমানে ছুটে চলেছে। আর তাকে ছুটতে দেখে সবাই তাকে চোর ভেবে তার পিছনে ধাওয়া করলো। কিছু দূরে গিয়েই ধরা পড়ে গেলো অলিভার। এবং সমবেত পথচারীদের ধাক্কায় মুখথুবড়ে পড়ে গেলো সে রাস্তার ওপরে। সবাই তাকে চাক্ষুস করার জন্য উদ্‌গ্রীব। কেউ বললো, 'দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও!' কেউ বা বললো, 'ওকে একটু বাতাস নিতে দাও!' আবার কেউ বা বিদ্রূপ করে বললো, 'চোরের আবার বাতাস!.........'কই সেই ভদ্রলোক কোথায় যাঁর জিনিস চুরি গেছে?' ....'হ্যাঁ, ওই তো আসছেন উনি। বৃদ্ধ মানুষ, ওঁকে পথ ছেড়ে দাও!'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে অলিভারকে দেখে একটু ইতস্তত করে বলেন, 'হ্যাঁ মনে হচ্ছে এই ছেলেটিই! ইস্ বেচারা পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আঘাত সহ্য করতে না পেরে পড়ে গেছে।'

'না না পড়ে যায়নি, আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি। এই দেখুন ওকে ধাক্কা মারতে দিয়ে আমার কব্জিটা কিরকম ছড়ে গেছে।' এই কথা বলে একজন মস্তান টাইপের লোক এগিয়ে এসে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্যালুট ঠুকে দাঁড়ালো বোধহয় কিছু পুরস্কার পাবার আশায়।

বেগতিক দেখে বৃদ্ধ তখন পালাবার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু পারলেন না। গোলমাল দেখে পুলিশ তখন ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো, পুলিশ বৃদ্ধের পথ আগলে ধরলেন। অলিভারকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ তার গায়ে বুটের ঠোক্কর মেরে মুখ খারাপ করলো, 'পাজী বদমাস।' তারপর প্রায় সঙ্গাহীন অলিভারকে নির্দয়ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চললো পুলিশকর্মীরা। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে একরকম বাধ্য হয়েই পুলিশের সঙ্গে থানায় যেতে হলো।

নিয়মমাফিক অলিভার আর বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ 'মাটন হিল' আদালতে গিয়ে হাজির হলো। একজন পালোয়ান গোছের বিরাট গোঁফওয়ালা দারোগাবাবু জানালেন যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও এক মিনিটের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হবে। তারপর দারোগাবাবু অলিভারকে থানার হাজতে পুরে তার দেহ তল্লাশী করলেন, কিন্তু কিছু না পাওয়া সত্ত্বেও তাকে আটক করে রাখলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর নামের কার্ড টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'এতে আমার নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যাঙ্গের মন মেজাজ সেদিন খুবই খারাপ ছিল। কয়েকদিন আগে এই ম্যাজিস্ট্রেটের একটা মামলায় উল্টোপাল্টা রায় দেওয়ার জন্যে একটা দৈনিক কাগজে তাঁর বিরুদ্ধে জোরালো সমালোচনা বেরিয়েছে। তাতে আরও লেখা হয়েছে, 'এই নিয়ে তিনশোবার স্বরাষ্ট্র সচিবের নজরে আনা হলো ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এই ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যাঙ্গ সেই বিতর্কিত প্রবন্ধটাই পড়ছিলেন, পড়তে পড়তে তাঁর চোখ-মুখ ক্রমশ লাল হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, কে তুমি?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর নাম-ঠিকানা লেখা সেই কার্ডটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সেটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ইন্সপেক্টর, এই আপদটা কে?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, হুজুর, এই অধমের নাম ব্রাউনলো। কিন্তু মহাশয়, যে ম্যাজিস্ট্রেট একজন সম্ভ্রান্ত নিরপরাধ, ভদ্রলোককে অকারণ এমন অপমান করেন, তাঁর নামটা কি জানতে পারি?'

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর হাতের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটির বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ আনা হয়েছে?'

দারোগা বললেন, 'হুজুর, নালিশ মিস্টার ব্রাউনলোর বিরুদ্ধে নয়, উল্টে তিনিই বরং নালিশ জানাতে এসেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সব কথা শোনার পর মিস্টার ব্রাউনলোকে হলফ করার জন্য নির্দেশ দিলেন দারোগাকে।



বিচার শুরু হলো। জেরার উত্তরে মিস্টার ব্রাউনলো বললেন, এই ছেলেটি প্রকৃত পক্ষে তাঁর রুমাল চুরি করেছে কিনা, সে কথা তিনি জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। আর ইতিমধ্যে সে যে ভাবে মার খেয়েছে তা যথেষ্ট হয়েছে বলেই তিনি মন করেন। ওদিকে অলিভার কাঠগোড়ায় উঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তখন দারোগার জবানবন্দী নেওয়া হলো। তিনি বললেন, অলিভারের নাম পর্যন্ত জানেন না। নিজে বানিয়ে তার একটা নাম দিলেন, 'টম হোয়াইট'। সামান্য দু'চারটে কথা শুনেই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বায়ে অলিভারকে তিন মাস সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

পুলিশ তখন বেহুঁশ অলিভারকে জেলে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সেই বইয়ের দোকানের মালিক, যার দোকান থেকে মিস্টার ব্রাউনলো বই কিনছিলেন, আদালতে এসে হাজির হলো। সে তখন ম্যাজিস্ট্রেটকে বললো, ওই বাচ্চা ছেলেটি চোর নয় হুজুর, কারণ আমি স্পষ্ট দেখেছি, ছেলেটি সব সময় মিস্টার ব্রাউনলোর কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে ছিল, চুরি করেছে অন্য একটি ছেলে। চুরি করতে দেখে ওই ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভয়ে ছুটে পালাতে যায়।'

ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যাঙ্গের মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে ছিল। তার ওপর বইয়ের দোকানীর এমন কথা শুনে ততোধিক রেগে গিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ঃ 'একথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

হুজুর, আপনার কাছে আমি আগেই আসতাম, কিন্তু দোকান ছেড়ে চট করে আসতে পারিনি।'

ফ্যাঙ্গের কঠোর জেরায় এও জানা গেলো, মিস্টার ব্রাউনলো, যে বইটি নিয়ে এসেছেন, তার দোকান থেকে, তাড়াহুড়োর মাথায় বইটার দাম দিয়ে আসতে পারেন নি তিনি। এ কথা শুনে ফ্যাঙ্গ কড়া ভাষায় মিস্টার ব্রাউনলোকে বিদ্রূপ করতে ছাড়লেন না। এতে মিস্টার ব্রাউনলোকে খুবই লজ্জায় পড়তে হলো।

যাই হোক, সময় মতো বইয়ের দোকানের মালিকের উপযুক্ত সাক্ষের ফলে অলিভার এযাত্রাতেও জেল খাতার দায় থেকে রেহাই পেয়ে গেলো।

তারপর মিস্টার ব্রাউনলো আর বইয়ের দোকানী আদালত থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, পুলিশ বেহুঁশ অবস্থায় অলিভারকে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে। মৃত্যুপথযাত্রী অলিভারের সাদা ফ্যাকাশে মুখ দেখে মিস্টার ব্রাউনলো আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি একটা চলন্ত ভাড়াগাড়িকে থামিয়ে অলিভারকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অতঃপর। বইয়ের দোকানদারকেও সঙ্গে নিলেন।

।। চার ।।

এ যেন স্বপ্ন, ভালো ভালো সব স্বপ্ন; প্রথম স্বপ্ন জেল খাটা থেকে রেহাই পাওয়া; দ্বিতীয় স্বপ্ন, দয়ালু মিস্টার ব্রাউনলোর বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া! এসব স্বপ্ন নয় তো কি? তাই অনেকদিন পরে অলিভার

যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে এখন। তবে শরীরের ক্লান্তি এখনো দূর হয়নি। এখন সে খুবই দুর্বল, রোগা হয়ে গেছে। আর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে সাদা চেহারা নিয়ে নড়তে-চড়তে পারছে না এখন। কোনোরকমে বালিশ থেকে মাথা তুলে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কোথায়? ঘুমোবার আগে এ ঘর তো আমি দেখিনি!'

এক বৃদ্ধা তার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসেছিলেন। অলিভারের গলার আওয়াজ শুনে তিনি তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ঃ চুপ করো বাছা। কথা বললে তুমি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।' এই বলে বৃদ্ধা অলিভারকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন। অলিভার বৃদ্ধার আদর-যত্নে খুবই প্রীত হয়ে নিজের রোগাটে দুর্বল কাঁপাকাঁপা হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধার হাতখানি কাছে টেনে নিয়ে এলো তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। বৃদ্ধা অশ্রু-সজল চোখে নরম গলায় বলে উঠলেন ঃ 'বাছা, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

অলিভার নিজের মায়ের কথা ভাবতে লাগলো। নিজের মাকে সে কখনো চোখে দেখেনি। তবু সে মনে মনে নিজের মায়ের ছবি একটা কল্পনা করে নিলো সে। সে এখন ভাবছে, তার মা যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধার মতো তার মাথার পাশে বসে এমনি সেবা শুশ্রূষা করতেন। বৃদ্ধাকে সে তার মনের কথা খুলে বলে, 'আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন, আমার মা যেন ঠিক আপনার মতো করুণাভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমার মাথার সামনে বসে আছেন।'

বৃদ্ধা মুগ্ধ হলেন তার কথা শুনে! অলিভারের এমন দিল খোলা কথা শুনে তাঁর চোখে জল এসে গেছিলো, চোখ মুছে তিনি এবার অলিভারকে ঠাণ্ডা শরবত খাইয়ে দিলেন। একটু পরেই অলিভার আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো।

তিনদিন পরে অলিভার অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো এবং নিজের থেকে উঠে বসতে সমর্থ হলো। এ অবস্থায় অলিভারকে হুইল চেয়ারে করে বৃদ্ধা নিজের ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। অলিভারকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে বৃদ্ধার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অলিভার বললো, 'একি আপনি কাঁদছেন কেন মা?'

'মা! তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে। আঃ এতদিনে তোমাকে ছেলের মতো পেয়ে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো।' বৃদ্ধা খুশীতে উপছে পড়লেন। চোখের জল মুছে তিনি আবার বললেন, 'ও কিছু নয় বৎস, আনন্দে কেঁদে ফেললাম। তা তোমার যখন ভালো লাগে না আর কাঁদবো না।

অলিভারও গদগদ হয়ে বললো, 'আমার প্রতি আপনার দয়ার কথা আমি কখনও ভুলতে পারবো না।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ও কথা এখন থাক বাছা। তোমাকে আরো সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। তার জন্যে তোমাকে ভালোমন্দ খেতে হবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, মিস্টার ব্রাউনলো আজ সকালে তোমাকে দেখতে আসবেন।'

অলিভারের খাবার গরম করতে করতে বৃদ্ধা লক্ষ্য করলেন, অলিভার দেয়ালে টাঙানো একখানা তৈলচিত্রের দিকে গভীর মনোযোগসহকারে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধার যেন কৌতূহল হলো, জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবি কি তোমার খুব প্রিয়?'

'না, তা ঠিক নয়,' উত্তরে অলিভার বললো, 'জীবনে ছবি তো বড় একটা দেখিনি। আশ্চর্য ছবিতে মহিলার মুখখান কি চমৎকার! আচ্ছা, এটা কার ছবি?'

বৃদ্ধা বললেন, 'সতি কথা বলতে কি, কার ছবি আমিও ঠিক জানি না।'

অলিভার বললো, 'যারই হোক, ছবির চোখদুটি কি গভীর বিষাদে মাখা! এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ছবির ওই মহিলা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে দেখে হঠাৎ ছবিখানা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।'

অলিভারের শেষ কথাগুলো শুনে বৃদ্ধা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর আশঙ্কা হলো, বুঝি বা অসুখের ঘোরে অলিভারের মাথার কোনো গোলমাল হয়ে থাকবে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি অলিভারকে গরম গরম প্রাতঃরাশের খাবার খেতে দিলেন। অলিভার খাওয়া শেষ করতেই ঘরে ঢুকলেন মিস্টার ব্রাউনলো।

অলিভারের ভগ্নস্বাস্থ্য দেখে তিনি খুব মুষড়ে পড়লেন এবং খোঁজ নিলেন, 'তা তুমি কেমন আছো টম হোয়াইট?'

অলিভার মৃদু প্রতিবাদ করে উঠলো, 'আমার নাম টম হোয়াইট নয় স্যার। আমার নাম অলিভার টুইস্ট।'

মিস্টার ব্রাউনলো অবাক চোখে তাকালেন। 'তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টম হোয়াইট বলেছিলে কেন?'

'না আমি তো বলিনি! আমি কেন আমার আসল নাম বদলাতে যাবো?'

মিস্টার ব্রাইনলো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অলিভারের দিকে। না, ও-মুখে মিথ্যার কোনো ছায়া পড়তে দেখা যাচ্ছে না। অলিভারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে একটা অতি পরিচিত মুখ মিস্টার ব্রাউনলোর মনে ভেসে উঠলো। তিনি পালা করে একবার দেয়ালের সেই মহিলার ছবিখানা আর একবার অলিভারের মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধাকে নিচু গলায় বললেন, 'একবার এদিকে তাকিয়ে দেখো বেডুইন, আশ্চর্য, কি অদ্ভুত মিল! অলিভার যেন দেয়ালের ওই তৈলচিত্রটির জীবন্ত মূর্তি!

মিস্টার ব্রাউনলোর অমন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর তাঁর বিস্ময়ভরা মানসিকতার আভাস পেয়ে অলিভার কাঁপা-কাঁপা গলায় কি যেন বলতে গিয়েও পারলো না, জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।



সেদিনের ওই ঘটনার পর থেকে অলিভারের সামনে মিস্টার ব্রাউনলো এবং মিসেস বেডুইন সেই তৈলচিত্রের প্রসঙ্গ ভুলেও আর কখনো তোলেননি। তবে বৃদ্ধার সেবাযত্নে এবং আন্তরিক সৎ ইচ্ছায় অলিভার দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলো। সে এখন বেশ ভালোভাবেই হাঁটা-চলা করতে পারছে।

সপ্তাহখানেক পরে মিসেস বেডুইনের সঙ্গে অলিভার খোসমেজাজে গল্প করছে, এই সময়ে মিস্টার ব্রাউনলো তকে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠালেন। একটু পরেই তাঁর লাইব্রেরী ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা মারলো অলিভার। 'চলে এসো!' ডাক পেয়ে অলিভার ভেতরে ঢুকে দেখলো চারদিকে গাদা গাদা বই আর মিস্টার ব্রাউনলো জানালার ধারে বসে বই পড়ছেন। অলিভারকে দেখেই তিনি তাঁর হাতের বইখানা বন্ধ করে বললেন, 'বসো আমি তোমার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস শুনতে চাই, বলো আমাকে। যেমন কে তোমাকে বড় করেছে? তারপর কি করেই বা চোর-ডাকাত-বদমাসের দলে তুমি ভিড়লে? আর কেনই বা ধরা পড়লে?'

অতীত জীবনের কথা মনে পড়ায় অলিভারের চোখদুটি জলে ভরে উঠলো। তারই মাঝে সে তার দুঃখের কাহিনী শুরু করতে যাবে এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। একটু পরেই ভৃত্য হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললো, 'হুজুর মিস্টার গ্রীমউইগ এসেছেন।'

'ঠিক আছে, ওকে ডেকে নিয়ে আয়। আর চা করে নিয়ে আয়, জানিস তো, চা না খেয়ে সে এখান থেকে নড়তেই চাইবে না।' মিস্টার ব্রাউনলো একটানা কথাগুলো বলে গেলেন।

অলিভার ঘর থেকে চলে যেতে গেলে মিস্টার ব্রাউনলো তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'বসো! সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার বাইরেটা দেখতে রুক্ষ হলেও ভেতরটা খুবই নরম।'

এই সময় লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একটা কমলালেবুর খোসা। ঘরে ঢোকামাত্র তিনি গর্জে উঠলেন : 'এই দেখো কাণ্ড! একবার কমলালেবুর খোসায় আছাড় খেয়ে একখানা পা আমার খোঁড়া হয়ে গেছে। আবার কমলালেবুর খোসা! দেখছি শেষ পর্যন্ত এটার জন্যেই আমার প্রাণটাই চলে যাবে। এ যদি না হয় তো আমি নিজেই নিজের মাথা খাবো।'

মিস্টার ব্রাউনলো হাসলেন। 'অসম্ভব! তোমার মাথাটা এতো বিরাট যে, কারও পক্ষে সেটা চিবিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়।'

'না, অন্য কাউকে খেতে হবে না। আমার মাথা আমি নিজেই খাবো।' এই বলে মিস্টার গ্রীমউইগ আরও কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হলো না হঠাৎ অলিভারকে দেখতে পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা একটু ঘুরিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এ ছোকরাটা আবার কে, আগে তো কখনো দেখিনি!'

উত্তরে মিস্টার ব্রাউনলো বললেন, 'ওর নাম অলিভার টুইস্ট, যার কথা তোমায় আগেই বলেছি মনে আছে তো?'

অলিভার মিস্টার গ্রীমউইগকে সম্ভাষণ জানালো।

মিস্টার গ্রীমউইগ বললেন, 'এরই বুঝি জ্বর হয়েছিল? দাঁড়াও, দাঁড়াও! এই ছোকরাটাই তাহলে কমলালেবু খেয়ে খোসাটা ফেলেছিল। আর ও যদি না ফেলে থাকে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি আমার মাথা খাবো, সেই সঙ্গে ওর মাথাটাও খাবো।'

মিস্টার ব্রাউনলো এক গাল হেসে বললেন, 'না, না, ও কেন ফেলতে যাবে! নাও, তুমি এখন বসো তো।'

মিস্টার গ্রীমউইগ এবার একটু শান্ত হয়ে অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছো অলিভার?'

'আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো!' উত্তরে অলিভার বললো।

মিস্টার গ্রীমউইগ আবার কিছু একটা বিশ্রী মন্তব্য করতে যাচ্ছেন দেখে মিস্টার ব্রাউনলো অলিবারকে সরিয়ে দিলেন মিসেস বেডুইনের কাছে চায়ের খোঁজ করতে। অলিভার চলে যেতেই মিস্টার ব্রাউনলো বললেন, 'ছেলেটি বেশ চমৎকার দেখতে, কি বলো?'

মিস্টার গ্রীমউইগের মুখটা কেমন বিকৃত হতে দেখা গেলো। 'ওসব বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই।' অলিভারকে যে ভালো লাগেনি তা নয়। আসলে তাঁর স্বভাবই হলো, বন্ধু মিস্টার ব্রাউনলোর সব কথার বিরোধিতা করা।

একটু পরেই মিসেস বেড়ুইন চা নিয়ে এলেন, অলিভারও তাঁর সঙ্গে এলো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিস্টার গ্রীমউইগ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছোকরার অতীত কাহিনী কিছু জেনেছো?'

'না, এখনও জানতে পারিনি। আর সেটা জানার জন্যেই তো ওকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।' এর পর মিস্টার ব্রাউনলো অলিভারের দিকে ফিরে বললেন, 'অলিভার, তুমি কাল সকাল দশটায় আমার কাছে আবার এসো, কেমন?'

'ঠিক আছে স্যার,' এই বলে অলিভার তার নিজের ঘরে চলে গেলো।

মিস্টার গ্রীমউইগ গলা নামিয়ে মিস্টার ব্রাউনলোকে বললেন, 'আমি বাজী ধরে বলছি, ও আর

তোমার কাছে কখনোই নিজের জীবনের কলঙ্কের কাহিনী বলতে আসবে না। ছোকরাটা দারুণ ধুরন্দর। ও তোমাকে বারবার ধাপ্পা দিচ্ছে।'

'আর আমিও জোর গলায় বলছি,' মিস্টার ব্রাউনলো দৃঢ়স্বরে বললেন, 'অলিভার আমাকে ধাপ্পা দিতেই পারে না।'

'বেশ তো, যদি ধাপ্পা না দেয় আমি............'উত্তেজনায় কথাটা শেষ করতে পারলেন না মিস্টার গ্রীমউইগ। তাঁর কাঁপাকাঁপা হাত থেকে লাঠিটা পরে গেল।

'আমি ওর সততা, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতার তরফে বাজী রাখছি আমার মাথা,' এই বলে রাগে উত্তেজনায় যেন গরম জলের মতো টগবগ করে ফুটতে থাকলেন মিস্টার গ্রীমউইগ।

মিস্টার ব্রাউনলো অনেক কষ্টে তার রাগ দমন করে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালেই হাতে হাতে তার ফল পাওয়া যাবে।'

এই সময় এক বাণ্ডিল বই হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস বেডুইন। মিস্টার ব্রাউনলোর ফরমাস মতো সেই দোকানী বইগুলো তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মিসেস বেডুইন চলে যাচ্ছিলেন, মিস্টার ব্রাউনলো তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে লোকটি এই বইগুলো এনেছে তাকে অপেক্ষা করতে বলো।'

'কিন্তু স্যার, বইগুলো দিয়েই সে চলে গেছে!'

'সেকি! বইগুলোর দাম যে দেওয়া হয়নি এখনো। তাছাড়া কতকগুলো বই বেশী দিয়েছে, সেগুলো ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া দোকানী এই বইগুলোর দাম বাবদ সাড়ে চার পাউণ্ড পাবে।'

সুযোগ পেয়ে ব্যঙ্গ করে মিস্টার গ্রীমউইগ বলেলন, 'কেন, তোমার বিশ্বাসী ছেলে অলিভার তো রয়েছে, তাকে দিয়ে বইয়ের দাম আর বাড়তি বইগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিলেই তো পারো। তুমি তো জানো, সে ঠিক পৌঁছে দেবে।'

মিস্টার গ্রীমউইগের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অসহ্য লাগলো মিস্টার ব্রাউনলোর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অলিভারকে ডেকে পাঠালনে। সে আসতেই তিনি তাকে বললেন, 'সেই বইয়ের দোকান তোমার চেনা, তাই না? তা তুমি এই বইগুলো তাকে ফেরত দিয়ে আসতে পারবে অলিভার?'

'হ্যাঁ, কেন পারবো না, আমি এখনি যাচ্ছি,' উত্তরে অলিভার বললো।

হ্যাঁ তাই করো। আর দোকানদার আমার কাছে সাড়ে চার পাউণ্ড পাবে। পাঁচ পাউণ্ডের এই নোটখানা নিয়ে যাও, তার কাছ থেকে দশ সিলিং ফেরত আনতে হবে।'

বই টাকা নিয়ে অলিভার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মিসেস বেডুইন সদর দরজা পর্যন্ত তাকে পৌঁছতে গেলেন। অলিভারের গমন পথের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের মনে বললেন, 'ওকে চোখের আড়াল করতে আমার খুবই কষ্ট হয়। বেচারা!'

মিস্টার ব্রাউনলো তাঁর কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিনিট কুড়ির মধ্যেই অলিভার ফিরে আসবে।'

সে কথা শুনে মিস্টার গ্রীমউইগ বললেন, 'সত্যি করে বলো তো, ছোকরা ফিরে আসার আশা তুমি করো? পরনে তার এক সেট নতুন পোশাক, এক বাণ্ডিল দামী বই আর নগদ পাঁচ পাউণ্ড হাতে পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এখন ও সোজা ওর পুরনো চোর পকেটমার ইয়ার বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে তোমাকে উপহাস করবে। আমি আবার বলছি, ওই ছোকরা যদি কখনো এ বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে আমি আমার মাথা খাবো!'

পর পর দুই বন্ধু দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে চুপ করে মুখোমুখি বসে রইলেন। এর পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো, তখনো দুই বন্ধু তেমনি নীরবে বসে রইলেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দুজনেই তখন ভাবছেন, অলিভার কোথায়? তবে কি সে..........

ওদিকে সন্ধ্যাবাতি জ্বেলে সদর দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন বেদুইন বেড়ুইন। চাকর-বাকরেরা পারাপারি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসছে, তবুও অলিভারের কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। এমন কি সেই বইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বই ফেরত দেওয়া দূরের কথা অলিভার তার দোকানে আদৌ যায়নি।

ওদিকে দুই বৃদ্ধ মুখোমুখি বসে তখনও অলিভারের ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে বুঝি বা তারা চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছেন।

।। পাঁচ ।।

'চোর! চোর! ধর! ধর!' শেষ পর্যন্ত অলিভারকে জনতার হাতে ধরা পড়তে দেখে চার্লি আর জ্যাক ফিরে এলো ফ্যাগিনের আস্তানায়।

তাদের সঙ্গে অলিভারকে দেখতে না পেয়ে ফ্যাগিন তাদের দিকে চোখ লাল করে জিজ্ঞেস করলো, 'অলিভার কোথায়?'

ফ্যাগিনের শিষ্য উঠতি-চোর-পকেটমাররা ওস্তাদের অমন রাগ দেখে ভীষণ ভয় পেলে। একটা কথাও বলার মতো সাহস পেলো না তারা।

জ্যাকের জামার কলার টেনে ধরে ফ্যাগিন বললো, 'বল, কি করেছিস তোরা ওই ছেলেটার? তাড়াতাড়ি বল তা না হলে গলা টিপে এখনি তোকে খতম করে ফেলবো।'

ফ্যাগিন এক কথার লোক, যে কথা সে মুখে বলে কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। ওরা ওদের ওস্তাদকে বেশ ভালো ভাবেই জানে। তাই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো চার্লি বেটস।

'চুপ করে রইলি কেন, বল শীগ্‌গীর!' ফ্যাগিন তাড়া দিলো।

জ্যাক ভয়ে ভয়ে বললো, 'পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সে। বললাম তো, এবার আমাকে ছেড়ে দাও।' এই বলে সে এক ঝটকায় তার ঢিলে জামাটার ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে এলো। জামাটা ফ্যাগিনের হাতেই রয়ে গেলো। তারপর সে একটা খুন্তি হাতে নিয়ে ফ্যাগিনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো।

চোখের পলক ফেলার আগেই সরে দাঁড়ালো ফ্যাগিন এবং পরক্ষণেই টেবিল থেকে মদের বোতল তুলে নিয়ে জ্যাকের দিকে তাক্ করলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে চার্লির গলা-ফাটানো চিৎকারে বিরক্ত হয়ে তাকে লক্ষ্য করেই সে ছুঁড়ে মারলো সেটা।

বোতলটা লুফে নিয়ে কে কেন হেঁড়ে গলায় বলে উঠলো, 'কে, কে ছুঁড়লো রে এটা, এতে নেহাতই মদ আছে বলে পার পেয়ে গেলো সে, নইলে তাকে আজ খুন করে ছাড়তুম!' কথা বলতে বলতে বছর পঁয়তিরিশের মস্তান টাইপের একটা লোক, তাকে অনুসরণ করে এলো সাদা রঙের একটা লোমশ কুকুর। ঘরে ঢুকে ফ্যাগিনকে দেখে রাগত স্বরে বলে উঠলো, 'এই যে অর্থপিশাচ, নিরীহ ছেলেগুলোর ওপর আবার জুলুম করছিস? এরা কেন যে তোকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে, তা ভেবে আমি অবাক হই।'

ওদিকে আগন্তুক বিল সাইকসকে দেখেই ফ্যাগিনের চড়া মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেলো। সাইকসকে দু'তিন গ্লাস মদ খাইয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত করে ফেললো ফ্যাগিন। মেজাজ ঠাণ্ডা হতেই সাইকস একবার জ্যাকের কাছ থেকে অলিভারের সব খবর এক এক করে জেনে নিলো।

ফ্যাগিন তার আশঙ্কার কথা বললো, 'আমার ভীষণ ভয় করছে, হয়তো সে এর মধ্যে এখানকার

সব গোপন খবর পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। আর তা যদি হয় তাহলে আমাদের সামনে এখন মহাবিপদ!'

সাইকস পরামর্শ দেয় ঃ 'থানায় কি ঘটেছে, কাউকে সেখানে পাঠিয়ে প্রকৃত ঘটনার খবরটা সংগ্রহ করে আনতে হবে।'

কিন্তু স্বইচ্ছায় পুলিশের খপ্পরে যেতে কেউ রাজী নয়। ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলো দুটি মেয়ে, ন্যান্সি আর বেট। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফ্যাগিনের অনুরোধে ন্যান্সি অলিভারের খবর নিয়ে আসতে রাজী হয়ে গেলো।

ন্যান্সির রূপ-রেখা হলো এই রকম ঃ এক হাতে একটা ঝুড়ি এবং অপর হাতে একটা বড় চাবি। কাঁতে কাঁদতে পথে নেমে সে ইনিয়ে বিনিয়ে মৃদু চিৎকার করতে থাকলো ঃ 'বলুন আপনারা, তার কি হলো? কে জানে তাকে কোথায় কে ধরে নিয়ে গেছে! আপনারা তার কোনো খোঁজ কি জানেন? জানলে দয়া করে বলবেন, আমার আদরের ভাইটি এখন কোথায় কার কাছে আছে?'

এভাবে সারাটা পথ চিৎকার করতে করতে ন্যান্সি পুলিশ-কোর্টে গিয়ে দারোগাবাবুর পায়ে আছড়ে পড়লো। দারোগাবাবু তার মুখ থেকে সব শুনে বললেন, অলিভারকে যে সহৃদয় ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন, তাঁর সঠিক ঠিকানা তিনি জানেন না। তবে সম্ভবত তিনি পেন্টনভিলে যে থাকেন, এটুকু বলতে পারেন, কারণ সেদিকেই তিনি গাড়ি চালাতে হুকুম করে ছিলেন কোচোয়ানকে।

যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেলো। ন্যান্সি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ফ্যাগিনকে এই খবরটা দিলো। এর পর ফ্যাগিন অলিভারের সন্ধান পাওয়ার জন্যে কড়া নির্দেশ দিলো তার সাগরেদদের। যে করেই হোক, জীবিত কিংবা মৃত যেভাবেই হোক অলিভারকে তার কাছে ফিরিয়ে আনা চাই। পুলিশের কাছে অলিভার তার আস্তানার ব্যাপারে কতো কি ফাঁস করে দিয়েছে, তা না জানা পর্যন্ত ফ্যাগিন আর তার দলের কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। শুধু তাই নয়, পুলিশের ভয়ে ফ্যাগিন তার পুরনো আস্তানা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিলো অন্য এক গোপন জায়গায়। সেই লুকনো বাক্সটা সঙ্গে নিতে ভুললো না সে, যার মধ্যে দামী দামী চোরাই মাল রেখে দিয়েছে সে তার সাগরেদদের নজর এড়িয়ে।



তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। অলিভারের কোনো খোঁজ নেই তখন পর্যন্ত। লিটল ম্যাপ্রন-হিলের জঘন্য নোংরা অঞ্চলের একটা শুড়ীখানার হলঘরে বসেছিল বিল সাইকস। ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো চিন্তায় ডুবে আছে সে। তার পায়ের কাছে বসে সেই সাদা লোমওয়ালা কুকুরটা জিভ দিয়ে নিজের মুখের ঘা চাটছিল আর মনিবের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে তার বর্তমান মনের খবরটা জানার চেষ্টা করছিল।

সাইকসের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল কুকুরটা, তাই সে তাকে ধমক দিয়ে গর্জে উঠতেই সে দু'একবার হলঘরে ঘুরপাক খেয়ে অবশেষে বাইরে বেরিয়ে গেলো। আর ঠিক সেই সময় সেখানে এসে হাজির হলো ফ্যাগিন! তাকে দেখা মাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো সাইকস ঃ 'এই যে ব্যাটা চোরের সর্দার! কুত্তাটাকে যেই তাড়িয়ে দিলাম অমনি তুই এলি? দেখ, আমার কুকুরের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবি না, বুঝলি!'

ফ্যাগিন ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'আচ্ছা বিল তোর কি হয়েছে বল তো? মেয়েটিকে ঠিক এখনো পোষ মানাতে পারিসনি?'

ফ্যাগিনের মুখে মেয়েটা মানে ন্যান্সির নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো সাইকস। ফ্যাগিনের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় ধরে বলে উঠলো, 'ফের ওর নাম মুখে এনেছিস কি রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে, বুঝলি শয়তান!'

ফ্যাগিন অনেক চেষ্টা করেও সাইকসের মনের খবর জানতে পারে না। তবে এ কথা ঠিক যে, তার দলের মধ্যে একমাত্র সাইকসই হচ্ছে সবার সেরা বুদ্ধিমান, কিন্তু বড়োই জেদী একগুঁয়ে সে। কথার নড়চড় হয় না। আর সে যা না করতে চাইবে, কোনোমতেই তাকে দিয়ে তা করানো যাবে না। এই রকম একজন ভয়ঙ্কর বেপরোয়া লোককে দিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কতো যে, চুরি-ডাকাতির কাজ করিয়েছে ফ্যাগিন তার ঠিক নেই। তার কাছে মানুষ খুন করা আর কুকুর-বেড়াল খুন করা একই ব্যাপার! মানুষের রক্ত দেখলে হিংস্র ক্ষুধাতুর বাঘের মতো তার জিভটা লক্‌লক্ করে ওঠে। তাই মানুষ খুন করার কাজটা সে নেহাতই মামুলি বলে মনে করে। আর তাই কি ফ্যাগিন তার দলের সেরা সুন্দরী মেনে ন্যান্সিকে সাইকসের হাতে তুলে দিয়েছে তার ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে। ফ্যাগিন ভেবেছিল সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে এলে সাইকসের রুক্ষ ভাব কেটে যাবে এবং মেজাজ খুশ হবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য বদলালো না সে একটুও।

সেই সাইকসের মেজাজ গরম দেখে ফ্যাগিন সরে পড়বার মতলব করছে, এমন সময় বাইরে হৈ-চৈ শোনা গেলো। সাইকস চিৎকার করে উঠলো, 'কি ব্যাপার ফ্যাগিন, বাইরে এতো চিৎকার কিসের?'

ফ্যাগিনেরও ওই একই প্রশ্ন, ব্যাপারটা বোঝবার আগেই এই সময় বার্নি নামে এক ইহুদী ছোকরা সেখানে এসে হাজির হলো। ফ্যাগিন তাকে বললো, 'এখানে আমাদের আর কেউ আছে নাকি?'

'কই না তো!'

এবার সাইকস তাকে বললো, 'তাহলে বাইরে এতো হৈ চৈ কিসের? যা বাইরে গিয়ে ব্যাপারটা এখনি দেখে আয় তো!'



ঠিক সেই মুহূর্তে সেখান দিয়ে অলিভার মিস্টার ব্রাউনলোর বইগুলো দোকানদারকে ফেরত দিতে যাচ্ছিল। ফ্যাগিনের আস্তানা যে এখানেই তা তার ঠিক জানা ছিল না। এই সময় হঠাৎ একটি মেয়ে, 'ভাইটি আমার এতদিন কোথায় ছিলে?' বলে গলা ফাটানো কান্নার সুরে চিৎকার করতে করতে অলিভারের সামনে ছুটে এসে সোহাগ করে এক হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

অলিভার তো স্তব্ধ, হতবাক। কোনোরকমে সামলে নিয়ে সে প্রতিবাদ করে উঠলো, 'এ কি হচ্ছে, ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে!'

তাকে ছাড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না মেয়েটির মধ্যে। সে তার অপর হাতে ধরে রাখা ঝুড়ি আর চাবি ঝাঁকিয়ে আরো জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ওরে আমার সোনার ভাইরে। ঈশ্বরের অসীম দয়া, তিনি তোকে পাইয়ে দিয়েছেন আমাকে, এখন তোকে ছাড়ি বললেই কি ছাড়তে পারি? কতো যে তোকে খুঁজেছি অলিভার! চল, ভাই চল, আর রাগ-অভিমান করে আমার কাছ থেকে দূরে থাকিস না, বাড়ি ফিরে চল ভাইরে আমার!'

হৈ-হট্টগোলের আর চিৎকার শুনে রাস্তায় লোক জমে গেলো। সবার কৌতূহল, প্রশ্ন একটাই ঃ 'ব্যাপার কি?'

অলিভার কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো, 'এই দেখুন না, এ আমার ভাই অলিভার। মাসখানেক আগে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে চোর-বদমায়েসের দলে ভিড়ে গেছে। অনেক খোঁজ খবর করার পর আজ আমি ওর খোঁজ পেলাম। তারপর সে আবার অলিভারের হাত

ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ভাই অলিভার, যা হওয়ার হয়ে গেছে, তুই যা চেয়েছিলি তাই হবে, তোর ইচ্ছে মতো তোকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না! বাড়ি ফিরে চল ভাই। তোর কথা ভেবে আর কাঁদতে কাঁদতে মা একটা কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে বসেছে। তাই মায়ের কথা ভেবে ফিরে চল ভাই।'

মেয়েটির কান্না-জড়ানো দুঃখের কথা শুনে পথচারীরা অলিভারের ওপরেই দোষারোপ করতে থাকলো। একজন তো তার ওপর চড়াও হয়ে এসে হুকুমের সুরে বললো, 'এই অবাধ্য ছেলে, দিদির কথা শুনে ওর সঙ্গে এখনি বাড়ি ফিরে যা!' আবার কেউ বা বললো, 'হতভাগা, বাউণ্ডুলে ছেলে কোথাকার!'

অলিভার তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'আমি এই মেয়েটিকে আদৌ চিনি না। বিশ্বাস করুন আপনারা, আমার কোনো বোন বা বাপ-মা নেই। আমি একা, নিঃসঙ্গ আর অনাথ। আমি পেণ্টনভিলেয় থাকি।'

মেয়েটিও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে নিজের পক্ষে এবার জনতার আদালতে জোর সওয়াল করলো, 'শুনুন মশাইরা ও কেমন নির্জলা মিথ্যে কথা বলছে, শুনুন!'

বিস্মিত অলিভার এই প্রথম মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠে বললো : 'আরে তুমি ন্যান্সি না?'

এই সুযোগে ন্যান্সি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'আপনারা নিজের কানে শুনলেন তো মশাইরা, ও যে আমাকে বেশ ভালো করেই চেনে, নিজের মুখেই ও তা স্বীকার করলো। এখন ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। তা না হলে আমাদের বাবা মা ওকে দেখতে না পেয়ে শেয়ে হয়তো একদিন মরেই যাবেন। আপনারা কি তাই চান? নাকি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর ছেলেমানুষি বন্ধ করে আমাদের মা-বাবার প্রাণ রক্ষা করবেন?'

এই সময়ে পাশের সামনের একটা শুঁড়ীখানা থেকে বিল সাইকস ছুটে বেরিয়ে এলো, আর তাকে অনুসরণ করলো তার সেই সঙ্গী সাদা কুকুরটা। ঘটনাস্থলে এসেই সে অলিভারকে হুকুম করলো, 'এই হতভাগা অলিভার, শীগ্‌গীর বাড়ি ফিরে চল, তোর মা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।'

'না, আমি যাবো না, আমার কোনো মা-বাবা নেই, কোনো বোন নেই........'

অলিভারকে বাধা দিয়ে সাইকস তার হাত থেকে বইয়ের বাণ্ডিলটা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত হানলো। দুর্বল অলিভার আঘাতটা সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে পড়লো। তার বেহুঁশ হওয়ার সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করল ন্যান্সি আর সাইকস। তারা তাকে একরকম কোলে করে নিয়ে গেলো এক নোংরা গলির একটা জরাজীর্ণ ভাঙা বাড়ির মধ্যে।

অলিভারকে দেখে 'ধান্দাবাজ' মুখ বিকৃত করে বললো, 'এই যে বাছা, এতোদিন পরে আমাদের কথা মনে পড়লো'? ফ্যাগিন, দেখো, দেখো, তোমার হারানো ধন আবার ফিরে এসেছে। এসো ওর অনারে সেলিব্রেট করা যাক।'

ওদিকে চার্লি শব্দ করে হেসে উঠলো, 'ওরে খোকনসোনাকে দেখে, আমার যে ভীষণ নাচতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু স্টেজ কোথায়?' বলে আবার এক চোট হেসে উঠলো। ধান্দাবাজ তার নামের সদ্ব্যবহার করতে ধান্দায় নেমে পড়লো অলিভারের জামা ও প্যান্টের পকেটগুলো হাতড়াতে থাকলো। আর চার্লি মন্তব্য করলো, 'দেখ কি দামী পোশাকই না পরেছে ছেলে আমার! আবার হাতে একগাদা বই! একেবারে ফিটফাট শিক্ষিতবাবু যেন!' ফ্যাগিন কপট-প্রশংসা করতে গিয়ে অলিভারকে স্যালুট করে বললো, 'দেখো বাছা, তোমার উন্নতি দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমার এমন দামী দামী পোশাক যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্যে ধান্দাবাজ আর এক সেট পোশাক তোমাকে দেবে। তা তুমি যে আজ তোমার পুরনো

আস্তানায় ফিরে আসছো, চিঠি লিখে কিংবা লোক পাঠিয়ে আমাকে জানাতে তো পারতে! তাহলে তোমার রাতের খাবারটা গরম করে রাখতে পারতাম।'

ধান্দাবাজ তার ধান্দা করতে গিয়ে অলিভারের পকেট থেকে পাঁচ পাউণ্ডের একটা নোট বার করতেই ফ্যাগিন সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো। তা দেখে সাইকস এক লাফে ফ্যাগিনের কাছে এসে বললো, 'এ টাকা আমার ফ্যাগিন, আমাকে দাও!'

'না বিল, তাকি করে হয়? এ টাকা আমার। তুমি বরং ওর হাতের বইগুলো নাও।'

কিন্তু সাইকস তার প্রস্তাব মানতে নারাজ। তার সাফ জবাব ঃ 'টাকা আমাকে না দিলে অলিভারকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।' কথার ফাঁকে ফ্যাগিনের হাত থেকে পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানা ছোঁ মেরে কড়ে নিলো সাইকস।

অলিভার অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো, 'ওই টাকা আর বইগুলো আমার নয়, আসলে ওগুলো আমার আশ্রয়দাতার। উনি আমাকে কঠিন রোগ থেকে বাঁচিয়ে তোলেন। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, এখানে আমাকে রাখতে চাও আপত্তি করবো না, কিন্তু এই টাকাটা আর বইগুলো তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। তা না হলে তিনি আমাকে চোর ভাববেন।'

কথাটা শেষ করার পরেই ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ফ্যাগিন আর তার সাগরেদরা কালবিলম্ব না করেই অলিভারের পিছু ধাওয়া করলো।

ওদিকে সাইকস তখন ভাবছে তার কি করা উচিত, ভেবে পায় না। হঠাৎ তার সেই সাদা কুকুরটার ওপর নজর পড়লো। কুকুরটা ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। তার মনিব সাইকসের হুকুম পেলেই কুকুরটা ঠিক অলিভারকে খুঁজে বার করে তার টুঁটি চেপে ধরতে পারে। আর এর থেকেই সাইকসের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো, ছটফটিয়ে উঠলো সে।

সাইকসের মনের কথা টের পেয়ে ন্যান্সি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। তারপর সাইকসের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো ঃ 'বিল, কুকুরটাকে চেন লাগিয়ে রাখো তা না হলে বাচ্চা ছেলেটাকে সে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

'হ্যাঁ, সেটাই হবে ওর উপযুক্ত শাস্তি। আমাকে অযথা বাধা দিতে এসো না, দিলে ফল ভালো হবে না, তোমাকে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।'

'তা দিতে হয় দেবো। আমি তোমাকে আবার স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমাকে খতম না করা পর্যন্ত তুমি অলিভারের পিছনে কুকুরকে লেলিয়ে দিতে পারবে না।'

সাইকস এবার তৎপর হলো। প্রথম ধাক্কাতেই ন্যান্সিকে ঘরের মেঝের ওপর ফেলে দিলো সে। আর ঠিক এই সময়েই অলিভারকে ধরে নিয়ে এলো ফ্যাগিনের দলের লোকেরা। ফ্যাগিন এগিয়ে গিয়ে অলিভারের ঘাড়ে কয়েকটা ঘুষি চালিয়ে এবং পাছায় বেমক্কা লাথি মেরে তাকে মেঝেতে ফেলে দিলো। এখানেই সে থেমে থাকলো না। আরো নির্দয় হয়ে উঠে সে এবার একটা ভারী লাঠি হাতে নিয়ে এবার অলিভারকে মারতে উদ্যত হলো। কিন্তু এবারেও ন্যান্সি বাধা দিলো ফ্যাগিনকে।

ন্যান্সি চোখ লাল করে সাফ জানিয়ে দিলো ফ্যাগিনকে,' 'আমিই অলিভারকে ধরে এনে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি। তবে তাই বলে মনে করো না, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তার ওপর তোমাদের জুলুম দেখবো! আমার প্রাণ থাকতে তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেবো না, মনে রেখো।'

'একি ন্যান্সি,' ফ্যাগিন ফুঁসে উঠলো, 'তুমি বেশ ভালো অভিনয় করতে পারো তো!'

ন্যান্সি তার কথায় তোয়াক্কা না করে বললো, 'এ আমাব অভিনয় নয়, অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব! তোমার

অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়! আর তোমাকে বলে রাখি, ওই দুধের শিশুটার ওপর কোনোরকম জুলুম যদি করো তোমার আখেরে ভালো হবে না কিন্তু।'

ন্যান্সির শেষ কথা শুনে সাইকস এবার লাল চোখ করে বলে উঠলো, 'এ তুমি কি বলতে চাও ন্যান্সি?'

ন্যান্সিও ততোধিক রাগতস্বরে বললো, 'বাচ্চা ছেলেটার ওপর তোমরা অমানুষিক অত্যাচার করে যাবে আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করবো ভেবেছো? না, এর পর আমি ওর গায়ে কাউকে হাত তুলতে দেবো না।'

ন্যান্সির এ হেন হুমকি শুনে সাইকস আর মাথা ঠিক রাখতে পারলো না। কড়া ধমক দিয়ে সে বললো, 'ন্যান্সি, আর একটা কথাও বলবি না, নইলে তোর মুখ কি করে বন্ধ করতে হয় আমি দেখিয়ে দেবো।'

সাইকসের হুমকিতে ন্যাসি কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। বরং উল্টে সে আরো বেশী গলা চড়িয়ে বলতে থাকলো, তোমার ক্ষমতার দৌড় যে কতখানি তা আমার বেশ ভালোই জানা আছে। তোমার ওই কুত্তা আর তোমার মধ্যে তফাত কিছু নেই, যতো সব অপদার্থের দল!'

সাইকস এবার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লো। ন্যান্সিকে মারতে ছুটে গেলো তার দিকে। 'একটু সামলে কথা বল, তা নাহলে আজই তোর শেষ দিন, জেনে রাখ!'

ন্যান্সিও ফুঁসে উঠলো, 'মরতে আমি ভয় পাই না। আমাকে খুন করবে, করো আমাকে খুন! আর তোমরা সব অকর্মন্যের দল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো শয়তানের দল।'

সাইকস হতবাক। ভেবে পায় না, রণচণ্ডী ন্যান্সির সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করবে।'

এরই মধ্যে ফ্যাগিন একটু সাহস দেখাতে এগিয়ে এলো, ওদের ঝগড়ার ইতি টানতে সে ভাববাচ্যে বললো, 'এসব কি হচ্ছে, ভদ্রভাষায় কথা বলো তোমরা, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, তোমাদের বস্তি-বাড়ি নয়!'

এ কথায় ন্যান্সির রাগ এবার চরমে উঠে গেলো। সে এবার সাইকসকে ছেড়ে ফ্যাগিনের দিকে তেড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ভদ্রভাষায় কথা বলতে বলছিস? কচিবয়সে আমাকে চুরি করে এনে এই জঘন্য আস্তাকুঁড়ের পাপ-ব্যবসার মধ্যে আমাকে ঠেলে দিয়েছিলি যখন, তোর তখন মনে হয়নি এ কাজ কোনো ভদ্রলোক করে না। উঃ ভাবতেও এখন আমার গা ঘিন-ঘিন করে ওঠে, মরণ না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমাকে থাকতে হবে তোর মতো শয়তানের জন্যে!'

'থাম!' ফ্যাগিন তাকে বাধা দিয়ে গলা আরও চড়িয়ে বললো, 'আর এ ধরনের একটা কথাও নয়! যদি মুখ বন্ধ না করিস, তাহলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবো তোর, বুঝলি!'

ন্যান্সি এবার প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ফ্যাগিনের দিকে তেড়ে গেলো তাকে মারবার জন্যে। কিন্তু ঠিক সময়ে সাইকস তার হাতের কব্জি ধরে এমন একটা মোচড় দিলো যে, ন্যান্সি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

তখনকার মতো ঝগড়া-ঝাঁটি এভাবে মিটে গেলেও অলিভারের জীবনে এলো এক ঘন আঁধার, যেখান থেকে তার বেরিয়ে আসা অসম্ভব বলেই মনে হলো।



পরের দিন দুপুরে, সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ফ্যাগিন অলিভারকে একা পেয়ে তাকে পাখি পড়ানোর মতো বোঝাবার চেষ্টা করলো এই বলে যে, বেইমানি করার শাস্তি ভয়ঙ্কর। তাই সে সব কিছু

ভুলে গিয়ে যদি আগের মতো দলের কাজকর্ম ঠিক-ঠাক করে, তাহলে ফ্যাগিন আর অন্য সাগরেদেরা সবাই তাকে তাদের বন্ধুর মতোই মনে করে ভালো ব্যবহার করবে তার সঙ্গে। অন্যথা সে যদি এখান থেকে পালাবার মতলব করে কিংবা কোনোরকম গোলমাল পাকায়, তাহলে সে তাকে খতম করে তার মৃতদেহ এমন এক জায়গায় চালান করে দেবে, কাকপক্ষীও জানতে পারবে না। অলিভারকে সে আবার এও বলে, আগে অনেক অবাধ্য ছেলেকে সে এভাবেই খতম করেছে। এভাবে অলিভারকে শাসিয়ে বাইরে থেকে তার ঘরে তালাচাবি দিয়ে বেরিয়ে গেলো ফ্যাগিন।

সপ্তাহখানেক এভাবে তালা বন্ধ অবস্থায় তাকে তালাবন্ধ ঘরে থাকতে হলো। তারপর একদিন তার ঘরে আর তালা পড়লো না। অলিভার তখন মুক্ত, একদিন ঘরের বাইরে এসে চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখলো সে। বাড়িটা খুবই পুরনো, আর জানালা-দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকে। এই বাড়িতেই অলিভার দেখলো, সদ্য জেলখেটে আসা আঠারো বছরের এক যুবক চিটলিংকে। এই চিটলিং আবার অলিভারকে শুধু চুরি-ডাকাতির গল্পই শোনাতো সময় পেলেই।



কয়েকদিন পরে একটা জরুরী কাজে বিল সাইকসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো ফ্যাগিন। ন্যান্সির ব্যাপারে সেদিন মনোমালিন্য হওয়ায় আগের মতো তেমন খাতির-যত্ন করলো না ফ্যাগিনকে। অন্য সময় হলে ফ্যাগিন তাকে তার এই গাফিলতির জন্য কৈফিয়ত তলব করতো। কিন্তু আজ তার মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত। যে করেই হোক এক বস্তা মোহরের লোভে কাজটা তাকে হাতে নিতেই হবে। কিন্তু সে কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হলে যে ন্যান্সির সাহায্যের প্রয়োজন, তাতে ফ্যাগিনের কোনো সন্দেহ নেই।

ফ্যাগিন বললো, 'টবির ধারণা, একটা ছোট ছেলে পেলে তুমি নাকি কাজটা সারতে পারো কথাটা কি ঠিক বলে তোমার মনে হয়?

'কাজটা হাতে নেওয়া ঠিক হবে না,' উত্তরে সাইকস বললো। 'টবি আর আমি দুজনেই বাড়িটা কাল দেখে এসেছি। তাতে মনে হয়েছে, সদর দরজা বেশ পাকাপোক্ত, মজবুত, আর দেওয়াল রীতিমতো পাকা। তাই আমার আশঙ্কা, কোনো দিক দিয়ে ওই বাড়িতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না।'

''যতো অসম্ভবই হোক না কেন, কাজটা তোমাকে সম্ভবপর করে তুলতেই হবে বিল,' ফ্যাগিন জোর দিয়ে বললো, 'কারণ আমার বিশ্বাস, এতে বেশ ভালোরকম লাভ হবার আশা আছে।'

'আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি,' সাইকস বললো, 'কাজটা করার জন্যে টবিকে সঙ্গে নিয়ে সম্ভাব্য খোঁজখবর নিয়েছি। বাড়ির পরিচারকরা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ওই বাড়িতে কাজ করছে। তাই মনে হয়, ওদের কাউকেই টাকার লোভ দেখিয়ে আমাদের দলে আনা যাবে না। তবে একটা পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। আর সেটা হলো সে পথে সাফল্য পেতে হলে একটা বাচ্চা ছেলের দরকার।

'কিন্তু আজকের দিনে বাচ্চা ছেলে কি হাতের কাছে পাওয়া যায়?' ফ্যাগিন বললো, 'যেসব বাচ্চা ছেলেদের আমার দলে ভিড়িয়েছিলাম, সবাই পুলিশ হাজতের দানাপানি খেয়ে তাদের পেশা বদলে ফেলেছে, তারা এখন সরকারী উদ্ধারাশ্রমে লেখাপড়া শিখছে।'

'তাহলে এখন উপায়?' সাইকস হতাশ গলায় বললো।

ন্যান্সি তাদের সব কথাই শুনেছিল। সে এবার তাদের দু'জনের মধ্যে এগিয়ে এসে বললো, 'অতো ইতস্তত করছো কেন ফ্যাগিন, অলিভারের কথাটা বলেই ফেলো না, আমি কিছুই মনে করবো না।'

ফ্যাগিন হেসে ফেললো। 'কি আশ্চর্য, দেখলে তো বিল, আমাদের সমস্যার সমাধান কতো সহজেই না করে দিলো ন্যান্সি। নারীর চরিত্র কী অদ্ভুত, তাই না? সে যাই হোক, কালই তাহলে অলিভারকে পাঠিয়ে দেবো তোমার কাছে, কেমন!'

'না, আমার মনে হয়, বরং ন্যান্সি তোমার ওখানে গিয়ে অলিভারকে নিয়ে আসে তাহলে খুব ভালো হয়। সেক্ষেত্রে হয়তো ছেলেটাকে পোষ মানাতে সুবিধে হবে।'

সাইকস বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা বলে মনে হলো ফ্যাগিনের। তাই সাইকসের কথা মেনে নিয়েই ঠিক হলো, আগামীকাল রাতে ন্যান্সি ফ্যাগিনের আস্তানায় গিয়ে অলিভারকে নিয়ে আসবে।



পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পরেই অলিভার অবাক চোখে দেখলো, তার জুতোজোড়া বদলে গেছে, পুরনোর বদলে একজোড়া নতুন জুতো।

প্রাতঃরাশের টেবিলে ফ্যাগিন অলিভারকে বললো, 'শোনো অলিভার, আজ রাতে তোমাকে সাইকসের আস্তানায় যেতে হবে। ন্যান্সি তোমাকে তার আস্তানায় নিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, এর পর থেকে আমি কি বরাবরের জন্যে সেখানেই থাকবো?'

'না, না, বরাবরের জন্যে হতে যাবে কেন?' উত্তরে ফ্যাগিন বললো, 'সাইকসের একটা কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। আর কাজটা হয়ে গেলেই তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে।'

কি এমন কাজ যে, সে ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না, অলিভার মহাচিন্তায় পড়লো, তবু সারাদিন ধরে সে তার মনটাকে সেই ভাবে তৈরী করে নিলো।

সন্ধ্যার পরে ফ্যাগিন অলিভারকে বললো, 'আমি একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছি, ফিরতে দেরী হবে। ন্যান্সি এসে তোমাকে সাইকসের আস্তানায় নিয়ে যাবে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, অলিভার! সাইকস রেগে গেলে তার মাথায় ঠিক থাকে না, তখন খুন করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। তাই বলে রাখছি, সে তোমাকে যাই বলুক না কেন, প্রতিবাদ করো না, সব কথা শুনে যেও!'

ফ্যাগিন অনেকক্ষণ হলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, অলিভার তখনও গালে হাত দিয়ে ভাবছে কিভাবে সাইকসকে মানিয়ে নেবে। তার চিন্তায় বাধা পড়লো ন্যান্সির আবির্ভাবে, সে এসেছে তাকে সাইকসের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসতে। এ ক'দিনেই তার চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। অলিভারকে আশ্বস্ত করতে সে বললো, যেভাবেই হোক সে তাকে এই সব শয়তানদের খপ্পর থেকে ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। অলিভারকে সে আরও বললো, সেদিন তার পক্ষ অবলম্বন করেছিল বলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হয়েছে, মারতে মারতে তাকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল। ঘাড় ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন সে দেখালো অলিভারকে। অলিভার দেখতে গিয়ে শিউরে উঠলো।

খানিক পরেই সাইকসের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলো ন্যান্সি অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে। কোনো কথা না বলেই একটা রিভলবার বার করলো তার পকেট থেকে। অলিভারকে রিভলবারটা দেখিয়ে সে শান্ত ও সংযত গলায় বললো, যদি আমার কথার অবাধ্য হোস তো, আশা করি একটা গুলিতেই তোর প্রাণ-পাখিটা উড়ে যাবে, ফিরবে না আর কখনো তোর জীবন-খাঁচায়!'

কথাটা শুনে অলিভার ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেলো।

এর পর সাইকস নৈশভোজ সেরে আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লো। তবে শোবার আগে ন্যান্সিকে হুকুম করলো, ঠিক ভোর পাঁচটায় সে যেন তাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়। ওদিকে অলিভার ঘরের মেঝের ওপর শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইলো, তার চোখে ঘুম আসছিল না। সে তখন ভাবছিল,

ন্যান্সি হয়তো তাকে কোনো উপদেশ দেবে, সাইকসের মন পেতে হলে কি কি করতে হবে তা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু সে সব কিছুই করলো না সে। সে তখনও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন, কি ভাবছে সে-ই জানে। সাইকসকে পরদিন ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে সে হয়তো সারা রাতই জেগে থাকবে।

সাইকসের ঘুম ভেঙে গেলো ভোর পাঁচটার আগেই। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে অলিভারের হাতে একটা বড় আলখাল্লা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'নে এটা গায়ে জড়িয়ে নে।' তারপর অলিভারের হাত ধরে সে তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়লো। কোথায় যে সে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কিংবা কি তাকে করতে হবে, এসব কিছুই জানতে পারে নি অলিভার এখনও পর্যন্ত। ভয়ে সাইকসকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। যেতে গিয়ে সে একবার পিছন ফিরে ন্যান্সির দৃষ্টি আকর্ষণও করতে চাইছিল, যদি চোখের ইশারায় সে কিছু নির্দেশ দেয়। কিন্তু ন্যান্সি তখনও ফায়ারপ্লেসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন ভেবে চলছে, কোনো দিকেই হুঁশ নেই তার এখন।



বর্ষার আকাশে ঘন-মেঘের আনাগোনা, বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। এমনিতেই গতরাতের প্রবল বৃষ্টিতে জল জমে আছে রাস্তায়, তার ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে তখনো। আজ আবার হাটবার। তাই রাস্তায় একটু একটু করে পথচারীর ভিড় বেড়ে চলেছে।

এদিকে সাইকস ক্রমাগত অলিভারকে গালাগাল দিতে দিতে একরকম গরু-পড়া করে নিয়ে আসতে আসতে হাইডপার্ক পেরিয়ে ক্রেনিংটনের পথ ধরলো। তারপর সেখানে একটা চলন্ত গাড়ি থামিয়ে তার মালিককে রাজী করিয়ে অলিভারকে নিয়ে তাতে উঠে বসলো। কিছুক্ষণ পরে একটা সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। সেখান থেকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে পৌঁছলো হ্যাম্পটন শহরে। সেখান থেকে আরও খানিকটা পথ হেঁটে শহরের বাইরে এদিক-ওদিক ঘুরে আবার শহরে ফিরে এসে এক সরাইখানায় উঠলো। সেখানেই রাতের নৈশভোজের ফরমাস দিলো সাইকস।

আহারের পরে সাইকস অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়ালো। হ্যালি ফোর্ডগামী একটা শ্রমিকের গাড়ি যাচ্ছিল সেখান দিয়ে, সেই গাড়িটা থামিয়ে তাতে চেপে বসে তারা সোপারটাউনে এসে নামলো। জায়গাটা জলকাদায় ভরা, কোনোরকমে সেই পথ পেরিয়ে অন্ধকার গলিঘুঁজি আর চাষের জমির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে তারা থামলো একটা পোড়ো বাড়ির সামনে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে নির্জন নিস্তব্ধ বাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হয়, প্রাণের কোনো সাড়া-শব্দ নেই সেখানে, আশপাশেও কোনো বাড়ি ছিল না। বাড়ির সদর দরজাটা ভেজানো ছিল। অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো সাইকস।

সদর দরজা পেরিয়ে দেখা গেলো ভেতরে মানুষ এবং তারা সাইকসের পরিচিত। টোবি ক্র্যাফট্ আর বার্নি সাইকসকে খুব খাতির করে অভ্যর্থনা করলো। তাদের সঙ্গে অলিভারের পরিচয় করিয়ে দিলো সাইকস।

কিছুক্ষণ পরে একটা খালি ঘরে যুতসই হয়ে বসে তারা তাদের মদের আসর জমিয়ে তু লো। তারা তিনজন মদের গ্লাসে মুখ ঠেকিয়ে একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আমাদের আজকের রাতের অভিযান যেন সফল হয়! তারপর তারা আকণ্ঠ মদ গিললো। অলিভারের শত আপত্তি সত্ত্বেও তারা থাকে জোর করে মদ খাইয়ে দিলো। মদ খাবার পর সবাই বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়লো। মদের নেশায় তারা তখন বিভোর।

এদিকে মদের নেশায় অলিভারেরও সারা দেহ কেমন ভারী হয়ে গেছে, চোখ দুটো বুজে আসছে।

একটু পরে সে-ও ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে অনেকদিন পরে সে ভালো একটা স্বপ্ন দেখলো, সে যেন তার ছেলেবেলার জীবনে ফিরে গেছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো টোবির ডাক শুনে। টোবি তখন বিছানা থেকে নেমে চিৎকার করে ঘোষণা করলো, 'দেড়টা বাজে..........' তার সেই আহ্বান শুনে অপর দুজনও উঠে দাঁড়ালো। সাইকস আর টোবি চাদর দিয়ে নিজেদের মুখ আর গলা ঢাকলো। তারপর তারা বার্নির কাছ থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে পকেটে চালান করে দিলো। বার্নি তাদের হাতে দুটো পিস্তলও তুলে দিলো এবং একটা আলখাল্লায় অলিভারের আপাদমস্তক ঢেকে দিলো।

অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতেই অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তারা। একে রাত তার ওপর কুয়াশার জন্য চারদিকে অন্ধকার থিক্‌থিক্ করছিল।

সাইকস পথ চলতে চলতে সগর্বে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলো, 'এহেন নিকষ কালো অন্ধকারে আমরা এখন সারা শহর চষে বেড়ালেও কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

রাত দুটোর কিছু আগে তারা শহর ছেড়ে পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। নিস্তব্ধ বাড়ি, কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই বাড়ির ভেতরটাও তেমনি নিস্তব্ধ। তারা কাজটা চটপট সেরে ফেলতে চাইলো। টোবি ক্র্যাবকিট চোখের পলক পড়তে না পড়তেই পাঁচিলের ওপরে উঠে পড়লো। তারপর অলিভারকে একরকম কোলে করে নিয়ে সাইকসও পাঁচিলের ওপর উঠে পড়লো। সব শেষে বার্নি। এবং পরক্ষণেই তারা সবাই পাঁচিলের ওপারে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো।

অলিভার খুব ভয় পেয়ে গেছে, মাটির ওপর বসে পড়ে সে যেন আর উঠতে চায় না। তা দেখে সাইকস রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো ঃ 'এই হতভাগা ওঠ, শীগগীর উঠে দাঁড়া! নইলে তোকে খতম করে এখানে পুঁতে রেখে যাবো।'

অলিভার ডুকরে কেঁদে উঠলো। 'আমি তোমাদের পায়ে পড়ি। আমি পারবো না। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও!'

'তোকে ছেড়ে দেবার জন্যে আমরা তোকে এতো কষ্ট করে এখানে এনেছি?' দাঁড়া হতভাগা তোকে মজা দেখাচ্ছি!' এই বলে সাইকস পিস্তল বার করে অলিভারকে গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সময়ে টোবি তার হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলো, সেই সঙ্গে অলিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, 'আর একটা আওয়াজ করেছিস কি পিস্তলের কুঁদো দিয়ে তোর মাথা একেবারে গুঁড়িয়ে দেবো।' তারপর বিল সাইকসের দিকে ফিরে সে বললো, 'বিল তুমি এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট জানালাটা আগে খুলে ফেলো, আমি এই একগুঁয়ে শুয়োরটাকে সামলাচ্ছি। এসব ছেলেকে সায়েস্তা করার কায়দা আমার বেশ ভালোই জানা আছে।'

সাইকসের হাতে যেন জাদু ছিল, তা না হলে সামান্য চেষ্টাতেই সামান্য সময়ের মধ্যে বাড়ির পিছন দিকের একটা ছোট জানালা খুলে ফেললো সে। আর সেই জানালা পথ দিয়ে অলিভারের মতো ছোট ছেলে সহজেই গলে যেতে পারে। তাই অলিভারের হাতে একটা লণ্ঠন দিয়ে সাইকস কানে কানে তাকে বলে দিলো ঃ 'যা ওই জানালা গলে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়। তারপর চুপিসারে দরজার খিলটা খুলে দিবি।'

খোলা জানালাপথে অলিভারকে তো ভেতরে ঠেলে দেওয়া হলো। অলিভারের তখন খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে বাড়ির লোকজনদের জাগিয়ে তোলে। কিন্তু হঠাৎ সে শুনতে পেলো, জানালার ওপার থেকে সাইকস চাপা গলায় তাকে ডাকছে ঃ 'ওরে হতভাগা ফিরে আয় ফিরে আয় জানালায়। তোকে আর দরজার খিল খুলতে হবে না।'

সাইকসের হুকুম অমান্য করলে নির্ঘাত মৃত্যু! তার হাতের রিভলবারটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

প্রাণভয়ে অলিভারের হাত থেকে লণ্ঠনটা খসে পড়ে গেলো। ঠিক সেই সময় সিঁড়ির শেষ ধাপে দুটি ছায়ামূর্তির উদয় হতে দেখা গেলো। আর সেই সঙ্গে আচমকা একটা আলোর ঝিলিক আর ধোঁয়া বেরিয়ে আসার সঙ্গে গুলির আওয়াজ। সেই গুলির আঘাত সইতে না পেরে অলিভার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো জানালার কাছে। সাইকস তখন সেই ছায়ামূর্তি দু'টিকে তাক করে রিভলবারের ট্রিগার টিপতেই ছায়ামূর্তি দুটি ভয় পেয়ে উধাও হয়ে গেলো সেখান থেকে। সাইকস আর কালবিলম্ব না করে বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে অলিভারের জামা ধরে, টেনে বাইরে বার করে নিয়ে এলো দ্রুতগতিতে।

তারপর সেখানে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে অলিভারকে কাঁধে তুলে নিয়ে সাইকস রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। বাড়ির ভেতর থেকে ছোঁড়া রিভলবারের একটা গুলি অলিভারের পায়ে লেগেছিল, তাই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকলো। এদিকে অলিভারের ভারী দেহটা কাঁধে নিয়ে ছুটতে খুবই অসুবিধে হওয়ার দরুণ অবশেষে সাইকস প্রায় বেহুঁশ অলিভারকে একটা নর্দমার ভেতরে ফেলে রেখে ছুট দিলো সেখান থেকে।

।। ছয় ।।

অলিভারকে বাড়ি ফিরতে না দেখে মিস্টার ব্রাউনলো খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরের দিনই তিনি দৈনিক সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে দিলেন, যার বয়ান ছিল এই রকম ঃ



পুরস্কার! পুরস্কার! পুরস্কার!

'গত বৃহস্পতিবার রাতে অলিভার টুইস্ট নামে একটি ছেলে তার পেণ্টনভিলের বাড়ি থেকে নিখোঁজ; কিংবা হয়তো কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। যিনি তার সন্ধান দেবেন, কিংবা তার অতীত ইতিহাস জানাবেন, তাঁকে পাঁচ গিনি পুরস্কার দেওয়া হবে.........'



বিজ্ঞাপনটা সংবাদপত্রে যেদিন বেরোলো, সেদিনই সন্ধ্যায় মিস্টার বাম্বলকে লণ্ডনে দেখা গেলো। তিনি এসেছেন অনাথ-আশ্রমের কাজে। একটা সরাইখানায় ঢুকেই তিনি সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রটার ওপর চোখ রাখলেন। আগেই, তিনি কড়া মদের ফরমাস দিয়েছিলেন। ওয়েটার সেটা তাঁর টেবিলে দিয়ে গেলে তিনি মদের গ্লাসটা সামনে রেখে কাগজটা পড়তে শুরু করে দিলেন। এই সময় হঠাৎ বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে পড়তেই সেটা তিনি তিন তিনবার পড়লেন। তারপর নিমেষে মদের গ্লাসটা শেষ করে তিনি সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পেণ্টনভিলের পথ ধরলেন।



মিস্টার বাম্বলের মুখে অলিভারের নাম শোনা মাত্র মিসেস বেডুইন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মিস্টার ব্রাউনলোর কাছে নিয়ে গেলেন। বলাবাহুল্য মিস্টার গ্রীমউইগও হাজির ছিলেন সেখানে।

কোনো ভূমিকা না করেই মিস্টার বাম্বল তাঁদের বললেন, অলিভার টুইস্টকে তিনি বেশ ভালো করেই চেনেন। তাঁদের অনাথ-আশ্রমেই অনাথ শিশু হিসেবে সে প্রতিপালিত হয়। এই পর্যন্ত ঠিক ছিলো। কিন্তু অলিভারের অতীত ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্যের চেয়ে মিথ্যে ভাষণ দিয়ে মিস্টার

বাম্বল তার ও তার মায়ের নামে যেসব কুৎসা রটালেন তা শুনে মিস্টার ব্রাউনলো এবং মিস্টার গ্রীমউইগ দু'জনেই খুব মুষড়ে পরলেন। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হলো, অলিভার বেজাত, পরিচয়হীন একটি ছেলে মাত্র, যার বাপের ঠিক নেই। তাই স্বভাবতই তাঁরা ধরে নিলেন, অলিভার একজন বেইমান আর তার স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত নীচ। যার মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। অলিভার সম্পর্কে মিথ্যে কুৎসা শুনে স্বভাবতই তার সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই নিমেষে পাল্টে গেলো। তাদের মনে হলো, সে একজন ঠগ, প্রতারক! অলিভার সম্পর্কে তাঁদের সব ধারণাই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেলো।

মিস্টার বাম্বল খুব খুশী! মিস্টার ব্রাউনলোর কাছে অলিভার সম্পর্কে মিস্টার ব্রাউনলোর ভুল ধারণা বদলে দিতে পেরে তিনি মনে মনে বাড়তি সুখ অনুভব করলেন। মিস্টার বাম্বল চলে যাবার পর মিস্টার ব্রাউনলো ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি মুখ খুললেন ঃ 'জানো, বেড়ুইন, অলিভার সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সত্যি সে একজন প্রতারক, জোচ্চোর। অন্যেরা এতদিন তার সম্পর্কে যা যা বলে এসেছে সব সত্যি আর অলিভারই মিথ্যে!'

মিসেস বেড়ুইন কিন্তু কোনোভাবেই মিস্টার বাম্বলের কথা মেনে নিতে পারলেন না। এর জন্যে তাঁকে বেশ ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতে হলো মিস্টার গ্রীমউইগের কাছ থেকে।

অলিভারের জন্ম যেই অনাথ-আশ্রমে সেখানকার ধাইমা মিসেস কর্নি একলা তাঁর নিজের ঘরে বসেছিলেন। বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে তিনি আয়েশ করে এক কাপ গরম চা নিয়ে বসেছেন। এই সময় তার মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ে গেলো। ভাবতে ভাবতে টিপটটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে তিনি বলে উঠলেন, 'অমনটা আমি আর পাবো না!' এ কথা তিনি যে কার উদ্দেশ্যে বললেন, অর্থাৎ মৃত স্বামী, নাকি সামনের টিপটটা, ঠিক বোঝা গেলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মিস্টার বাম্বল।

আশ্রমের অনাথ শিশুদের ব্যাপারে তাঁরা দুজন অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। এই আলোচনার সারমর্ম হলো, একটা ব্যাপারে ওঁরা দু'জনেই একমত দু'জনেরই লক্ষ্য হলো, যতো পারো অনাথদের শোষণ করো। যৎকিঞ্চিৎ খরচ করে বরাদ্দের বাকী অর্থ অন্যত্র সরিয়ে রেখে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ানো। এই সব আলোচনার মাঝে মিস্টার বাম্বল বিদায় নিতে চাইলেন, বাইরে তখনও সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছিল, তাই মিসেস কর্নি তাঁকে আরও খানিকক্ষণ থেকে থেকে এবং গরম গরম চা খেয়ে যেতে বললেন। মিস্টার বাম্বল তাঁর অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। তাছাড়া মিসেস কর্নির প্রতি তাঁর সেই দুর্বলতাটা প্রকাশ করেই ফেললেন। তিনি মিসেস কর্ণিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। এই সময় একজন বৃদ্ধা এসে মিসেস কর্ণিকে জানালো, শ্যালীবুড়ির শেষ অবস্থা, যে কোনো সময় তার মৃত্যু হতে পারে। মরার আগে সে মিসেস কর্নিকে একটা খুবই দরকারী কথা বলে যেতে চায়।

খবরটা শুনেই মিস্টার বাম্বলকে অপেক্ষা করতে বলে মিসেস কর্নি মৃত্যুপথযাত্রী শ্যালীবুড়ির ডাকে বেরিয়ে পড়লেন সেই বৃদ্ধার সঙ্গে। একটা ছোট্ট খুপরির মতো ঘর। সেখানে তখন একজন তরুণ চিকিৎসক শ্যালীবুড়ির কাছে বসে ওষুধ তৈরী করছিল। ওদিকে রোগিণী তখন প্রায় বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। তার পাশে আর একজন বৃদ্ধ বসে হা-হুতাশ করছিল।

তরুণ ডাক্তারটি জানালো, শ্যালীবুড়ির আয়ু আর মাত্র দু'ঘণ্টা। কিন্তু মরার আগে তার জ্ঞান ফিরে আসবে কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই খবরটা দিয়েই তরুণ ডাক্তারটি চলে গেলো সেখান থেকে।

মিসেস কর্নি এবার বিরক্ত হয়ে মুখ বিকৃত করে বললো, 'আচ্চা ঝামেলায় পড়া গেলো তো! শ্যালীবুড়ি কখন মরবে সেই সময় পর্যন্ত আমাকে ঠায় এখানে বসে থাকবে হবে!'

ঘরের মধ্যে যে দু'জন বৃদ্ধা বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, 'বেশীক্ষণ নয় মহাশয়া!

আমাদের সবার মরণের জন্য কাউকেই আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না, বিরক্তও হতে হবে না!'

'চুপ কর বুড়ি!' ধমকে উঠলেন মিসেস কর্নি। তিনি আবার এও জানতে পারলেন যে, শ্যালীবুড়ি এর আগেও বেশ কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে পড়ে থেকেছে। একথা শুনে মিসেস কর্নি চলে যাবার জন্যে উঠছিলেন। এই সময় শ্যালীবুড়ি হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারপর মিসেস কর্নির একখানা হাত ধরে তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। কোনোরকমে তিনি মিসেস কর্নিকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন আলোচনা আছে। তার আগে ওদের ঘর থেকে বার করে দিন তাড়াতাড়ি। দেরী করবেন না, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে।'

মিসেস কর্নি তৎপর হলেন। একরকম ধাক্কা দিয়ে জোর করে ঘর থেকে ওদের বার করে দিলেন, ওদের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।

এর পর আসন্ন মৃত্যুর শমন পাওয়া শ্যালীবুড়ি যতোটা সম্ভব গলা উঁচিয়ে তার সেই গোপন কথাটি বলতে শুরু করলো ঃ 'হ্যাঁ, এবার খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। এই ঘরে, এই শয্যায় ঠিক কতো বছর আগে মনে নেই তবে সেই কুড়িয়ে পাওয়া একটি মেয়েকে এনে শোয়ানো হয়। মেয়েটি গর্ভবতী ছিলো, প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল সে তখন। কিছুক্ষণ পরেই সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। আমি তার একটা জিনিস চুরি করে বড় অপরাধ করে ফেলেছি। এ অপরাধের কথা না বললে বোধহয় মরেও আমি শান্তি পাবো না।' উত্তেজনাবশে কথা বলতে বলতে হঠাৎ শ্যালীবুড়ি বিছানায় শুয়ে পড়লো। খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে আবার ধড়মড়িয়ে আবার উঠে বসে বলতে শুরু করলো 'সেটাই ছিল তার জীবনের একমাত্র মূল্যবান সম্পদ! তার পরনে না ছিল গরম পোশাক কিংবা পেটে অন্ন, কিন্তু সেই মূল্যবান সম্পদ সে সযত্নে আঁকড়ে রেখেছিল তার বুকের মধ্যে। আর সেটা ছিল অতি মূল্যবান সোনার জিনিস!'

'সোনার জিনিস?' মিসেস কর্নি খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, 'থামলে কেন, বলো সেটা এখন কোথায়? সেটার বিলি ব্যবস্থা তুমি কি করলে?'

শ্যালীবুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে থাকে ঃ 'বিশ্বাস করেই সেটা সে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে আমার হাতদুখানি তার হাতের মুঠোয় জড়িয়ে ধরে বলেছিল, যদি তার ছেলেটি বাঁচে তার হাতে সেটা যেন আমি তুলে দিই, তাহলে সে অন্তত অনাথ হয়ে সমাজের চোখে মাথা নিচু করে থাকবে না। ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল অলিভার, অলিভার টুইস্ট। আর আমি যে সোনার জিনিসটা চুরি করেছিলাম—

'হ্যাঁ বলো, থেমো না, তোমার কথা শেষ করে যাও!' এই বলে মিসেস কর্নি শ্যালীবুড়ির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তার শেষ কথাটা শোনর জন্য।

শ্যালীবুড়ির তখন বাঁচার আয়ু শেষ তলানিতে এসে পৌঁছেছিল। শেষবারের মতো উঠে বসে বিড়বিড় করে কি যেন বললো, তারপরেই সব শেষ। প্রাণহীন দেহটা বিছানার ওপর ঢলে পড়লো। চোখের পাতাগুলো ধীরে ধীরে বুজে গেলো। কিন্তু তার হাতদুটো তখনও মিসেস কর্নির হাত দুটি জড়িয়ে ধরে আছে।



ওদিকে মিসেস কর্নির ঘরে একা পায়চারি করতে করতে মিস্টার বাম্বল তাঁর ঘরের আসবাবপত্র নেড়ে চেড়ে দেখে মনে মনে সেগুলোর দাম কষে হিসেব শেষ করলেন, ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকলেন মিসেস কর্নি। এর পরের আলোচনায় মিস্টার বাম্বল জানতে পারলেন, মিসেস কর্নি তাঁর চাকরির

সুবাদে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিনামূল্যে কয়লা ও মোমবাতি পেয়ে থাকেন এবং তাঁকে বাড়িভাড়া দিতে হয় না। এরকম মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়াটা সৌভাগ্যের কথা মনে মনে ভাবলেন তিনি এবং ফিরে আবার তিনি মিসেস কর্নিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। একটু ইতস্তত করার পর মিসেস কর্নি তাঁর বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

তারপরেই মিসেস কর্নির অনুরোধে বাইরে সেই দুর্যোগপূর্ণ ঝড়-জল উপেক্ষা করে মিস্টার বাম্বল ছুটলেন মিস্টার সোয়ারবেরীর বাড়ির উদ্দেশ্যে মৃতা শ্যালীবুড়ির জন্য কফিনের ফরমাস দিতে।

সোয়ারবেরী দম্পতি তখন বাড়িতে ছিলেন না। নোয়া ক্লেপোল সেই সুযোগে শার্লটিকে একা পেয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে বসলো। এই সময় মিস্টার বাম্বল সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। বিয়ের প্রস্তাব শুনে মিস্টার বাম্বল কঠোর ভাষায় ধমক দিয়ে নোয়াকে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, এখানেও বিয়ের কথাবার্তা? এই হতভাগা তোকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, ফের যদি তুই ওকে বিয়ের কথা মুখে আনিস, তাহলে তোর ওই মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দেবো, বুঝলি! যাক, এখন কাজের কথা শোন! তোর মনিব বাড়ি ফিরলে তাঁকে বলিস, অনাথ আশ্রমের এক মৃতা বুড়ির জন্যে কাল সকালেই সে যেন একটা কফিন পাঠিয়ে দেয়।'

'আজকালকার ছোঁড়া-ছুঁড়িদের হলো কি! কেবল বিয়ে আর বিয়ে! সবাই বিয়ে পাগলা হয়ে উঠেছে। দেশটা একেবারে রসাতলে গেলো, এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার.........' নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে মিস্টার বাম্বল সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন অতঃপর।

।। সাত ।।

ফ্যাগিনকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল। সে তার আস্তানায় ফায়ারপ্লেসের সামনে মুখ গোমড়া করে বসেছিল। ওদিকে ঘরের এক কোণায় বসে ধান্দাবাজ জ্যাক, চার্লস বেটস্ এবং চিটলিং তাস খেলায় মশগুল ছিল। হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ধান্দাবাজ কে এলো দেখতে গেলো। একটু পরেই সে ফিরে এলো টোবি ক্র্যাকিটকে সঙ্গে নিয়ে।

টোবির মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, রুক্ষ্ম বীভৎস তার চেহারা। কোনো ভূমিকা না করে ঘরে ঢুকেই ফ্যাগিনকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার খবর কি ফ্যাগিন? ভালো আছো তো?'

ফ্যাগিনের উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই টোবি তার মুখ আর গলা ঢাকা আলোয়ানটা ধান্দাবাজকে রাখতে দিয়ে সে এবার তার পরনের জামাটাও খুলে ফেললো। তারপর ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা চেয়ারে পা তুলে থিতু হয়ে বসে ক্লান্ত গলায় বলে উঠলো, 'অনেকদিন পেটে দানাপানি পড়েনি। অনেক খবর আছে, তবে আগে কিছু খেতে দাও, তারপর ক্ষুধা নিবৃত্ত করে সব কথা তোমাদের বলবো।' এই বলে সে কৌতুহলী ফ্যাগিনের দিকে তাকালো।

ফ্যাগিন জানে টোবির খুব খিদে পেলে তখন তাকে খেতে না দিলে তার পেট থেকে একটা কথাও বার করা যাবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে ধান্দাবাজকে ইশারা করে বললো, তাকে খাবার দেবার জন্য। প্রচণ্ড খিদে পেলেও টোবি ধীরে ধীরে পরম তৃপ্তি সহকারে খেতে থাকলো। ফ্যাগিন ভেতরে ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেও মুখে কোনো কথা বললো না। ধৈর্যসহকারে টোবির খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকলো।

খাওয়া শেষ হলে পর টোবি ফ্যাগিনকে বললো, অন্য সবাইকে ঘর থেকে বার করে দেবার জন্যে। ফ্যাগিনের নির্দেশে সবাই ঘর থেকে চলে গেলে পর টোবি জিজ্ঞেস করলো, 'ফ্যাগিন, বিল কেমন আছে বলো?'

'কি বললে, বিলের কথা জিজ্ঞেস করছো?' ফ্যাগিন ভয়ে ভয়ে মৃদু চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়, কোথায় তারা? মানে সাইকস্ আর সেই ছেলেটা এখন কোথায়? আর অভিযানেরই বা কি খবর বলো!'

টোবি বিষণ্ণ গলায় বললো, 'ওদের কথা পরে বলছি, তার আগে তোমাকে বলে রাখি, আমাদের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে!'

ফ্যাগিন তার জামার পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ টেনে বার করে বললো, 'সে খবর তো আমার আগেই জানা হয়ে গেছে। তারপরের ঘটনার কথা এখন্ বলো!'

'হ্যাঁ বলছি,' টোবি বললো, 'অভিযান ব্যর্থ হয় বাড়ির লোকেরা সজাগ থাকাতে। তাদের লোকের গুলিতে আহত অলিভারকে পিঠে নিয়ে সাইকস ছুটতে থাকে। বাড়ির লোকজনও তাদের তাড়া করতে থাকে। ধরা পড়ার মতো অবস্থা হতেই শেষ পযর্ন্ত সাইকস অলিভারকে পথের ধারে একটা নর্দমার ভেতরে ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তবে অলিভার বেঁচে আছে কি মারা গেছে তা জানি না।' এই পর্যন্ত বলে টোবি থামলো।

ফ্যাগিন আর্ত চিৎকার করে দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো।

রাস্তায় নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করলো ফ্যাগিন। উদ্দেশ্য সাইকসের আস্তানায় যাওয়া। কিন্তু সাইকসের আস্তানা থেকে সিকি মাইল দূরে পৌঁছে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে হেঁটে চললো সে। তার গন্তব্যস্থলে। কিছুটা পথ হেঁটে এসে একটা এঁদো গলির ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। গলির দৈন্যতা বলে দিচ্ছিল যে, এখানে সমাজের নিচুতলার বাসিন্দারা থাকে। গলির একেবারে শেষ প্রান্তে একটা দোকানের সামনে এসে সে এবার সেখানকার এক জন সেলসম্যানের কাছ থেকে জানতে পারলো সাইকস এখনো তার ঘরে ফিরে আসেনি। ফ্যাগিন তখন সাইকসের আস্তানা ছাড়িয়ে একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লো নিঃশব্দে পরিচিতজনের দৃষ্টি এড়িয়ে। শুঁড়িখানার মালিকের সঙ্গে সে গোপনে অনেকক্ষণ ধরে নিজের পেশার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলো। চলে আসার আগে সে শেষ প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা সে কি আজ রাতে এখানে ফিরে আসবে বলে মনে হয়?'

'মঙ্কসের কথা বলছো?' শুঁড়িখানার মালিক পাল্টা প্রশ্ন করলো।

'আস্তে!' ফ্যাগিন মৃদু চিৎকার করে উঠলো, তারপর ছোট্ট একটা উত্তর দিলো, 'হুঁ'। এই বলে সে তার জবাবের আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শুঁড়িখানার মালিক এবার ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, 'অনেক আগেই তার তো এখানে এসে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনও এলো না কেন বোঝা যাচ্ছে না। আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করো, হয়তো........ ......'

'না, এখানে আমি আর এক মুহূর্তই থাকতে পারছি না,' বাধা দিয়ে ফ্যাগিন তেমনি চুপিচুপি বললো, 'বরং সে এলে তাকে বলো একটা জরুরী প্রয়োজনে আমি তার খোঁজে এসেছিলাম। তাকে আরও বলো, কাল হয়তো সে যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে একবার দেখা করে, মনে থাকবে তো? এর পর ফ্যাগিন আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না। দ্রুতপায়ে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে এলো। এর পর সাইকসের ঘরে ঢুকে ফ্যাগিন দেখলো, হতাশ মনে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে আছে ন্যান্সি। সেদিনের সেই রাতের অভিযানের পর থেকে কোনো খবরই সে পায়নি বিল সাইকসের। ন্যান্সি বরং ভাবছিল সাইকসের খবর নেবে ফ্যাগিনের কাছ থেকে। ফ্যাগিন তাকে টোবির মুখে শোনা সেই রাতের ব্যর্থ অভিযানের খবর জানালে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ফ্যাগিন আরও বললো, 'ভাগ্যহীন ওই ছেলেটার কথা ভাবো ন্যান্সি, কি ভয়ংকর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে, ওরা তাকে একটা নর্দমার মধ্যে ফেলে এসেছে!'

এ কথায় ন্যান্সি মুখ তুলে তাকালো ফ্যাগিনের দিকে। 'ছেলেটা যেখানেই থাকুক না কেন, আমাদের কছে থাকার চেয়ে ভালোই থাকবে। তবে আমার ভাবনা কেবল বিলের জন্য। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ও যেন ভালো থাকে।'



গভীর রাতে ফ্যাগিন তার আস্তানায় ফিরে এলো। তারপর চাবি ঢুকিয়ে সে যখন দরজা খুলতে যাচ্ছে, তখনি কে যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে ডেকে উঠলো, 'ফ্যাগিন!'

ফ্যাগিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'তা তুমি কখন এলে মঙ্কস?'

'ঘণ্টা দুই তো বটেই! তখন থেকে তোমার অপেক্ষায় এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'তোমাবি কাজে বন্ধু! বাড়ির ভেতরে চলো সব বলছি।'

মঙ্কসকে নিয়ে ফ্যাগিন বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুতে নিচু গলায় কি যেন আলাপ করলো। মঙ্কস ঘাড় নেড়ে বেশ জোর গলায় বললো, 'মতলবটা তোমাদের একেবারেই ভেস্তে গেলো। প্রথমেই অমন শক্ত অভিযানে ছেলেটাকে না পাঠিয়ে তাকে এখানে আটকে রেকে পকেটমার কিংবা গাঁটাকাটা চোর করে তুললে না কেন?'

'সেরকম সুবিধে একেবারেই ছিল না।'

মঙ্কস এবার রুক্ষস্বরেই বলে উঠলো, 'ভুল, সুবিধে করে নিতে হয়। তাই আমি মনে করি, তুমি ইচ্ছে করলে তা করতে পারতে। কেন, এর আগে তুমি কতো ছেলেকে পাকা পকেটমার, সিঁধেল তৈরী করেছো, যাদের কাছ থেকে তুমি আজও কমিশন পেয়ে থাকো। এভাবে তুমি এ ছেলেটিকেও পকেটমার তৈরী করে পরে তাকে জেলে পাঠিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারতে। আর এই পথেই হয়তো সে সারাজীবনের মতো দেশ থেকে নির্বাসিত হতো একদিন।'

মঙ্কসের কথায় রাগ আর উত্তেজনা প্রকাশ পেতে থাকলো। এদিকে ফ্যাগিন তাকে শান্ত করার জন্য কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে যেতে থাকলো। 'চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করিনি। মাঝখান থেকে ছেলেটি ধরা পড়ে সব গোলমাল করে দিলো। আর যে মেয়েটাকে দিয়ে ছেলেটিকে রাস্তা থেকে নিজেদের আস্তানায় ফিরিয়ে আনলাম, সেই মেয়েটির নেকনজরে পড়ে গেছে ছেলেটি এখন। আর এটাই এখন আমাদের এ পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'বাধা কিসের, তাকে খতম করে ফেললেই তো পারো!' মঙ্কস বললো।

'কথাটা যে আমি ভাবিনি তা নয়,' ফ্যাগিন বললো, 'সেটা কার্যকর করার সময় এখনো আসেনি। সময় হলে আমি নিজেই সেই কাজটা সারতে পারবো। তাই বুঝতেই পারছো, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ছেলেটি যদি পাকা চোর বনে যায় তাহলে সে মেয়েটির সহানুভূতি হারাবে। আর ছেলেটি যদি আমাদের হাতেই মারা যায় তাহলে কেসটা অন্য রকম হয়ে যাবে।'

'না, না, ওকে মেরো না,' মঙ্কস প্রতিবাদ করে উঠলো, 'চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে যদি প্রতিরোধ বাহিনীর আঘাতে মারা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে কারোর কিছু বলার থাকতেই পারে না। আসল কথা কি জানো ফ্যাগিন, ছেলেটিকে নিয়ে তোমরা যা খুশী করতে পারো, তবে নিজেরা ওকে মেরে ফেলো না। তা করলে আমার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ মঙ্কস চমকে উঠলো, 'ওকি! দেখো দেখো ফ্যাগিন, ওটা একটা মেয়ের ছায়া না?'

মঙ্কস এবং ফ্যাগিন দুজনেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে চারদিকে বাড়ির খুঁজে দেখলো, কিন্তু কাউকে কেন কারোর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলো না।

ফ্যাগিন শান্ত ও নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'ও তোমার দেখার ভুল। আসলে তুমি কিছুই দেখো নি মঙ্কস।'

'না, না আমি দেখতে কোনো ভুল করিনি। আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি স্পষ্ট একটি মেয়ের ছায়া সরে যেতে দেখেছি। আমার এই দেখার মধ্যে কোনো ভুল থাকতে পারে না।'

ফ্যাগিন তখন না বলে থাকতে পারলো না, 'ও বাড়িতে কোনো মেয়ে থাকে না। তাই তার ছায়া দেখার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।'

মঙ্কস আর কথা না বাড়িয়ে রাগে গজরাতে গজরাতে চলে গেলো।

।। আট ।।

পরের দিন ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে নর্দমার মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায় অলিভারের জ্ঞান ফিরে এলো। কোথায় সে আছে, বা কারা সেখানে তাকে ফেলে গেছে, প্রথমে কিছুই মনে করতে পারলো না সে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবার জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো সে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেলো সে। সে তখন বুঝে গেছে এই শীতে নর্দমায় ঠাণ্ডা জলে এভাবে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকলে নির্ঘাত তার মৃত্যু হবে সেখানে। তাই কষ্ট হলেও কোনো রকমে সেই নর্দমা থেকে উঠে এসে হাঁটতে শুরু করলো সে। মাথা ঘুরছে, পা দুটো কাঁপছে, তবু তার পথ চলা থামলো না। এক সময় সামনে একটা বিরাট বাড়ি দেখতে পেলো সে। সেখানে গিয়ে একটু খাবার আর একটা আশ্রয় চাইবে বলে ভাবলো অলিভার। কিন্তু বাড়ির ফটক পেরিয়ে বাগানের মধ্যে পা দিতেই চমকে উঠলো সে, আরে এই বাড়িতেই তো তারা গতকাল ডাকাতি করতে এসেছিল। একবার ভাবলো সে পালিয়ে যাবে, কিন্তু পালিয়ে সে যাবেই বা কোথায়? তাই সে মনস্থির করে ফেলে এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লো। কিন্তু তার শরীর তখন এতোই দুর্বল ছিলো যে, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।



গতকাল সাইকস যে বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল, গাইলস হচ্ছে সেই বাড়ির খানসামা আর ব্রিটলস হলো 'বয়', মানে যাকে বলে বালক ভৃত্য। খুব অল্প বয়সেই এই বাড়িতে কাজে লেগেছিল ব্রিটলস কিন্তু এখন তার বয়স তিরিশোর্দ্ধ হলেও তার 'বয়' নামটা ঘোচেনি। তবে আর একজন বহিরাগত লোক দুটো কুকুর নিয়ে রাত কাটাতো ওই বাড়ির রোয়াকে শুয়ে, সে ছিল একজন ঝালাইওয়ালা। এরা তিনজন পুরুষ ছাড়া বাড়ির অন্য বাসিন্দারা সবাই মহিলা। গতকাল রাতে সাইকস আর তার সঙ্গীদের পিছনে ধাওয়া করেছিল এই তিনজন পুরুষ, সঙ্গে দুটি কুকুরও ছিল। বেশ খানিকটা পথ ধাওয়া করার পর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে একটু সময়ের জন্যে থামলো।

দলের মধ্যে সবচেয়ে ভারিক্কি আর মোটাসোটা চেহারার লোকটি মন্তব্য করলো, 'আর এগোনা ঠিক হবে না, তাই আমার মতে এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। চলো, বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক।'

গাইলসের কথা শুনে দ্বিতীয় লোক ঝালাইওয়ালা আতঙ্কিত গলায় বলে উঠলো, 'মিস্টার গাইলসের সঙ্গে আমি এক মত।'

তৃতীয় লোকটি, অর্থাৎ ব্রিটলস বললো, 'মিস্টার গাইলসের পরামর্শ অস্বীকার করার মতো স্পর্ধা আমার নেই।' কথা বলতে গিয়ে তার দাঁতগুলো অসম্ভব কাঁপছিল।

'কাঁপছো কেন, তুমি কি ভয় পেয়েছো ব্রিটলস?' গাইলস জিজ্ঞেস করলো।

'না, ভয় পেতে যাবো কেন?' ব্রিটলস অস্বীকার করলো।

'তুমি মিথ্যে কথা বলছো।'

ব্রিটলস্ পাল্টা অভিযোগ করলো, 'বরং আপনি মিথ্যে বলছেন মিস্টার গাইলস!'

যাই হোক ওদের দু'জনের মতবিরোধ মিটমাট করে দিলো ঝালাইওয়ালা। সে বললো, 'সত্যি কথা বলতে কি, এখানে আমরা সবাই ভয় পেয়েছি, কেউ কম, কেউ বা বেশী।'

তারপর তারা তিনজনে এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে চললো বাড়ির দিকে। তখন রাতের আঁধার ঘুচে গিয়ে পূর্বাকাশে এক চিলতে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ফিরে এসে তারা রান্না ঘরে বসে তারা তাদরে চায়ের আসরে গত রাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিল। গাইলস এ বাড়ির প্রধান পরিচারক, সে হিসেবে সে তার মর্যাদা রাখতে সব সময় একটা গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে এবং অন্য সব চারকদের সঙ্গে যতোটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। কিন্তু গতরাতে সেই লোমহর্ষক ডাকাত ধরার অভিযানে সে নেতৃত্ব দিয়েছিল বলে আজ সে চিরাচরিত স্বভাব বদল করে সবার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করছে, মিশছে এবং বলাবাহুল্য একটু যেন বেশীই কথা বলছে,। তার হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে বাড়ির ঝি আর রাঁধুনী হাঁ করে গিলছিল তার প্রতিটি কথা।

'তারপর, তারপর কি হলো?' গাইলস একটু থামতেই রাঁধুনী বলে উঠলো, 'থামলে কেন বলো!'

'হ্যাঁ, রাত তখন প্রায় দুটো হবে। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম, কিন্তু একটা শব্দ হতেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। প্রথমে মনে হলো, বোধহয় স্বপ্ন দেখছি, তাই আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আবার সেই শব্দ, তখন আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। বিছানায় উঠে বসলাম। ভাবলাম, চোর আসুক কিংবা ডাকাত আসুক, এবার চুপ করে না থেকে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।'

'সে কি?' ঝি আর রাঁধুনী দু'জনে এক সঙ্গে কথাটা বলে গাইলসের আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলো। 'তোমার তো কম সাহস নয়, ডাকাতদের ধরতে গেলে?'

গাইলস একথা একটু গম্ভীর স্বরেই বললো, 'সাহস কি এমনি এমনি হয়, তাগিদ থাকলে আপনা থেকেই মানুষের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। ব্রিটলস্ বেচারা তখন ঘুমচ্ছিল নাক ডাকিয়ে। তাই ঠিক করলাম ওকে তুলতে হবে তা না হলে ডাকাতরা হয়তো ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে খুন করে রেখে যাবে, ওর যা গভীর ঘুম টেরও পাবে না। তাই নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম। বললাম, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'তা ও কি ভয় পেলো?' রাঁধুনী জিজ্ঞেস করলো।

'একেবারেই না। কারণ ও যে আমারই তো সাহসী কিনা।'

ঝি বললো, 'আমি হলে কিন্তু ভয়ে মরেই যেতাম।'

ব্রিটলস বললো, 'তা তো মরবেই, কারণ তুমি যে মেয়েমানুষ!'

গাইলস তাকে সমর্থন করে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো ব্রিটলস্! মেয়েমানুষেরাই তো ভয় পেয়ে থাকে, কারণ তারা যে অবলার জাত!'

তাদের কথার মাঝে বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই গাইলস্ এবং অন্য সবাই চমকে

উঠলো। ঝি আর রাঁধুনী ভয়ে আঁতকে উঠে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেললো। গাইলস দলনেতার মতো হুকুম করলো, 'যাও, দরজাটা কেউ খুলে দাও!'

কিন্তু ভয়ে কেউ দরজা খুলতে যেতে চাইলো না। গাইলস তাদের ভয়ার্ত মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'এতো ভোরে কে আবার এলো? বড় সন্দেহজনক ব্যাপার। যাই হোক, কেউ গিয়ে দরজাটা খুলে দাও।'

গাইলস এবার ব্রিটলসের দিকে তাকালো। ব্রিটলস্ অবাক চোখে তার দিকে এমন করে তাকালো ভাখানা এই যে, গাইলস যেন কখনও তাকে এতো বড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে বলতে পারেনা। ওদিকে ঝালাইওয়ালাকে দেখা গেলো, হঠাৎ রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হয়েছে তার দু'চোখে। আর মেয়েদের ভয় পাওয়ার কথা যতো কম বলা যায় ততোই ভালো।

গাইলস এবার গম্ভীর স্বরে বলেলা, 'ঠিক আছে, ব্রিটলস্ যখন এতোই ভয় পাচ্ছে, তখন আমি বলি কি, তার সঙ্গে আমরাও সকলে একসঙ্গে দরজা খুলতে যাই, কি তোমরা আমার সঙ্গে একমত তো?'

একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করার মতো ঝালাইওয়ালা হঠাৎই যেন আবার ঘুম থেকে জেগে উঠে বললো, 'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

এবার সবাই এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো

অলিভারকে দেখে গাইলস যেন ভূত দেখার মতো করে চমকে উঠে বললো, 'আরে এযে সেই কালকের বিচ্ছু ডাকাতটা। একে চিনতে পারছো ব্রিটলস্ আর ঝালাইওয়ালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতো সেই ছোকরাই বটে! এই বলে সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো। কিন্তু গাইলস তাদের সবাইকে টেক্কা দিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে বাচ্চা অলিভারকে একরকম কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির ভেতরে এসে মেঝের ওপর শুইয়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকলো, 'কর্তামা, দিদিমণি, দেখবে এসো আমি কেমন ডাকাত ধরেছি। কাল আমি এই খুদে ডাকাতটাকেই গুলি করেছিলাম।'

গুলির কথা শুনেই একজন যুবতী মেয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালো এবং অলিভারকে না দেখেই ব্রিটলসকে পাঠিয়ে দিলো ডাক্তার আর পুলিশকে খবর দেবার জন্য।

যথারীতি সকালের প্রাতঃরাশ সারতে বসলেন দু'জন রমণী একজন বয়স্কা এবং অপরজন যুবতী, বয়স প্রায় বছর সতেরো হবে, মেয়েটি রীতিমতো সুন্দরী। তাদের খাবার পরিবেশন করতে থাকলো গাইলস।

বয়স্কা মহিলা চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রিটলস কতক্ষণ হলো গেছে বলো তো?'

গাইলিস দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিসেব করে বললো, 'এক ঘণ্টা বারো মিনিট কর্তামা!'

'কুঁড়ের বাদশা ও।'

গাইলস বললো, 'হ্যাঁ কর্তামা, ব্রিটলস ছেলেটা বরাবরই ওইরকম।'

মৃদু হেসে মেয়েটি বললো, 'ছেলেটি রাস্তায় আবার অন্য ছেলে দেখলে তার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে দেয়।' বলে হাসলো মেয়েটি।

মেয়েটি ঠাট্টা করে বললো বুঝতে পেরে গাইলসও হেসে ফেললো। এই সময় একজন মোটসোটা ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে কোনো ভূমিকা না করেই বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ, মিসেস মেইলি একি কাণ্ড! শুনলাম, কাল রাত্রে আপনার বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছিল? তা আমাকে তখনি খবর দিলেন না কেন? কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! অতো রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ি চড়াও হওয়া। এ্যাঁ, মিস রোজ, আপনি কি বলেন?'

বক্তা হলেন এ বাড়ির হাউস ফিজিসিয়ান ডাঃ লসবার্ন।

'পরে এ ব্যাপারে কথা হবে,' এই বলে মিস রোজ পত্রপাঠ ডাক্তারকে অলিভারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোগী দেখতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো ডাঃ লসবার্নের। তারপর তিনি নিচে নেমে এসে মিসেস মেইলি এবং মিস রোজকে নিয়ে গেলেন অলিভারকে দেখবার জন্যে।

প্রায় নিঃশব্দে আলতো পা ফেলে তাঁরা অলিভারের ঘুরে ঢুকলেন। অলিভারকে দেখামাত্র রোজ অবাক হয়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার অমন কচি বয়স দেখে কেমন যেন মায়া হলো রোজের। অলিভারের কাছে গিয়ে তার অবিন্যাস্ত চুলে বিলি কাটতেই সে ছলছল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অলিভারকে দেখে মিসেস মেইলি বলে উঠলো, 'বেচারা! এমন নিষ্পাপ দেখতে ছেলে কখনোই ডাকাত দলের লোক হতে পারে না।'

'আপনি যতোই ওকে বেচারা বলুন না কেন, মিসেস মেইলি,' ডাক্তার লসবার্ন বললেন, 'বাইরের চেহারা দেখে কাউকে ঠিক বোঝা যায় না। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে?'

'কিন্তু তাই বলে,' মিস রোজ প্রশ্ন করলো, 'এতো কম বয়সে?'

উত্তরে ডাঃ লসবার্ন বললেন, 'কম বয়সেই তো ছেলেমেয়েরা অতি সহজেই এই সব পাপ-চক্রের খপ্পরে পড়ে থাকে।'

'কিন্তু এমনও হতে পারে,' রোজ তার যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'হয়তো মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা কিংবা বাড়ির সুন্দর পরিবেশ এই ছেলেটির কপালে কোনোদিন জোটেনি। আবার এমনও হতে পারে, অনাদর, অবহেলা, অত্যাচার আর পেটের জ্বালাতেই ও বদসঙ্গে মিশে থাকবে।' তারপর সে তার পিসীমার দিকে ফিরে বললো, 'সে যাই হোক, ওর বিরুদ্ধে পুলিশ-কেস করো না, ওকে জেলে পাঠিয়ো না।' ক্ষমা করে দাও ওকে।'

বাচ্চা ছেলে অলিভারকে দেখা মাত্র রোজের মতো মিসেস মেইলির হৃদয়ও গলে গেছিলো, ছেলেটিকে তাঁর মনে ধরেছিল। তাই রোজ অনুরোধ করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গেই অলিভারকে ডাকাতি করায় অপরাধ থেকে কি উপায়ে বাঁচানো যায়, এ ব্যাপারে তিনি ডাঃ লসবার্নের কাছে পরামর্শ চাইলেন।

এ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা-ভাবনা করে ডাঃ লসবার্ন অবশেষে জানালেন যে, হ্যাঁ তিনি ছেলেটিকে জেলে পাঠানোর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন, তবে একটা শর্তে। গাইলস এবং ব্রিটলস্‌কে ধমক দেবার অধিকার দিতে হবে তাঁকে। তবে সেই অযথা ধমকানির খেসারত হিসেবে মিসেস মেইলি তাদের না হয় কিছু বকশিস দিতে পারেন। ডাঃ লসবার্ন আরও জানালেন, ইতিমধ্যেই তিনি বেশ কিছুটা কাজ এগিয়ে রেখেছেন। যেমন, অলিভারের অবস্থা সংকটজনক বলে কনস্টেবলকে ঠেকিয়ে রেখেছেন, অলিভারের সঙ্গে তাকে এখনও পর্যন্ত দেখা করতে দেননি।'

মিসেস মেইলি এবং মিস রোজ দু'জনেই ডাক্তারের শর্তটা মেনে নিলেন।

ওদিকে গাইলস নিচে রান্নাঘরে রীতিমতো খোসগল্পে জমিয়ে বসেছিল। ব্রিটলস্, ঝালাইওয়ালা, রাঁধুনী আর ঝিয়ের কাছে তার বীরদর্প ও সাহসের কাহিনী শোনাচ্ছিল সে। পুলিশ কনস্টেবলও ছিল সেখানে। এই সময় ডাঃ লসবার্ন তাদের সেই আড্ডায় এসে হাজির হলেন।

দু'একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার পর ডাঃ লসবার্ন কাজের প্রসঙ্গে এলেন ঃ 'এ পর্যন্ত ছেলেটির সম্পর্কে আমি যা শুনেছি বা জেনেছি তা থেকে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, গাইলস, তুমি বোধহয় ভুল করছো। যাই হোক, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'বলুন, কি জানতে চান?'

'তুমি শাস্ত্র মানো তো?'

'হ্যাঁ, মানি বৈকি!' উত্তরে গাইলস বললো।

'আর ব্রিটলস্ তুমি?'

'অবশ্যই! মিস্টার গাইলস যখন মানেন, তখন আমিও কি না মেনে থাকতে পারি?' ব্রিটলস্ বললো।

'বেশ' ডাক্তার লসবার্ন এবার বেশ ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'খুব ভালো কথা! আচ্ছা, তোমরা কি জোর দিয়ে বলতে পারো, ওপরের ঘরে যে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে সেই কাল রাতে এ বাড়িতে ডাকাতি করতে ঢুকেছিল? এখানে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, পুলিশী তদন্তে তোমাদের অনুমান যদি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়। তাহলে যমরাজ যমদূত পাঠিয়ে তোমাদের সেই মিথ্যে বলার উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবেন।' তারপর তিনি কনস্টেবলের দিকে ফিরে বললেন, 'কনস্টেবল, এদের জবাবটা তোমার রেকর্ড বুকে নোট করে রাখো।'

গাইলস এবং ব্রিটলস্ দু'জনে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে, কি উত্তর দেবে, চোখের ভাষায় এ ও কে জিজ্ঞেস করলো। ঠিক সেই সময় সদর দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। 'ওই বোধহয় দারোগাবাবু এলেন,' কনস্টেবল বললো।

হ্যাঁ, দারোগা ব্ল্যাদার্স তাঁর সহকারী ডাফকে সঙ্গে নিয়ে এসে ঢুকলে ডাঃ লসবার্ন ধীরে সুস্থে বেশ গুছিয়ে গত রাতে এ বাড়িতে ঘটে যাওয়া সব কাহিনী বললেন এক এক করে।

সব শুনে দারোগা ব্ল্যাদার্স বললেন, 'এ নিশ্চয়ই খেত-খামারের কাজ নয়, কি বলো ডাফ?'

'অবশ্যই না!' দারোগাবাবুর সহকারী ডাফ তাঁর কথায় সায় দিলেন।

ডাঃ লসবার্ন তখন বলেন, 'দেখুন দারোগাবাবু, খেত-খামার বলতে আপনারা যদি গেঁয়ো-মানুষ বোঝাতে চান তাহলে বললো, আপনাদের অনুমান যথার্থ, হ্যাঁ, এটা গেঁয়ো-মানুষের কাজ হতেই পারে না।'

'হ্যাঁ, তা না হয় হলো,' দারোগা ব্ল্যাদার্স এবার জানতে চাইলেন, 'এখন বলুন, যে ছোকরা-ডাকাতটাকে চাকর-বাকররা ধরেছিল বলছিল.................'

লসবার্ন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওসব একেবারে বাজে কথা। ভয় পেয়ে তারা যা-তা বলেছে। সেই ছেলেটির সঙ্গে এই ডাকাতির কোনো সম্পর্কই নেই!'

লসবার্নের বক্তব্য অস্বীকার না করলেও দারোগা কিন্তু অলিভারকে জেরা করে তার প্রকৃত পরিচয় জানার জন্যে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি আবার এও বললেন, 'ছোকরাটা কে, কোথা থেকে এলো, এসব তো আমাদের জানতে হবে! সে তো আর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেনি?'

ডাঃ লসবার্ন তখন দারোগাকে রুখতে শেষ বারের মতো চেষ্টা করলেন ঃ 'দেখুন দারোগাবাবু, ছেলেটি এমন ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ যে, চিকিৎসক হিসেবে আমি এখন কিছুতেই তাকে বিরক্ত করার অনুমতি দিতে পারি না। আপনি যদি তার সঙ্গে একান্তই দেখা করতে চান, তাহলে আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

ডাক্তারের যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না দারোগা ব্ল্যাদার্স। তাই তিনি ঠিক করলেন, আগে তিনি বাড়ির ঝি-চাকরদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ডাকাতরা কোন্ পথ দিয়ে এসেছিল সেটা খুঁটিয়ে দেখবেন।

একটু আগে ডাঃ লসবার্নের কাছে ধমক খেয়ে গাইলস এবং ব্রিটলস্ খুব ঘাবড়ে গেছিলো, তাই দারোগার কঠোর জেরার উত্তরে উল্টোপাল্টা এজাহার দিতে থাকলো, এর ফলে অলিভারের ওপর পুলিশের সন্দেহ একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেলো।

ডাঃ লসবার্ন মনে মনে খুব খুশী হলেন, অলিভার সম্পর্কে পুলিশের মনোভাব বদলাতে পেরে। তাই খুশীতে ডগমগ হয়ে ঝি-চাকরদের পুলিশী জেরা শেষ হয়ে গেলে পর তিনি দারোগা আর সহকারীকে আকণ্ঠ মদ খাইয়ে দিলেন। তাঁরাও ভরপেট মদ খেতে পেয়ে খুব খুশী। ওদিকে তাঁদের মন থেকে অলিভারের ওপর সব সন্দেহ তখন মুছে গেছে। এর পর তাঁরা এই ডাকাতি কোন্ দলের কাজ হতে পারে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকলেন।

ফিরে যাবার আগে দারোগা আর তাঁর সরকারী ঘরে ঢুকে অলিভারকে দেখলেন বটে, কিন্তু ডাঃ লসবার্নের পরামর্শ মতো তাকে কোনো জেরা করলেন না। তবে তাঁরা একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে যদি একান্তই এড়ানো না যায় তাহলে অলিভারকে অন্তত একবার আদালতে হাজির করতে হবে। আর সে যাতে হাজির হয় তার জন্যে মিসেস মেইলি এবং ডাঃ লসবার্ন জামিন থাকবেন। ওঁরা দু'জনেই এই শর্ত মেনে নিলেন। দারোগা ব্ল্যাদার্স এবং তার সহকারী চলে যাবার সময় ডাক্তার তাঁদের দুজনের হাতে একটা করে গিনি তুলে দিলেন, তাঁরা খুব খুশী হয়ে ফিরে গেলেন।



অলিভারের অসুখটা সত্যি সত্যিই বেশ কঠিন ছিল, আর তাই কি সেই রোগ নিরাময় হতে একটু বেশী সময়ই লাগলো। বেশ কয়েক সপ্তাহই তো বটেই! সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর সে তার আশ্রয়দাত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের জীবনের করুণ কাহিনী জানালো সবিস্তারে। সব বলার পর সে তার কচি কচি ছোট ছোট হাতদুটো জড়ো করে তাঁদের কাছে করুণ মিনতি জানালো, তারা যেন তাকে দূরে ঠেলে না দেন। এবং সে বলে, তাঁরা তাকে যে কাজ করতে বলবেন হাসি মুখে সে সব কাজ করতে রাজী হয়ে যাবে।

তাকে বোধহয় এতো মিনতি জানাতে হতো না, কারণ ইতিমধ্যেই অলিভারের মুখ থেকে তার কষ্টের কথা শুনে রোজের চোখদুটো ছলছল করে উঠেছিল। তার সারা মন অলিভারের প্রতি সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে অলিভারকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'আমাদের খুশী করার জন্যে তোমাকে এতো ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। এই যে তোমার জীবনের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনলাম, যা থেকে আমার পিসীমা তোমাকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, তাতেই আমি খুব খুশী হয়েছি। পরে যদি দেখতে পাই তার করুণা অপাত্রে বর্ষিত হয়নি. তাহলে আমার চেয়ে বেশী খুশী বোধহয় কেউ হতে পারবে না, এমন কি পিসীমাও নয়।

একটা আশার আলো দেখতে পেয়ে কথা প্রসঙ্গে অলিভার জানালো যে, মিস্টার ব্রাউনলোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কে জানে সেই বৃদ্ধ সৎ মানুষটি তাকে ফিরে যেতে না দেখে হয়তো তাকে অকৃতজ্ঞ জোচ্চোর ভাবছেন। সে কথা শুনে রোজ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'এতো ব্যাকুল হচ্ছো কেন, তুমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছো না! একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলে তুমি নিজে গিয়ে মিস্টার ব্রাউনলোর সঙ্গে দেখা করে আসবে। সব শুনে তিনিও নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই অলিভার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। এই সময় সে একদিন মিসেস মেইলির ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সে ডাক্তার লসবার্নকে সঙ্গী করে মিস্টার ব্রাউনলোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে প্রথমেই মিস্টার ব্রাউনলোর বাড়ি চিনতে ভুল করে বসলো। যাই হোক, পরে অনেক কষ্টে তাঁর বাড়িটা খুঁজে বার করলেও কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, সেই বাড়ির সদর দরজায় একটা

সাইনবোর্ড ঝুলে থাকতে দেখলো, তাতে লেখা ছিল, 'বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে।' তখন ডাঃ লসবার্ন নিজের থেকেই পাশের-বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানলো যে, মিস্টার ব্রাউনলো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে গেছেন। তাঁর এক পরিচারিকা আর তাঁর নিত্যসঙ্গী এক বন্ধুও তাঁর সাথী হয়ে চলে গেছে সেখানে।

খবরটা শুনে অলিভার একেবারে মুষড়ে পড়লো। রোগভোগের সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে মনে মনে কতো কথাই না ভেবে রেখেছিল। সে তার কল্পনায় দেখতে পেতো, দীর্ঘদিন পরে মিস্টার ব্রাউনলো আর মিসেস বেডুইন তাকে আবার দেখতে পেয়ে কি আনন্দেই না ফেটে পড়েছেন। যাই হোক, অবশেষে সে ঠিক করলো, বইয়ের দোকানীর কাছে গিয়ে মিস্টার ব্রাউনলোর খবর নেওয়ার কথা বলবেই। ডাঃ লসবার্ন বললেন, 'এতো আশা করে এসেও যখন ব্যর্থ হতে হলো, তখন নতুন করে আবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বইয়ের দোকানীর খোঁজে গিয়ে দেখবে, হয়তো সে মারা গেছে। তাই বলছি, আর নয়। সেখানে গিয়ে শুনবে হয় সে মারা গেছে, নয়তো সে নিজেই নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে অন্যত্র কোথাও পালিয়ে গেছে।

অবশেষে ব্যর্থ হয়ে অলিভার বাড়ি ফিরে এলো। তার মনটা তখন ভীষণ ভাবে হাহাকার করছে, বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

।। নয় ।।

পেন্টনভিলের বাড়িতে আর মন টিকছিল না মিসেস মেইলি এবং মিস রোজের। তাই দিন পনেরো পরে তারা অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের শহরতলীর পল্লী-ভবনে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে দিলেন। নতুন জায়গাটা খুব পছন্দ হলো অলিভারের। এখানে এসে তার মন খুশীর আমেজে ভরে গেলো কানায় কানায়। খোলামেলা জায়গা, উন্মুক্ত আকাশ। এখন বসন্তকাল বসন্তের বাতাস যেন দেহ মনে একটা খুশীর পরশ বুলিয়ে যায়। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ, দরাজ হাতে এখানকার মানুষজনের কাছে তার সমস্ত সৌন্দর্য-সুধা বিতরণ করে দেয়। তাদের পল্লী-ভবনের অদূরেই সবুজ ঘাসে মোড়া ছোট ছোট সারি সারি পাহাড়। চারদিকের এই সবুজ ঘাস, সবুজ তরুবীথির সমারোহ অলিভারের চোখে যেন এক অদ্ভুত মায়াজাল বিছিয়ে দিলো। কাছেই ছিল ছোট্ট সুন্দর মনোরম একটা গির্জা, প্রার্থনা গৃহ, তার প্রাঙ্গনে এদিক-ওদিক কতকগুলো সমাধি ছড়িয়ে ছিল। অলিভার অবসর পেলেই সেই সব সমাধিক্ষেত্রের ধারে ঘুরে বেড়াতো, তখন তার মৃতা মায়ের কথা মনে পড়ে যেতো, চোখের জল আর সামলাতে পারতো না।

এমন সুন্দর শান্ত পরিবেশে অলিভারের দিনগুলো বেশ সুখেই কাটতে থাকলো। প্রতিদিন সকালে তার কাজ ছিল গির্জার কাছেই এক প্রবীণ জ্ঞানী-গুণী ভদ্রলোকের কাছে লেখা-পড়া শিখতে যাওয়া। এই ব্যবস্থাটা মিস রোজই করে দিয়েছিল মিসেস মেইলির নির্দেশে। বিকেল হলেই মিসেস মেইলি এবং মিস রোজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তো সান্ধ্য-ভ্রমণে। পথ চলতে চলতে ওঁরা নানান বই নিয়ে আলোচনা করতেন, আর অলিভার নিবিষ্ট মনে শুনতো ওঁদের কথা। কখনো কখনো শেষ অপরাহ্নে গাছের ছায়ায় বসে আঁধার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সে মিস রোজের বই পড়া শুনতো। এই সময় কখনো যদি তাঁরা অলিভারকে ফুল তুলে আনতে বলতেন, সে তখন খুশীর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ছুটে যেতো তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে। সন্ধ্যার পর তাঁরা বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি ফিরে এসে মিস রোজ পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতো, তার গলাটা ছিল ভারি মিষ্টি। অলিভার মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনতো, সে যেন এক ঘুমপাড়ানি গান, তার গান শুনতে শুনতে কখনো কখনো বা ঘুমিয়ে পড়তো সে।

তবে সবার সেরা দিনটা ছিল তার কাছে রবিবার। গ্রাম উজাড় করে লোক এসে রবিবার সকালে

জমায়েত হতো গির্জার প্রার্থনা সভায়। দরিদ্র মানুষ গির্জার জন্যে আর্থিক সাহায্য করতে না পারলেও তারা তাদের অন্তর দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে ধনী গরিব নির্বিশেষে সবার সঙ্গে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতো।

অলিভার কাজ-পাগলা ছেলে, তাই তার কাজের শেষ ছিল না। ঘর সাজাবার জন্যে গাছ থেকে ফুল তোলা, মিসেস মেইলির পাখিদের জন্যে খাঁচা তৈরী করা, গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করা। এসব ছাড়া আছে পরিচিত প্রতিবেশীদের ফাই-ফরমাশ খাটা। সব কাজই সে বেশ আনন্দের সঙ্গে করতো। আর এ-রকম আনন্দের মধ্যে দিয়ে তার তিনমাস কেটে গেলো। এই অব্যাহত ধারায় আস্তে আস্তে অলিভার মিসেস মেইলির পরিবারেরই যেন একজন হয়ে গেলো। তার মিষ্টি ব্যবহারে পল্লী-ভবনের মানুষজন ভুলেই গেলো যে, মাত্র কয়েকমাস আগেও সে ছিল একজন বহিরাগত, তাদের সম্পূর্ণ অচেনা, তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ওদিকে বসন্ত যায়, মরি হায় হায়, কবিদের আক্ষেপ, কিন্তু তাই বলে প্রকৃতি তো এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না! চিরন্তন ঋতুর আবর্তে তারপরে এলো গ্রীষ্ম। গ্রামটা তখন আরও বেশী সুন্দর, আরও বেশী মন-মুগ্ধকর হয়ে উঠলো যেন।

একদিন দিনের বেলায় হঠাৎ খুব গরম পড়লো। তবে রাতের চেহারা একেবারে অন্যরকম, আগের মতোই সেদিনও চাঁদ বেশ সুন্দর ভাবে আকাশের শোভাবর্দ্ধন করলো, এবং মৃদু-মন্দ বাতাস বইতে শুরু করলো। রোজকার অভ্যাস মতো সেদিনও সন্ধ্যার পর অলিভার, মিসেস মেইলি এবং মিস রোজ পিয়ানোর সামনে বসে আচ্ছন্নের মতো যন্ত্রটার ওপর তার আঙুলের বিলি কাটতে কাটতে হঠাৎ বাজনা থামিয়ে ককিয়ে ওঠার মতো করে কেঁদে উঠলেন। মিসেস মেইলি অবাক চোখে রোজের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারলেন, অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। তিনি তখন রোজকে গান গাইতে নিষেধ করে তাকে শুইয়ে দিলেন বিছানায়।

রোজের হঠাৎ এই অসুস্থতায় মিসেস মেইলিই কেবল চিন্তিত হলেন না, অলিভারও দারুণ উদ্বিগ্নও হয়ে উঠলো। সেদিনই রাতে মিসেস মেইলি অলিভারকে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, 'আমাদের এখন কেবল চিন্তায় ডুবে থাকলে চলবে না, রোজের রোগ নিরাময়ের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে অলিভার। ডাঃ লসবার্নের কাছে এই চিঠিটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দিতে হবে। এখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটা গঞ্জে এটা নিয়ে যেতে হবে। সেখানে একটা সরাইখানায় লোক আছে। তারে মধ্যে কাউকে চিঠিটা দিলেই সে তোমাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে তখনি ডাঃ লসবার্নের কাছে নিয়ে যাবে। তোমার প্রতি আমার আস্থা আছে, 'আমার বিশ্বাস, এ কাজ তুমি ঠিক পারবে।

অলিভার মুখে কিছুই বললো না, তখনি চিঠিটা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ভীষণভাবে অস্থির হয়ে উঠলো।

মিসেস মেইলির হাতে আরও একখানা চিঠি ছিল। সেই চিঠির খামের ওপর হ্যারী মেইলির নাম লেখা ছিল। মিসেস মেইলি জানালেন, কাল পর্যন্ত রোজের অসুখের অবস্থা না দেখে এ চিঠিটা পাঠাতে চান না।

একটু পরেই চিঠি নিয়ে অলিভার বেরিয়ে পড়লো। মিসেস মেইলি তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দাও। পথ-খরচার জন্যে লাগবে।' পথে কতো মাঠ-ঘাটই না পড়লো। ডাক-হরকরাদের মতো ছুটতে ছুটতে অলিভার এসে হাজির হলো একটা সরাইখনায়। মাত্র একটা চিঠি নিয়ে কেউ যেতে চাইলো না সেখানে। যাই হোক, অনেক অনুরোধের পর একজন ডাকবাহী ঘোড়সওয়ারকে কোনোরকমে রাজী করিয়ে সেই চিঠিটা নিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ডাঃ লসবার্নের কাছে। কাজটা

করাতে পেরে অলিভার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তারপর মনের আনন্দে সে যখন সরাইখানা থেকে বেরোতে যাছে, তখনি একজন লম্বাটে, লোকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নিজেকে সামলে নিয়ে অলিভার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কাছে ক্ষমা চাইলো।

লোকটা কিন্তু ক্ষমা করার বদলে উল্টে তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠলো, 'আরে, এ আবার কে? চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি?' এই বলে সে অলিভারকে ভালো করে দেখেই ভূত দেখার মতো করে চিৎকার করে উঠলো, ঃ 'কি আশ্চর্য এয়ে দেখছি আমাদের চোখের মণি অলিভার টুইস্ট! কে জানতো, ও আবার কবর থেকে উঠে এসে আমার পথের মাঝে এসে বাধা সৃষ্টি করবে? না, না, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, কাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই। এই মওকা!' এই বলে সে ঘুষি পাকিয়ে অলিভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। কিন্তু অলিভারের গায়ে হাত দেওয়ার আগেই তার উদ্ধত হাতটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে নিজেই বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, তার শরীরটা সাপের মতো মোচড়াতে থাকলো, সেই সঙ্গে তার মুখ থেকে ফেনা বেরোতে থাকলো।

লোকটার অমন অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলো অলিভার। সঙ্গে সঙ্গে সে সরাইখানার লোকজনদের ডেকে আনলো লোকটার দেখাশোনা করার জন্যে, লোকটার এমন অদ্ভুত আচরণ তাকে ভয়ঙ্করভাবে অবাক করে দিলো। তার কথা ভাবতে ভাবতেই অলিভার বাড়ির পথে রওনা হলো।

বাড়ি ফিরে এসে একটা দুঃসংবাদ পেলো অলিভার, মিস রোজের অবস্থা খুবই খারাপ, অসুখটা হঠাৎই ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে।

ডাঃ লসবার্ন সেদিন গভীর রাতে এসে পৌঁছলেন পল্লী-ভবনে। মিস রোজকে পরীক্ষা করে তিনি জানিয়ে দিলেন তার ভালো হয়ে ওঠার আশা খুবই কম তাকে এখন ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে, এ ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হয় সে মারা যাবে, তা না হলে ভালোর দিকে মোড় নেবে। ডাক্তার লসবার্নের সতর্কবাণী শুনে সারা দিন-রাত অলিভার ও মিসেস মেইলি ভয় বুকে চেপে বসে রইলেন যে যার ঘরে। আহারের কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন তাঁরা।

সন্ধ্যার পর আর একটা রাত নেমে এলে ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনে অলিভার এবং মিসেস মেইলি দুজনেই দরজার কাছে ছুটে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন ডাঃ লসবার্ন। মিসেস মেইলি সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন 'রোজকে কেমন দেখলেন ডক্টর, বলুন?'

ডাঃ লসবার্ন দৃঢ়স্বরে বললেন, 'চিন্তা কিসের? ঈশ্বরের কৃপায় আমি বলছি, রোজ দীর্ঘায়ু হবে, মৃত্যু তার কাছ থেকে বহু, বহু দূরে সরে থাকবে।'



আঁধার করে রাত ঘনিয়ে আসছিল। অসুস্থ রোজের ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর সুন্দর ফুল সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছিল অলিভার। এই সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ির হঠাৎ তার সামনে এসে থেমে গেলো। গাড়ির ভেতর থেকে এক যুবক চিৎকার করে উঠলো, 'এই যে অলিভার! মিস রোজ কেমন আছেন?'

মিস রোজের খবর জানতে চাইছে লোকটি? তবে কি সে, গাড়ি কাছে ছুটে গিয়ে অলিভার জিজ্ঞেস করলো, 'আরে তুমি তো গাইলস, তাই না?'

গাইলস উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে এক যুবক তাকে টপকে সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'পরিষ্কার করে বলো, ভালো না মন্দ?'

অলিভার কাল বিলম্ব না করে বললো, 'ভালো অনেক ভালো।

'ঈশ্বর তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ!' যুবকটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললো, 'বৎস তুমি ঠিক বলছো তো? আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছো না তো?

'না স্যার, আমি আপনাকে বাজে কথা বলতে যাবো কেন? আর ঠাট্টা-ইয়ার্কিই বা করবো কেন? তাছাড়া ডাক্তার সত্যি সত্যিই বলেছেন, মিস রোজের আয়ু বিরাট লম্বা।'

'সে তো খুব ভালো কথা,' এই বলে যুবকটি এবার গাইলসের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি এই গাড়িতে করে নিয়ে আগে মাকে খবর দাও, আমি বরং গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে যেতে মনটা একটু ঠিক করে নিই ততক্ষণে।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার হ্যারী, খবর দেওয়ার ভারটা কোচোয়ানের ওপরেই ছেড়ে দিন,' গাইলস আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আমি এ বেশে ঝি-চাকরদের সামনে গিয়ে হাজির হলে তারা আর আমাকে মানবে না।'

'ঠিক আছে,' হ্যারী এক গাল হেসে বললো, 'কিন্তু তোমার ওই টুপিটা বদলে ফেলতে হবে না, তা না হলে লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।'

'না, না, আমি চাই না লোকে আমাকে পাগল ভাবুক।' এই বলে গাইলস্ নিমেষে তার মাথার টুপিটা বদলে ফেললো, তারপর কোচোয়ানকে গাড়ি হাঁকিয়ে এগিয়ে যেতে বলে তারা তিনজনে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো।

মিসেস মেইলির সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র হ্যারী অভিমানের সুরে বলে উঠলো ঃ 'মা, তুমি আমাকে আগে কেন চিঠি দাওনি?'

উত্তরে মিসেস মেইলি বললেন, 'অনেক আগেই তো তোমাকে চিঠি দেবার কথা ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু মুশকিল হলো কি, ডাঃ লসবার্নের প্রকৃত অভিমত না জেনে আগে-ভাগে তোমাকে কি করে জানাই বলো!'

এদিকে ডাঃ লসবার্নও ঘরেই ছিলেন। তিনি হ্যারীকে মিস রোজের রোগের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। তারপর গাইলসের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, 'গাইলস, এর মধ্যে কাউকে গুলি করে আঘাত করোনি তো?'

গাইলস বেশ বুঝতে পারে ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছেন। কথাটা মনে হতেই ভীষণ লজ্জা পেলো। একটু ইতস্তত করে সে বললো, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, না তেমন কাউকে নয়!'

'চোর-ডাকাতও ধরোনি বোধহয়!'

'না স্যার। একবার ডাকাত ধরতে গিয়ে যে ঝামেলায় পড়েছিলাম, তাতে নতুন করে আবার ডাকাত ধরার কথা ভাবাই যায় না।'

'যা বলেছো, সেবার যাকে ডাকাত বলে ধরেছিল, শেষ পর্যন্ত তোমাদের বর্ণিত সেই খুদে ডাকাতই তোমাদের যেভাবে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিলো,.................

'সেদিনের কথা ভেবে আর লজ্জা দেবেন না স্যার!'

'শুনে বড়ই হতাশ হলাম,' ডাঃ লসবার্ন। বিদ্রূপ করতে ছাড়লেন না। 'যাক সে কথা ব্রিটলস্ কেমন আছে?'

'ভালোই আঁছে সে। সে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে।'

'ভালো, শুনে খুশী হলাম। তা তোমার জন্যেও একটা ভালো খবর আছে গাইলস। তবে সবার সামনে বলা যাবে না,' এই বলে ডাঃ লসবার্ন তাকে ঘরের এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় সেই শুভ খবরটা দিতেই গাইলস্ সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ছুটে গেলো। তার সহকর্মী অন্য সব চাকর-

বাকরদের ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিলো তাদের। তার সেই খাওয়ানোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে সবাইকে জানালো, 'তোমাদের একটা শুভ খবর দিই, ডাকাতির রাত্রে আমার সাহস ও বীরত্বের কথা বলে কর্তারা আমাকে পঁচিশ পাউণ্ড পুরস্কার দিয়েছেন।'



তারপর থেকে রোজ সকালে অলিভার মিস রোজের ঘর সাজাবার জন্যে বাগান থেকে ফুল তুলতে যেতো। হ্যারী মেইলিও এক একদিন তার সাথী হতো। আদর ও যত্নে মিস রোজ একটু একটু করে ক্রমশ সেরে উঠতে থাকলো।

এই সময় কাজের ফাঁকে ফাঁকে অলিভার গভীর ভাবে তার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলো। এইভাবে সে তার এতো দ্রুত উন্নতি করলো যে, সে নিজেই অবাক না হয়ে থাকতে পারলো না। খুশীও হলো তেমনি।

আবার মনটাও বিষণ্ণ হয়ে উঠলো, একদিন সন্ধ্যাবেলা জানালার ধারে বসে পড়াশোনা করতে করতে অলিভার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই তন্দার ঘোরে তার মনে হলো সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে, চারদিকে কেমন যেন দম বন্ধ করা আবহাওয়া, সে যেন ফিরে আবার ফ্যাগিনের আড্ডায় গিয়ে পড়েছে, ফ্যাগিন তার মুখোমুখি বসে আছে। আর তার পাশে বসে আছে অন্য'একজন লোক যাকে সে চেনে না, এর আগে কখনও দেখেনি। লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, যাতে করে কেউ না তাকে দেখতে পায়। অলিভারের আবার এও মনে হলো সে যেন ফ্যাগিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে, ফ্যাগিন যেন সেই অপর লোকটিকে বলছে, 'আস্তে, ছোকরাটা শুনতে পাবে, আমার কি মনে হয় জানো, এ সেই ছোকরাই বটে! আমি কি ওকে চিনতে ভুল করতে পারি? একদল অশরীরী মূর্তি যদি ওর মতো চেহারা নকল করে ওর সঙ্গে মিশে বসে থাকে, তবু তা সত্ত্বেও আমি ওকে ঠিক চিনে বার করতে পারবো। এমন কি পঞ্চাশ ফুট মাটির তলায় আমার অজান্তে, ওকে কবর দিয়ে যদি সেই কবরের পাশ দিয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলেও আমার চিনতে একটুও অসুবিধে হবে না, ওকে ওখানেই কবর দেওয়া হয়েছে। আমি তখন সেই কবর থেকে তুলে আমি ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা অবশ্যই করবো।'

ওদের আলোচনার মধ্যে প্রচণ্ড একটা আক্রোশের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। আধো-ঘুমের মধ্যেই এ হেন আতঙ্কে অলিভারের তন্দ্রা ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়ালেও তার বুকের ধড়ফড়ানি কিন্তু একটুও কমলো না। এবার সে যেন স্পষ্ট দেখলো দু'জন লোক জানালার পাশ থেকে দ্রুত সরে গেলো। তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বুকের কাছে জমা হতে থাকলো, কথা বলার শক্তি সে হারিয়ে ফেললো। তা মনে হলো ওই জানালা গলিয়ে হাত বাড়ালেই হয়তো সে তাদের স্পর্শ করতে পারবে। অলিভার স্পষ্ট দেখলো, ফ্যাগিন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি মারছে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরাইখানার বেহুঁশ হয়ে যাওয়া সেই লোকটা! সে কেবল একটা লহমার জন্যে! তারপরেই তারা যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। অলিভার মুহূর্তের জন্যে পলক পতনহীন চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ জানালা টপকে বাগানে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলো! চোর! চোর! চোর!'

অলিভারের চিৎকার শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এলো ঘটনাস্থলে। একটা মোটাসোটা লাঠি হাতে নিয়ে হ্যারী মেইলি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলোঃ 'চোরগুলো কোন্‌দিকে গেছে?'

আঙুল দেখিয়ে অলিভার বললো, 'ওই দিকে।'

'ওই দিকে?' তাহলে মনে হয় খানার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। এসো, আমার পিছু পিছু তাড়াতাড়ি ছুটে এসো!' এই বলে হ্যারী লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে তীরবেগে ছুটে চললো। গাইলস আর লসবার্নও ছুটলেন তার পিছু পিছু। কিন্তু তাদের ছোটাই সার হলো। কোথাও তাদের হদিশ পাওয়া গেলো না।

হ্যারী ফিরে এসে বললো, 'অলিভার, তুমি স্বপ্ন দেখে বলোনি তো?'

'না-না, স্বপ্ন নয়!' অলিভার দৃঢ়স্বরে বললো, 'আমি তখন সম্পূর্ণ জেগে স্পষ্ট দেখেছি, হ্যাঁ দুজন লোককেই জানালার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখেছি।'

'দু'জন? তা তারা দুজন কে, কে?' হ্যারী আর ডাঃ লসবার্ন দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

'ফ্যাগিন আর সেই লোকটা, সরাইখানায় যে আমাকে মারতে এসে নিজেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল!'

এইসব কথা শোনার পর তারপর তারা আবার চারদিক খুঁজে দেখলো। শুধু তাই নয়, পরের দিন অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে গঞ্জে গিয়েও হ্যারী খোঁজ করলো লোক দুটি সম্পর্কে, কিন্তু তাদের কোনো হদিশই পাওয়া গেলো না।



এদিকে মিস রোজ খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভ করলো। এতে সারা পরিবারের মধ্যে খুশীর জোয়ার বয়ে গেলো। সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়ই রোজকে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেতে দেখা যায় মাঝে মাঝে, এই ব্যাপারটা কিন্তু অলিভারের দৃষ্টি এড়ালো না। আড়াল থেকে সে প্রায় মিস রোজকে চোখের জল মুছতে দেখেছে।

একদিন এক সকালবেলায় হ্যারী রোজের কাছে প্রস্তাব রাখলো সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোজ তার সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিলো। এই নাকচ করার ব্যাপারে, সে যুক্তি দিয়ে বোঝায়, 'আমি একজন নিঃস্ব, কপর্দকহীনা মেয়ে। এছাড়াও আমার জীবন কলঙ্কে ভরা। তাই আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে আমি তোমার উন্নতির পথে কাঁটা হয়ে যেতে পারি। না, আমি তা হতে চাই না। এ কথা সত্য যে, আমার নামে ওইসব অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও আমি নির্দোষ, কিন্তু আমার কথা কে শুনবে? তাই আমি কাউকেই আমার সেই সব কলঙ্কের সঙ্গে কাউকে জড়াতে চাই না। বিশেষ করে তোমার সঙ্গে তো নয়ই! তবে তোমার অবস্থা অন্যরকম হতো, অর্থাৎ যদি তোমার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এতো উঁচুতে না হতো, তাহলে হয়তো তোমার এই প্রস্তাব আমি বিনা দ্বিধায় হাসিমুখে মেনে নিতাম। কিন্তু তোমার মতো বিত্তবান ও খ্যাতিমান লোকে বিয়ে করলে সবাই ভাববে অর্থ ও খ্যাতির লোভে আমি তোমাকে বিয়ে করছি।'

এর পর হ্যারী আর কথা বাড়ালো না। তবে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে রোজের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলো। বছরখানেক পরে সে আবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে এবং এই সময়ের মধ্যে রোদ এই ব্যপারটা খুব ভালো করে ভেবে দেখবে এবং তার প্রস্তাবে সায় দেবে।.

।। দশ ।।

মিস্টার বাম্বলের মুখে বিষাদের ছায়া থিক্‌থিক্ করছিল, চোখে উদাস চাহনি। অনাথ-আশ্রমের ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে তিনি তাঁর অতীত জীবনের কথা ভাবছিলেন। তাঁর পোশাকে অনেক শিথিলতা এসেছে, অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, তার পদেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি এখন অনাথ-আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক

আর নন, মিসেস কর্নিকে বিয়ে করে আশ্রমের সর্বময় কর্তা হয়েছেন। তাঁর জায়গায় তত্ত্বাবধায়কের কাজ করছেন অন্য আর একজন লোক।

মিস্টার বাম্বলের মুখ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তারপর হতাশ গলায় তিনি বললেন, 'কাল পুরো দু'মাস পূর্ণ হবে। দুটো বছর তো নয় যেন একটা যুগ কেটে গেছে। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো, আজ থেকে দু'বছর আগে আমি মাত্র ছ'খানা চামচ একজোড়া রুপোর বাটি, একটা দুধের গামলা কিছু পুরনো আসবাব আর কুড়িটা পাউণ্ডের বিনিময়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলাম। বড় সস্তায় নিজেকে দিয়েছি, জলের মতো সস্তা দরে।'

'সস্তা! জলের দরে?' পিছন থেকে মৃদু চিৎকার করে কে যেন বলে উঠলো, 'তোমার আবার কিসের দাম শুনি? যে দামেই তোমাকে কেনা হয়ে থাক না কেন, তোমার প্রকৃত দামের থেকে অনেক বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।'

পিছন ফিরে তাকাতেই মিস্টার বাম্বল দেখলেন, সেই কণ্ঠস্বর তাঁর সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর, যিনি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। মিস্টার বাম্বল তাঁর স্বভাবসুলভ রুক্ষ মেজাজে বললেন, 'কি ব্যাপার, এখন এসব কথা উঠছে কেন? এই মুহূর্তে তাঁর চাহনি এমনি ভয়ঙ্কর, যা দেখে অনাথ-আশ্রমের বাসিন্দারা ভয়ে কুঁকড়ে যেতো। ঠিক সেই রকম হিংস্র চোখে তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে তাকালেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী কর্নি তাকে কোনোরকম ভয় না পেয়ে বরং তোয়াক্কা না করে তাঁর স্বামীর হুমকিটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন অট্টহাসি হেসে।

স্ত্রীর এমন সৃষ্টিছাড়া হাসি দেখে মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন মিস্টার বাম্বল। নড়েচড়ে বসার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না তাঁর মধ্যে। তিনি যেন সংসার-ধর্ম সব কিছুই ভুলে গেলেন তখন।

'তুমি কি ভেবেছো, আজ সারাটা দিনই তুমি অমন মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে?' মিসেস বাম্বল উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন,

উত্তরে মিস্টার বাম্বল ততোধিক উত্তেজনাপূর্ণ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি যা খুশী তাই করবো। সে অধিকার অবশ্যই আমার আছে অস্বীকার করতে পারো?'

'তোমার অধিকার?' মিসেস বাম্বল ওরফে কর্নি গলা আরও চড়িয়ে ততোধিক রুক্ষ মেজাজে বললেন, 'কি রকম?'

'অধিকার যেমন হয়ে থাকে। এই ধরো সব কিছু করার একচেটিয়া অধিকার পুরুষের আছে। আমিও পুরুষ, অতএব তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। আমি মনে করি, মেয়েদের অধিকার বলতে বোঝায় শুধু পুরুষদের হুকুম তামিল করা।'

মিসেস বাম্বল এবার রাগে ফেটে পড়লেন। 'তুমি একটা জানোয়ার, তোমার জঙ্গলেই স্থান হওয়া উচিত! তোমার মতো জানোয়ার ছাড়া এ ধরনের অমানবিক কথা কেউ বলতে পারে? তুমি মানুষ নও, একটা গর্দভ মাত্র!' তারপর মিসেস বাম্বল আর একটা কথাও বলতে পারলেন না, উল্টে রাগে উত্তেজনায় এবং অভিমানে চোখের জল আর সম্বরণ করতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন।

মিস্টার বাম্বল তাতে একটুও বিচলিত হলেন না। বরং স্ত্রীর কান্না দেখে বিদ্রূপ করে বললেন, 'হ্যাঁ কাঁদো, খুব করে কাঁদো। শুনেছি চোখের জলে ধুলে মুখের ময়লা মুছে যায়, চোখের ব্যায়াম হয়, মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। তাই যতো পারো কেঁদে নাও।' এই বলে তিনি খোশ মেজাজে ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

মিস্টার বাম্বল সবে মাত্র দরজা পর্যন্ত গেছেন, ঠিক সেই সময় তাঁর মাথা থেকে টুপিটা যন্ত্রচালিতের মতো উড়ে গেলো। তাঁর স্ত্রী কর্নি তাঁর গায়ে বেশ গোটা কয়েক কিল বসিয়ে দিলেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে ক্ষেপা কুকুরের মতো হাতের

নখ দিয়ে চোখ-মুখ আঁচড়াতে লাগলেন। শেষে আরও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেন তিনি, স্বামীর চুলের মুঠি ধরে টেনে ধরে বললেন, 'উঠে পড়ো শিগ্‌গীর! তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। তা না হলে তোমার কপালে এর চেয়েও ঢের বেশী দুর্ভোগ আছে, বুঝলে?'

মিঃ বাম্বল দুর্ভোগের ভয়ে তাড়াতাড়ি টুপিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন। বেরোবার সময় মিস্টার বাম্বল শুনতে পেলেন, বাইরে একটা ঘরের ভেতরে কতকগুলো অনাথা মেয়ে সোরগোল পাকিয়ে বসেছে। স্বভাবসুলভ কর্তৃত্বের ভঙ্গিমায় মিস্টার বাম্বল ঘরে ঢুকতে যেতেই মিসেস বাম্বল ঘরে ঢুকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তুমি এখনও যাওনি, যাও এখনি দূর হও এখান থেকে!'

মুখ কাচুমাচু করে মিস্টার বাম্বল বললেন, 'কি করবো,' হঠাৎ এরা যে গোলমাল বাধিয়ে বসলো।'

'ওরা গোলমাল করছিল তো তোমার কি?' খিঁচিয়ে উঠলেন মিসেস বাম্বল। সাবধান! এদের ব্যাপারে কখনও নাক গলাতে এসো না। যাও, এখন মানে মানে সরে পড়ো এখান থেকে।'

বেচারা! মুখ নিচু করে চোরের মতোন মিস্টার বাম্বল বেরিয়ে গেলেন অনাথ-আশ্রম থেকে। স্ত্রীর সামনে অমন ভিজে বেড়ালের মতো দেখালে কি হবে, ভেতরে ভেতরে তিনি তখন ভীষণ রেগে উঠেছিলেন। তাই সদর দরজা দিয়ে বেরোবার সময় তিনি তাঁর সেই চাপা রাগ প্রকাশ্যে এনে ফেললেন খুদে দারোয়ান অনাথ-বালকটির মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে। তারপর সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে না থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর ফলে তাঁর চাপা রাগ কিছুটা প্রশমিত হলো। এই সময় আবার কালো আঁধার করা মেঘ গলে গলে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে থাকলো ভূমিতলে। বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে মদের ফরমাস দিলেন তিনি।

শুঁড়িখানায় তখন একজন মাত্র খরিদ্দার ছিল। লোকটা দীর্ঘদেহী, গায়ের রং ময়লা, পরনে মস্তবড় একটা ঢিলে ঢালা কোট। মিস্টার বাম্বল এবং সেই লোকটা আড়চোখে দৃষ্টি বিনিময় করলো কয়েকবার, তবে দু'জনেই নীরবতা অবলম্বন করলো। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই লোকটা নিজের থেকে এই প্রথম কথা বললো, 'মনে হচ্ছে আপনাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি। কিন্তু তখন আপনার পরনের পোশাক অন্যরকম ছিল।'

এবার মিস্টার বাম্বলও সরব হলেন, 'হ্যাঁ, তখন আমি এখানকার অনাথ-আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। আর এখন আমি আশ্রমের কর্তা।'

'তা আপনার পদমর্যাদা বাড়লেও টাকার চাহিদা নিশ্চয়ই একটুও কমেনি?' লোকটা তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো।

'তা তো হবেই!' মিস্টার বাম্বল নিজেকে সমর্থন করে বললেন, 'অনাথ-আশ্রমের কর্মীদের মাইনে এসব কিছু আহামরি গোছের নয়। তাই সৎপথে ভদ্রভাবে যদি কিছু উপরি আয় হয়, তাহলে কেনই বা তারা তা হাতছাড়া করবে বলুন?'

লোকটা তখন বয়কে ডেকে আরও দু'গ্লাস মদের ফরমাস দিয়ে মিস্টার বাম্বলকে বললো, 'তাহলে আসল কথাটাই বলি শুনুন আপনার খোঁজেই আজ আমি এসেছি এই শহরে! সৌভাগ্যবশত একবারের চেষ্টাতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলো। আপনার কাছ থেকে কিছু খবর জানতে চাই, তবে তার জন্যে টাকা আপনি পাবেন। আমার এই কথার যথার্থতা প্রমাণ করতে এই সামান্য কিছু আগাম নিয়ে রাখুন!' এই বলে সে দুটো গিনি গুঁজে দিলো মিস্টার বাম্বলের হাতে।

মিস্টার বাম্বল গিনি দুটো ভালো করে দেখে নিয়ে পকেটস্থ করলেন। লোকটা আবার সরব হলো : 'এবার আমি আমার কাজের প্রসঙ্গে আসছি। কাজটা হলো, আপনাকে আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে বছর বারো আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে করতে হবে। তখন অনাথ-আশ্রমে শীতের এক নিশুতি

রাত্রি। একটি ছেলের জন্ম দিয়ে মারা গেলো তার মা, এক অনাথ রমণী তার সদ্যজাত শিশু পুত্রটিকে অনাথ করে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে গেলো।'

'এ আর এমন নতুন কি বলছেন,' মিস্টার বাম্বলকে বাধা দিয়ে লোকটি বলে উঠলো, 'এরকম ঘটনা এই আশ্রমে আকছার ঘটে থাকে।'

একথায় লোকটা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, 'আপনার আশ্রমে অমন নক্যারজনক অনেক ঘটনার কথা রাখুন তো। আমি এখানে কেবল একটা ঘটনার কথাই বলছি, যে ঘটনার সঙ্গে ছোঁড়াটা কিছুদিন কফিনওয়ালার কাছে কাজ করেছিল। আমি এখন ভাবছি, ছোঁড়াটা কেন যেন নিজের কফিনও সেই সঙ্গে তৈরী করে তার মধ্যে চিরকালের মতো শুয়ে পড়লো না, তা করলে বোধহয় এমন জঘন্য ঘটনা আর ঘটতো না।'

'ওহো, আপনি কি অলিভার টুইস্টের কথা বলছেন। তার মানে আপনি সেই বিচ্ছু, শয়তানটার ব্যাপারে কিছু জানতে চান, তাই না?'

'না, অলিভারের বিষয়ে আর কোনো কথাই শুনতে চাই না, তার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। আমি এখন জানতে চাই সেই বুড়ির কথা, যে কিনা অলিভারের মায়ের দাইয়ের কাজ করেছিল।'

'ও, সেই বুড়ি-দাইমার কথা জানতে চান? আরে সে তো গতবছর শীতকালে মারা গেছে।' মিস্টার বাম্বল বললেন, 'আর কিছু জানতে চান?'

একথা শুনে লোকটা একটু সময় কি যেন ভাবলো, তারপর অনেকটা নিরাশ হওয়ার মতো করে বললো, 'থাকগে, সে যখন মারাই গেছে.........' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে লোকটা চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো, মিস্টার বাম্বল ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী এই বুড়ি-দাইমা সম্পর্কে এমন কোনো গোপন খবর জেনে থাকতে পারে, যে খবর এই লোকটি জানতে চায় আর তাকে সেটা দিতে পারলে তার বিনিময়ে কিছু টাকা সে রোজগার করতে পারে। কারণ তিনি জানেন শ্যালী-বুড়ি মারা যাবার আগে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে কিছু গোপন কথা বলে গেছিলেন। সে কথাটা মনে করে তিনি লোকটাকে বললেন, 'আমি যতদূর জানি সেই বুড়ি-দাইমা তার মৃত্যুর সময় এক মহিলাকে চুপি চুপি কিসব গোপন কথা যেন বলে গেছিলো, আমার বিশ্বাস সেই গোপন কথা শুনলে হয়তো আপনার কিছু কাজ হতে পারে।'

কথাটা শুনে লোকটা আবার চেয়ারে বসে পড়ে বললো, 'আপনার অনুমান যথার্থ। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে মহিলাটির দেখা আমি কি করে পেতে পারি?'

উত্তরে মিস্টার বাম্বলার বললেন, তারজন্যে চিন্তা করবেন না, সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারবো। অবশ্য এর জন্যে আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিতে হবে।'

'বেশ তো তাই হবে। আগামীকাল ঠিক রাত ন'টার সময় এই ঠিকানায় সেই মহিলাটিকে গোপনে নিয়ে আসবেন।' এই বলে সে একটা ছোট্ট কাগজে ঠিকানা লিখে মিস্টার বাম্বলকে দিলো। এর পর সে মদের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

মিস্টার বাম্বল দ্রুত সেই কাগজের লেখাটা পড়ে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, তাতে ঠিকানা থাকলেও কোনো নাম লেখা নেই। তিনি তখন দ্রুত লোকটার পিছু ধাওয়া করে তার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে চিৎকার করে তাকে ডাকতেই সে চিৎকার করে উঠলো, 'এমন কি ব্যাপার হলো যে, আমার পিছু ধাওয়া করতে হলো আপনাকে?'

সেই কাগজের টুকরোটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে মিস্টার বাম্বল বললেন, 'কোনো নাম তো লেখেননি, কার নাম ধরে ডাকবো?

'মঙ্কস।'

গ্রীষ্মের রাত, তার ওপর প্রচণ্ড গুমোট। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এরই মাঝে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝড়ের আভাস বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমনি এক মুহূর্তে বাম্বল দম্পতি এক বস্তির একটা পুরনো জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। বাড়িটার পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে।

'কে, কে ওখানে? আর এগিও না, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।' দোতলা থেকে বাম্বল দম্পতিকে দেখতে পেয়ে একটা লোক বলে উঠলো। খানিক পরেই লোকটা দোতলা থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'এসো, ভেতরে এসো!'

মিসেস বাম্বল প্রথমে একটু দ্বিধা করে তারপর বুকে সাহস এনে দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়লেন। এদিকে মিস্টার বাম্বলও অনেকটা লজ্জায় ও ভয়ে তাঁর স্ত্রীকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

মঙ্কস বললো, 'অন্ধকারে তোমরা ওখানে দাঁড়িয়েছিলে কেন?'

'বড্ড গরম, তাই একটু হাওয়া খেতে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।' মিস্টার বাম্বল বললেন।

'বড্ড গরম লাগছিল, হাওয়া খাচ্ছিলে!' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো মঙ্কস। 'মানুষের মনে যে নরকের আগুন জ্বলছে তা নেভানোর মতো ঠাণ্ডা বাতাস কোনোদিন বয়নি, বইবেও না। যাক, সে কথা থাক, মিসেস বাম্বলের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে মঙ্কস জিজ্ঞেস করলো, 'এ সেই মহিলা নাকি?'

'হ্যাঁ, আপনার প্রয়োজনীয় অনেক খবরই ও জানে, তাই তো ওকে এনেছি।

'ঠিক আছে, এসো!'

তারপর তিনজনে মই বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠলেন, ঘরে ঢুকে সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে লণ্ঠনের শিখাটা কমিয়ে দিলো মঙ্কস। তারপর তারা একটা টেবিলের চারপাশে রাখা তিনখানা চেয়ারে বসলো।

আলোচনার ফাঁকে মঙ্কস জেনে গেলো যে, আগন্তুক মহিলাটি মিস্টার বাম্বলের স্ত্রী। তাই কাল বিলম্ব না করে সে মিসেস বাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলো, 'শুনেছি সেই বুড়ির মৃত্যুর সময় তুমি নাকি তার পাশেই ছিলে? তখন সে তোমাকে কি বলেছিল?

'হ্যাঁ, তুমি মিস্টার বাম্বলের কাছে যে ছেলেটির নাম করেছো, তার মায়ের সম্পর্কে সে আমাকে মৃত্যুর আগে কয়েকটা কথা বলে গেছিলো। উত্তরে মিসেস বাম্বল বললেন।

মঙ্কস এবার বললো, 'তাহলে আমাকে প্রথমে জানতে হবে, কি বিষয়ে সেই বুড়ি-দাইমা তোমাকে বলেছিল?'

'কিন্তু তার আগে আমাকে জানত হবে,' মিসেস বাম্বল বললো, 'আমাকে জানতে হবে, এখবরটা তোমাকে দিলে বিনিময়ে কতো টাকা তুমি আমাকে দেবে?'

'সে শুধু শয়তানই বলতে পারে!' মঙ্কস তীক্ষ্ণস্বরে বললো।

মিসেস বাম্বলও কথা বলতে জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'তাহলে তো তোমারই তা অবশ্যই জানা উচিত!'

মিসেস বাম্বলের এই এসব দৃঢ়তা দেখে মঙ্কস্ বুঝে গেলো, খুবই শক্ত মহিলার পাল্লায় পড়েছে সে। ভালোরকম লোভ না দেখালে তাঁর কাছ থেকে আসল খবরটা বের করা যাবে না। তাই সে খবরটা কেনার জন্য কুড়ি পাউণ্ড দেবার প্রতিশ্রুতি দিলো। এই অল্প দামে খবরটা বেচতে রাজী হলেন না তিনি। যাই হোক, অনেক দর কষাকষির পর পঁচিশ পাউণ্ডে রফা হলো এবং সেই মতো টাকা গুনে টেবিলের ওপর রেখে মঙ্কস্ বললো। 'টাকাটা তো পেলে, এবার খবরটা কি বলে ফেলো।'

মিসেস বাম্বল বলতে শুরু করলেন অতঃপর, 'সেই বুড়ি দাই মারা যাবার সময় ঘরে একা আমিই শুধু ছিলাম তার কাছে। মৃত্যুর আগে সে একটি তরুণীর কথা বলেছিল। সেই মেয়েটিই কয়েকবছর আগে এই ঘরেই ওই বিছানায় শুয়ে একটি সন্তানের জন্ম দিয়েই মারা যায়। মরার সময় সেই মেয়েটি ওই বুড়িকে একটা জিনিস দিয়ে যায় এবং তাকে যায়, সে যেন তার সন্তানের জিনিষটা পরে বেচে দেয়।'

'কি বললেন, সেটা সে বেচে দিয়েছে?' আঁতকে ওঠার মতো করে মঙ্কস বলে উঠলো, 'কবে কার কাছে সেটা সে বেচে?'

'বলতে পারবো না,' মিসেস বাম্বল্ বললেন, 'এই পর্যন্ত বলেই সেই বুড়ি মারা যায়।'

'মিথ্যে কথা!' মঙ্কস্ গর্জে ওঠে। 'আমার সঙ্গে চালাকি করো না।' নিশ্চয়ই সে আরও কিছু বলেছিল। সে কথা না বললে এখান থেকে বেরুবার পথ তুমি পাবে না।'

মঙ্কস-এর হুমকি শুনে মিঃ বাম্বল ভীষণ ভয় পেলেও মিসেস বাম্বল কিন্তু একটুও ভয় না পেয়ে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, 'বললাম তো, এর বেশী কিছু বলেনি বুড়ি। তবে সে তার হাত দিয়ে আমার পোশাক চেপে রেখেছিল, মারা যাবার পর তার হাতটা ছাড়াতে গিয়ে একটা কাগজ পাই, সেটা বন্দকীর রসিদ। আসল মালিকের কাছে জিনিসটা পৌঁছে দিয়ে মোটা টাকা দাঁও মারার মতলবে বুড়ি সেটা অনেক দিন ধরে রেখেছিল কিন্তু দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করার পরেও কেউ যখন সেটা দাবী করতে এলো না, সে তখন সেটা বাধা দেয়। তখন তার খুব অর্থাভাব যাচ্ছিল। বছরের পর বছর ধরে নিয়মিতভাবে সুদ দিতে থাকে সে। রসিদটা পেয়ে আমি সেই জিনিসটা ছাড়িয়ে আনি। কে জানে কখন কার প্রয়োজনে লাগে সেটা!'

'দেখি, কোথায়, কোথায় সেই জিনিসটা?' উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো মঙ্কস্।

'এই তো!' এই বলে মিসেস বাম্বল একটা ছোট ব্যাগ মঙ্কস্-এর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মঙ্কস্ সেটা দ্রুত খুলে ফেলে দেখে, ব্যাগের মধ্যে একটা ছোট্ট সোনার লকেট, লকেটের মধ্যে দুগাছা চুল আর একটা সাধারণ বিয়ের আংটি। আংটিতে 'অ্যাগনেস্' নাম লেখা রয়েছে। তবে কোনো পদবী ছিল না। আর ছিল অলিভারের জন্মের কয়েকবছর আগেকার একটা তারিখ।

মিসেস বাম্বল এবার মঙ্কস্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব নিয়ে তুমি কি করবে? আমার কোনো ক্ষতি করবে না তো?'

'না, কখনোই নয়। কি করবো দেখবে? তবে সাবধান! এক পাও এগিও না, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তোমাদের জীবনের দাম একটা কানা কড়িও থাকবে না।' কথাটা শেষ করেই মঙ্কস হঠাৎ টেবিলটা সরিয়ে ফেলে মেঝের একটা আঙটা ধরে টান দিতেই মিঃ বাম্বলের পায়ের কাছ থেকে একটা গুপ্ত-দরজা বেরিয়ে এলো। মিঃ বাম্বল্ ভয়ে আঁতকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। তারপর মঙ্কসের নির্দেশ মতো তাঁরা সেই গুপ্ত-দরজার নিচে তাকিয়ে দেখলেন, সেখান দিয়ে একটা নদী হয়ে যাচ্ছে। মঙ্কস্ বললো, 'আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে ডুবিয়ে মারতে পারতাম।'

মিঃ বাম্বল শিউরে উঠে বললেন, 'উঃ কি স্রোত! আজ ওই নদীতে পড়লে কাল সকালে তার লাশ এখান থেকে বারো মাইল দূরে গিয়ে ভেসে উঠবে।'

মঙ্কস্ এবার মিসেস বাম্বলের কাছ থেকে পাওয়া জিনিসসমেত ব্যাগটার সঙ্গে একটা লোহার ভারী জিনিস বেঁধে সেটা নদীর জলে নিক্ষেপ করে গুপ্ত দরজাটা বন্ধ করে দিলো। তারপর সে মিঃ বাম্বলকে

বললো, 'আমি তোমার স্ত্রীকে ভয় করি না, কিন্তু তুমি এর পর মুখে কুলুপ এঁটে থেকো, নইলে তোমার বিপদ অনিবার্য। এবার এখান থেকে বিদায় হও!'

।। এগারো ।।

সাইকস্ আগে যে বাড়িতে থাকতো, সেটা ছেড়ে দিয়ে এখন একটা এঁদো গলির ভেতরে একটা নোংরা বাড়িতে উঠে এসেছে, তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে, তার আর্থিক অবস্থা রীতি মতো খারাপ হয়ে গেছে। ছেঁড়া পোশাকে তালি দেওয়া, অসুস্থ সাইকস্ বিছানায় শুয়েছিল। মুখে একগাল দাড়ি। কুকুরটা বিছানার সামনে শুয়ে তার প্রভুর দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। ওদিকে জানালার ধারে বসে নিবিষ্ট মনে সাইকসের একটা ছেঁড়া জামায় তালি দিচ্ছিল ন্যান্সি। গতকয়েক সপ্তাহ ধরে দিবা-রাত্র একটানা সাইকসের সেবা-শুশ্রুষা করার ফলে তার চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

হঠাৎ সাইকস্ জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কটা বাজে?'

'সাতটা বেজে গেছে,' উত্তরে ন্যান্সি বললো, 'কেমন আছো বিল্?'

'আমার আবার ভালো থাকা? একেবারে কাদা হয়ে গেছি ন্যান্সি। হাতটা একবার ধরবে আমার, দেখা যাক এই ক্লান্তিকর বিছানাটা ছেড়ে উঠতে পারি কিনা?'

রোগাক্রান্ত হয়েও সাইকস্ তার বদ-মেজাজ এতটুকু বদলায়নি। উঠে বসতে দিয়ে ন্যান্সিকে এমন খারাপ খারাপ গালিগালাজ করতে লাগলো যে, যা শুনে বেচারী বেহুঁশ হয়ে পড়লো।

এই সময়ে ফ্যাগিন হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললো 'কি ব্যাপার ভায়া?'

সাইকস্ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, 'ওখানে দাঁড়িয়ে অমন চোখ পাকিয়ে কি দেখছো শুনি? পারলে এগিয়ে এসে ওকে একটু সুস্থ করে তোলো, দেখো না ন্যান্সি কেমন বেহুঁশ হয়ে গেছে!'

ফ্যাগিনের পিছন পিছন ধুরন্ধর ও চার্লিও এসেছিল। ধুরন্ধরের বগলে ছিল একটা মোড়ক। সেটা সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চার্লির হাত থেকে একটা বোতল ছিনিয়ে নিলো। বোতলের মদটা একটু পরখ করে দেখে ন্যান্সির মুখে ঢালতে গিয়ে সে বললো, 'চার্লি, তুমি এক কাজ করো, জোরে জোরে পাখার বাতাস করো। আর ফ্যাগিন, তুমি ওর হাতে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে থাকো,। সাইকস্ তুমি এক কাজ করো, ওর পোশাকগুলো একটু ঢিলে করে দাও। ধুরন্ধরের নির্দেশ মতো সবাই যে যার কাজ চট্‌পট সেরে ফেলতেই ন্যান্সি অচিরেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো। ফ্যাগিন বললো, 'বিল্ তোমার জন্য কিছু পোশাক নিয়ে এসেছি।'

সাইকস্ সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'কাজের কাজই করেছো, কিন্তু শুধু পোশাকে তো আমার পেট ভরবে না। আজ রাতে আমার যে, কিছু টাকা চাই ভায়া।'

উত্তরে ফ্যাগিন বললো, 'দুঃখিত আমার কাছে এখন একটা কানাকড়িও নেই।'

'অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না। তোমার বাড়িতে অনেক টাকা আছে।'

'অনেক টাকা?'

'হ্যাঁ, অনেক। ঠিক কতো আছে বলতে পারবো না, আর তুমিও ভালো করে না গুনে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারবে না। মোট কথা আজরাতে কিছু টাকা আমার অবশ্যই চাই।'

'ঠিক আছে, আমি ধুরন্ধরকে দিয়ে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফ্যাগিন।

সাইকস্ আপত্তি জানালো, 'উঁহুঁ তা হবে না। ও নামেও ধুরন্ধর, আর কাজেও ধুরন্ধর। হয় ও এখানে

আসতে ভুলে যাবে। নয়তো পথ হারিয়ে ফেলবে। তা নাহলে কোনো লাল পাগড়ীর ফাঁদে পড়বে। এখানে ফিরে না আশার একটা অজুহাত সে ঠিক বানিয়ে নিতে পারবে। আমি তা হতে দেবো না। তুমি বরং ন্যান্সিকে নিয়ে যাও টাকা নিয়ে আসার জন্য।'

অগত্যা ফ্যাগিন তার দলবল আর ন্যান্সিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হলো। ফ্যাগিনের ঘরে পৌঁছতেই দেখা গেলো সেখানে টোবি ক্র্যাকিট আর টম চিটলিং বসে জুয়া খেলায় মত্ত। ওদের দেখেই সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। রইলো কেবল ফ্যাগিন এবং ন্যান্সি। ফ্যাগিন টাকার বাক্স খুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় নীচে পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলো ফ্যাগিন, কেউ যেন তার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। তার গলার স্বর শুনেই ফ্যাগিন চিনতে পারে আগন্তুককে। ওদিকে ন্যান্সি শিউরে ওঠে।

ফ্যাগিন চটপট বলে উঠলো, 'আরে, এই লোকটারই এখানে আসার কথা ছিল না? যাক্ সে এসে গেছে ভালোই হলো। ন্যান্সি ওর সামনে টাকার প্রসঙ্গ যেন তুলো না। দশ মিনিটের খেল্ দেখিয়েই কেটে পড়বে ও এখান থেকে।'

পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলো মঙ্কস।

ন্যান্সিকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে ফিরে যাবার মতলব করতেই ফ্যাগিন বলে উঠলো, 'ওকে দেখে এভাবে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই ভায়া! এ আমারই শাকরেদদের মধ্যে একজন।'

ন্যান্সি কিন্তু তখনো মঙ্কস-এর দিকে পলক পতনহীন চোখে তাকিয়ে ছিল।

ফ্যাগিন জিজ্ঞেস করে, 'কোনো খবর-টবর আছে নাকি?'

মঙ্কস রহস্য করে বলে, 'হ্যাঁ আছে, খুব দামী একটা খবর আছে ভায়া!'

'ভালো নাকি খারাপ, তা তো বলবে হে?

মঙ্কস চোখ ছোট করে বলে, 'অবশ্যই মন্দ নয়। তোমার সঙ্গে কিছু গোপন আলোচনা ছিল।' এই বলে ন্যান্সির দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালা, সে কিন্তু ঘর থেকে চলে যাবার কোনোরকম ইচ্ছাই প্রকাশ করলো না।'

ন্যান্সিকে বেশী ঘাঁটাতে চাইলো না ফ্যাগিন। চলে যেতে বললে যদি সে চিৎকার করে টাকাটা চেয়ে বসে। এই আশঙ্কায় মঙ্কসকে নিয়ে ওপরতলায় উঠে গেলো ফ্যাগিন তাঁর সঙ্গে গোপন আলোচনা করবার জন্য। ওরা চলে যেতেই ন্যান্সি কালো গাউনটায় নিজের সারা দেহটা মুড়ে ফেললো। তারপর খালি পায়ে নিঃশব্দে চুপি চুপি পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো তাদের গোপন আলোচনার কথা আড়ি পেতে শোনবার জন্য।

ফ্যাগিন ফিরে আসার আগেই ন্যান্সি চলে এসেছিল সেখানে। ন্যান্সিকে কালো মুখ করে বসে থাকতে দেখে ফ্যাগিন বললো, 'আচ্ছা ন্যান্সি, তা তোর মুখটা অমন কালো করে বসে আছিস কেন বল তো?'

'জানি না,' ন্যান্সি বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, 'কতক্ষণ এই গুমোট ঘরে বসে থাকবো? যে জন্যে এখানে আসা, মানে টাকা দাও, চলে যাই।'

কাল বিলম্ব না করে ফ্যাগিন ন্যান্সির হাতে গুনে গুনে টাকা তুলে দিলো। প্রতিটি টাকা দেওয়ার সময় একটা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকলো সে। উত্তেজিত ন্যান্সি টাকাগুলো নিয়ে একরকম ছুটেই বাড়ি ফিরে এলো। ভাগ্য তার ওপর সুপ্রসন্ন এই কারণে যে, সাইকস্ তারপরের দিনই সেই টাকা পেয়ে মনের সুখে মদ গিলতে শুরু করলো, ন্যান্সির আচরণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থা তখন আর তার রইলো না।

সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যান্সির মানসিক উত্তেজনা খুবই বেড়ে গেলো। সাইকস্ কখন মদ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়বে, সেই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকে ন্যান্সি। তবে ন্যান্সির মুখে এমন একটা

বিবর্ণভাব এবং চোখে এমন একটা জ্বালা ফুটে উঠলো যে, নির্লিপ্ত স্বভাবের সাইকস্-এর নজর এড়ালো না। কিন্তু ন্যানসির কাছ থেকে এর কোনো সদুত্তর পেলো না সে।

খানিকক্ষণ বুঁদ হয়ে পড়ে থাকার পর সাইকস্ ন্যান্সিকে তার হাত-পা টিপে দেবার জন্য হুকুম করলো। চকিতে একবার ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে তার মনে হলো, ওর মতো বিশ্বাসী মেয়ে এ জগতে দ্বিতীয়টি আর কেউ নেই। সেরকম না হলে সে যা রাগী লোক, তিনমাস আগেই গলা কেটে ফেলতো।

সাইকসকে ঘুমতে না দেখে ন্যান্সি এবার তার মদে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে কয়েক পাত্তর খেতে দিতেই সে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লো। তা দেখে ন্যান্সি তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করে নিঃশব্দে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাত তখন সাড়ে নটা হবে। রাস্তায় নেমে ন্যান্সি এতো জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো যে, পথচারীরা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো তার গমনপথের দিকে। ন্যান্সির গন্তব্য স্থল এখন হাইড পার্কের দিকে। এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে একটা হোটেলের সামনে এসে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়লো। দারোয়ানকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে। কিন্তু এক তরুণী পরিচারিকা তাকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইলো, 'কি চাই, কোথায় যাচ্ছো?' তার চোখে-মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

উত্তরে ন্যান্সি বলে, 'আমি মিস মেইলির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পরিচারিকা সহজে তাকে ছাড়বার পাত্রী নয়, তার ডাকে একজন পরিচারক এসে ন্যান্সিকে চ্যালেঞ্জ জানালো ঃ 'কি নাম তোমার? তাঁকে তোমার কি দরকার?'

ন্যান্সি তার প্রয়োজনের কথা জানাতে অস্বীকার করলো। পরিচারক তখন তাকে সদর দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে খিঁচিয়ে উঠে বললো, 'তাহলে কেটে পড়ো এখান থেকে।'

ন্যান্সি প্রতিবাদ করে উঠলো, 'এই যদি তোমাদের মতলব হয়, তাহলে আমি তোমাদের পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি, তোমরা দুজনে মিলেও আমাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারবে না।

এই সময়, এক ঠাণ্ডা মেজাজের বাবুর্চি এসে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, 'এই রাত-বিরেতে কি ঝামেলাই না বাধিয়ে তুললে তোমরা। ওহে জো, তেনার কাছে ওর এখানে আসার খবরটা পৌঁছে দাও না কেন? তাহলে তো আর কোনো হাঙ্গামা আর থাকে না।'

বাবুর্চির কথায় কাজ হলো, জো মিস মেইলিকে খবরটা দিতে চলে গেলো। ওদিকে তার আসার অপেক্ষায় ন্যান্সি দাঁড়িয়ে রইলো বিবর্ণ মুখে। এই সময় ন্যান্সি শুনতে পেলো, হোটেলের পরিচারিকারা তার উদ্দেশ্যে কুৎসিতভাবে গালিগালাজ করছে। ন্যান্সি মুখ বুজে সব সহ্য করে গেলো। প্রতিবাদ করলো না।

একটু পরেই জো ফিরে এসে ন্যান্সিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে বসালো।



রোজ ঘরে ঢুকতে ন্যান্সি একটু মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলো, 'আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি যদি আর পাঁচটা মানী ব্যক্তির মতো রাগ করে চলে যেতাম, তাহলে হয়তো সেজন্য আপনাকে অনুশোচনা করতে হতো।'

রোজ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'কেউ যদি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকে, তার জন্যে

আমি খুবই দুঃখিত। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি যেন তার কথায় কান দিও না, মন থেকে মুছে ফেলো সেসব কথা। যাই হোক, এখন বলো, কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো?'

রোজের নিরুত্তাপ ভাব দেখে এবং মিষ্টি কথাবার্তা শুনে ন্যান্সি অবাক হয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বললে, 'আপনার কথায় যথেষ্ট সহৃদয়তার ছাপ উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু আপনি তো আমার আসল পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানেন না। তাই না জানা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এমন সদয়ভাবে কথা বলবেন না। সে যাই হোক, রাত অনেক হয়েছে, এবার কাজের কথাটা বলেই ফেলি। তার আগে বলুন তো ওই দরজাটা বন্ধ আছে তো?'

এ কথায় ভয় পেয়ে গিয়ে রোজ জানালো, 'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু কেন বলো তো?'

উত্তরে ন্যান্সি বললো, 'কারণ আমি কয়েকজনের জীবন আপনার হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছি। আমি চাই না সেটা জানাজানি হোক।' তারপরেই ন্যান্সিকে ভেঙে পড়তে দেখা গেলো।

কথাটা কিভাবে শুরু করবে তা ঠিক করতে না পেরে রোজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবশেষে ন্যান্সি মাথা নীচু করে বললো, 'জানেন আমিই পেন্টনভিলের বাড়ি থেকে অলিভারকে ধরে নিয়ে গেছিলাম ফ্যাগিনের আড্ডায়।'

'তু-তুমি?'

'হ্যাঁ আমিই সেই মহাপাপিষ্ঠা, যে কিনা চোরেদের সাথী। আর জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে কিনা ভালো পরিবেশে বাস করার কোনো সুযোগই পায়নি।

অবাক চোখে রোজ বিচিত্র নারী ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তার মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। ধীর স্থির ও শান্ত গলায় সে বললো, 'তোমার জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হয়।'

'আপনি দয়াময়ী! ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন। খবরটা দেবার জন্যে আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। ওরা জানতে পারলে আমাকে খুন করে ফেলবে।' এখানে একটু থেমে ন্যান্সি জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আপনি মঙ্কসকে চেনেন? ওই নামের কোনো লোককে?'

'কই না তো!'

'সে কিন্তু আপনাকে চেনে। আর আপনি যে এখানে আছেন, তাও তো সে জানে। আমি আড়ি পেতে তাদের কথাবার্তা শুনেছি বলেই আপনার ঠিকানা জেনে এখানে আসতে পেরেছি।'

'কিন্তু ও নাম কখনো আমি শুনিনি,' রোজ বলে।

তাহলে ওই ছদ্মনামে সে আমাদের দলে মেশে। আমার অনুমানও তাই। অলিভারকে আপনাদের বাড়িতে ডাকাতির কাজে লাগিয়ে দেবার কদিন পরেই ওই লোকটা হঠাৎ ফ্যাগিনের সঙ্গে দেখা করে। ফ্যাগিন তাকে নিয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে একটা বন্ধ ঘরে তার সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালায়। আমার কেমন যেন সন্দেহ হতেই ওদের চুপিসারে অনুসরণ করে ওদের গোপন কথাবার্তা শুনি, এবং তা থেকে জানতে পারি যে, অলিভার যেদিন পুলিশে ধরা পড়ে, মঙ্কস সেদিন হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পারে যে, এতদিন সে যে ছেলেটির সন্ধান করছিল অলিভারই হচ্ছে আসলে সেই ছেলেটাই। তখন সে ফ্যাগিনের সঙ্গে পরামর্শ করে মতলব আঁটে। ফ্যাগিন যদি তাকে আটকে রেখে তাকে চোর বানাতে পারে, তাহলে মঙ্কস তাকে মোটা টাকা পাইয়ে দেবে।'

'কিন্তু এর পিছনে তার কি উদ্দেশ্যই বা থাকতে পারে, শুনেছো কি?'

'না, শুনতে পাইনি। কারণ সেই সময় মঙ্কস জানালা পথে আমার ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে। আমারও তখন খুব ভয় হয় ধরা পড়ার ভয়। তাই আমি তাদের পরবর্তী কথাবার্তা না শুনেই সেখান থেকে পালিয়ে নীচে নেমে আসি।'

'তারপর?'

'তারপর ওর দেখা পেলাম আবার কাল রাত্রে ফ্যাগিনের ডেরায়। আগের মতো যথারীতি সে গোপন পরামর্শ করার জন্য ফ্যাগিনকে নিয়ে দোতলার ঘরে চলে যায়।'আমি এবার আমার আপাদমস্তক এমন ভাবে ঢেকে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম যাতে করে সে আমার ছায়া দেখতে না পায় আর পেলেও যাতে চিনতে না পারে। দরজার এপারে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে ওদের সব কথাবার্তা শুনলাম। মঙ্কস ফ্যাগিনকে বললো, 'ছোকরাটার পরিচয়ে একমাত্র চিহ্ন এখন নদীগর্ভে। আর যে বুড়িটা ওর মায়ের কাছ থেকে সেই চিহ্নটা নিয়েছিল, সে বুড়ি এখন কবরে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। মঙ্কস আরও বললো, 'যদিও ওই শয়তানটা ছেলেটার টাকা হাতিয়ে নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই ভোগ করছে, তবে সে অন্যভাবে নিশ্চিন্ত হতে চায়, কারণ তাকে জেলের ঘানি টানিয়েই সে ক্ষান্ত হতে চায় না, পরিণামে ফ্যাগিনের সাহায্যে তার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলিয়ে তার বাপের উইলের শর্ত ভাঙতে পারলে কতো সুবিধেই না হবে তার। অবশ্য ঝামেলার সম্ভাবনা না থাকলে সে নিজে কবেই ছেলেটাকে খতম করে ফেলতে পারতো; কিন্তু তা যখন সে পারছে না তখন অন্যভবে ছেলেটার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বিষময় করে তোলার দিকে মনোনিবেশ করবে সে। সেই সঙ্গে ছেলেটার জন্ম এবং তার মায়ের কলঙ্কজনক চরিত্রের সুযোগ নিয়েও সে তার ক্ষতি করবে।' সব শেষে সে বলে, 'জানো ফ্যাগিন, আমার ভায়ের জন্য এমন ফাঁদ পাতবো যে, তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

রোজ বিস্মিত হয়ে বললো, 'তাই কি?'

ন্যান্সি বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে বলেছে, সে আরও কি বলেছে জানেন? তার বিরুদ্ধে ভগবানের বা শয়তানের চক্রান্তের ফলেই হোক্, অলিভার যখন একবার আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, তখন তার আসল পরিচয় জানার জন্য আপনারা হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ করতেও পিছপা হবেন না। আর কোনো কথা নয়, রাত অনেক হয়ে গেছে, আমি এখন চলি, নইলে ওরা আমাকে সন্দেহ করতে পারে।

রোজ তাচ্ছিল্যের মতো করে বললো, 'তা এ খবর নিয়ে আমি কি করবো? আমার করার কিছু নেই। তাছাড়া, তুমিই বা সেখানে ফিরে যাবে কেন? তুমি তো বলেছো, তোমার সঙ্গীরা সবাই খুব বিপজ্জনক লোক। আমি বরং পাশের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোককে ডেকে আনি, আধ ঘণ্টার মধ্যে সে তোমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় বাখার ব্যবস্থা করতে পারবে।'

ন্যান্সি আপত্তি করে, 'না, না, তা কখনোই করবেন না। আমাকে সেখানে ফিরে যেতেই হবে। ওই চোরেদের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে। ওই চোরেদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। এমন কি যে কলঙ্কময় জীবন এখন আমি যাপন করছি, তা থেকে রক্ষা পাবার উপায় থাকলেও আমি তার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়তে পারবো না।'

রোজ বললো, 'কিন্তু নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যখন একজন বালকের জীবন রক্ষা করার জন্য এতো রাতে ছুটে এসেছো, তখন আমার আশা, তোমার ভুল শোধরাবার উপায় এখনও আছে।' কথা বলতে গিয়ে রোজের দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তারপর সে আবার হাত জোড় করে কাতর অনুনয় করে বললো, 'একজন মেয়ে হয়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ভালো ভদ্র পরিবেশ রেখে তোমাকে ভালো ভাবে বাঁচার সুযোগ দাও আমাকে।'

ন্যান্সি, হাঁটু মুড়ে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললো, 'আপনিই প্রথম আমাকে এতো সব ভালো ভালো কথা বললেন। বছর কয়েক আগেও যদি এমন সব ভালো ভালো কথা শুনতাম, তাহলে হয়তো সৎ পথে থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু এখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে, ফেরার পথ আর নেই।'

রোজ বাধা দিয়ে বললো, 'না, মোটেই দেরী হয়নি। এখনও যথেষ্ট সময় আছে।'

ন্যানসী আর্ত চিৎকার করে উঠলো। 'হ্যাঁ দেরী হয়ে গেছে, আমি বলছি, অনেক দেরী হয়ে গেছে ফেরার পথ সব বন্ধ। তাছাড়া, আমি তাকে এখন কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারবো না, আমি তার মৃত্যুর কারণ হতে পারবো না।'

রোজ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'তার যে মৃত্যু হবে। এ কথাই বা ভাবছো কেন, তুমি?'

ন্যান্সি, জোর দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ আমি বলছি, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। এতক্ষণ আপনাকে যা যা বললাম, তা যদি তাদের কাউকে বলি, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য!'

রোজ বললো, 'ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করো ন্যান্সি, যেমন যে লোক আজ বাজে কাল ফাঁসির দড়ি গলায় দেবে, তবু তার জন্যে কেন তুমি নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছো। তা বুঝতে আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। যাই হোক, তুমি যে খবর আমাকে দিলে, সেটার সত্যাসত্য প্রমাণ করার জন্য তদন্ত করতে হবে। এর পরে হয়তো তোমার আরও সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। তখন তোমাকে কোথায় পাবো বলতে পারো?'

একটু ইতস্তত করে ন্যান্সি বলে, 'আপনি যদি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন, আমার ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, তাহলে খোলাখুলিভাবেই বলতে পারি যে, প্রতি রবিরার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আমি লণ্ডন-ব্রীজের ওপর ঘুরে বেড়াবো, অবশ্য যদি বেঁচে থাকি তবেই। আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, হয় আপনি একা আমার সঙ্গে দেখা করবেন, নয় তো এমন একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন যে, অন্য কারোর কাছে সে এ বিষয়ে অন্য মুখ খুলবে না।'

রোজ এরকম প্রতিশ্রুতি দিলে পর ন্যান্সি চলে গেলো অতঃপর।

।। বারো ।।

রাতে রোজের ভালো ঘুম হলো না। পরের দিন হ্যারীকে চিঠিতে সব ব্যাপার জানিয়ে পরামর্শ নেবে বলে ঠিক করলো সে। কিন্তু পরের দিন সকালে চিঠি লেখার আগেই অলিভার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে খবর দিলো, এই মাত্র সে মিঃ ব্রাউনলোকে একটা বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে, বাড়ির ঠিকানাটাও একটা কাগজে লিখে এনেছে সে। ঠিকানা ক্র্যাডেন স্ট্রীটের একটা বাড়ির। সঙ্গে সঙ্গে অলিভারের সঙ্গে নিয়ে রোজ বেরিয়ে পড়লো একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে।

অলিভারকে বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখে রোজ ভেতরে গিয়ে মিঃ ব্রাউনলোর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তখন মিঃ গ্রীমউইগের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। মিঃ ব্রাউনলো রোজকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'এসো মা এসো! বন্ধু মিঃ গ্রীমউইগের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিঃ ব্রাউনলো তাকে বাইরে চলে যেতে বললেন।

রোজ বাধা দিয়ে বললো, 'না, না উনি এখানেই থাকতে পারেন। আমি যে ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি, সেটা ওঁর অজানা নয়। মিঃ গ্রীমউইগ উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন।

এবার রোজ তার কাজের প্রসঙ্গে এলো। 'এক সময় আপনি আমার এক বালক বন্ধুকে দয়া করেছিলেন। মনে আছে মিঃ বাউনলো? তাকে আপনারা অলিভার টুইস্ট বলেই জানেন।'

ওদিকে মিঃ গ্রীমউইগ একখানা মোটা বই খুলে পড়ার ভান করছিলেন, রোজের মুখ থেকে অলিভারের নামটা শোনা মাত্র বইটা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেলো। হাঁ করে রোজের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

আর মিঃ ব্রাউনলোও রোজের কথায় কম বিস্মিত হননি। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে তিনি

বললেন, 'দয়ার কথা বাদ দাও মা, তুমি যার নাম বললে তার ব্যাপারে আমি খুবই হতাশ হয়ে গেছি।'

মিঃ গ্রীমউইগ তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, 'ছোকরা বদ না হয়ে যেতে পারে না। আমার এই অনুমান যদি সত্যি না হয় তাহলে আমি নিজেই আমার মাথা চিবিয়ে খাবো।'

রোজ্ প্রতিবাদ করে উঠলো, 'আপনার মাথা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, তবে আমার কথা শুনুন, আপনারা যাকে বদ বলে চিহ্নিত করছেন, আসলে সে কিন্তু অত্যন্ত ভালো ছেলে. এমন সৎ ছেলে বড় একটা দেখা যায় না।'

গ্রীমউইগের মুখটা গোমড়া হয়ে উঠতে দেখা গেলো, 'আমার বয়স একষট্টি, আমার দীর্ঘজীবনে অনেক ভালো-মন্দই তো দেখলাম. দেখলাম ওই অলিভার ছোঁড়াটা যে একটা মহা শয়তান তাতে আমার সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকার কথা নয়।'

মিঃ ব্রাউনলো মুখ কাঁচামাচু করে বললেন. 'ওঁর কথায় কিছু মনে করো না মা। উনি যা বলেন, তা মন থেকে বলেন না।'

মিঃ গ্রীমউইগ তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'হ্যাঁ আলবৎ বলি, আমি আমার অন্তর থেকে বলি।'

মিঃ ব্রাউনলো ক্রুদ্ধ হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন. 'না, কখনই নয়!'

মিঃ গ্রীমউইগ নাছোড়বান্দা। তিনি বেশ রাগত স্বরেই বললেন, 'যে এ কথা মানে না তার মাথায় ছাই পোড়া আছে।'

মিঃ ব্রাউনলো জোর দিয়ে বললেন, 'যার কথার মধ্যে এতো জেদ তার মাথাটা ভেঙে দেওয়া উচিত।'

মিঃ গ্রীমউইগ লাঠিটা মেঝেয় ঠুকে রাগ দেখিয়ে বললেন, 'সেও দেখতে চায়, তার মাথা ভাঙার সাহসটা কার?'

রোজ বিস্ময় ভরা চোখে দেখে এতো রাগারাগি বাদানুবাদের পরেও দুই বৃদ্ধ আগের মতোই কেমন হাসাহাসি, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে প্রত্যেকেই একই নস্যি-দানি থেকে এক এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে একে অপরের হাতে হাত বোলালেন। কি অদ্ভুত বিচিত্র তাদের বন্ধুত্ব।

এবার ব্রাউনলো রোজের দিকে ফিরে বললেন, 'মা, তুমি এখন তোমার আসল বক্তব্যটা কি বলো তো? ছেলেটার ভালো যাতে হয় সাধ্য মতো তার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বড় দুঃখের সঙ্গেই তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করতে হলো আমাকে।'

রোজ এবার অলিভার সম্পর্কে যা জানতো তা সংক্ষেপে বললো দুজনকেই, বললো যা কেবল ন্যান্সির কথা। তবে পরে ন্যান্সির কথা সে ব্রাউনলোকে গোপনে বলবে।

রোজের কথা শুনে ব্রাউনলোর মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'অলিভারের কথা বলে তুমি বড়ই আনন্দ দিলে মা আমায়। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে একটু বকবো, তুমি অলিভারকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?'

উত্তরে রোজ বললো, 'অলিভার আমার সঙ্গেই এসেছে, বাইরে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে সে।'

কথাটা শোনা মাত্র ব্রাউনলো এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। গ্রীমউইগ উঠে দাঁড়িয়ে অলিভারকে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন।

ব্রাউনলো বললো, 'আর একজনের কথা ভুললে আমাদের চলবে না।' কথাটা বলেই তিনি মিসেস বেডুইনকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে ব্রাউনলো অলিভারকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখোতো এখানে তোমার কোনো হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পাও কিনা?'

অলিভার কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলো না, ছুটে গিয়ে মিসেস বেড়ুইনকে জড়িয়ে ধরে ডাকলো, 'ধাইমা?'

'অলিভার না? হায় ঈশ্বর!' মিসেস বেড়ুইন আনন্দে ফেটে পড়লেন। 'তুই যে এখানে আবার ফিরে আসবি, এ আমি জানতাম কিন্তু এতদিন ছিলি কোথায় বাছা? এই তো সেই মুখ সেই চোখ, সেই হাসি। এসব যে আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, সে কি কখনো ভোলা যায়!' বলতে বলতে হাসি-কান্নায় অধীর হয়ে উঠলেন মিসেস বেড়ুইন।

মিঃ ব্রাউনলো রোজকে বললেন, 'আজ আমি রাত আটটার সময় হোটেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। আর সেই মতো মিসেস মেইলিকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রেখো, বুঝলে?'

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রোজ অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে ফিরে গেলো।

কথা মতো রাতে হোটেলে এলেন মিঃ ব্রাউনলো। সেখানে তখন ডাঃ লসবার্নও উপস্থিত ছিলেন। মিসেস মেইলি তাঁকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অলিভারের ব্যাপারটা তাঁকে জানাবার জন্য। ডাঃ লসবার্ন সব কথা শুনে খুব রেগে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলেন তিনি। মিঃ ব্রাউনলো ভালো কথায় হচ্ছে না দেখে অধৈর্য হয়ে এক ধমক দিলেন ডাক্তারকে।

তবুও ডাঃ লসবার্ন বললেন, 'আমি ওদের সব কটাকে জেলে পুরে ছাড়বো।'

'তাদের যেখানেই পাঠান না কেন,' মিঃ ব্রাউনলো কাজের কথাই বললেন, 'এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, অলিভারের বাবা-মায়ের পরিচয় খুঁজে বের করা, আর তার বাপের বিষয়-সম্পত্তির ওপর তার দাবীদাওয়ার বিষয়ে ব্যাপারটা এখন কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে হবে।'

ডাঃ লসবার্ন এবার শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে অবশ্যই ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার আর বাকীগুলোকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। ওরা নিজেরাই নিজেদের ফাঁসি আর দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করে নেবে। ন্যান্সির সাহায্যে মঙ্কসকে চিনে নিয়ে তাকে আলাদা করে ধরে আনতে হবে। কিন্তু রবিবারের আগে ওই মেয়েটার দেখা পাওয়া যাবে না। আজ সবে মঙ্গলবার, এ কয়েকদিন আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে, এমন কি অলিভারকে পর্যন্ত জানতে দেওয়া হবে না। তবে আমি আমার বন্ধু গ্রীমউইগকে আমার দলে নিতে চাই। লোকটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির হলে হবে কি, দারুণ চালাক। আমাদের কাজে লাগতে পারে।

ডাঃ লসবার্ন মিঃ ব্রাউনলোর প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আমিও আমার একজন বন্ধুকে দলে নেবো। সে ওই বৃদ্ধা মহিলার ছেলে আর এই তরুণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু।' এই বলে তিনি মিসেস মেইলি এবং রোজকে দেখিয়ে দিলেন।

মিসেস মেইলি জানালেন, এ কেসের তদন্ত যাতে সফল হয় তার খরচা বাবদ যতো টাকা লাগে তা তিনি খরচ করতে কসুর করবেন না।



ন্যান্সি যখন রোজের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন সেই রাত্রে লণ্ডনের পথ ধরে হাঁটছিল একজোড়া পুরুষ ও মহিলা। পুরুষটি রোগাটে, তার কাঁধে একটা লাঠির ডগায় একটা বোঁচকা বাঁধা। তার বয়স যে কতো বোঝা মুশকিল, ওদিকে স্ত্রীলোকটির চেহারা ঠিক তার উল্টো, মোটাসোটা, তার পিঠেও একটা বোঝা ছিল। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ভালো বলে সেটা বহন করতে তার কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। ল্যাং-ল্যাং

করা পা-দুটো লম্বা-লম্বা করে ফেলে স্ত্রীর থেকে পুরুষটি অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিল। বোঝার ভারে নুইয়ে পড়া স্ত্রীলোকটির উদ্দেশ্যে পিছন ফিরে সে বললো, 'তাড়াতাড়ি চলে আয় শার্লটি। তুই দেখছি কুঁড়ের বেহদ্দ।'

মেয়েটি ক্লান্ত গলায় বললো, 'বোঝাটা যে বড্ড ভারী নোয়া।'

'ভারী? এ তুই কি নতুন কথা শোনাচ্ছিস। ভারী বোঝা বইবার জন্যেই তো মেয়েদের জন্ম! আবার থামলি কেন? বেশ থাম, দেখবি মজা! মিঃ সোয়ারবেরী যখন ধাওয়া করে এসেতোর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবে, তখন তোর এই কুঁড়েমির ঠেলা বুঝতে পারবি।'

শার্লটি বলে, 'শুধু আমাকে বলছো কেন? তুমি কি বাদ যাবে ভেবেছো নাকি?'

'তুই মালিকের হাতবাক্স থেকে টাকা চুরি করেছিস যে!'

'তা আমি চুরি করেছি, সে তো তোমার জন্যই!'

'কিন্তু সে টাকা কি আমি নিজের কাছে রেখেছি।'

না, নোয়া ক্লোপোল সে টাকা নিজের কাছে রাখেনি শার্লটির কাছে রেখে দিয়েছে। বিশ্বাস করে সে যে টাকাটা শার্লটির কাছে রেখে দিয়েছে তা নয়। যদি ধরা পড়ে যায় কখনো, তাহলে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে বলতে পারবে, টাকাটা সে নেয়নি নিয়েছে শার্লটি।

সাবধানে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে তারা সেণ্ট জন রোডে এসে পড়লো। নোয়া কয়েকটা সরাইখানায় ঢুঁ মেরে অবশেষে তারা ঢুকলো 'ত্রিভঙ্গ' নামে একটা খুব নোংরা সরাইখানায়। একজন ইহুদী ছোকরার কাছে সেখানে থাকার জন্যে একটা ঘরের খোঁজ করে নোয়া বললো, 'আগে আমাদের হাত-মুখ ধোয়ার জল কিছু মাংস আর মদ তো দিয়ে যাও, ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

ইহুদী ছোকরার নাম বার্নি। নোয়ার ফরমাশ মতো খাবার আর মদ নিয়ে ওপরতলায় চলে গেলো তাদের ঘরের ব্যবস্থা করার জন্য। ওপরের সেই ঘরে ঢুকতে যাবে সেই সময় ফ্যাগিন সেখানে এসে হাজির হতেই বার্নি তাকে বললো, 'নিচের ঘরে নতুন একজোড়া অতিথি এসেছে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হলো, ওরা পলাতক, তোমার পথেরই পথিক সে।' খাবার পর নোয়া আর শার্লটি সেই ঘরে এসে ঢুকলো।

ফ্যাগিন আড়াল থেকে ওদের গোপন কথাবার্তা শুনতে থাকলো। নোয়া ক্লোপোল তখন শার্লটিকে বলছে, 'আমি ভদ্রলোক হতে চাই।'

'আর আমিও তো তাই হতে চাই।' শার্লটি বলে, 'কিন্তু রোজ রোজ আর হাত বাক্স ভাঙা যাবে না!'

'চুলোয় যাক তোর হাত-বাক্স! এটা ছাড়াও ভাঙার আরো অনেক কিছু আছে, যেমন ধর ছেলেমেয়েদের হাতব্যাগ, ডাকগাড়ি, ব্যাঙ্ক, বাড়ি আরো কতো কি! একটা লুঠেরার দলে ঢুকে যাওয়াই আমার ইচ্ছে। তাছাড়া তুই একাইতো পঞ্চাশটা মেয়ের সামিল। তোর মতো চতুর আর ধড়িবাজ মেয়ে আমি এর আগে কখনো দেখিনি।'

নোয়ার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে শার্লটি আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলো। নোয়া আরো বললো, 'আমি একটা লুঠেরা দলের সর্দার হতে চাই।'

এই সময় ফ্যাগিন ঘরে ঢুকে কিছু মদ আনার ফরমাশ দিয়ে নোয়াকে জিজ্ঞেস করলো, 'মশায়ের বুঝি মফঃস্বল থেকে আসা হচ্ছে?'

নোয়া পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'বুঝলেন কি করে?'

নোয়ার জুতোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফ্যাগিন বললো, 'এ শহরে এতো ধুলো তো নেই।'

'বাঃ আপনার নজর দারুণ প্রখর তো। দেখেছিস শার্লটি, কি সাংঘাতিক নজরদার লোক উনি।'

ফ্যাগিন তার কথার জের টেনে বললো, 'শহরে থাকতে গেলে নজর থাকা চাই বইকি! এখানে পুরুষকে যে সব সময় হাতবাক্স, মেয়েদের হাতব্যাগ, বাড়ি, ডাকগাড়ি আর ব্যাঙ্ক লুঠ করতে হয়।'

কথাটা শুনেই নোয়া ভয়ে শিউরে উঠলো, তার মুখটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

ফ্যাগিন তার মনোভাব টের পেয়ে তার কাছে এসে নিচু গলায় বললো, 'তোমার ভাগ্য ভালো যে তোমাদের কথাগুলো কেবল আমিই শুনেছি।'

নোয়া সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'আমি কিন্তু কিছুই নিইনি, এসব ও মেয়েমানুষটার কাজ।'

'যেই নিয়ে থাক না কেন, তাতে ক্ষতি কিছু নেই। এই 'ত্রিভঙ্গ' সরাইখানা লণ্ডনে খুবই নিরাপদ জায়গা। আমিও তোমার পথেরই পথিক। এই সরাইখানার সবাই তাই। তাই তুমি ঠিক জায়গাতেই এসে হাজির হয়েছো ভায়া। আমার এক বন্ধু আছে, যে তোমার মনের ইচ্ছে পুরণ করতে পারে।' এই বলে ফ্যাগিন শার্লটিকে তাদের ঘরে মালপত্রর রেখে আসতে বললো। শার্লটি চলে গেলে পর ফ্যাগিন জানতে চাইলো, 'তুমি আমার সেই বন্ধুর দলে যোগ দিতে রাজী আছো তো?'

নোয়া জানতে চাইলো, 'বন্ধুটি কি ধরনের ব্যাপারী?'

'ব্যবসায়ীদের শিরোমণি আর পাক্কা শহুরে সে। তার দলে কোনো গেঁয়ো লোকের জায়গা নেই। তবে গেঁয়ো লোকদের জায়গা হতে পারে একটা শর্তে, তার দলে ঢুকতে হলে তুমি মিঃ জোয়ারবেরীর হাত-বাক্স ভেঙে যে কুড়ি পাউণ্ডের নোটগুলো চুরি করেছো, তার সবটাই প্রবেশমূল্য হিসেবে তাকে দিতে হবে।' ফ্যাগিন আরো বোঝালো নোয়াকে, এই নোটগুলো সে বাজারে ভাঙাতে গেলে ধরা পড়ে যাবে। কারণ সেই সব নোটের নম্বরগুলো নিশ্চয়ই মিঃ সোয়ারবেরীর কাছে আছে।

নোয়া জিজ্ঞেস করলো, 'বেশ তা না হয় হলো, মাইনে কতো পাবো আমি?'

ফ্যাগিন মুখটা ঝামটা দিয়ে উঠলো, 'মাইনে?' মাইনে আবার কিসের শুনি! বিনি পয়সায় থাকতে পাবে, মদ তামাক খেতে পাবে, তাছাড়া তুমি আর তোমার বান্ধবী যা চুরি করবে তারও অর্ধেক অংশ পাবে।'

অন্য সময় হলো অর্থপিশাচ নোয়া এতো কমে রাজী হতো না, কিন্তু এখন প্যাঁচে পড়ে গিয়ে সে কোনোরকমে ঢোক গিলে বললো, 'কিন্তু আমি হালকা কাজ নিতে চাই।'

'বেশ তো,' ফ্যাগিন বললো, 'তুমি তো তোমার বান্ধবীকে বলছিলে, গোয়েন্দাগিরির কাজ পেলে তোমার ভালো লাগবে। আমার বন্ধুরও একজন গোয়েন্দা দরকার।'

'কিন্তু তাতে তো আয় বলতে কিছু হবে না।'

'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আচ্চা, বুড়িদের হাতব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার কাজটা তোমার কেমন লাগবে?'

'কিন্তু ও কাজে ঝামেলা অনেক,' নোয়া আপত্তি করে, 'বুড়িরা বড্ড বেশী চিৎকার করে, তাই ধরা পড়ে যাবার ভয় অনেক। অন্য কোনো কাজের কথা বলো।'

'বেশ, তাহলে ছোকরা-ছিনতাই করো?'

'সে আবার কি ধরনের কাজ শুনি?'

'ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সময় টাকা বা খুচরো পয়সা নিয়ে দোকান-বাজারে যায় জিনিস কিনতে। সেই সময় স্রেফ তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া, তারপর তাদের হাতের পয়সা তোমার হাতে চালান করে দেওয়া, এই কাজ আর কি? কোনো ঝামেলা নেই।'

'ঠিক আছে, এ কাজটাই আমার ঠিক মনের মতো হবো। এটাই আমি করতে চাই।'

এইসময় শার্লটি ফিরে এলো। কথা হলো, কাল বেলা দশটার সময় ফ্যাগিন আসবে তার বন্ধুর সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। ফ্যাগিনের কাছে নোয়া তার নাম বললো বোল্টার আর শার্লটিকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলো, এর পর ফ্যাগিন চলে গেলো।



এ ক'দিনে ন্যান্সি বেশ রোগা হয়ে গেছে। সব সময় ঘরের মধ্যে বসে থাকে উদাসভাবে। অকারণ হেসে ওঠে। নিজের মনেই চমকে উঠে সে ভাবে, তবে কি সে পাগল হয়ে যাচ্ছে? ফ্যাগিনের মনে সন্দেহ জেগেছে তার এমন আচরণে। ফ্যাগিন বেশ ভাল করেই জানে যে, তার দলের সেরা মেয়ে ছিল ন্যান্সি, দলের গোপন খবর সে শুধু তাকেই জানাতো, সব ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করতে সে। সেই ন্যান্সি আজ দলছাড়া। সাইকসের নোংরা ঘরের এক কোণে কার্যত বন্দী হয়েই আছে বলা যায়। এর ফলে স্বভাবতই ফ্যাগিনের মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

রবিবার রাতে সাইকসের আস্তানায় বসে ফ্যাগিন তাদের পরবর্তী কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করছিল, এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং করে এগারোটা বাজলো। সাইকস বলে, 'কাজ-কর্মের পক্ষে আজকে-র রাতটা খুবই চমৎকার, কি বলো ফ্যাগিন?'

ফ্যাগিন কোনো উত্তর না দিয়ে ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলো। সাইকস দেখলো। ন্যান্সি বাইরে যাবার পোশাক পরছে। সাইকস চিৎকার করে উঠলো, 'এতো রাত্রে চললে কোথায় শুনি?'

'আমি নিজেই জানি না কোথায় যাচ্ছি।'

'ওসব ন্যাকামো রাখো!' সাইকস ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'কোথায় যাচ্ছো, না বললে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।'

আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইলো ন্যান্সি। সাইকসও নাছোড়বান্দা, সে তখন ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বললো, 'যেখানে আছো, সেখানেই চুপটি করে বসে থাকো।'

ঘরের ভেতর থেকে কান্নার মতো করে ন্যান্সি চিৎকার করে উঠলো, 'বিল, তুমি আমার কি ক্ষতি যে করছো জনো না। তোমরা দুজনে আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। ভালো চাওতো, এখনি দরজা খুলে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও এই মুহূর্তে। মাত্র একটা ঘণ্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দাও!' এই বলে ন্যান্সি মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

ন্যান্সির একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে সাইকস চোখ লাল করে বলে উঠলো, 'চুপ কর শয়তানী। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়া!'

'উঠবো না। যেতে না দিলে এখান থেকে কিছুতেই উঠবো না।' ন্যান্সি চিৎকার করতে লাগলো।

সাইকস তখন তাকে টেনে-হিঁচড়ে পাশের একটা ছোট কুঠরীর মধ্যে আটকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো।

গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ন্যান্সি কিছুটা শান্ত হলো, বাইরে যাবার আশা ছেড়ে দিলো সে।

সাইকস দুঃখ করে বললো ফ্যাগিনকে, 'ভেবেছিলাম তবে বুঝি পোষ মানিয়েছি। কিন্তু দেখলাম, এখনো ঠিক আগের মতোই বেয়াদপ, বেয়াড়াই রয়ে গেছে।'

ফ্যাগিনের কথা শুনে ন্যান্সি শব্দ করে হেসে উঠলো।

চলে যাবার সময় ফ্যাগিনকে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো ন্যনসি বাতি হাতে নিয়ে। তাকে একা পেয়ে ফ্যাগিন বললো, 'ন্যান্সি, তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। সাইকস নিজেই একটা

বেয়াদপ। তোমার কদর বোঝে না সে। সাইকসের হাত থেকে যতো তাড়াতাড়ি তুমি রেহাই পাও তার ব্যবস্থা করবো খুব শিগ্‌গীর।'

ন্যান্সি চুপ করে শুনে গেলো ফ্যাগিনের কথাগুলো। তার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে ফ্যাগিন বুঝে গেলো, তার কথাটা ন্যান্সির মনে ধরেনি।

রাস্তায় নেমে ন্যান্সির আজকের অমন অদ্ভুত আচরণ আর একবার পর্যালোচনা করে দেখলো। ন্যান্সি কেনই বা এতো রাত্রে এক ঘণ্টার জন্য বাইরে বের হবার জেদ ধরলো, বেরোতে না দিলে ফল ভালো হবে না বলে সাইকসকে শাসালোই বা কেন? এর থেকে ফ্যাগিনের সন্দেহ হলো, ন্যান্সি বোধহয় গোপনে কোনো কাজকারবার করছে, অথচ দলের কেউ তা জানে না, এমনকি সাইকসও তা জানে না। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকলো না ফ্যাগিনের। যতোই সে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে ততোই তার সন্দেহ বেড়ে যায় ন্যান্সির ওপর। অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করলো, ন্যান্সির ওপর গোপনে নজর রাখার ব্যবস্থা করবে।

পরের দিন ভোরবেলা ফ্যাগিন তার নতুন সহকর্মীর দেখা পেলো। সে ফিরে এসেই গাদা গাদা খাবার গিলতে শুরু করলো। ফ্যাগিন তাকে ডাকতেই নোয়া বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনো কাজ করতে আমাকে বলো না।'

মনে মনে নোয়ার মুণ্ডপাত করতে করতে ফ্যাগিন বললো, 'তা খেতে খেতে তোমার কথা বলতে কোনো অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই?'

'না, হবে না। বরং কথা বলতে বলতে খেলে বেশী খাওয়া হয়ে যায়।' এই বলে নোয়া বেশী করে খানিকটা রুটি কেটে নিয়ে বললো, 'শার্লটি আবার গেলো কোথায়?'

'তাকে আমি একটা অকাজের অজুহাত দেখিয়ে বাইরে পাঠিয়েছি তোমার সঙ্গে এখানে বসে গোপনে কিছু আলোচনা করার জন্য।' এখানে একটু থেমে ফ্যাগিন আবার তোষামোদের সুরে বললো, 'কাল কিন্তু তোমার কাজ খুব ভালো হয়েছে, প্রথম দিনেই ছ'শিলিং-ন'পেন্স। মনে হচ্ছে, এরকম ছোকরা-ছিনতাই করেই তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।'

মিষ্টি মিষ্টি কথায় নোয়াকে খুশী করে ফ্যাগিন এবার তার মতলবের কথাটা পাড়লো। 'আমার জন্যে তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়, স্রেফ দলের একটা মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। তাকে জানাতে হবে, সেই মেয়েটা লুকিয়ে কোন্ জায়গায় কাদের সঙ্গে দেখা করে, কি ধরনের আলোচনা করে তাদের সঙ্গে বা কাদের কাছ থেকে কিরকম পরামর্শই বা নেয়। এসব খবর সংগ্রহ করে ফ্যাগিনকে গোপনে জানাতে হবে, আর এই সামান্য কাজের জন্য ফ্যাগিন পুরস্কার হিসেবে নোয়াকে এক পাউণ্ড বকশিশ দেবে।' টাকার অঙ্কটা ফ্যাগিন একটু জোর দিয়ে বললো, যাতে নোয়ার মন গলে যায়।

নোয়া তার টোপটা গিলে ফেলে জিজ্ঞেস করলো, 'তা আমাকে কোথায় যেতে হবে শুনি?'

উত্তরে ফ্যাগিন বললো, 'আমি সময় মতো তোমাকে তা জানিয়ে দেবো। যাই হোক তুমি তৈরী থেকো।'



একদিন ফ্যাগিন ন্যান্সির ওপর তার সন্দেহের কথা সাইকসকে বললে সে হেসে খুন ফ্যাগিনের ভোঁতা মগজ দেখে। সাইকস বলে, 'মানছি ন্যান্সি খুব জেদী মেয়ে, ইচ্ছে করলে সে অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু তাই বলে বেইমানী সে করবে না কখনো। তাছাড়া সে আমাকে—

ফ্যাগিন বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু যদি সে বেইমানী করে তাহলে কি করবে?'

সাইকস স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'সকলের যা করা হয় ওর বিরুদ্ধেও তাই করবো। যেদিন শুনবো আমার সঙ্গে বেইমানী করেছে, সেদিনই ওকে খতম করে দেবো।'

'কথাটা তোমার মনে থাকে যেন। এর খেলাপ করো না।' ফ্যাগিন গম্ভীরভাবে বললো।

ফ্যাগিন লক্ষ্য করে, সাইকস আজকাল শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ির বাইরে বেরোয় না। তাই ন্যান্সিরও বেরোবার সুযোগ পাচ্ছে না বলে তার ওপর থেকে সন্দেহের মেঘটা কিছুইতে কাটছে না। এসব কথা ভেবেই ফ্যাগিন ঠিক করলো, সাইকসকে বাইরের একটা কাজে পাঠাবার চেষ্টা করবে এবং কাজটা পেয়েও গেলো সে। মোটা টাকা পাওয়ার লোভে সাইকসও কাজটা হাতে নিলো এবং ঠিক করলো আগামী রবিবার রাতে সবাই যখন আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকবে। তখন সে ফ্যাগিনের দেওয়া কাজটা হাসিল করবে।

রবিবার সন্ধ্যার একটু আগে ফ্যাগিন হাসতে হাসতে এসে নোয়াকে বললো, 'মনে হচ্ছে, সেই মেয়েটা আজ রাতে বাড়ি থেকে বেরুবে। যে লোকটাকে সে ভয় করে, সেও আজ রাতে বাড়িতে থাকবে না। ভোরের আগে সে ফিরছে না। অতএব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।' তারপর ফ্যাগিন তাকে তাদের সরাইখানায় নিয়ে এসে আড়াল থেকে ন্যান্সিকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'এই মেয়েটির পিছনেই তোমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

রাত এগারোটায় ন্যান্সি বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নোয়া দূর থেকে তার পিছু নিতে শুরু করলো। রাত সোয়া-এগারোটা নাগাদ লণ্ডন ব্রিজের ওপর দুটো মানুষকে দেখা গেলো ন্যান্সির সামনে ও পিছনে। নোয়া খানিকটা তফাতে থেকে অতি সাবধানে ন্যান্সির পিছু নিয়ে চলতে থাকে।

গভীর রাতের ঘন আঁধারে ব্রিজের ওপর রাতে আশ্রয় নেওয়া গৃহহারাবা ন্যান্সি ও নোয়াকে তেমন করে চিনতে পারলো না। নদীর ওপারে কুয়াশার ঢল নেমেছে। তারই মাঝে দু'একখানা নৌকোর আলো কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠেছে আবছাভাবে।

মিনিট-দুয়েক পরে সেখানে একটা ভাড়াটে গাড়ি এসে থামলো। সেই গাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নামলেন এক তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক হলেন মিঃ ব্রাউনলো এবং তরুণীটি হচ্ছে রোজ।

ন্যান্সি দ্রুতপায়ে তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এখানে নয়, চলুন ওই ব্রিজের সিঁড়ির ওপর।' এই বলে সে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলো। দূর থেকে ন্যান্সির আঙুল দেখানো দেখে নোয়া আগে-ভাগেই পা টিপে টিপে সিঁড়ির নীচে গিয়ে নিজেকে আড়াল করলো।

ন্যান্সির পিছন পিছন কিছুদূর যাবার পর মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'আমি আর এগোতে দেবো না আমার সঙ্গিনীকে, অনেক দূর এগিয়েছি তোমাকে খুশী করার জন্য।'

'আমাকে খুশী করার জন্য?' জোরালো গলায় প্রতিবাদ করে উঠলো ন্যান্সি। 'আমি তো আগেই বলেছি, আপনাদের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার ভয় করছে। জানি না হয়তো এটা মৃত্যু-ভয়! রক্তমাখা লাশের চেহারা যেন সারাদিন আমার চোখে ভাসছে। সন্ধ্যার পর একখানা বই পড়ছিলাম, মনে হলো, ছাপার অক্ষরগুলো যেন রক্তমাখা রয়েছে।'

মিঃ ব্রাউনলোকে ন্যান্সির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করলো রোজ।

মিঃ ব্রাউনলো জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে আসার জন্য তোমায় কেউ সন্দেহ করতে পারে নাকি?'

উত্তরে ন্যান্সি বললো, 'না তা করবে না কেউ।'

মিঃ ব্রাউনলো ন্যানসিকে বলে ফ্যাগিনকে ধরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু ন্যান্সি রাজী হলো না। যুক্তি

দেখিয়ে সে বলে, 'হয়তো সে বদ লোক, কিন্তু আমিও তো ভালো মেয়ে নই। আমরা এক সাথে বাস করি, ইচ্ছে করলে আমারও ক্ষতি করতে পারতো সে, কিন্তু তা সে করেনি।'

মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে মঙ্কসকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আর তোমার মত না নিয়ে ফ্যাগিনকে আদালতে তুলবো না।'

ন্যান্সি নিশ্চিত হতে রোজকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনিও কি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমিও এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

এর পর মিঃ ব্রাউনলো মঙ্কসের ব্যাপারে এবং তার চেহারার বিবরণ জানতে চাইলো। ন্যান্সি যা যা জানতো সব খুলে বললো রোজ এবং মিঃ ব্রাউনলোকে।

সব শোনার পর মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'তার গলায় কি একটা লাল দাগ আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক তাই! তা আপনি তাকে চেনেন নাকি?

'হ্যাঁ, মনে হয় তাকে আমি চিনি। যাকগে সে কথা। তুমি আজ আমাদের বড় উপকার করলে। এখন বলো, তোমার জন্যে আমরা কি করতে পারি?'

'কিস্সু নয়,' ন্যান্সি অনীহা প্রকাশ করলো।

তবু মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'তুমি একজন সহৃদয়া রমণী। একটা অসহায় অনাথ ছেলেকে রক্ষা করবার জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তুমি এখানে এসেছো। তোমাকে তোমার পুরোনো সাথীদের কছে ফিরে যেতে দিতে চাইনা আমি। ওরা তোমাকে খতম করে ফেলবে। তাই তুমি যদি চাও তো কাল ভোর হবার আগেই এদেশ থেকে বহুদূরে বিদেশের কোনো ভালো জায়গায় তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। তুমি শুধু রাজী হয়ে যাও, তারপর যা করার আমি করবো।

ন্যান্সি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিয়ে বললো, 'না, আমি আমার পুরোনো জীবন থেকে কিছুতেই সরে যেতে পারি না। কারণ অনেকদূর এগিয়ে গেছি, আর সেখান থেকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'তাহলে কি আর করা যাবে। যাই হোক, আমরা এখন চলি।'

তাঁরা চলে যেতেই কান্নায় ভেঙে পড়লো ন্যান্সি। তারপর সে তার দুর্বল শরীরে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলো সেখান থেকে।

ওদিকে নোয়া যখন উঁকি মেরে দেখলো, সবাই চলে গেছে, সেও তখন তার লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্যাগিনের আড্ডার দিকে এগিয়ে গেলো।



ফ্যাগিন তার আস্তানায় বসে আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে, চোখ দুটো লাল টকটকে। মেঝের ওপরে একখানা জাজিমে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে নোয়া। ন্যান্সির ওপর ঘেন্নায় ও রাগে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে ফ্যাগিনের মন। ন্যান্সি তাকে ধরিয়ে দিতে চায়নি, নোয়া তার হয়ে যতোই সাফাই গাক না কেন, ফ্যাগিন তার কথা বিশ্বাস করেনি।

এই সময় একটা বাণ্ডিল হাতে সাইকস সেখানে এসে হাজির হলো। বাণ্ডিলটা ফ্যাগিনের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললো, 'এটা নিরাপদ জায়গায় তুলে রাখো, অনেক কষ্ট করে এটা জোগাড় করতে হয়েছে।'

বাণ্ডিলটা আলমারিতে তুলে রেখে ফ্যাগিন স্থির চোখে সাইকসের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে প্রতিহিংসার ছায়া।

সাইকস ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার ফ্যাগিন, অমন লাল চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন? তুমি কি আমাকে মারবার মতলব করছো?'

'না, না, তোমাকে মারতে যাবো কেন? তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই।'

সাইকস এবার তার পকেটে লুকোনো পিস্তলটায় হাত রেখে মৃদু হেসে বললো, 'না থাকলেই ভালো, নইলে আমাদের মধ্যে খুনোখুনি হয়ে একজনকে হয়তো টেঁসে যেতে হতো।'

সাইকসের কথায় পাত্তা না দিয়ে ফ্যাগিন এবার কাজের কথায় এলো, 'বিল, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।'

'বেশ তো বলেই ফেলো' সাইকস তাড়া দিয়ে বলে, 'নইলে এরপর দেরী হতে দেখলে ন্যান্সি হয়তো ধরে নেবে যে, আমি মারা গেছি।'

'তা সে তোমাকে মেরে ফেলার পথ তৈরী করেই এসেছে আজ। আচ্ছা মনে করো, এই যে লোকটা ওখানে পড়ে ঘুমোচ্ছে,' এই বলে সে ঘুমন্ত নোয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলো ফ্যাগিন, 'ও যদি আমাদের দুশমনদের কাছে গিয়ে আমাদের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়, যদি আমাদের আস্তানার আর আমাদের কারোর কারোর চেহারার বিবরণ দিয়ে আসে, তাহলে তুমি ওকে কি করবে?'

'তাহলে আমি জুতোর তলার কাঁটা দিয়ে মাড়িয়ে ওর মাথাটা ঝাঁঝরা করে দেবো।'

'শপথ নিয়ে বলছো তো?'

'হ্যাঁ, এখনই পরখ করে দেখতে পারো আমাকে।'

'ধরো যদি চার্লি বা ধুরন্ধর এমন জঘন্য কাজ করে? কিংবা—'

'সে যেই হোক না কেন, আমার কাছে কোনো বাছবিচার নেই। আমি তাকে ওইরকম সাজাই দেবো।'

সাইকসের মুখ থেকে একথা শুনে ফ্যাগিন এবার নোয়াকে ডেকে তুলে তাকে ন্যান্সির গত রাতের গোপন অভিযানের কথা বলতে বললো।

নোয়া সুযোগ পেয়ে কোনোরকম রা'খ-ঢাক না করেই খোলাখুলি ভাবে বলে যেতে লাগলো, কিভাবে সে ন্যান্সির পিছু পিছু ধাওয়া করে লণ্ডন ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েছিল, আর কিভাবে ন্যান্সি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তরুণী রোজের সঙ্গে দেখা করে মঙ্কসের কথা তাদের বলে দিয়েছিল।

'ওহো এই কথা? শয়তানী, কি ভয়ঙ্কর শয়তানী!' এই বলে চিৎকার করতে করতে সাইকস ছুটে দরজার দিকে মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেলো। ব্যাপারটার সাংঘাতিক পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে। এমন কিছু অনুমান করে নিয়ে ফ্যাগিন দৌড়ে গিয়ে সাইকসের হাত ধরে ফেলে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো বটে। কিন্তু তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো সাইকস। তবু তার উদ্দেশ্যে ফ্যাগিন শেষ চেষ্টা করার জন্য বললো, 'সাইকস, ন্যান্সির ওপর খুব বেশী অত্যাচার করো না। তা করলে আমাদের দলের সকলেরই সমূহ বিপদ ঘটবে।'

সাইকস কোনো জবাব না দিয়েই ছুটতে ছুটতে তার নিজের আস্তানায় এসে হাজির হলো এবং ন্যান্সিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো।

ন্যান্সি তাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বললো, 'বিল তুমি? কিন্তু তুমি অমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?'

তেমনি হিংস্র আক্রোশে সাইকস মুহূর্তের জন্য ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে থেকে তার টুঁটি টিপে ধরে তাকে ঘরের এককোণে টেনে আনলো এবং হাত দিয়ে সজোরে তার মুখ চেপে ধরলো।

'বিল, আমি চেঁচাবো না, একটুও কাঁদবো না, শুধু আমাকে খুন করার আগে একবার বলো, আমি তোমার কি এমন ক্ষতি করেছি যে, তুমি আমাকে এভাবে—'

সাইকস দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'শয়তানী, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস? জানিস, কাল রাতে তোর

পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছিল। তুই লুকিয়ে যেখানে গেছিলি আমাদের সর্বনাশ করার জন্য, ওদের যা বলে এসেছিস সেখানে, তা সবই আমি জানি। বেইমান কোথাকার!'

ন্যান্সি আর্তনাদ করে উঠলো। 'বিশ্বাস করো বিল, আমি তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি, সত্যি বলছি, আমি তোমার সঙ্গে বেইমানী করি নি। উঃ বড্ড লাগছে, মরে গেলুম বিল, বিল আমাকে মেরো না।'

'বেইমানকে বাঁচিয়ে রাখা আমার ধর্ম নয়, মরতে তোকে হবেই!' এই বলে সাইকস এবার ন্যান্সির গলা টিপে ধরলো এক হাতে, আর অন্য হাতে তার পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলো। কিন্তু প্রচণ্ড রাগের মাথায়ও তার খেয়াল হলো, পিস্তলের শব্দে লোক জানাজানি হয়ে যাবে, আর তাতে হয়তো তাকে খুনের দায়ে হাতে নাতে ধরা পড়তে হবে। তাই সে পিস্তলের উল্টো দিকটা দিয়ে ন্যান্সির কপালে ও মুখে বারবার সজোরে আঘাত করতে লাগলো। ন্যান্সি সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেলো তার কপালের ও মুখের ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। সাইকস তবুও থামলো না, ন্যান্সির রক্তমাখা মুখের ওপর ক্রমাগত প্রচণ্ড আঘাত হানতে লাগলো সে। ন্যান্সি বিড়বিড় করে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শেষ প্রার্থনা জানালো। সব কথা বেরুলো না। শেষ দিকে তার ঠোঁট দুটো কেবল সামান্য একটু নড়ে উঠলো তারপর ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটো বুজে গেলো চিরদিনের মতো। সাইকস তাতেও নিশ্চিত হলো না। ন্যান্সির দেহে প্রাণের বিন্দুমাত্র স্পন্দন থাকতে সে তাকে ছাড়বে না। তাই একটা ভারী লাঠি দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগলো মৃত ন্যান্সিকে। তারপর সে একখানা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো ন্যান্সির দেহটা। পড়ে রইলো শুধু রক্ত আর মাংস, নরম তুলতুলে মাংস আর চাপ চাপ রক্ত।

তারপর সাইকস আগুন জ্বেলে লাঠিটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেললো। হাতমুখ ধুয়ে পোশাক ঘষে ঘষে রক্তের দাগগুলো মুছে ফেললো। এর পর সে তার প্রিয় কুকুরটাকে ডেকে খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে চললো সে নতুন আস্তানার খোঁজে।

।। তেত্রিশ ।।

তখন সন্ধ্যা। নিজের বাড়ির সামনে এসে মিঃ ব্রাউনলো গাড়িটা থামালেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই দু'জন লোক মঙ্কসকেও গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলো। মঙ্কস ঘরে ঢুকতে অস্বীকার করলে মিঃ ব্রাউনলো শাসালেন, 'ঘরে না ঢুকলে তোমাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেবো।' মঙ্কস ভয় পেয়ে বাধ্য ছেলের মতো ঘরে এসে ঢুকলো। তবে সে মৌখিক প্রতিবাদ কবতে ছাড়লো না ঃ 'বাবার বন্ধু হয়ে চমৎকার ব্যবহার করছেন আমার সঙ্গে।'

মিঃ ব্রাউনলো পাল্টা খোঁচা দিয়ে বললে, 'তোমার বাবার বন্ধু বলেই তো এরকম ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাকে, নইলে এতক্ষণে জেলে পচে মরতে হতো তোমাকে। শুধু তোমার বাবার সঙ্গেই আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল না, তোমাদের পরিবারের আরো একজনের সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। অনেক বছর আগে তোমার পিসীমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বোধহয় ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল না সে বিয়েতে, তাই বিয়ের আগেই তোমার পিসীমা মারা যান। তবে তাঁর স্মৃতি আজও আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। আর তাইতো তোমার সঙ্গে এখনো সদয় ব্যবহার করছি এডওয়ার্ড লীফোর্ড!'

'ও নামে আমাকে সম্বোধন করছেন কেন?' মঙ্কস প্রতিবাদ করে উঠলো,'ওই নামের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'কারণ আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, রাতারাতি নাম ও পদবী পাল্টে ফেললেই মানুষ

কখনোই নিজেকে বদলাতে পারে না, আর তুমিও পারোনি। তবে তোমার এই পরিবর্তনে আমি খুব খুশী।'

মঙ্কস রেগে গিয়ে বললো, 'বাজে কথা ছাড়ুন। আমাকে কেন এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন বলুন!'

'তোমার ভাইয়ের জন্যেই তোমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছি তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য।'

'আমার কোনো ভাই নেই।'

'ধাপ্পা দিও না আমাকে।' মিঃ ব্রাউনলো ধমক দিয়ে উঠলেন। আমি তোমাদের পরিবারের সব খবরই রাখি। তোমার মায়ের অস্বাভাবিক চালচলনের জন্য তোমার বাবার জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে বসে। তোমার মা তোমাকে নিয়ে যখন বিদেশ ভ্রমণে মশগুল তখন তোমার বাবা নিজ দেশে পড়ে থাকেন নিঃসঙ্গ হয়ে দীর্ঘদিন ধরে।' এখানে একটু থেমে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'এই সময় নৌবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর বড় মেয়ের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন বলে তোমার বাবা পাকা কথাও দেন। এই সময় তোমার বাবা একজন মৃত্যু পথযাত্রী বিত্তবান আত্মীয়কে দেখতে রোমে চলে যান, কারণ ওই আত্মীয়ের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু রোমে গিয়েই তোমার বাবা এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। রোমে যাবার আগে তোমার বাবা আমার কাছে কয়েকটা জিনিস গচ্ছিত রেখে যান। তার মধ্যে তাঁর নিজের হাতে আঁকা একখানা ছবি ছিল, সেটা তাঁর বাগদত্তা স্ত্রীর। কিছুদিন আগে তোমার সেই ভাইকে আমি একটা চোর-ডাকাতের দল থেকে উদ্ধার করি। তখন কিন্তু তাকে আমি তোমার ভাই বলে চিনতাম না। পরে তার চেহারার সঙ্গে তোমার বাবার হাতে আঁকা বাগদত্তা স্ত্রীর ছবিখানার মিল দেখে অবাক হয়ে যাই। তাছাড়া তোমার ভাইয়ের চোখে-মুখের আদলের সঙ্গে তোমার বাবার আদলও একই রকম দেখতে পেয়ে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তোমার ভাইয়ের জন্ম-বৃত্তান্তের ইতিহাস জানার আগেই তাকে রাস্তা থেকে একদিন ধরে নিয়ে গেলো তোমার চুরি-ছিনতাই করা দলের লোকেরা।

মঙ্কস বীরদর্পে প্রতিবাদ করে উঠলো, 'বাঃ, এতেই আপনি আমাকে চোর আর ঠগ বলে ঠাওরালেন? আপনি নিজেই নিশ্চিতভাবে জানেন না যে, আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের কোনো ছেলে ছিল কিনা!'

মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'হ্যাঁ, আগে জানতাম না বটে, কিন্তু গত পনেরো দিনের মধ্যে সবকিছুই জেনে ফেলেছি। আর এও জেনেছি, ভাই তোমার ঠিকই হয়েছিল, আর তুমিও তাকে বেশ ভালো করেই চেনো। উইলও ছিলো তোমার বাবার, কিন্তু তোমার মা সেটা নষ্ট করে ফেলেছেন ইচ্ছে করে। কারণ সেই উইলে তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু বলা ছিল, আর তোমার মার কাছ থেকে সে খবরটাও তুমি পেয়েছো। তারপর তোমরা তোমার ভাইকে চুরি-ছিনতাই করতে শেখাও। একদিন পুলিশ তোমার ভাইকে চুরি করার অপরাধে গ্রেপ্তার করে, সে খবর শুনে তুমি খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠো। তার বাবার পরিচয়ের প্রমাণ সম্পর্কে তুমি তো নিজেই বলেছো, 'ছোকরার পরিচয়ের একমাত্র চিহ্ন এখন নদীগর্ভে। আর যে বুড়ি তার মায়ের কাছ থেকে সেই প্রমাণটা নিয়েছিল, সেও আজ কবরে শুয়ে। এর পরেও কী আমার এসব কথার প্রতিবাদ করতে সাহস পাও এডওয়ার্ড লীফোর্ড?'

একথার প্রতিবাদ করার মতো কোনো উপযুক্ত জবাব তখনি খুঁজে না পেয়ে মঙ্কস মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।



ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়ে মিঃ ব্রাউনলো মঙ্কসের বিরুদ্ধে সমানে অভিযোগ করে চললেন, 'ওই

ঘৃণ্য শয়তান ফ্যাগিনের কাছে তুমি যা বলেছো তার প্রতিটি কথাই আমি জানি। নির্যাতিত অলিভারের দুঃখে ন্যান্সির মতো ভলো মেয়েরও প্রাণ কেঁদে ওঠে, অলিভারকে বাঁচাতে গিয়ে ন্যান্সি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে, তাকে যারা খুন করেছে তার মধ্যে তুমিও আছো। তোমার গোপন কথা ন্যান্সি ফাঁস করে দিয়েছে বলেই তাকে খুন করা হয়েছে?'

এ কথা শুনে মঙ্কস খুব ভয় পেয়ে গেলো। সে এবার মিঃ ব্রাউনলোর দাবী মেনে নিয়ে তাঁর কথামতো সাক্ষীর সামনে সব কথা খুলে বলে অলিভারকে নিজের ভাই বলে স্বীকার করে নিয়ে তার বাবার উইলমতো অলিভারকে তার পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে আর আপত্তি করলো না।

এই সময় ডাঃ লসবার্ন সেই ঘরে ঢুকে খবর দিলেন, সাইকসকে গ্রেপ্তার করার জন্য চিরুনী তল্লাশী চলছে। বেচারী মেয়েটির খুনের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে।' একথা বলে ডাঃ লসবার্ন চলে গেলেন।

টেমস নদীর তীর বরাবর একটা মস্ত বড় বস্তি। লণ্ডনের অধিকাংশ চোর-ডাকাত বদমায়েশদের আড্ডা সেখানে। যতো সব অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ করে থাকে এখানকার বস্তির বাসিন্দারা। যাদের পুলিশের নজর এড়িয়ে লুকিয়ে থাকতে হয় বা অভাবের জন্য অন্য কোনো জায়গায় ঠাঁই পায়না তারাই এ সব বস্তির বাড়িগুলোতে বাস করে থাকে। এখানকারই একটা বড় বাড়ির দোতলায় একটা ঘরে পড়ন্ত অপরাহ্ন বেলায় বসে ছিল ক্র্যাকিট, টম, চিটলিং এবং এক পুরোনো ডাকাত, নাম তার ক্যাগস।

চিটলিং জানালো, বেলা দুটোর সময় ফ্যাগিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে চার্লি কোনো রকমে ঘরের চিমনী বেয়ে নিচে নেমে পালিয়ে গেছে। কিন্তু বোল্টার শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছে। ''ত্রিভঙ্গ '' সরাইখানায় সবাইকেই কয়েদ করা হয়েছে। ক্যাগস বলে, 'বোল্টার নিশ্চয়ই রাজসাক্ষী হবে।'

এই সময় সাইকসের কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো। ওরা তাকে জল খেতে দিলো। সন্ধ্যার পরেই দরজায় ঘনঘন ধাক্কার শব্দ শোনা গেলো। ক্র্যাকিটকে সাইকস জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো বাড়ির মালিক, আমাকে এখানে একটু ঠাঁই দেবে?'

উত্তরে ক্র্যাকিট একটু ইতস্তত করে বললো, 'তুমি নিরাপদবোধ করলে এখানে থাকতে পারো।'

পরমুহূর্তেই সদর দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। এবার এলো চার্লি বেটস। ঘরে ঢুকে সাইকসকে দেখা মাত্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলে উঠলো, 'আগে থেকে আমাকে তুমি একথা বলোনি কেন টোবি? আমাকে অন্য কোনো ঘরে বসতে দাও।'

সাইকস তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'চার্লি, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না?'

চার্লি আরও পিছিয়ে গিয়ে বললো, 'আমার কাছে এসো না তুমি। জানোয়ার কোথাকার!'

এ কথা শুনেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে পড়লো সাইকস।

চার্লি ডান হাত মুঠো করে গর্জে উঠলো। 'তোমরা সবাই জেনে রাখো, আমি ভয় করি না ওকে। ওরা ধরতে এলে আমি ওকে ধরিয়ে দেবো। ওর সাহস থাকে তো খুন করুক আমাকে। আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি, ওকে আমি ধরিয়ে দেবো।'

চার্লির মতো একটা ছোকরার বেইমানী সহ্য করতে না পেরে সাইকস তার দিকে হিংস্র আক্রোশে তাকাতেই চার্লি ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'আমাকে খুন করছে। কে আছো কোথায়, আমাকে বাঁচাও!' এই বলে সে অতর্কিতে সাইকসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি কিল, ঘুষি ও লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ঘরের সবাই স্তব্ধ, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এই সময়ে হঠাৎ বাইরের গলিতে মশালের আলো দেখা গেলো। সেই সঙ্গে বহু উত্তেজিত জনতার চেঁচামেচি আর

পায়ের শব্দ ভেসে এলো। তাদের মধ্যে একজমকে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে দেখা গেলো। তিনি হলেন ডাঃ লাসবার্ন। তারপরেই বাড়ির সদর দরজায় জোরে জোরে ঘা পড়তে লাগলো, সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ জনতা চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'ন্যান্সির খুনী কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে চার্লি চিৎকার করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই খুনে লোকটা এখানেই আছে। তোমরা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ো, খুনীকে ধরে নিয়ে যাও। খুনের বদলা নাও তার ওপর।'

ওদিকে সাইকস একগাছা দড়ি সংগ্রহ করে বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলো। আশপাশের বাড়ির কৌতূহলী নরনারী চিৎকার করে নীচের জনতাকে জানিয়ে দিলো, খুনে লোকটা ছাদে উঠেছে। সাইকস তখন কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে দেখলো, খালে জল নেই। শুধু কাদা আর কাদা, অনেকটা খাদের মতো, অতো উঁচু থেকে কিভাবে লাফিয়ে পড়বে তা ভাবতেই গা শিউরে উঠলো সাইকসের। তার চোখে মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

উত্তেজিত জনতার মধ্যে ছিলেন মিঃ ব্রাউনলো। তিনি এবার চিৎকার বলে উঠলেন। 'যে ওই খুনীকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনতে পারবে, তাকে আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড উপহার দেবো।' এই আশ্বাসে জনতা গর্জে উঠে সাইকসকে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

ওদিকে সাইকস তখন পালাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। ছাদের দরজা দিয়ে বাড়ির চিমনীর মাথায় উঠে দাঁড়ালো, হাতে তার লম্বা একটা শক্ত দড়ি। জনতার চিৎকার, খুনীকে ধরো! সাইকস তাদের দিকে নজর না দিয়ে দাঁত ও হাত দিয়ে অপূর্ব কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে দড়ির একটা ফাঁস তৈরী করে ফেললো, আর সেই দড়ির একটা প্রান্ত দিয়ে চিমনীর মাথাটা বেঁধে ফেললো চটপট। তার মতলব ছিল, ফাঁসটার মধ্যে মাথা গলিয়ে সেটা ডান বগলের তলা দিয়ে নিয়ে নিজের শরীরটাকে ফাঁস দিয়ে ভালো করে বাঁধতে, যাতে চিমনীর মাথা থেকে দড়ি ফেলে তা বেয়ে পিছনের খাদে নামার সময় কোনোরকম অসুবিধে না হয়। খাদের মাটিতে পড়ার কিছু আগেই দড়িটা কেটে ফেলার জন্য সে হাতে একটা ছুরি নিলো। ছুরিটা বাগিয়ে ধরে ফাঁসটার মধ্যে নিজের মাথা গলিয়ে দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় তাকে লক্ষ্য করে জনতা ভীষণ গর্জে উঠলো। সাইকস কাল বিলম্ব না করে ফাঁসটার মেধ্যে মাথা গলিয়ে দিলো। কিন্তু ফাঁসের দড়িটা ডান বগলের তলায় টেনে আনার আগেই হঠাৎ বিকারের ঘোরে সে চিৎকার করে উঠলো, 'সেই চোখ, আবার সেই চোখ!'

তারপরেই টাল সামলাতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলো সে চিমনীর মাথা থেকে আর দড়ির ফাঁসটা বগলের তলায় না আটকে গলায় জড়িয়ে গেলো তার। প্রায় পঁয়তিরিশ ফুট নীচে ঝুলে পড়লো সাইকস ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে, আর তার প্রাণহীন দেহটা দড়িতে ঝুলতে থাকলো, ছুরি ধরা তার হাতের মুঠোটা তখন শক্ত হয়ে গেছে। এই সময়ে সাইকসের কুকুরটা কোথা থেকে ছুটে এসে ঝুলন্ত দড়িটা তাক করে একটা লাফ দিলো। কিন্তু দড়ির নাগাল না পাওয়াতে একেবারে খাদের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়লো আর একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার মাথা ফেটে গিয়ে ঘিলু বেরিয়ে পড়লো।

।। চৌদ্দ ।।

মঙ্কসের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেলো। দুদিন পড়ে অলিভার গাড়িতে চড়ে তার জন্মস্থান অনাথ আশ্রমে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিলেন মিসেস মেইলি, রোজ এবং মিসেস বেডুইন। মিস্টার ব্রাউনলো তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পিছন পিছন অন্য আর একটা গাড়িতে চড়ে আসছিলেন। গাড়ি যতোই অনাথ আশ্রমের কাছাকাছি এগিয়ে এলো, ততোই অলিভারের চোখের সামনে তার ছেলেবেলার কথা ভেসে উঠতে

লাগলো। শহরের সেরা হোটেলে এসে উঠলো তারা। এই হোটেলেই দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে মিসেস মেইলি, মিসেস বেডুইন ও রোজ অলিভারকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দিনের বাকী সময়টা কাটিয়ে দিলেন নীরবে। রাত নটায় মিঃ গ্রীমউইগ ও মিঃ ব্রাউনলো সেই ঘরে এসে ঢুকলেন মঙ্কসকে সঙ্গে নিয়ে। তাকে দেখা মাত্র ভয়ে আঁতকে উঠলো অলিভার, মঙ্কসের চোখে-মুখেও নিদারুণ ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

অলিভারকে দেখিয়ে মিঃ ব্রাউনলো বলে উঠলেন, 'এডওয়ার্ড লীফোর্ড, এ হলো তোমার সৎ ভাই, তোমার বাবা আর অ্যাগনেস ফ্লেমিংয়ের একমাত্র পুত্র।'

মিঃ ব্রাউনলোর নির্দেশে মঙ্কস সবার সামনে আসল সত্যতা প্রকাশ করতে বাধ্য হলো। এই ভাবে ঃ রোমে তার ও অলিভারের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে মঙ্কসের মা স্বামীর গুরুতর অসুখের খবরটা শুনেই প্যারিস থেকে ছুটে যান সেখানে। মঙ্কসের বাবার কাগজপত্রের মধ্যে অলিভারের মায়ের কাছে লেখা একটা চিঠি এবং তাঁর উইলটা ছিল। সেই চিঠিতে তিনি অলিভারের মা অ্যাগনেসকে তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যান। আর সেই উইলে তিনি ব্যবস্থা করে যান এই ভাবে যে, মঙ্কস ও তার মা প্রত্যেকে বছরে আটশো পাউণ্ড করে বৃত্তি পাবে এবং বাকী সম্পত্তি সমান দুভাগে ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে অ্যাগনেস এবং অপর ভাগটা পাবে অ্যাগনেসের ছেলে। উইলে শর্ত ছিল, অ্যাগনেসের ছেলে যদি নাবালক অবস্থায় বদসঙ্গীদের সঙ্গে মিশে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে না যায়, তবেই সে তার বাবার সম্পত্তি পাবে, নইলে তার পাওনা ভাগটা সবই পাবে মঙ্কস, মঙ্কস আরও জানায় যে, বাবার এই চিঠি ও উইল তার মা নষ্ট করে ফেলেন। শুধু তাই নয়। মঙ্কসের মা তার সৎমা অ্যাগনেসের বিষয়টা আত্মীয়-স্বজনের কাছে অ্যাগনেসের নামে নানান মিথ্যে অপবাদ দেন। এর ফলে লজ্জায় ঘৃণায় অ্যাগনেস তার বাপের বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়।

মঙ্কস আরও বললো, মারা যাবার কয়েকদিন আগে তার মা সেই উইল ও চিঠিটার ব্যাপারে সব গোপন খবর তার কাছে ফাঁস করে দেন। মঙ্কসের মা তাকে এ কথাও বলেন, তাঁর ধারণা, অ্যাগনেসের একটা ছেলে হয়েছে, আর সেই ছেলের ব্যাপারে সে যেন সব সময় সতর্ক থাকে। এ কথা শুনে সে তার মায়ের কাছে শপথ করে, সে তার বৈমাত্রেয় ভাইকে বেকায়দায় ফেলে জেলে পাঠিয়ে ঘানি টানাবে। আর এভাবেই সে তার বাবার উইলের শর্ত অনুযায়ী তার সৎ-ভাইয়ের পাওনা-ভাগটা সে নিজেই একা ভোগ করবে। মায়ের মৃত্যুর পরে হঠাৎ একদিন রাস্তায় ফ্যাগিনের দলের লোকেদের সঙ্গে অলিভারকে দেখতে পাই। তখন ফ্যাগিনের কাছে গিয়ে মোটা টাকার লোভ দেখাই এই শর্তে যে অলিভারকে আটকে রেখে একটু একটু করে তাকে পাকা চোর বানিয়ে তুলতে হবে। মঙ্কস আরও বলে, মিসেস বাম্বলের কাছ থেকে কায়দা করে অ্যাগনেসের লকেট আর আংটি হাতিয়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।

এই পর্যন্ত বলে মঙ্কস নীরব হলো। সে থামলে পর মিঃ ব্রাউনলোর ইশারায় মিঃ গ্রীমউইগ উঠে দিয়ে বাম্বল দম্পতিকে নিয়ে এলেন। মিঃ ব্রাউনলোর ইশারায় মিঃ গ্রীমউইগ আবার উঠে গিয়ে বাইরে থেকে দুজন বুড়িকে নিয়ে এলেন সেখানে। বুড়ি দুজন জানালো, শ্যালীবুড়ি মরবার সময়ে মিসেস বাম্বলকে যা বলেছিলেন, তারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন তাছাড়া, তারা মিসেস বাম্বলকে বন্ধকীর দোকান থেকে একটা লকেট আর সোনার আংটি ছাড়িয়ে আনতে দেখেছিল। বুড়িদের কথা শুনে মিসেস বাম্বল এবার অকপটে সব কিছু স্বীকার করলেন।

মিঃ বাম্বল ভয় পেয়ে মিঃ ব্রাউনলোকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ঘটনার পর তাঁর অনাথ আশ্রমের চাকরীটা খোয়াতে হবে কিনা!

উত্তরে মিঃ ব্রাউনলো জানালন, 'অবশ্যই যাবে।'

মিঃ বাম্বল বললেন, 'এ ব্যাপারে তাঁর কোনো দোষ নেই, সব দোষ তাঁর স্ত্রীর।'

মিঃ ব্রাউনলো বললেন, 'এ অজুহাত আইন মানবে না, কারণ সব জেনেশুনেও অলিভারের পরিচয় সূত্রটা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এবং আইন ধরে নেবে যে তাঁরই নির্দেশ মতো তাঁর স্ত্রী সেই বে-আইনী কাজটা করেছেন।'

মিঃ বাম্বল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'আইন যদি এ কথা ধরে নেয়, তাহলে আইন একটা নিরেট গাধা। আইন তাহলে কখনো বিয়ে করেনি।'

একথায় সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো।

বাম্বল-দম্পতি চলে যাবার পর মিঃ ব্রাউনলোর প্রশ্নের জবাবে মঙ্কস জানালো, অ্যাগনেসের ছোটবোন রোজকে সে এর আগে বহুবার দেখেছে। সে আরও বললো, বাবাকে হারিয়ে রোজ একেবারে অনাথ হয়ে পড়ে। তখন এক গবীর মানুষ দয়াপরবশ হয়ে তাকে লালন-পালন করতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনেরা রোজের খোঁজ না পেলেও মঙ্কসের মা কিন্তু তাকে ঠিক খুঁজে বার করেন এবং তার আশ্রয়দাতাকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে অ্যাগনেসের এবং রোজের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আসেন। রোজকে তার আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই ছিল তার মায়ের মতলব। এসময়ে একজন বিধবা মহিলা রোজকে দেখে কেমন যেন করুণা হয় তার এবং নিজের বাড়িতে এনে তাকে লালন-পালন করতে থাকেন।

অলিভার রোজকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'আমি কিন্তু তোমাকে মাসী বলে ডাকতে পারবো না, আমি তোমাকে এখনকার মতো দিদি বলেই ডাকবো।



একটু পরে হ্যারী. মেইলি এসে ঘরে ঢুকলো। রোজ ও হ্যারীকে রেখে বাকী সবাই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। হ্যারী এবার রোজকে একা পেয়ে জানালো, রোজের অতীত ইতিহাস সে আগে থেকেই সব জানে। এখন রোজের সব অপবাদ যখন দূর হয়ে গেছে তাই সে আবার এসেছে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। রোজ কিন্তু এ বিয়েতে রাজী হলো না। সে বলে, যদিও সে আজ সব অপবাদ থেকে মুক্ত, তাহলেও সে গরীব আর হ্যারী শুধু বিত্তবানই নয়, আইন-সভার সদস্যও বটে।

হ্যারী এবার তাকে বললো, এ বাধাও আর নেই এখন কারণ রোজের সঙ্গে নিজের তফাতটা দূর করার জন্য সে আইন-সভার সদস্যের পদে ইস্তফা দিয়ে গ্রামের গির্জায় পাদরীর চাকরি নিয়েছে। এখন থেকে তার জীবন হবে শান্ত, সহজ-সরল এবং অনাড়ম্বর। অগত্যা এ বিয়েতে রোজের রাজী হওয়ার আর কোনো বাধাই রইলো না।



আদালতের বিচারে ফ্যাগিনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন বিচারপতি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অনেক। ছোট ছোট ছেলেদের দলে টেনে তাদের দিয়ে যতো সব অসামাজিক কাজ করাতো, তাদের

দিয়ে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই করিয়ে অর্থ উপার্জন করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়াও অসামাজিক লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সব শেষে সাইকসকে তাতিয়ে ন্যান্সিকে খুন করার মূলে ছিল সে।

অসংখ্য লোকের গালিগালাজ শুনতে শুনতে ফ্যাগিন গিয়ে ফাঁসিকাঠের সামনে হাজির হলো। মৃত্যুভয়ে তার সারা শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। ফাঁসি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ন্যান্সি ও সাইকসকে মনে পড়লো তার। তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই সে ফাঁসি কাঠেঝুলে পড়লো এক সময়।

এর পরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। তিনমাসের মধ্যেই হ্যারী ও রোজের বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পর হ্যারী যে গ্রামে ' .দরীর পদ পেয়েছিল সেখানে রোজকে নিয়ে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। মিসেস মেইলিও তাদের সঙ্গে বাস করতে গেলেন।

বাবার উইল মতো অলিভার তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েও মিঃ ব্রাউনলোর পরামর্শ মতো মঙ্কসকে একটা ভাগ ছেড়ে দিলো। মঙ্কস সে টাকা নিয়ে সুদূর আমেরিকার এক শহরে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে সে তার স্বভাব বদলাতে পারলো না। সে আবার খারাপ দলে মিশে কিছুদিনের মধ্যেই সব টাকা উড়িয়ে দিলো। তারপর জালিয়াতির অপরাধে তার সশ্রম কারাবাস হলো, জেলের মধ্যে রোগে ভুগে একদিন মারা গেলো সে।

এদিকে মিঃ ব্রাউনলো অলিভারকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে হ্যারী ও রোজের বাড়ির মাইলখানেক দূরে এসে বাসা বাঁধলেন। মিঃ গ্রীমউইগও তাঁর চিরসাথী হয়ে থেকে গেলেন সেখানে।

ডাঃ লসবার্নেরও কাজের জায়গায় মন আর বসলো না। তিনি তার ডাক্তারখানা সহকারীকে দান করে দিয়ে হ্যারীদের গ্রামের ধারে একখানা কুটীর কিনে বসবাস করতে লাগলেন।

রাজসাক্ষী হওয়ার দরুণ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায় নোয়া ক্লেপোল। সে এখন শার্লটির সঙ্গে বেসরকারী কাজ করতে লাগলো।

রোজের স্নেহে এবং মিঃ ব্রাউনলোর আদর-যত্নে অলিভার দিনকে দিন নানান বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগলো।



তারপর কত যুগই না কেটে গেছে। কিন্তু আজও পথচারীরা পথ চলতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায় অলিভারের জন্মস্থানের পুরোনো গির্জার প্রাঙ্গণে। যেখানে একটা কবরের ওপরে একখানা স্মৃতিফলকে সোনার অক্ষরে একটা নাম লেখা আছে, 'অ্যাগনেস!'

—o—